কারাগারের স্মৃতি

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

কারাগারের স্মৃতি

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

www.pathagar.com

কারাগারের স্মৃতি

- মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

প্রকাশক ঃ আবু মুসায়েব
ইতিহাস পরিষদ
ছোট বলি মেহের, সাভার।

প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট - ২০১৭

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৩৫০.০০ (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

মুদ্রণে ঃ আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা।

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (রহ.) ছিলেন একজন আলেমে দ্বীন, বরন্যে রাজনীতিবিদ, অভিজ্ঞ পার্লামেন্টেরিয়ান, দেশপ্রেমিক এবং সু-লেখক। তিনি ছিলেন গোটা দুনিয়ার ইসলামপ্রিয় জনতার অতি কাছের একজন মানুষ।

কিশোর বয়সেই তিনি ইসলামী আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। ছাত্রজীবনে ইসলামী ছাত্রসংঘ পূর্ব পাকিস্তানের সভাপতি এবং নিখিল পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের দুই মেয়াদ সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন তিনি। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশে যোগদান করেন এবং পর্যায়ক্রমে তিনি ঢাকা মহানগরী আমীর, এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী জেনারেল, সেক্রেটারী জেনারেল এবং অবশেষে জামায়াতে ইসলামীর আমীর নির্বাচিত হন।

মাওলানা নিজামী ছিলেন এদেশের গণমানুষের অতি প্রিয় নেতা। যার প্রমাণ তিনি দু'মেয়াদে পাবনা- ১ আসন থেকে বিপুল ভোটে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। দেশ গঠনে অসামান্য অবদান রয়েছে তাঁর। ২০০১-২০০৬ মেয়াদে তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে অভূতপূর্ব সাফল্য প্রদর্শন করেছিলেন। বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর জন্যও মাওলানা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। তাঁর স্বীকৃতি সরূপ ২০০৯ সালের ইউ, এস এ ভিত্তিক "দ্যা রয়েল ইসলামিক স্ট্রাটিজিক স্টাডিজ সেন্টার" কর্তৃক বিশ্বের শীর্ষ ৫০ জন ব্যক্তির মধ্যে মাওলানা ছিলেন একজন।

২০০০ সালের ১৯ নভেম্বর মাওলানা নিজামী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর নির্বাচিত হওয়ার পর ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। ইসলাম এবং ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বকে নিশ্চিহ্ন করার নানামূখী অপতৎপরতার পর ইসলামের দুশমনেরা ২০১০ সালে যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুন্যাল গঠন করে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করে মাওলানাকে। কারণ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন বিভিন্ন অপরাধের তদন্তে স্বাধীনতাত্তোর গঠিত বিভিন্ন তদন্ত কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট এবং সরকারি নথিতে কোথাও অপরাধি হিসেবে তাঁর নাম ছিল না। ট্রাইবুন্যাল গঠনের পূর্ব পর্যন্ত তথাকথিত মিথ্যা অভিযোগে সারা বাংলাদেশে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো মামলাতো দূরে থাক একটি জিডি পর্যন্ত হয়নি। এ থেকে বুঝা যায় মাওলানা নিজামীর অপরাধ কি ছিল! মূলত তার অপরাধ ছিল তিনি ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের একজন সিপাহসালার। এদেশকে যারা তাবেদার রাষ্ট্র বানাতে চায়, অবাধে লুটপাট চালাতে চায়, অবৈধভাবে স্বার্থ হাসিল করতে চায় তারা মাওলানা নিজামী ও তাঁর দল জামায়াতে ইসলামীকে প্রধান বাধা মনে করে। আর তাইতো পরিকল্পিতভাবে সর্বজন শ্রদ্ধেয় গণমানুষের এ প্রাণ প্রিয় নেতাকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে হত্যা করে।

তিনি একাধিকবার ট্রাইবুন্যালের সামনে এবং কারাগারে পরিবার-পরিজন ও আইনজীবীদের সাথে সাক্ষাতের সময় দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করেছেন- "আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ"। তাঁর সাথে কারাগারে শেষ বারের মত বিদায় দিতে যাওয়া পরিবার-পরিজন ও আত্মীয় স্বজনকে কাছে পেয়ে প্রথমেই ছোট-ছোট শিশুদের আদর করেন। তারপর পরিবারের সদস্য ও সংগঠনের নেতাকর্মীদেরকে সর্বশেষ নসিহত প্রদান করেন। অতপর শান্তমনে পরিবারের লোকদের বিদায় দিয়ে মহান মাবুদের সান্নিধ্যে চলে যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণভাবে তৈরী হয়ে কারা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলেন- "আমি প্রস্তুত কখন ফাঁসি কার্যকর হবে"? ফাঁসির মঞ্চে উঠে ফাঁসি কার্যকরের ঠিক পূর্ব মূহুর্তে সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর একত্বের ও রিসালাতে মুহাম্মদীর সাক্ষ্য "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ" উচ্চস্বরে উচ্চারণ করে সর্বশেষে মাবুদের দরবারে আকুতি জানান- "হে-আল্লাহ আমাকে শহীদ হিসেবে কবুল করে নিন"। ২০১৬ সালের ১০ মে

www.pathagar.com

দিবাগত রাতে ইসলামী আন্দোলনের এ অকুতভয় সিপাহসালার মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে চলে যান।

মজলুম এ মানুষটি ২০০৮ সালের ১৮ই মে এ্যারেস্ট হয়ে ৫৬ দিন, একই বছরের নভেম্বরে এ্যারেস্ট হয়ে ১০ দিন এবং ২০১০ সালের ২৯ জুন এ্যারেস্ট হয়ে আমৃত্যু কারাগারে বন্দী ছিলেন। কারাগারের অসহ্য স্মৃতি বর্ণনা করে গেছেন- তিনি তাঁর এই লিখনীতে। এছাড়াও এ লেখায় তিনি তাঁর অগনিত ভক্তদের অনেক জিজ্ঞাসার জবাব রেখে গেছেন।
আমরা আশা করি পাঠক সমাজ বইটি পাঠ করে উপকৃত হবেন।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

- একটি মামলা নিয়ে কথা ০৯
- ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় কারাগারে উপস্থিতি৪২
- ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অনুভূতি- ০১ ৮৬
- প্রতীক্ষার বিড়ম্বনা৯২
- সাক্ষাতের প্রতীক্ষা ও বিড়ম্বনা ১০১
- মিডিয়ার তেলেসমাতি ১১৪
- ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অনুভূতি- ০২ ১৩১
- ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অনুভূতি- ০৩ ১৪৪
- ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অনুভূতি- ০৪ ১৮৪
- ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অনুভূতি- ০৫ ২২৬
- ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অনুভূতি- ০৬ ২৩৫

- চট্টগ্রামে যাওয়া-আসার বিড়ম্বনা- ০১ ২৭১
- চট্টগ্রামে যাওয়া-আসার বিড়ম্বনা- ০২ ৩১৫
- চট্টগ্রামে যাওয়া-আসার বিড়ম্বনা- ০৩ ৩২৪
- চট্টগ্রামে যাওয়া-আসার বিড়ম্বনা- ০৪ ৩৪৬
- চট্টগ্রামে যাওয়া-আসার বিড়ম্বনা- ০৫ ৩৫৪
- চট্টগ্রামে যাওয়া-আসার বিড়ম্বনা- ০৬ ৩৬৫
- চট্টগ্রামে যাওয়া-আসার বিড়ম্বনা- ০৭ ৩৭৭
- চট্টগ্রামে যাওয়া-আসার বিড়ম্বনা- ০৮ ৩৮৮
- চট্টগ্রামে যাওয়া-আসার বিড়ম্বনা- ০৯ ৪১১
- চট্টগ্রামে যাওয়া-আসার বিড়ম্বনা- ১০

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

একটি মামলা নিয়ে কথা

১৮ মার্চ ২০১০ তারিখের জনকণ্ঠ, কালেরকণ্ঠ, সমকাল, যুগান্তর ও প্রথম আলো'র একটি সিন্ডিকেটেড রিপোর্টকে ভিত্তি করেই আমাকে, সাঈদী সাহেব ও মুজাহিদ সাহেবকে 'জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেবার' অভিযোগে অভিযুক্ত করে সাজানো মামলার কথা বলছি। পত্রিকাগুলোর সিন্ডিকেটেড রিপোর্টটি ছিল ইসলামী ছাত্র শিবিরের উদ্যোগে আয়োজিত 'সিরাতুন্নবী' অনুষ্ঠানে জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগরীর আমীর মাওলানা রফিকুল ইসলাম খানের একটা বক্তব্যকে কেন্দ্র করে।

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে তার কোন শত্রু ছিল না। সকলের কাছে তিনি ছিলেন পরম বিশ্বস্ত আল-আমীন। কিন্তু নবুওয়াত প্রপ্তির পর আল্লাহর দিকে আহ্বান জানানোর সাথে সাথে বিরোধিতা শুরু হয়। ধাপে ধাপে সে বিরোধিতা চরম আকার ধারণ করে। এটা ঐতিহাসিক ও সত্য ঘটনা। কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী অতীতেও এভাবে সকল নবী এবং রাসূলের (আঃ) দাওয়াতের বিরোধিতা করেছে। মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ রাসূল। তারপরে যেহেতু আর কোন নবী আসবেন না, অতএব মানব জাতিকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানানোর দায়িত্ব তাদেরকেই পালন করতে হবে যারা শেষ নবীর উম্মত। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন শেষে দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার আগে তাঁর উম্মতের উপরই এ দায়িত্ব অর্পণ করে গেছেন।

সর্বশেষ নবী (সা.) সহ অতীতের নবী রাসূল দ্বীনের এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যেভাবে বাধা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছেন, শেষ নবীর পদাংক অনুসারী উম্মতগণও ঐ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে একইভাবে বাধা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হবে, এটা একান্তই স্বাভাবিক। আল্লাহর কুরআন ও রাসূল (সা.)-এর হাদিসে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। ঐ সাংবাদিক বন্ধুদের যদি এ বিষয়ে কুরআন ও হাদিসের শিক্ষা সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণাও থাকত, তাহলে তাদের কারো কারো রিপোর্টে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হত না। তাছাড়া সাংবাদিকের কাজ তো বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্ট করা। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মত ক্ষোভ প্রকাশ তাদের কাজ হতে পারে না। উক্ত অনুষ্ঠানে আমি যেহেতু উপস্থিতই ছিলাম না, তাই মাওলানা রফিকুল ইসলাম আসলে কিভাবে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন, তা আমার জানার সুযোগ হয়নি। তবে দৈনিক সংগ্রাম তার বক্তব্য বিস্তারিত রিপোর্ট করেছে। দৈনিক সংগ্রামের ঐ রিপোর্ট পড়লে জনকণ্ঠ, প্রথম আলো, যুগান্তর, কালেরকণ্ঠ ও সমকালের রিপোর্ট যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং রীতিমত তথ্য সন্ত্রাস এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। আমরা এখানে দৈনিক সংগ্রাম পরিবেশিত রিপোর্ট থেকে মাওলানা রফিকুল ইসলাম খানের বক্তব্যটি উদ্ধৃত করছি। দৈনিক সংগ্রাম তার প্রকাশিত রিপোর্টে লিখে, 'রফিকুল ইসলাম খান বলেন, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা.) নবী হিসাবে যেমন শ্রেষ্ঠ তেমনি একজন মানুষ হিসাবেও তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ। আর এই শ্রেষ্ঠ মানুষটির উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কিতাবটি নাজিল হয় সেটিও নিঃসন্দেহে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ কিতাব ছিল। ঠিক এভাবেই এই কিতাবটি যে বা যারাই অনুসরণ করে জীবন গড়ার চেষ্টা করবে তারাই হবে শ্রেষ্ঠ জাতি। কিন্তু সেই শ্রেষ্ঠ মানুষটি যখনই নবী হিসাবে তার রবের প্রতি মানুষকে ডাকতে শুরু করলেন, তখনই তিনি হলেন পাগল। তার উপর নেমে এল অত্যাচার আর নির্যাতন। এমন কি তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা হল। বর্তমানে যারা কোরআন আর হাদিসের পক্ষে কথা বলছে তাদের উপর একইভাবে অত্যাচার- নির্যাতন চালানো

www.pathagar.com

হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, জামায়াতে ইসলামীর বর্তমান আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী দলের আমীর নির্বাচিত হওয়ার আগে তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিল না। কিন্তু যখনই তিনি আমীর নির্বাচিত হলেন তখন থেকেই মিথ্যা আর নানা কল্পকাহিনী বানিয়ে তার বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু হল। বর্তমানে রাজনীতি থেকে ইসলামকে আলাদা করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এই বাংলার জমিনে যেমন আল্লাহর বিধানকে ও রাসূলের আদর্শকে নিষিদ্ধ করা যাবে না, তেমনি জামায়াত ও শিবিরকেও নিষিদ্ধ করা যাবে না।'

উপরিউক্ত বক্তব্যের মধ্যে রাসূলের (সা.) সাথে কাউকে তুলনা করার বিষয়টি সাংবাদিকদের একটি অংশ কিভাবে আবিষ্কার করলেন তা ভাবতে অবাক লাগে। শুধু আবিষ্কার নয়, তারা নাকি রীতিমত ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাদের সিন্ডিকেটেড রিপোর্টে তাদের সেই ক্ষোভেরই নাকি প্রকাশ ঘটান। আসলে ক্ষোভ নয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে বক্তব্যকে বিকৃত করে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়। ঐসব পত্রিকায় উদ্দেশ্যমূলক হেডিং ও বিকৃত সংবাদ পরিবেশনের প্রতিবাদ করে মাওলানা রফিকুল ইসলামের পক্ষ থেকে বিবৃতি দেয়া হয়। কিন্তু ঐসব পত্রিকায় তার প্রতিবাদ ছাপা হয়নি। দেখা যাচ্ছে, তাদের এই বিকৃত রিপোর্টই আলোচ্য মামলার একমাত্র ভিত্তি।

কিন্তু যদি ঐ সিন্ডিকেটেড রিপোর্টই মামলার সব হয়, তাহলে তো কেবল মাত্র রিপোর্টে উল্লেখিত বক্তব্য প্রদানকারীকেই একমাত্র দায়ী করে বা বিবাদী করে মামলা করা হত। অন্যদেরকে এ মামলায় জড়ানো হল কেন? যদি ধরে নেই ঐ সভা মঞ্চে উপস্থিত থেকেও কথিত ঐ বক্তব্যের প্রতিবাদ করেননি তাদেরকেই আসামী করা হয়েছে। তাহলে প্রশ্ন, উক্ত সভা মঞ্চের সকলকে তো আসামী করা হয়নি। সভার শ্রোতারাই বা বাদ যাবেন কেন? রিপোর্টের আলোকে দেখা যায় সাংবাদিকগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। সাংবাদিকদের এই বিক্ষুব্ধতার চেয়ে তো বেশি বিক্ষুব্ধ হবার কথা শ্রোতাদের। অথচ শ্রোতাদের কোন নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার কথা কোন পত্রিকাতেই উল্লেখ করা হয়নি।

বাদী পক্ষের দাবি অনুযায়ী মাওলানা রফিকুলের বক্তব্যে উল্লাস প্রকাশ এবং হাতে তালি দেবার কারণেই নাকি মঞ্চে উপস্থিত মাওলানা সাঈদীসহ কয়েকজনকে আসামী করা হয়েছে। উল্লেখ্য কোন পত্রিকার রিপোর্টেই আমাকে এবং জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব মুজাহিদকে উপস্থিত দেখানো হয়নি। আর বাস্তব সত্য যে আমরা দুজনের কেউই উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিলাম না। মজার ব্যাপার হল ঐ সিন্ডিকেটেড রিপোর্টে শরীক একটি পত্রিকা 'কালের কণ্ঠ' একই কলামে ঐ সমাবেশের রিপোর্টের নীচে আর একটি অনুষ্ঠানে আমার এবং মুজাহিদ সাহেবের উপস্থিতির এবং বক্তব্য প্রদানের কথা উল্লেখ করেছে।

বিচারিক আদালত মামলাটি আমলে নেয়ার যোগ্য কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্যে পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টগুলো পর্যালোচনা করতেন, তাহলে অবশ্যই মামলাটি বিবেচনায় নিতেন না। আর বিবেচনায় নিলেও অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত ছিল না এমন ব্যক্তিদের নাম অবশ্যই আসামীর তালিকা থেকে বাদ দিতেন। আমাদের জানা মতে ঢাকার সিএমএম কোর্টের সংশ্লিষ্ট সম্মানিত ও বিজ্ঞ বিচারক মামলাটি অনেক দিন পর্যন্ত আমলে নেননি বা নিতে চাননি। রাজনৈতিক চাপের মুখেই আমলে নিতে হয়েছে। ফেনী জেলার আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মামলাটি শুধু পত্রিকার রিপোর্টের ভিত্তিতে আমলে নিতে রাজি হলেন। একটি মামলার আসামী হিসাবেই আমাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। বিচারিক আদালতে হাজিরা দেবার পর ঐ মামলার জামিন মঞ্জুর করা হলেও এ মামলার জামিনের আবেদন নিষ্পত্তির আগে অনেকগুলো কাল্পনিক ও সম্পূর্ণ মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার দেখানোর ও রিমান্ডের আবেদনসহ সরকার পক্ষীয় বিজ্ঞ আইনজীবীদের চাপের মুখে যে সংশ্লিষ্ট মামলা ছাড়া হঠাৎ করে এত গুলো মামলায় গ্রেফতার দেখানো ও রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের আবেদনগুলো কিভাবে উপস্থাপিত হল এবং মঞ্জুরও হল তা আজো আমার বুঝে আসেনি। আসলে সেদিন ঢাকা সিএমএম আদালতের পরিবেশ কোন আদালতের

www.pathagar.com

জন্যে মানানসই পরিবেশ ছিল এটা কোন বিবেকবান ব্যক্তির পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আদালতে উভয় পক্ষের আইনজীবীগণ স্ব স্ব পক্ষে আইনগত দিক তুলে ধরে ঠান্ডা মাথায় যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপনের কথা। কিন্তু এখানে তার পরিবর্তে পরিলক্ষিত হয়েছে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্যে রীতিমত বলপ্রয়োগের হুমকিসহ অশালীন উক্তির মাধ্যমে প্রতিপক্ষের আইনজীবীদের কথা বলতে না দেয়ার ফ্যাসিবাদী প্রয়াস এবং বিবাদীদের বিরুদ্ধে মানহানিকর ও চরিত্র হনন করার এক অশুভ প্রয়াস। যা ন্যায়বিচারের প্রতি হুমকি হিসাবেই বিবেচিত হবার যোগ্য।

ঢাকার সিএমএম আদালত বেশ পরে মামলাটি আমলে নিয়ে ২৯ শে জুন ২০১০ তারিখ হাজির হতে বলে। মামলাটি যেহেতু জামিন যোগ্য সেজন্যে আমরা যথাসময়ে হাজির হবার জন্যে মানসিকভাবে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছিলাম। ইতোমধ্যে আইনজীবীদের কৌশলগত সিদ্ধান্ত জানানো হল। সবাইকে হাজির করা হবে না, শিবিরের কয়েকজনকে হাজির করা হবে। তাদের জামিন হলে অন্যদের জন্যে পরবর্তী একটা তারিখ পাওয়া যাবে, যেটা ইতোমধ্যেই দেশের আরো কয়েকটি আদালতে হয়েছে সেদিন অবশিষ্টদের হাজির করানো হবে। দুপুরে এটিএম আজহার সাহেব জানালেন যারা হাজির হয়েছিল তাদের জামিন মঞ্জুর হয়েছে। বাকীদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত পরে জানাবে। ইতোমধ্যেই বাসা থেকে আমার বেগম সাহেবার ফোন এল টেলিভিশনে বলা হচ্ছে আমাদের বিরুদ্ধে নাকি গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে।

জোহরের নামাজ ও দুপুরের খাবার শেষে বিশ্রামরত অবস্থায় খবরটি পেলাম। বিকেল ৪টায় প্রেস ক্লাবে বিশ্ব মাদক দিবস উপলক্ষে মহানগরী আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করার কথা। উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা শেষে প্রেস ক্লাব মসজিদেই নামাজ পড়ে জামায়াতের কেন্দ্রীয় অফিসে যাবার কথা। কিন্তু মনে হল কেন্দ্রীয় অফিসে গিয়েই নামাজ পড়া যাক, তাই মগবাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিতেই প্রেস ক্লাবের গেটে গাড়ী আটকে দেয় পুলিশ ও ডিবির কর্মকর্তাবৃন্দ। আমি প্রেস ক্লাবের মসজিদে নামাজটা আদায় করে নিতে চাইলে গাড়ীটা প্রেস ক্লাবের দিকে নেয়ার চেষ্টা করতেই একজন পুলিশ কর্মকর্তা ড্রাইভারের হাত থেকে গাড়ীর চাবি ছিনিয়ে নেয়। আমাকে এই সময় ডিবির একজন কর্মকর্তা অনুরোধ করলেন, 'স্যার ডিবি অফিসে গিয়েই নামাজ আদায় করতে পারবেন। এখানে বিলম্ব করলে কোন অপ্রীতিকর সীন ক্রিয়েট হতে পারে, আপনি তাড়াতাড়ি আমাদের গাড়ীতে উঠুন।

আমি কর্মী ও দায়িত্বশীলদেরকে শান্ত থাকার অনুরোধ করে তাদের গাড়ীতে নিজেই উঠে যাই। আমাদের কথা শুনে দায়িত্বশীল কর্মীদের শান্ত করার চেষ্টা করে পুলিশের গাড়ী বের হবার সুযোগ করে দেয়। সাংবাদিক এবং ফটো সাংবাদিকদের অনেকেই ডিবি'র গাড়ীর সাথে সাথে আসতে থাকে। এক পর্যায়ে দেখি আমার গাড়ীর চাবি পুলিশ কর্মকর্তার হাতেই রয়ে গেছে। তখন তাকে বললাম গাড়ীটা প্রেস ক্লাব গেটে পড়ে থাকলে তো গাড়ীর ক্ষতির আশংকা আছে। তখন উক্ত পুলিশ কর্মকর্তা চাবিটি আমার হাতে দিয়ে দেন। আমি বললাম, এ চাবি নিয়ে এখন আমি কী করব, আমি আপনাদের গাড়ীতে উঠার সাথে সাথে দিয়ে দেননি কেন। হঠাৎ দৈনিক সংগ্রামের ফটোগ্রাফার গাড়ীর বাম জানালার পাশে থেকে ছবি তোলার চেষ্টারত তাকে ডেকে প্রেস ক্লাবের সামনে আমার গাড়ীর চাবি পৌঁছাবার দায়িত্ব দিলাম। মনে মনে উক্ত পুলিশ কর্মকর্তার খামখেয়ালীর জন্যে সাংঘাতিক বিরক্তি অনুভব করলাম।

ডিবি অফিসে এসে পৌঁছলাম। একজন ডিবি কর্মকর্তাকে অনুরোধ করে বাসায় ফোন দিয়ে আমার প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় ও ওষুধপত্র ডিবি অফিসে পাঠানোর খবরটা দেওয়াতে পেরেছিলাম। এতে একটু স্বস্তি বোধ করলাম। আসরের নামাজ আদায়ের আগেই দেখলাম মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেবকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। একটু পরে আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ সাহেবকে আনা হল। তিনজনকে পৃথক রুমে নেয়ার ব্যবস্থা করলে সাঈদী সাহেব আমার সাথে এক রুমে নামাজ আদায় পর্যন্ত থাকার কথা বলায় তারা রাজি হয়ে যায়। পরে মাগরিব, এশা এবং ফজর আমরা দুজন একই রুমে আদায়ের সুযোগ পাই।

www.pathagar.com

পরের দিন কোর্টে হাজির করার কথা। সকাল থেকেই কোর্টে যাবার প্রস্তুতি নিতে থাকি। ইতোমধ্যে ডিবি'র এডিসি মনিরুল ইসলাম সাহেবকে অনুরোধ করলাম আমাদের ব্লাড সুগার টেস্ট করার ব্যবস্থা করতে এবং সেই সাথে ব্লাড প্রেসারের অবস্থা দেখে দেবার জন্যেও। তিনি বেশ আন্তরিকতার সাথে ব্যবস্থা করলেন। তার বাসায় লোক পাঠিয়ে ব্লাড সুগার টেস্ট করার মেশিন আনিয়ে আমার ব্লাড সুগার টেস্টের ব্যবস্থা করলেন। ব্লাড প্রেসার চেক করার ব্যবস্থাও করা হলো। সারারাত কড়া লাইটের নীচে আমার মোটেই ঘুম না হওয়ার কারণে প্রেসার বেশ বেড়ে গিয়েছে বলে প্রতীয়মান হল। আমার ব্লাড প্রেসার মোটামুটি নিয়ন্ত্রণেই থাকে। কখনও বেশি বাড়লে ১৬০/৯০ পর্যন্ত উঠতে দেখেছি এর বেশি কখনও উঠে নাই। সাধারণত ১৪০/৭০ বা ৮০ তেই থাকে। কোর্টে রওয়ানার কিছু আগ মুহূর্তে এডিসি সাহেবের রুমে ব্লাড প্রেসারের রিডিং আসল ১৮০/১০০, এটা আমার জন্যে ছিল খুবই অস্বাভাবিক। ইতঃপূর্বে কোন দিনই প্রেসার এমন উঠেনি।

যাহোক দুপুরের দিকে আমাদেরকে কোর্টে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হল। কোর্টে নিয়ে ঢাকা সিএমএম কোর্টের হাজতে তিনজনকে তিনটি আলাদা আলাদা রুমে রাখা হল। এখানে দীর্ঘ অপেক্ষার পর নেয়া হয় কোর্টে। কোর্টের পরিবেশ সম্পর্কে ইতঃপূর্বে বলা হয়েছে। যে মামলায় আমাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয় এবং গ্রেফতারও করা হয়, সে মামলার কোন আলোচনাই কোর্টে শুনতে পেলাম না। তার পরিবর্তে কাল্পনিক, অসত্য ও বানোয়াট মামলায় গ্রেফতার দেখানো এবং রিমান্ডের আবেদন উঠতে লাগল। মাননীয় আদালত তাদের আবেদন মঞ্জুর করতে থাকেন।

আদালতের কার্যক্রম শেষে আবার আমাদেরকে কোর্ট হাজতে নেয়া হয়। কোর্টেও বসার কোন ব্যবস্থা ছিল না। আর গারদে (কোর্ট হাজতে) তো এ সবের বালাই নেই। আমি কোন মতে অসময়ে আসরের নামাজ আদায়ের পর দাঁড়াতে গিয়ে প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম। এভাবে কয়েকবার পড়ে যাওয়ার উপক্রম হল। পাশে থাকা পুলিশদের কয়েকজনকে আমার কথা জানাই। কিন্তু তাদের মধ্যে মানবিক কোন অনুভূতি আছে বলে মনে হয়নি। কোর্টের আদেশ না আসা পর্যন্ত দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় গারদে। একান্ত দুরবস্থার মধ্যেই সেখানেই মাগরিব আদায় করি। গারদ থেকে আমাদেরকে সরাসরি রিমান্ডে নেবে না কারাগারে নেয়ার পর নেয়া হবে, কোর্টে এ ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত আসবে, আমাদের কথা শোনার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশের লোকেরা এ ব্যাপারে কেউ কিছু বলতে পারছিল না। অবশ্য আমাদের আইনজীবীরা আশ্বস্ত করলেন এখান থেকে কারাগারেই নেয়া হবে। সেখান থেকেই পরবর্তী কার্যক্রম শুরু হবে।

যাহোক দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আমাদেরকে কেন্দ্রীয় কারাগারের উদ্দেশ্যে প্রিজন ভ্যানে উঠানো হল। ঐদিন সিএমএম কোর্টে আওয়ামী আইনজীবীদের পাশাপাশি আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগের লোকদেরকেও পরিকল্পিতভাবে জড়ো করা হয়েছিল যাতে আদালত তাদের কথামত সিদ্ধান্ত দিতে বাধ্য হয়। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে জামায়াতের সমর্থকদেরও একটা উল্লেখযোগ্য অংশের উপস্থিত হবার কথা। উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যাওয়ার আশংকা হচ্ছিল। আমি আমার পক্ষ থেকে আইনজীবীদের মাধ্যমে সবাইকে সংযত আচরণ করার এবং যেকোন মূল্যে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেই। প্রচুর র‍্যাব সদস্য ও পুলিশের উপস্থিতি সত্ত্বেও আওয়ামী সমর্থকদের আচরণ ছিল খুবই উগ্র এবং নৈরাজ্যকর। চরম নিরাপত্তা হীনতার মধ্য দিয়ে আমরা রওয়ানা হই কেন্দ্রীয় কারাগারের বাসে।

ডিবি অফিস থেকে কোর্টে রওয়ানার সময় দুপুরের খানা খাবার সুযোগ হয়েছিল কিনা ভাল করে মনে নেই। আমার মনে হয় দুপুরের খাবারের সময় হওয়ার আগেই আমাদেরকে কোর্টে পাঠানো হয়। ডিবির এডিসি সাহেবের ধারণা ছিল আমাদেরকে সরাসরি কোর্টে নেয়া হবে, খুব বেশি সময় কোর্টে অবস্থান করতে নাও হতে পারে। তিনি আমাদেরকে একটু তাড়াতাড়ি কোর্টে পাঠানোর চেষ্টা করলেন যাতে ওখানে বেশিক্ষণ থাকতে না হয়। সকাল সকাল না পৌঁছলে বিডিআরের আসামীদের শুনানির কারণে

www.pathagar.com

অনেক সময় লেগে যেতে পারে, তাই সাত সকালে আমাদের গাড়ীতে উঠানো হয়। সুতরাং দুপুরের খাবার আসলে সময়ও হয়নি, সুযোগও হয়নি।

আমি এবং সাঈদী সাহেব ডায়বেটিসের রোগী হওয়ার কারণে আমাদের দুজনেরই কষ্টের মাত্রাটা ছিল বেশি। কোর্টের কার্যক্রম শেষে কেন্দ্রীয় কারাগারে বা অন্য কোথাও পাঠাতে পারে। ডিবিতে পাঠাতেও পারে। নাও পাঠাতে পারে। তাই সাথে সংক্ষিপ্ত জিনিসপত্র প্রিজন ভ্যানেই নিয়ে নেয়া হয়। কিন্তু কোর্টের গারদে বা হাজত খানায় এগুলো ঢুকতে দেয়া হয়নি। করিডোরে রেখে দেয়া হয়।

আমাদের তিনজনকে একরুমে থাকতে দেয়া হয়নি। আলাদা আলাদা রুমে রাখা হয়। আগেই উল্লেখ করেছি ওখানেই কোন মতে জোহর এবং আসরের নামাজ আদায় করি। কোর্টে হাজিরা শেষে আবার গারদে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি। আগেই নেয়ার ব্যবস্থা হলে কারাগারে পৌঁছে অথবা পথে গাড়ীতেই মাগরিব পড়া যেতো। গারদের অস্বস্তিকর পরিবেশে নামাজ আদায় করতে হত না। কিন্তু একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাগরিব ওখানেই আদায় করতে হয়। কোর্টের অর্ডার আসা পর্যন্ত এই অস্বস্তিকর পরিবেশে অপেক্ষা করতে হয়।

ডায়াবেটিসের কারণে সকাল এগারোটায় কিছু খেতে হয়। এ জন্যে আমি সাথে লেকসাস বিস্কুটের ছোট দুটো প্যাকেট পকেটে রেখেছিলাম। আর সাথে ছিল এক বোতল পানি। ইতঃপূর্বে জরুরি অবস্থায় সরকারের আমলে যখন গ্রেফতার হই, তখন ক্যান্টনমেন্টে থানায় রাত কাটানোর পর সকালেই কোর্টে প্রেরণ করা হয়। আদালতে প্রথম প্রহরেই হাজিরা শেষে কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। সুতরাং সেদিন কোর্টের আনুষ্ঠানিকতা শেষে কারাগারে পৌঁছেই দুপুরের খাবার স্বাচ্ছন্দ্যে খেয়েছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে দুপুরের খাবার খাওয়া তো দূরের কথা রাত্রির খাবার খাওয়া ভাগ্যে জুটবে কিনা এ ব্যাপারেও যথেষ্ট সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হয়। যাহোক কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছার সাথে সাথেই কারা কর্তৃপক্ষকে আমাদের সারাদিনের অবস্থাটা অবহিত করি।

কারা কর্তৃপক্ষ জেল কোড অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে আমাদেরকে ২৬ সেলে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করলেন। পরের দিন আমাদের পরিবারের লোকদের দেখা সাক্ষাতেরও ব্যবস্থা নিলেন। ৩০শে জুন ২০১০ তারিখে রাতে আমাদেরকে সিএমএম আদালত হয়ে কারাগারে পৌঁছানো হয়। ২৬ সেলে পূর্ব থেকেই বিএনপির অন্যতম উপদেষ্টা শমসের মুবিন সাহেব ও এহসানুল হক মিলন ও আঃ সালাম পিন্টু অবস্থান করছিলেন। আমাদের আগমনের খবর পেয়েই তারা আমাদের তিনজনের খাবারের ব্যবস্থা করেন। ২৬ সেলে পৌঁছেই প্রাথমিক কুশল বিনিময়ের পরেই রাতের খানা খেয়ে সারা দিনের ক্ষুধার জ্বালাটা মিটিয়ে নিলাম। এশার নামাজ আদায়ের পরে বিশ্রামে যাবার সুযোগ হল।

১৬ দিনের রিমান্ড মাথায় নিয়ে আমরা কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছলাম ৩০ শে জুন রাতে। এরপর থেকেই রিমান্ডের পালা শুরু হবার কথা। কারাগারের পুরাতন সাথীদের অভিজ্ঞতা থেকে তারা বললেন বিকেল ৩ টার দিকে সাধারণত রিমান্ডের জন্যে নিতে আসে। আমরা মনে মনে সেভাবে প্রস্তুত হই। ইতোমধ্যে এহসানুল হক মিলন পিজি থেকে দুপুরের দিকে কারাগারে প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি কারাগারের গেটে রিমান্ডের জন্যে আমাদের নিতে এসেছে বলে জানালেন। জানালেন আমাদের পরিবারের লোকজনও গেটে অপেক্ষা করছে।

একটু পরেই রিমান্ডে যাবার বার্তা এসে গেল। কাপড়-চোপড় পরে প্রস্তুত হলাম। ব্যাগ ব্যাগেজ কী নিব, ওষুধপত্র কিভাবে নিব এ ব্যাপারে রফিক সাহেব বেশ সহযোগিতা করলেন। সাঈদী সাহেব এবং মুজাহিদ সাহেবসহ আমিও যাবার জন্যে প্রস্তুত। এমন সময় সিআইডির লোক এসে খবর দিল আমাকে নাকি যেতে হবে না। আজকে উনাদের দু'জনকেই শুধু নেবে। অফিসারদের অস্বস্তিসহ উনাদের দুজনকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া করে বিদায় দিলাম। পরে ২৬ সেলের সাথী বন্ধুদের কেউ কেউ রেডিওর খবর শুনে বললেন আমাকে শরীরের অসুস্থতার কারণে নেয়া হয়নি। পরে নেয়া হবে। ১লা জুলাই ২০১০

www.pathagar.com

তারিখে বিকেল বেলা মাওলানা সাঈদী সাহেব এবং মুজাহিদ সাহেবকে রিমান্ডের জন্যে ডিবি অফিসে নেয়া হল। আমি ২রা ও ৩রা জুলাই (দুই দিন) বিকেল তিনটায় আমাকে রিমান্ডে নিতে আসতে পারে এ ধারণায় প্রতীক্ষায় থাকি।

১লা জুলাই আমার পরিবারের লোকেরা সাক্ষাতের জন্যে এসে নিরাশ হয়ে ফিরে যায়। পরের দিন জেল গেট থেকে খবর এল দেখা করার জন্যে আমার পরিবারের লোকজন এসেছে। কাগজে পাঁচ জনের নাম দেখলাম। কিন্তু গেটে উপস্থিত হয়ে দেখি শুধু আমার স্ত্রী বেগম শামসুন্নাহার নিজামী, ছেলে নাজিবুর রহমান মোমেন ও মিঠু বসে আছে। আমি তাদের কাছে পৌঁছেই আমার বড় মেয়ে মুহসিনার কথা তুলে বললাম ওকে নিয়ে আসো নাই কেন? কারণ আমার বড় দুশ্চিন্তা ওকে নিয়েই। সে আমার প্রথম সন্তান খুবই আবেগপ্রবণ। বাপের জন্যে তার মনের আবেগ অনুভূতি অতিমাত্রায়। দুপুরের দিকে এরা বেশ তাড়াহুড়ো করে আসতে গিয়ে ওকে সাথে আনতে পারেনি। আমার খুব ভাল লাগল এটা দেখে যে তাদেরকে আমি সান্ত্বনা দেবার পরিবর্তে তারাই আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে দুশ্চিন্তা মুক্ত থাকার এবং আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে দোয়া করার পরামর্শ দিল সবাই সম্মিলিতভাবে।

১লা জুলাই আমার দু'জন নিকটতম সাথীকে রিমান্ডে নেয়ার পর থেকেই প্রতীক্ষায় ছিলাম আমাকে কখন যেন নিতে আসে। ২রা জুলাই ও ৩রা জুলাই পার হবার পর ৪ঠা জুলাইয়ের বিকেল তিনটা পার হবার পর মনে হল অন্তত আজকে আর নিতে আসছে না। তাই একটু বিশ্রামে যাওয়ার চিন্তা করতেই রিমান্ডে যাবার বার্তা এসে হাজির। পূর্ব থেকেই যেহেতু মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম, তাই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে রওয়ানা করতে আর বেশি সময় লাগল না। কারাগার থেকে প্রিজন ভ্যান যোগে ডিবি অফিসে পৌঁছেই আসরের নামাজ আদায় করে নিলাম। তার আগে কিছুক্ষণ অফিস কক্ষে অপেক্ষা করতে হল। আমাকে যে রুমে রাখার ব্যবস্থা করার কথা ঐ রুমেই মুজাহিদ সাহেব ছিলেন। তাকে এ রুম থেকে অন্য রুমে নেয়ার পরই আমাকে নির্ধারিত রুমে নেয়া হল। জেল খানা থেকে করে যাওয়া অজুতেই আসরের নামাজ আদায় করলাম আমার জন্যে নির্ধারিত কক্ষে, যে কক্ষে ডিবি কর্তৃক গ্রেফতারকৃত আরো ১২/১৪ জন আসামী অবস্থান করছিল। ২৯ জুন তারিখে ডিবি কর্তৃক গ্রেফতার হয়ে এক রাত এবং দিনের অধিকাংশ এই রুমটাতেই অন্যান্যের সাথে আমি এবং সাঈদী সাহেব থেকে গেছি। রুমে লোক সংখ্যা কখনও ১৫ জনের বেশিও হয়ে যায়। সবার জন্যে একটা টয়লেট, যা হাইকমোড নয়। আমার মত সায়েটিকার রোগীদের জন্যে যা নেহায়েৎ কষ্টদায়ক। তাছাড়া গণ ব্যবহারের কারণে সাংঘাতিক পিচ্ছিল। যেকোন মুহূর্তে বড় রকমের অঘটন ঘটতে পারে বলে আমি ডিবি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলাম। টয়লেটের ট্যাপটা বন্ধ করা যায় না বিধায় অনবরত পানি পড়তে থাকে। ২৯ জুন রাতে এবং ৩০ জুন দিনের সকাল ভাগেই এ ব্যাপারে তাদেরকে অবহিত করা হয়। কিন্তু জুলাইয়ের ৪ তারিখে গিয়ে একই অবস্থা দেখতে পেলাম।

তখনতো মাত্র একরাত এবং দিনের কিছু অংশ ছিলাম। এবার এসেছি ১৬ দিনের রিমান্ডে। এই দীর্ঘ সময় এই রুমেই থাকতে হবে। ঐ বিপজ্জনক বাথরুমই ব্যবহার করতে হবে। এই রুম থেকে মুজাহিদ সাহেবকে অন্যরুমে স্থানান্তরের সময় সামনা-সামনি দেখা হয়। কুশল জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি বললেন, কোমরের ব্যথা বেড়েছে। ঐ পরিবেশে বসা এবং শোয়ার ব্যবস্থা সবটাই আমাদের মত শারীরিক অবস্থার লোকদের জন্যে প্রতিকূল এবং কষ্টদায়ক। আর রিমান্ডে আনাই হয়েছে সাধারণত কষ্ট দেয়ার জন্যে।

এখানে থাকার প্রথম অসুবিধা হল এটা একটা গণ রুম। এমন পরিবেশে গরম কম্বলের উপর একটা পাতলা চাদর বিছিয়ে শোয়া, একটা কম্বল বালিশ হিসাবে ব্যবহার করা, সারাক্ষণের জন্যে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন লাইট জ্বালানো থাকা, পাশেই অস্ত্রাগারে সারাক্ষণ ডিবির লোকদের আসা এবং খটখট আওয়াজের মধ্যে আমার ঘুমানো ছিল একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। ডিবির কর্মকর্তাদের ব্যবহার ছিল ভালো। কিন্তু এখানকার অবকাঠামোগত অসুবিধাসহ সার্বিক পরিস্থিতি ন্যূনতম ভদ্রলোকদের জন্যে অসহনীয়। ডিবি যাদেরকেই গ্রেফতার করে এখানেই নিয়ে আসে। জিজ্ঞাসাবাদের নামে যাদের মারপিট

www.pathagar.com

করে, তারাও অসহ্য ব্যথা নিয়ে ভিআইপিদের সাথে থাকা রুমে কান্নাকাটি করতে থাকে। তাদের রেখে আলাদা খাবার তাদেরই সামনে খেতে মানসিক কষ্ট ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমি একদিন এক ডিবি কর্মকর্তাকে বললাম আমার ব্লাড প্রেসার ভীষণভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার মূল কারণ রাতে দিনে কখনও ভাল করে ঘুমাতে পারছি না। পুলিশ হাসপাতালের একজন মহিলা ডাক্তার আমার নির্ধারিত ওষুধটি দুই বেলা খেতে বললেন, ঘুমের ওষুধ হিসাবে রাতে টেনিন খেতে বললেন। এরপর একদিন প্রেসার বৃদ্ধি পেয়ে ২২০/১১০ এ উঠে। এত বেশি প্রেসার বৃদ্ধির ঘটনা ইতঃপূর্বে কখনও ঘটেনি। এ ছাড়া এ বছর আগস্টের প্রথম দিকে আমার মৃদু ব্রেইন স্ট্রোকের ঘটনা ঘটায় প্রেসার বাড়লেই একটু বিচলিত হই। কিন্তু ডিবির পরিবেশে এতটা প্রেসার বৃদ্ধির কোন প্রতিকারের উপায় ছিল না। ডাক্তার সান্ত্বনা দিয়ে বললেন আমি যে ওষুধটা খাই ওটা এক বেলার পরিবর্তে দুই বেলা খেতে হবে। আর সাথে টেনিন খেলে ভাল ঘুম হবে এবং প্রেসার নরমাল হয়ে আসবে। তার কথায় মোটামুটি আশ্বস্ত হই। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে বড় রকমের কোন দুর্ঘটনা আর ঘটেনি।

৪ঠা জুলাই বিকেল থেকে নিয়ে ২০ জুলাই পর্যন্ত টানা ১৭ দিন বিভিন্ন গ্রুপে জিজ্ঞাসাবাদ চলতে থাকে। মামলার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন বিষয়ই বেশি জিজ্ঞাসা করা হয়। মামলার সাথে এরূপ প্রশ্নের সম্পর্ক কী জানতে চাইলে তারা বলেন তারা নাকি যেকোন বিষয়েই প্রশ্ন করতে পারেন। সে কোন থানার আই,ও এটা আমার মনে নেই। আমার প্রোফাইল তৈরির জন্যে ছেলে-মেয়েদের কথা জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গে আমাকে বে আদবের মত প্রশ্ন করে বসল 'আপনার স্ত্রী ক'জন'। মনে মনে তার এই প্রশ্নে আমি ভীষণ ক্ষুব্ধ হলেও মৃদু ভাষায় তা প্রকাশ করি এবং ক্ষোভটা চেপে যাই। আমি তাকে পাল্টা প্রশ্ন করি 'দাড়ি টুপিওয়ালা হলেই তাদের একাধিক স্ত্রী থাকতে হবে এমন বিশ্বাস থেকেই কি এ প্রশ্ন করছেন? আই,ও কে এবার কিছুটা বিব্রত মনে হল, তার কথাটা চাপা দেবার জন্যে বলল, না, একজন মারা যাবার পরে কারো দ্বিতীয় বার বিয়ের প্রয়োজন হয়ে থাকে।

আসলে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে যে কয়টি টিম সাজানো হয়েছিল, সবকটি টিমের ২/১ জন ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সব সদস্যই ইসলাম বিদ্বেষী এবং জামায়াতের প্রতি বিদ্বেষী পরায়ণ। তাদের কারো কারো কথাবার্তার ধরন প্রকৃতই অমার্জিত এবং অসৌজন্যমূলক। মনে হয় তারা আমাকে রাগাতে চেয়েছে কোন অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্যে। অবশ্য সেই কৌশলে তারা সফল হয়নি। আমি আল্লাহর রহমতে রাগ হজম করে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় তাদের প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করেছি। তাদের কেউ কেউ আমাকে ইসলামের জ্ঞান দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তাদের কথার জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করিনি। শেখ সাদীর উপদেশ এখানে স্মরণ করে ভূমিকা রেখেছি। তার পরামর্শের সারমর্ম হল 'অজ্ঞ গণ্ড মূর্খের প্রশ্নের মোক্ষম জবাব হল কোন জবাব না দিয়ে নীরবতা পালন করা'।

৪ঠা জুলাই বিকেলে ডিবি অফিসে পৌঁছার পর পরই মুজাহিদ সাহেবের সাথে দেখা হলেও সাঈদী সাহেবের সাথে দেখা হয়নি। ডিবির অফিসার একজনকে জিজ্ঞেস করে জানলাম ওনাকে রমনা থানায় নেয়া হয়েছে। সম্ভবত পল্টন থানার আই,ও আমার সামনে পড়ায় সালাম দিয়ে কেমন আছি জানতে চেয়ে নিজেই বললেন, আমি এখন সাঈদী সাহেবের ওখানে যাচ্ছি। উনি অবশ্য ভালই আছেন। বাসা থেকে খাবার দিতে পারছে। আমি উনাকে বললাম, সাঈদী সাহেবকে আমার সালাম পৌঁছাবেন। মাঝখানে একবার সাঈদী সাহেবকে রমনা থানা থেকে ডিবি অফিসে আনা হয়েছিল। একদিন কি দুইদিন পরে উনাকে এখান থেকে হুমায়ুন আজাদ হত্যা মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে সিআইডি অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। ডিবি অফিসে ১৬/১৭ দিন অবস্থানের সাথে আমাকে একবার কোর্টে হাজিরা দেয়ার জন্যে নিয়ে যায়। আবার সেখান থেকে ডিবি অফিসে নিয়ে আসে। এই আসা যাওয়া এবং কোর্ট হাজতের গারদে অবস্থান অসহনীয় কষ্টদায়ক। বোধ হয় এভাবে কষ্ট দেবার জন্যে তারা গ্রেফতার করেছে। আমার দুপায়ের হাঁটুতে ব্যথার কারণে দাঁড়িয়ে থাকা কষ্টকর। গারদে বসার কোন ব্যবস্থা নেই। গারদে আমাদের

www.pathagar.com

নেয়া আনা ও দেখাশোনার দায়িত্ব যারা পালন করে থাকেন এমন পুলিশের লোকদের সাথে আলাপ করে মনে হয়েছে প্রাণহীন কোন পাথরের মূর্তির সাথে কথা বলছি। একজন পুলিশ কর্মকর্তা আমাকে দেখে এবং কথা শুনে দুঃখ প্রকাশ করলেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার মুখ থেকে উচ্চারিত হল, 'অমানবিক' শব্দটি। মনে একটু আশা জাগল হয়ত উনি কিছু একটা করবেন। কিন্তু না, পরে তার আর কোন খোঁজই পাওয়া গেল না।

'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার' অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েই আমরা আজ কারাগারে। ২৯শে জুনে আমাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে তা কার্যকর করা হয় এই অভিযোগেই। কিন্তু গ্রেফতারের পরের দিন আদালতে হাজির হয়ে দেখলাম, ঐ মামলা নিয়ে কোন আলোচনাই নাই। ঐ মামলার বাদী পক্ষের উকিল নিজ থেকে আফসোস করে বললেন আমি 'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে তরিকত ফেডারেশনের পক্ষ থেকে মামলা করেছি অথচ আমাকে কথা বলার সুযোগই দেয়া হচ্ছে না। আমাকে উদ্দেশ্য করে বেচারা কয়েকবার বললেন আমিই আপনাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছি। যে মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে সে মামলার কোন আলোচনাই নাই। নতুন নতুন মামলা নিয়ে কথা হচ্ছে।

আসলেই আওয়ামী আইনজীবীদের দ্বারা সৃষ্ট এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে বিজ্ঞ আদালতকেও বিব্রত মনে হয়েছে। কিন্তু শাসক দলের আইনজীবীদের চাপের মুখে অসহায় আদালত যে মামলায় গ্রেফতারকৃত আসামীদের আদালতে হাজির করেছেন, সে মামলার আলোচনা বাদ রেখে নতুন নতুন মামলার যৌক্তিকতা বিচার ছাড়াই গ্রেফতার দেখানো ও রিমান্ডের আবেদন মঞ্জুর করতে থাকেন। এটা কি আদৌ ন্যায়বিচার হতে পারে?

একটানা ষোল দিনের রিমান্ড শেষে ২১ জুলাই আমাকে আবার কোর্টে হাজির করা হল এবং কোর্ট থেকে কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হল। এই ১৬/১৭ টি দিন বড় কষ্ট হয়েছে শোয়া, ঘুমানো ও টয়লেটে যাওয়া আসায়। আমার শোবার ঘরে চাদের আলো ঢুকলেও আমি ঘুমাতে পারি না। আমার ঘুম আসে না। আমি কোন দিন নিজের শোবার ঘরে ডীম লাইটও ব্যবহার করে অভ্যস্থ নই। অথচ দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা এক নাগাড়ে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বাল্বের আলোর নীচে একটানা ১৬/১৭ দিন কাটাতে হল এটা যে কত কষ্টদায়ক তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই পরিবেশেই আমার রক্তের উচ্চ চাপের মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। ২০০৯ সালে উচ্চ রক্ত চাপের ফলেই 'মাইল্ড স্ট্রোক' হওয়ায় অস্বাভাবিক এই রক্ত চাপ বৃদ্ধিতে সঙ্গত কারণেই আমি বেশ চিন্তিত হই। কারণ এর প্রতিক্রিয়া, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ইতোমধ্যে কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। যাহোক এইভাবে ডিবি অফিসে ১৬/১৭ দিন কাটানোর পর জেল খানায় ফিরে এসে কিছুটা হলেও স্বস্তি বোধ করলাম।

এরপর কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কোর্টে ধার্যকৃত দিনে নিয়মিত হাজিরা দেয়া শুরু হয়। আগেই বলেছি প্রিজন ভ্যানে আসা যাওয়া, গারদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবস্থান করাটাই মূলত একটা বড় রকমের অমানুষিক শাস্তি যা বিচারের আগেই আসামীদের ভোগ করতে হয়।

অসংখ্য মামলায় গ্রেফতার দেখানোর কারণে রিমান্ডের মাত্রাও ছিল অনেক বেশি। রমজানে কোর্টে হাজিরা এবং রিমান্ডে নেয়া যেন না হয় এজন্যে জেল কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। ইতোমধ্যেই আমার পিঠ ও বুকের ডান পাশে ভীষণ ব্যথা অনুভূত হয়। হাসপাতালের ডা. শামসুদ্দিন সাহেব দেখে বললেন অন্য কোন আশংকা নেই। তবে এটা (হারপিচ) বেশ কষ্টদায়ক ব্যথার কারণ হতে পারে। দ্রুত এ জন্যে ওষুধের ব্যবস্থাও করলেন। ইতোমধ্যেই কদমতলী থানার এক কথিত বা কল্পিত মামলার রিমান্ডে নিতে আসে। উক্ত মামলায় আমাদের তিনজনকে (আমি, সাঈদী সাহেব ও মুজাহিদ সাহেব) গ্রেফতার দেখানো হয়েছে এবং আদালত তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে, প্রথমে শুধু একজনকে (মুজহিদ সাহেবকে) নিচ্ছে কিন্তু কেন? তাহলে পরে আমাদেরকে নিতে পারে এজন্যে মানসিকভাবে তৈরি থাকাই ভাল।

www.pathagar.com

জেলখানার ডাক্তারদের ধারণা ছিল অসুস্থতার কারণে আমাকে রিমান্ডে নাও নিতে পারে। যেদিন আমার পিঠের ব্যথার কারণে জেলকর্তৃপক্ষ এবং জেল হাসপাতালের ডাক্তারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানা গেল অসুস্থতার কারণে আমাকে রিমান্ডে নাও নিতে পারে সেদিনই (রমজানের প্রথম দিনে) বিকেল সাড়ে তিনটা কি চারটার দিকে আমি রুমে বিশ্রামরত অবস্থায় দেখি দরজার পাশে মুজাহিদ সাহেব দাঁড়ানো। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, যে গাড়িতে করে তাকে নিয়ে এসেছে ঐ গাড়িতে করেই আমাকে এখনই নিয়ে যাবে ডিবিতে।

মুজাহিদ সাহেব কদমতলী থানার এই মামলার আই, ও (তদন্তকারী কর্মকর্তা) সাহেবের বেশ প্রশংসা করলেন। আমাকে বললেন আপনার অবস্থা সম্পর্কে খোলামেলাভাবে তার সাথে আলাপ করে নেবেন। আমি বেশ আশ্বস্ত হলাম। পিঠের ও বুকের ব্যথা এবং অতীতে কোন দিন নাম শুনিনি এমন একটা অসুখ নিয়ে রিমান্ডে যেতে তেমন আর কোন দুশ্চিন্তা রইল না। আজকেই সকালে সাক্ষাতের জন্যে বাসা থেকে আমার স্ত্রী, বড় মেয়ে, জামাই ও মেঝ ছেলে এসেছিল। তারা পিঠের অসুখটা দেখে গেছে। তারা জানে না যে আজ আমাকে ডিবিতে রিমান্ডে নেয়া হবে।

জেলখানার ২৬ সেলে আমরা যারা অবস্থান করছি তারা এক অভিন্ন পরিবারের সদস্যের মত এক সাথে ইফতার করছি। তারাবিহ শেষে রাতের খানাও একসাথে খেয়ে ঘুমাতে যাই। অবশ্য সেহরীটা খেতে হয় যার যার রুমে লক আপ অবস্থায়। ইফতারের জন্যে প্রত্যেকের বাসা থেকে আসা ফল ফলাদিসহ বিভিন্ন ইফতার সামগ্রী সকলে মিলে খাওয়ার সময় যেমন একটা অন্তরঙ্গ পরিবেশের তৃপ্তি অনুভূত হত, তেমনি পরিবার পরিজনের কথা ভেবে, সংগঠন আয়োজিত ইফতার মাহফিলের সান্নিধ্যে ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত হওয়ার বেদনায় বুকটা ভারী হয়ে আসতো। তবে সকলের একত্রে ইফতার ও ইফতারের আগে দোয়ার একটা স্বর্গীয় অনুভূতি জাগ্রত হত অন্তরের অন্তঃস্থলে। ডিবির পরিবেশ দেখে এসেছি। তাই ডিবি অফিসে রিমান্ডে যাবার পথে মনটা ব্যথায় ভারী হয়ে আসল।

কদমতলী থানার আই, ও সাহেব আমাকে নিতে এসেছিলেন। কিন্তু তার সাথে আমার দেখাই হয়নি। শুনেছি মুজাহিদ সাহেবকে প্রিজন ভ্যানে না নিয়ে উনার গাড়ীতেই উঠিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু আমার জিনিসপত্র উনার গাড়ীতে নিলেন আমাকে প্রিজন ভ্যানে নেয়া হল।

মুজাহিদ সাহেবকে কোর্টেও প্রিজন ভ্যানে না নিয়ে উনার গাড়ীতেই নিয়েছিলেন। আবার কোর্ট থেকে কেন্দ্রীয় কারাগার পর্যন্ত ঐ ভাবেই এসেছিলেন। আমার সাথে আচরণটা সেরকম হল না, যে রকম আচরণের জন্যে মুজাহিদ সাহেব আই, ও সাহেবের প্রশংসা করেছিলেন। মুজাহিদ সাহেবকে যেভাবে নেয়া আসা করেছেন, সাঈদী সাহেবেকেও সেভাবেই নেওয়া আনা করা হয়েছে, আমার ব্যাপারটা ভিন্ন হল কেন এখনও আমি বিষয়টি বুঝে উঠতে পারিনি।

সাঈদী সাহেব আই, ও সাহেবের সাথে গাড়ীতে যাওয়ার সময় তাকে অনুরোধ করেছিলেন যেন রিমান্ড শেষে উনি আমাদের সাথে ২৬শে রমজানের দিনগত রাত (অর্থাৎ ২৭শের রাত) আমাদের সাথে কাটানোর সুযোগ পান। আই, ও সাহেব সাঈদী সাহেবের অনুরোধ রক্ষার জন্যে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করার কথা দিয়েছিলেন, কথা তিনি রক্ষাও করেছেন। আমরাও দোয়া করছিলাম যেন ২৭শের রাতে সাঈদী সাহেবকে আমাদের মাঝে পাই। রিমান্ড শেষে ২৬শে রমজানের বিকেলে ইফতারের বেশ আগেই সাঈদী সাহেব আমাদের মাঝে এসে পৌঁছায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি।

কদমতলী থানার মামলার আই ও মুজাহিদ সাহেব ও সাঈদী সাহেবকে ডিবি অফিসে নেয়ার আগেই জেল গেটেই উনাদের সাথে দেখা করেছেন এবং কথা বলেন। এই সূত্র ধরে মুজাহিদ সাহেব আমাকে বলে ছিলেন আমি যেন আমার শরীরের অবস্থা খুলে বলি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে তার সাথে জেলগেটেও দেখা হয়নি। ডিবি অফিসে পৌঁছেও দেখা হয়নি। রিমান্ডের আসামী দেখা শোনা ও খাবারের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট মামলার আই ও দের। কিন্তু আমি রোজা অবস্থায় মারাত্মক অসুখ নিয়ে ডিবিতে রিমান্ডে

www.pathagar.com

গেলাম তিন দিন অবস্থান করলাম। আই ও সাহেবের কোন খোঁজ খবরই পেলাম না। পরে শুনেছি তিনি নাকি চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন।

আমি অবশ্য আল্লাহর শুকরিয়া জানানোর সাথে ডিবির উপস্থিত কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানাই। আমি ওখানে পৌঁছেই আমার বাসায় যোগাযোগ করে যত দ্রুত সম্ভব ডাক্তার নিয়ে আসার জন্যে অনুরোধ করি। ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের ফোন নম্বর উনাদের কাছে আগে থেকে ছিল বিধায় সরাসরি ইসলামী ব্যাংকের আরএমও ডা. হাফিজ সাহেবের সাথে যোগাযোগ করার অনুরোধ করি। তারা যথাসম্ভব দ্রুত যোগাযোগ করে আমাকে জানালেন ইফতারের পর পরই রওয়ানা করবেন ডিবি অফিসের উদ্দেশে। ডিবি অফিসে প্রথম দিনে যে রুমে ছিলাম দ্বিতীয় বারে ১৬/১৭ দিনের রিমান্ডের সময়ও ঐ রুমটাতেই ছিলাম। এবারও ঐ রুমেই আমাকে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। জেলখানায় ইফতারের জন্যে বাসা থেকে উন্নত মানের খেজুরের একটা প্যাকেট রমজানের ১ম দিনেও এসেছিল। আর যে দিন রিমান্ডে যাই ঐদিন আরো তিন প্যাকেট উন্নতমানের খেজুর এসেছিল পরিবারের লোকজনদের সাক্ষাতের সময়। কিন্তু ওসব রেখেই শুধু জমজমের পানির বোতল এবং খাবার পানি এক বোতল সাথে নিয়ে নিলাম। অল্প কিছু খেজুরও সাথে নিয়েছিলাম কিনা ভাল করে মনে নেই। তবে জামায়াতের কেন্দ্রীয় অফিস ডিবি অফিস থেকে বেশি দূর না হওয়ায় অফিস থেকে দ্রুত আমার জন্যে ইফতারী পাঠানো হয়। এতে ছোট এক প্যাকেট খেজুর ছিল, সাথে কিছু বড়া, পেয়াজু, বেগুনী জাতীয় জিনিস এবং ছোলা মুড়ি আর কিছু জিলাপী।

আমাকে যে কামরায় রাখা হয় সেখানে পূর্ব থেকেই ১০/১২ জন লোক ছিল। তাদের রেখে, তাদের সামনে একা একা ইফতার করা, খানা খাওয়া আমার জন্যে মানসিকভাবে ছিল বেশ পীড়াদায়ক। আমার ইফতারের জন্যে সামান্য যা কিছু এসেছিল, পিয়াজু বড়া জাতীয় জিনিসগুলো আমার কামরায় অবস্থানরতদেরকে দেই। জিলাপীর পুরো প্যাকেটটা এবং খেজুরের প্যাকেটের মধ্য থেকে ক'টা খেজুর রেখে সবটাই আমি তাদেরকে দিয়ে দেই। কিন্তু সাথে সাথেই দেখলাম ডিবির টেবিলে অপারেটরের দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি রুমে ঢুকে ওদের কাছ থেকে জিলাপী এবং খেজুরের প্যাকেট পুরোটাই নিয়ে গেল। লোকটার এই হৃদয়হীন আচরণ দেখে ব্যথা পেলেও কিছু বলার ছিল না। মনে মনে নিজেকে বেকুফ ভাবলাম। আমার নিজের কাছে এগুলো থাকলে হয়তো এভাবে নিয়ে যেতে পারত না।

যাহোক ইফতার, মাগরিব নামাজ আদায় শেষে ডাক্তার আসার অপেক্ষার পালা। আমাকে জানানো হল আমার ছেলে নাজিব ডাক্তার নিয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাফিজ সাহেব একজন কার্ডিওলজিস্টসহ উপস্থিত হলেন। পোর্টেবল ইসিজি মেশিনে আমার ইসিজি করে নিলেন। অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তারা ওষুধ এনে দিয়ে তার পর চলে গেলেন। কেন্দ্রীয় কারাগারের ২৬ সেলে আমরা একত্রে ইফতার করতাম। তারাবিহর জামায়াত শেষে একসাথে রাতের খাবার খেয়ে ঘুমোতে যেতাম। ডিবি অফিসে বন্ধ কামরায় একাকী এশার নামাজ ও তারাবিহ আদায় করি। এশার আগেই রাতের খাবারটা খেয়ে নেই। আমার পূর্বে থেকে হয়ে আসা রোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও কোমর ব্যথার সাথে এবার শরীরের ডান পাশের বুকে পিঠের সাথে হারপিচ নামের রোগটিতে আক্রান্ত অবস্থা নিয়েই ডিবি অফিসে আসি। ডান পাশের পিঠ, বুকের ব্যথা ও হারপিচের মত কষ্টদায়ক রোগ নিয়ে এমনিতেই ঘুমানো কষ্টকর। তদুপরি থাকার জায়গার বা রুমের অস্বস্তিকর পরিবেশ ঘুমোনোর জন্যে আরো কষ্টকর মনে হয়েছে। তারপরও চোখ বুজে ঘুমোনোর চেষ্টা করি। পাশের রুম অস্ত্রাগার। সেখানে ডিবির লোকদের সারা রাত্রির আনা গোনা ও ঠক ঠক আওয়াজে ঘুমানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

রাত সাড়ে তিনটায় কেন্দ্রীয় কারাগারে সেহরী খেতাম। সেহরী রুমে আসতো রাত আড়াইটায়। যথারীতি রাত সাড়ে তিনটায় উঠে ডিবির ডিউটি অফিসারকে বললাম তারা সেহরীর ব্যবস্থা করবেন কিনা। তাড়াতাড়ি কেন্টিনের রুহুল আমীন এসে বলে গেল কী খাব। সে তড়িঘড়ি করে দুই টুকরো মুরগীর গোস্তসহ ডাল এনে দিয়ে গেল। সেহরীর সময় তখন মাত্র ১৫ মিঃ বাকী। আমার সেহরী খাবার শেষে

www.pathagar.com

অনেকগুলো ওষুধ খাবার কথা। খুব দুশ্চিন্তা নিয়ে নাকে মুখে সেহরী শেষে ওষুধগুলো খেয়ে নিতেই আজানের আওয়াজ কানে এল। এরপর ফজরের নামাজ শেষে আবার ঘুমানোর অসাধ্য চেষ্টা। সকালে বাথরুমে যাওয়ার সময় দেখি শরীরের অবস্থা এতটাই কাহিল যে আমি হাঁটা তো দূরের কথা ভাল করে দাঁড়াতেই পারছি না। রুমের অবস্থানকারী সবাই আমার এ অবস্থা দেখে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসে। দু'জনের কাঁধে ভর করে আমি বাথরুমে যাই। আবার বাথরুম থেকে বের হবার সময় তাদের সাহায্য নিয়ে বের হই।

সকালের দিকে আবার ডাক্তার আসে ব্লাড প্রেসার এবং ব্লাড সুগার টেস্ট করার জন্যে। ব্লাড সুগার বেশি নেমে যাওয়ায় সমস্যা হচ্ছে বিধায় ডায়াবেটিসের ওষুধ রাতে দু'বার না খেয়ে একবার খাবার কথা বললেন। তৃতীয় দিনে ওষুধ বন্ধ করতে বললেন। এই দুরবস্থার মধ্যে তিনদিন কেটে গেটে গেল, আই ও'র দেখা নেই। শুনলাম আমি ডিবি অফিসে আসার সাথে সাথে উনি চট্টগ্রাম যান এবং তৃতীয় দিন শেষে রাতে ঢাকায় আসেন। ৪র্থ দিন সকালে আমাকে বলা হলো, আমার সাথে আনা ব্যাগ ব্যাগেজ নিয়ে যেন আমি প্রস্তুত থাকি। যাতে আই, ও সাহেবের সাথে আলাপ শেষ হবার সাথে সাথে কোর্টে রওয়ানা করতে পারি। কোর্টে হাজিরা শেষে কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে।

অবশেষে বেলা সাড়ে নয়টা কি দশটার দিকে আই, ও সাহেবের সাথে আলাপের জন্যে ডিবি অফিসের একজন কর্মচারীর সাহায্যে আমি নির্ধারিত কামরা পর্যন্ত পৌঁছি। তার সাথে এক ঘণ্টার মত (কমবেশি) আলাপ হল। তিনি আমার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানতে চাইলেন না। মুজাহিদ সাহেব আমাকে বলেছিলেন শরীরের অবস্থা তাকে খুলে বলার জন্য, কিন্তু এমন পরিবেশ পাওয়াই গেল না। কদমতলী মামলায় গ্রেফতার এবং রিমান্ড যে মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়, এটা জেনেই তিনি অর্পিত দায়িত্ব পালনের খাতিরেই এসব করছেন এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান হল। এক পর্যায়ে তিনি কদমতলী মামলা প্রসঙ্গে আমার মন্তব্য জানতে চাইলেন। আমি খুব সংক্ষেপে বললাম। জামায়াতে ইসলামী নীতিগতভাবে কখনও নাশকতামূলক কাজ অনুমোদন করে না। নিজেরা কোন দিনই এর সাথে জড়িত হয়নি। অন্যকারো দ্বারা কখনও এমন কাজ করানোও পছন্দ করে না। সর্বোপরি কথা, যে মামলায় আমরা এজহারভুক্ত আসামী নই, সেই মামলায় আমাদেরকে গ্রেফতার করা এবং রিমান্ড চাওয়া যেতে পারে না। বরং এটা রীতিমত অবিচারের শামিল। আই, ও সাহেব শুধু এতটুকু বললেন, বিচারক নিশ্চয়ই আইনগত কোন ভিত্তি পেয়েছেন বলেই গ্রেফতারের অর্ডার দিয়েছেন এবং রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন। তার শেষ কথা ছিল, আর আপনাকে কষ্ট দিতে চাই না। আপনি যেতে পারেন।

তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেই আমার সাথের জিনিসপত্র নিয়ে পূর্ব থেকে তৈরি থাকা প্রিজন ভ্যানে উঠি কোর্টে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। সাথে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত একজন পুলিশকে আমার কাছে থাকতে বলি যাতে প্রয়োজনে তার সাহায্য নিতে পারি। প্রিজন ভ্যানে বসাও কষ্টকর। আমার শরীরের অবস্থার জন্যে এটা আরো কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। প্রিজন ভ্যান ঢাকা সিএমএম কোর্টে পৌঁছার পর আমাকে ওখানকার কোর্ট হাজতে নিয়ে যায়। কোর্ট হাজত বা গারদে বসার কোন ব্যবস্থা নেই। সাথে আনা একটা পুরানা পেপার বিছিয়ে তার উপর জায়নামাজ পেতে বসে সময় কাটানোর চেষ্টা করি। আদালতের বিভিন্নমুখী দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশদের একজন আমাকে জানালো রিমান্ড পত্র জমা দিয়েই আপনাকে কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হবে। বেশি সময় এখানে সম্ভবত অপেক্ষা করতে হবে না।

এই দিন সকালে গোসল করার জন্যে কমোডওয়ালা একটা বাথরুম ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছিলাম। কেন যেন সাংঘাতিক কঠিন কোষ্টকাঠিন্যের কারণে পায়খানার সাথে বিকট কালো রক্ত যায়। আদালতের গারদে অবস্থান কালেও পায়খানার চাপ হয় কিন্তু দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পরও পায়খানা হল না, কিন্তু অসহ্য কষ্টকর অবস্থায় টয়লেট থেকে ফিরে এসে অজু করে কোন মতে জায়নামাজে বসে কেন্দ্রীয় কারাগারের পথে রওয়ানার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি। কোর্টে হাজিরার সময় অন্যান্য দিনে যেভাবে কোর্টের

www.pathagar.com

আনুষ্ঠানিকতা শেষে বিজ্ঞ আইনজীবী বন্ধুরা দেখা সাক্ষাৎ করতেন, আজও সেভাবে তারা গারদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কুশল বিনিময় করলেন। এবং আইনী প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু কাগজপত্রে সই স্বাক্ষর নিয়ে বিদায় হলেন। আমি দুপুর আড়াইটা তিনটা নাগাদ কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছে যাই। কারাগারের ২৬ সেলে আমার সাথী বন্ধুরা সবাই আমার স্বাস্থ্যগত অবস্থার জন্যে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাদের মাঝে ফিরে এসে কারাগারে এই দুঃখ কষ্টের মধ্যেও এক ধরনের মানসিক স্বস্তি ফিরে পেলাম। এখনকার ইফতার ও তারাবিহর পরিবেশটা পেয়ে ডিবি অফিসে থাকা অবস্থায় শারীরিক ও মানসিক কষ্টের কথা মনে পড়ে, মনে অনাবিল শান্তি ও স্বস্তি ফিরে পেয়ে আল্লাহর শুকরিয়া জানাই। দ্বিতীয় দফায় ডিবি অফিসে কদমতলী থানার মামলায় তিনদিনের রিমান্ড শেষে চতুর্থ দিনে কোর্ট হয়ে আবার কেন্দ্রীয় কারাগারে ফিরে আসার আগে একজন ডিউটি অফিসার বললেন, যেহেতু আমাকে দিনের দ্বিতীয় ভাগে অর্থাৎ বিকেল বেলা আনা হয়েছে, অতএব ঐ দিন নাকি হিসাবে ধরা হবে না। কিন্তু অপর একজন কর্মকর্তা বললেন, যেহেতু জেলখানা থেকে আনা হয়েছে, অতএব সকালে হোক আর বিকেলে হোক, যখনই আনা হোক না কেন সে দিনটা হিসাবে ধরা হবে। অতএব আমাকে আর ডিবি অফিসে রিমান্ড উপলক্ষে রাখার কোন সুযোগ নেই। ঐ সময় একজন কর্মকর্তা আমাদের মামলার ফাইলটা দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটা স্বগতোক্তি করলেন, কোন একটা কেসেওতো উনি এজহারভুক্ত আসামী নন। মনে হল তার পেশাগত অভিজ্ঞতায় মনে মনে ভাবছেন, এসব মামলায় যেভাবে রিমান্ডে আনা হয়েছে তার কোন আইনগত ভিত্তি নেই।

এবারে ডিবি অফিসের তিনটি দিনই কেটেছে চরম কষ্টে। রোজা রাখতে পারব কিনা আশংকা দেখা দিয়েছিল। ৪র্থ দিনে সকালে ডাক্তার হাফিজ সাহেব এসে সুগার লেভেল এবং আরও যা দেখলেন তাতে ইফতার পর্যন্ত টিকে থাকতে পারব কিনা আশংকা প্রকাশ করলেন। এ অবস্থায় কোর্টের গারদের কষ্টের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। ঐদিন সকালে পায়খানার সাথে কালো এবং গাঢ় রক্ত যাবার কথাও আগে উল্লেখ করেছি। যাহোক এ অবস্থায় ডিবি অফিস থেকে কোর্ট হয়ে জেলখানা পর্যন্ত যাওয়া ছিল আমার জন্যে খুবই কষ্টকর। প্রিজন ভ্যানের মধ্যে অনেকটা নোংরা পরিবেশে বসা কষ্টকর। সাধারণত এতে আসামীরা বসে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আমার শরীরের অবস্থা এমন ছিল না যে আমি দাঁড়িয়ে যেতে পারি।

তাছাড়া প্রিজন ভ্যানে আগে থেকেই কিছু পানি জমেছিল। প্রিজন ভ্যানের ড্রাইভার সাধারণত রাফ ড্রাইভ করে। তাই জমে থাকা পানি কখনও গড়িয়ে এসে জুতাসহ পা ধুয়ে দেয়। যা খুবই অস্বস্তিকর। গাড়ি এভাবে ড্রাইভ করার ফলে মাঝে মধ্যে যে চড়াই উৎড়াইয়ে কিছু ওলটপালটের আশংকা সৃষ্টি হয় সেটা আমার মত কোমরের সমস্যা যাদের আছে তাদের জন্যে খুবই কষ্টকর। আমার জিনিসগুলো আই, ও সাহেবের গাড়ীতে নেয়া হয়। সাথে আসা সিপাহীকে জিজ্ঞাসা করলাম ঐ গাড়িতে কি আমাকে নেয়া যেতো না। সে আমতা আমতা করতে লাগল কোন উত্তর খুঁজে পেল না। গত তিন দিনে ওখানে কত কষ্ট হয়েছে কেমন কষ্ট হয়েছে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জেল খানার ২৬ সেলের সাথীদের জানাইনি। তবে ওখানে যাওয়ার সাথে সাথে ঘণ্টা দেড় ঘণ্টার মধ্যে আমার নিজস্ব ডাক্তার আসার ব্যবস্থা হওয়ায় আমার বেশ লাভও হয়। মনের প্রশান্তির সাথে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ ব্যবহার করি নিশ্চিন্তে। তারা আমার শরীরের সার্বিক অবস্থা চেক করে একটা পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টও তৈরি করে ডিবি কর্মকর্তাদের হাতে দিয়ে যান। কোর্ট থেকে জেলখানায় রওয়ানার আগে সেগুলো আমাকে দিয়ে দেয়া হয়। আমার হার্টের জন্যে ইকো করায় আমার ব্যাক পেইন ও হাঁটুর ব্যথার জন্যে ফিজিওথেরাপির সাজেশন দিলেও তা এখন পর্যন্ত কার্যকর হতে পারেনি।

১৯৮০ সন থেকে প্রতি রমজানে শেষ দশ দিন আমি মসজিদে ইতেকাফ করে আসছি। মন্ত্রীত্বের দায়িত্বে থাকা অবস্থায় কোন কোন বছর শেষ পাঁচ দিন বা ছয়দিন হলেও ইতেকাফ ছাড়িনি। এ বারে কারাগারে

www.pathagar.com

রোজা পালন করতে গিয়ে সবচেয়ে মনের উপর কষ্টকর চাপ অনুভব করেছি মসজিদে ইতেকাফ করতে না পারার বেদনার কারণে। সেই সাথে মাঝে মধ্যে সুগার অতিরিক্ত নিম্নমুখী হবার কারণে আমার চেয়ে আমার সাথীদের মধ্যেই বেশি উদ্বেগ উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করলাম। মির্জা আব্বাস তো আমাকে প্রথম থেকেই সতর্ক করেছিলেন। বলেছিলেন, দিন যত যাবে ততই সমস্যা বাড়তে থাকবে, দুর্বল হয়ে পড়বেন, অতএব রোজা না রাখাই উচিত। পরিবারের লোকজনও প্রয়োজনে রোজা না রেখে ফিদিয়া দেবার প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। সুগার যাতে বেশি ফল না করে এজন্যে প্রথমে শুধু রাতের খাবারের পরে একবার ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ মেনে চলা শুরু করলাম। পরে আমার ডাক্তারের কাছ থেকে পরামর্শ আসল 'কমেট' একেবারে বন্ধ করে দিলেও কোন অসুবিধা নাই। আমি ওষুধ বন্ধ করলাম। আল্লাহর ফজলে ওষুধ ছাড়াই রমজানের শেষ সপ্তাহ থেকে আজ পর্যন্ত ব্লাড সুগার বৃদ্ধির আর কোন ঘটনা ঘটে নাই। তবে খাবার ব্যাপারে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করছি এবং সময় সুযোগ মত বিকেলে ৩০ মিনিট রাতের খাবারের পরে ১৫/২০ মিনিট হাঁটার চেষ্টা করছি। অবশ্য সকালে ফজরের নামাজ শেষে ঘুমের চাপ থাকায় আর সকালের হাঁটাটা হয়ে উঠে না। কদমতলী থানার মামলায় মুজাহিদ সাহেবের রিমান্ড শেষে আমাকে নেয়ার কারণে ধারণা হচ্ছিল, আমাকে জেলখানায় পৌঁছিয়েই হয়ত সাঈদী সাহেবকে নিয়ে যাবে। কিন্তু না সেদিনতো নেয়ইনি; তারপরও ক'দিন চলে যাওয়ায় মনে হল এই মামলায় ওনারে নাও নিতে পারে। কিন্তু ২৪শে রমজান দুপুরের পরে সাঈদী সাহেবকেও রিমান্ড নেয়ার জন্যে সংশ্লিষ্ট লোকেরা এসে হাজির। নিয়ম অনুযায়ী জেলখানা থেকে নেয়ার হিসাবে ধরলে ২৬শে রমজানে তিন দিন পূর্ণ হয়। সাঈদী সাহেবের ঐকান্তিক কামনা ছিল যেন ২৬ শের দিবাগত রাত ২৭শে রমজানের রাতটা তিনি এখানে ২৬ সেলে সাথীদের সাথে কাটাতে পারেন। মুজাহিদ সাহেব তাকে পরামর্শ দিলেন তিনি যেন প্রথমেই আই, ও সাহেবকে তার ইচ্ছার কথাটা জানান। আই, ও সাহেব সাঈদী সাহেবকে তার গাড়িতেই নিয়েছেন। এই সুযোগে সাঈদী সাহেব তার মনের কথাটা আই, ও সাহেবকে বলেন। আই, ও সাহেব কথা দিলেন তিনি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবেন। আমরা উনাকে বিদায় দিলাম আন্তরিক দোয়া সহকারে। সেই সাথে ইফতারের আগের দোয়ার সময় সাঈদী সাহেবের জন্যে বিশেষভাবে দোয়া করলাম। যেন উনি ২৬ শে রমজানে ফিরে এসে ২৭শে রমজানের রাতে অর্থাৎ লাইলাতুল কদরে আমাদের সাথে শরীক হতে পারেন।

আল্লাহর মেহেরবানীতে মুহতারাম মাওলানা সাঈদী সাহেব ২৬ মে রমজানের বিকেলে এসে পৌঁছলেন। উনি পৌঁছার অল্প কিছু আগে আমরা আসরের নামাজ শেষে ইফতারের অপেক্ষায় যার যার মত দোয়া দরুদরত ছিলাম। সাঈদী সাহেব আসার পর উনি রুমে গিয়ে ফ্রেস হয়ে আমাদের সাথে ইফতারের টেবিলে শরীক হলেন। ইফতারের পূর্বে প্রতি দিনই আমরা একসাথে দোয়া করে থাকি। আজকের দোয়া পরিচালনার দায়িত্ব রিমান্ড ফেরত মজলুম মাওলানা সাঈদীকেই পালনের অনুরোধ করা হল। উনার স্বভাবসুলভ আবেগজড়িত কণ্ঠে দোয়া করলেন, 'ইফতারের এই মুহূর্তে আমাদের পরিজনের কেউ পাশে নেই। তাদের মনের কষ্ট, মনের আবেগ-অনুভূতির অবস্থা আল্লাহ তুমিই সবচেয়ে ভাল জান। তাদের দিকে চেয়ে আমাদেরকে এই কারা জীবন থেকে মুক্তি দাও'। তার এ দোয়া সত্যি ছিল খুব মর্মস্পর্শী। আমিসহ সকলেই ইফতারের পূর্ব মুহূর্তের এই দোয়ায় আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়ি। এভাবে তারাবিহ শেষেও সামষ্টিক মুনাজাত শেষে বাকী এবাদত বন্দেগী আমাদের চলে লকআপকৃত স্ব স্ব রুমের মধ্যে।

কারাগারে প্রতিদিন তিনটি মুহূর্তে মনের কষ্ট পাথরের মত ভারী হয়ে চাপ সৃষ্টি করত। এর একটি মুহূর্ত ইফতারের সময়। এ সময় সংগঠনের প্রিয় সহকর্মীদের আয়োজিত ইফতার মাহফিলে বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাথে মেলা মেশা কুশল বিনিময়ের স্মৃতি মনে দারুণ ব্যথার সৃষ্টি করে। সেই সাথে পরিবার পরিজনের অন্তরঙ্গ পরিবেশের স্মৃতিও মাঝে মাঝে বেশ পীড়া দেয়। দ্বিতীয় মুহূর্তটি তারাবিহর সময়। কারাগারের পাশের বেশ কয়েকটি মসজিদের জমজমাট তারাবিহর অনুষ্ঠানের কিছুটা হলেও আভাস

www.pathagar.com

ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যার উপলব্ধি মনকে বেশ ব্যথা ভারাক্রান্ত করে তুলে। সেহরীর মুহূর্তটি আরো বেদনাদায়ক। অব্যক্ত ব্যথায় বুকটা ভারী হয়ে আসে। ইফতার তারাবিহ আমরা যে ক'জন আছি একসাথে মিলেমিশে এতে শরীক হচ্ছি। কিন্তু লক আপে সেহরীর সময়ে পাশে কেউ থাকে না। একা একা এই বয়সে হটপট খোলা, আবার খাবার শেষে আটকানো, খাবার আগে পরে নিজ হাতে প্লেট পরিষ্কার করার ঘটনা বাহ্যিক কষ্টের চেয়ে মনের উপরে বড় চাপ সৃষ্টি করে এই মুহূর্তে প্রিয়জনের কেউ পাশে না থাকার বিষয়টি ।

জামায়াত অফিস সংলগ্ন চান মসজিদে মন্ত্রী থাকা অবস্থায়ও অন্তত পাঁচ দিন মসজিদে এতেকাফ করেছি। এ মসজিদে তারাবিহ আদায়ে আমি বেশ তৃপ্তি পেতাম। খতিব সাহেব একজন ভাল মুহাক্কেক আলেম এবং হাফেজ। তিনি নিজেই তারাবিহতে ইমামতি করেন, আর একজনকে সাথে রাখেন বেশ দেখে শুনে। যার পড়াও বেশ হৃদয়গ্রাহী। কারাগারে অবস্থান কালে এবারের পবিত্র রমজানব্যাপীই এই স্মৃতিগুলো আমাকে সাংঘাতিক পীড়া দেয়। আমি শুনেছি রমজানে চান মসজিদের পরিবেশের কথা আমার যেমন মনে পড়েছে, চান মসজিদের খতীবসহ সকল মুসল্লিয়ানে কেরাম আমাকে স্মরণ করেছেন, আমার জন্যে দোয়া করেছেন। আল্লাহ যেন তাদের দোয়া কবুল করেন। দেখতে দেখতে রমজানের মাসটি বিদায় হয়ে গেল, এল খুশির ঈদের দিনটি। কারাগারে রোজা পালন যেমন ছিল জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা, তেমনি ঈদ উদযাপনও ছিল প্রথম। মাসব্যাপী আল্লাহর হুকুমে রোজা পালন করতে সক্ষম হওয়ার আনন্দই মূলত ঈদের আনন্দ। অতএব সেখানে যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, মাসব্যাপী রোজা পালন করতে পারার শুকরিয়া আদায়ের মাধ্যমে যে ঈদ, তা যেখানেই পালন করা হোক না কেন, ঈমানদারের জন্যে আনন্দেরই হবার কথা। জেলখানায় ২৬ সেলের (ভিআইপি) লোকদের জন্যে মসজিদে জামায়াতে যাওয়ার অনুমতি নেই। কারণটি নিরাপত্তাজনিত।

২৬ সেলে আমাদের ঈদ জামায়াত হল ক্ষুদ্র জামায়াত। সর্বসাকুল্যে উপস্থিতি ১২/১৪, কম ছাড়া বেশি হবার কথা নয়। মুহতারাম মাওলানা সাঈদী সাহেবের ইমামতিতে আমরা ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় ও খোতবা শেষে দোয়া মুনাজাতের মাধ্যমে ঈদের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করি। উপস্থিত মুসল্লিদের সাথে কোলাকুলি শেষে আমি মনের আবেগ লুকোবার জন্যে দ্রুত আমার রুমে এসে পড়ি। জিন্দেগীতে কোন দিন এত আবেগ তাড়িত হয়েছি বলে আমার মনে পড়ে না। দু'চোখ বেয়ে অঝোরে অশ্রু ঝরা যেন কোন ক্রমেই বন্ধ হচ্ছে না। এ অবস্থায় কারো সামনে যেতে আমি সাংঘাতিক লজ্জাবোধ করি। ইতোমধ্যে আইজি (প্রিজন) এর সাথে ডিআইজি, জেল সুপার ও জেলারসহ আমাদের সাথে কুশল বিনিময়ে আসলেন। তার সাথে আমরা সবাই মিলে কিছু হালকা নাশতায় অংশ নিলাম। পরিবেশটা এতে বেশ কিছুটা হালকা হয়ে আসে। এর পরপরই আমার পরিবারের লোকজন সাক্ষাতের জন্যে চলে আসে। সম্ভবত আমাদের ২৬ সেলের পরিবারগুলোর মধ্যে সবার আগে আমার পরিবারের লোকেরা সাক্ষাতের জন্যে এসে হাজির হয়। এতে মনে হল আমার মতই তাদের মনের অবস্থা। তাদের অনুপস্থিতিতে আমি যেমন মনোকষ্টে আছি, আমার অনুপস্থিতিতে তারা আরো বেশি পেরেশানিতে আছে। তাই বনানী থেকে ঈদের নামাজ শেষে এত তাড়াতাড়ি কেন্দ্রীয় কারাগারে এসে উপস্থিত হয়েছে আমার সাথে সাক্ষাতের জন্যে। ঈদের দিনের জন্যে তৈরি বিশেষ খাবার পৌঁছানোর জন্যে।

যাদের অনুপস্থিতির অনুভূতিতে আমি আবেগ তাড়িত হই, এত দ্রুত তাদের সাক্ষাতের সুযোগ মনের আবেগকে আরো শানিত করল। তাদের সাথে সাক্ষাতের মুহূর্তে আবেগকে সামলানো আমার পক্ষে সম্ভব হল না। আমার বড় মেয়ে মুহসিনার ব্যাপারে আমি বেশি চিন্তিত ছিলাম। আল্লাহর মেহেরবানী তাকে বেশ মজবুত মনে হল এবং সেই বেশি নছিহত করল শান্ত থাকার জন্যে, নিশ্চিন্তে থাকার জন্যে।

ঈদুল ফিতরের পর শাওয়াল মাসের ছয়টি রোজা প্রতি বছরেই রেখে আসছি। এ ব্যাপারে রমজানে বার বার সুগার বেশি নীচে নেমে যাওয়ার সমস্যার কারণে শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনেকেই রোজা না রাখার পরামর্শ

www.pathagar.com

দিয়েছিলেন। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে রমজানব্যাপী পূর্ণ রোজা রাখতে সক্ষম হয়েছি। অনেকের দৃষ্টিতেই এটা ছিল চরম ঝুঁকিপূর্ণ। অতএব নফল রোজা না রাখাই শ্রেয়। যদিও এ রোজার ফজিলতের কথা চিন্তা করে বার বার সিদ্ধান্ত নিয়ে আবার সিদ্ধান্ত পাল্টেছি। সাথীদের অনেকেই রাখলেন। তাদের রোজা রাখা দেখলেই মাঝে মাঝে মনে কষ্ট হত। এমন একটি নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হতে হল। এর জন্যে বাড়তি আর একটি বাধা ছিল কখন কোর্টে হাজিরা দিতে হয়। এর মধ্যে তিনটি তারিখ নির্দিষ্ট ছিল কোর্টে হাজিরার জন্যে। ঐ সময়ে রোজা রাখার পরিকল্পনা করে পরে কোর্টে হাজিরার কথা মনে করেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য হই। কিন্তু পরে দেখলাম ঐ নির্ধারিত দিনগুলোতে আমাদেরকে কোর্টে নেয়া হয়নি। মাঝখান থেকে আমার রোজা রাখা হল না। সারা জীবনের জন্যে এটা হয়ে থাকবে একটা আফসোস, অনুতাপ আর অনুশোচনার বিষয়। আমাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয় ২৯ শে জুন দুপুর বেলায় 'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া' অভিযোগে বা অজুহাতে। মামলাটির ব্যাপারে ইতঃপূর্বে আমরা বলেছি। পত্রিকার রিপোর্টের ভিত্তিতেই মামলাটি দায়ের করা হয়। ঢাকা সিএমএম আদালত মামলাটি সহজে আমলে নিতে চেয়েছে বলে মনে হয়নি। রাজনৈতিক চাপের মুখেই অনেক দিন পরে ২৯ জুন হাজির হওয়ার নোটিশ দেয়া হয়। আমার নিজের মত ছিল উপস্থিত হওয়ার। কিন্তু এ নিয়ে দ্বিমত হওয়ায় সিনিয়র আইনজীবীদের বলতে বলা হয়। একবার কোর্টে উপস্থিত হওয়ার জন্যে পরের দিন অর্থাৎ ২৯ শে জুন সকাল ৯ টায় প্রস্তুত থাকতে বলা হল। গাড়ী ঠিক ২ টায় বাসা থেকে আমাকে নিয়ে আসবে। অন্যরাও সেভাবেই প্রস্তুত থাকবেন। কিন্তু পরক্ষণে জানানো হলো আমরা না গেলেও চলবে। সুতরাং আমি স্বাভাবিকভাবে যে সময় অফিসে এসে থাকি সেই সময়েই অফিসে আসি।

অফিসে যথাসময়ে এসে প্রাত্যহিক কাজকর্ম দেখতে দেখতে জোহরের নামাজের সময় হয়ে আসে। নামাজ আদায় করে দুপুরের খাবার একটু আগে শুনলাম যারা হাজির হয়েছিল তাদের জামিন হয়েছে। বাকীদের ব্যাপারে পরে সিদ্ধান্ত জানাবে। দুপুরের খাবার শেষে বিশ্রামে যাওয়ার সাথে সাথে বাসা থেকে খবর এলো টেলিভিশন চ্যানেলে আদালত কর্তৃক আমাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। এর পরের ঘটনা ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

বিষয়টি আলাচনায় আসার কারণ হল যে মামলায় আমাদেরকে গ্রেফতার করা হয়, সে মামলার কোন কার্যক্রম এখন পর্যন্ত পরিচালিত হচ্ছে না। শুনছিলাম ৬ই সেপ্টেম্বরের কোর্টে হাজিরা দেবার একটা তারিখ নির্ধারিত আছে। কিন্তু সে তারিখে আমাদেরকে কোর্টে নেয়া হয়নি। মূলত মামলটির কোন মেরিট নেই। একটা মামলায় গ্রেফতার হয়ে কোর্টে হাজির করে অসংখ্য মামলায় ১৬/১৭ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করা রিমান্ডের মাধ্যমে অপ্রাসঙ্গিক আরো অনেক বিষয়ের অবতারণাই তার জীবন্ত প্রমাণ।

কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থান কালে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি বললেন, তরিকত ফেডারেশনের একজন বড় নেতার সাথে বিশেষ এজেন্সির একজন প্রভাবশালী কর্মকর্তার আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। তার মতে তরিকত ফেডারেশনকে দিয়ে এই মামলা করানোর পেছনে তার হাত থাকতে পারে।

বিএনপি আহূত হরতালকে কেন্দ্র করে বেশ কটি মামলায় আমাদের গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। তথাকথিত যুদ্ধাপরাধী মামলাতে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। আবার চেষ্টা শুরু হয়েছে 'দশট্রাক অস্ত্র মামলায়' আমাকে জড়ানোর পাঁয়তারা। অবশ্য পেছনে উস্কানি দাতার পর্যায়ে মুখ্য ভূমিকায় আছে এক শ্রেণীর মিডিয়া। আমাকে সবচেয়ে বেশি অবাক করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব ড. শোয়েবের মিথ্যাচার এবং সাবেক সেনা কর্মকর্তা বিসিআইসির সাবেক চেয়ারম্যান অবসর প্রাপ্ত মেজর জেনারেল ইমামুজ্জামানের অসত্য বক্তব্য। আমার মনে হয়েছে অন্যান্য মামলায় আমাকে যেনতেনভাবে জড়ানোর পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে এদেরকে ব্যবহার করা হয়েছে। তাদের বানোয়াট বক্তব্যে সত্যি বিস্মিত হয়েছি। ৩০শে জুন সিএমএম কোর্টের দৃশ্য ইতঃপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। তরিকত ফেডারেশনের মামলার উকিলকে খুবই অসহায় এবং অস্থির মনে হয়েছিল। তিনি বলার চেষ্টা করেন তার

www.pathagar.com

মামলায়ই জামায়াত নেতাদের গ্রেফতার করে কোর্টে হাজির করা হয়েছে। অথচ তাকে সেটি সম্পর্কে মোটেই কথা বলতে দেয়া হচ্ছে না। আওয়ামী উকিলগণ এই সুযোগে একের পর এক তাদের সাজানো মামলায় গ্রেফতার ও রিমান্ডের আবেদন পেশ করে চলেছেন। তাদের পক্ষে বিভিন্ন থানার আই, ও গণ শিখানো বুলি আওড়িয়ে মিথ্যা প্রতিবেদন পেশের মাধ্যমে আওয়ামী আইনজীবীদের ডিকটেশন অনুযায়ী রিমান্ডের আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তাব করে চলেছেন। আদালতের সার্বিক পরিস্থিতির বর্ণনা আমরা ইতঃপূর্বে দিয়েছি। এই পরিস্থিতিতে বিচারক আইন দ্বারা পরিচালিত হয়ে গ্রেফতার ও রিমান্ড মঞ্জুর করলেন, না আওয়ামী আইনজীবীদের রাজনৈতিক চাপের মুখে সিদ্ধান্ত দিলেন এটা বোঝার কোন উপায় ছিল না। বিস্ময়ের ব্যাপার হল, যে মামলায় জামায়াতের তিনজন শীর্ষ নেতাদের গ্রেফতার করা হয়। সেই মামলা এখন কোন দৃশ্যপটে নেই। আর কোন আলোচনার বিষয়ও নয়। ২৯ শে জুন ২০১০ তারিখে কোর্টে আমরা হাজিরা দিলে এই নির্দিষ্ট মামলায় জামিন মঞ্জুর হবার সম্ভাবনা ছিল যেমন অন্যদের জামিন মঞ্জুর হয়। গ্রেফতারের পরের দিন এই নির্দিষ্ট মামলাটি কোর্টের টেবিলে তেমন গুরুত্ব না পেলেও এক ফাঁকে মাননীয় আদালত জামিন মঞ্জুরের ঘোষণা দিলেন। কিন্তু তার আগে একে একে কয়েকটি নতুন কাল্পনিক মামলায় গ্রেফতার দেখানো এবং রিমান্ড মঞ্জুর করার দৃশ্য দেখে মনে হল ২৯শে জুন নির্দিষ্ট দিন কোর্টে হাজিরা দিলেও এই পরিস্থিতিরই সৃষ্টি হত।

হরতাল সংশ্লিষ্ট যে মামলাগুলোতে আমাদের কয়েক ভাইকে গ্রেফতার করে জেলে আনা হয়েছে, সেই একই মামলায় বিএনপির উপদেষ্টা সাবেক পররাষ্ট্র সচিব ও রাষ্ট্রদূত জনাব শমসের মুবিন জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। বিএনপির এমপি শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি জামিনে মুক্তি পেয়ে গেছেন। অবশেষে অনেক টালবাহানার পর মির্জা আব্বাসও মুক্তি পেয়েছেন। কিন্তু সেই একই মামলার আসামী জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরীর আমীরের জামিন হয়নি। ছাত্র শিবিরের কারো কারো জামিনে মুক্তি হলেও এখনও অনেকেরই জামিন হয়নি। জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতা কামারুজ্জামান ও আব্দুল কাদের মোল্লাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে প্রেস ক্লাবের গেট থেকে আমাকে গ্রেফতারের সময় পুলিশের কাজে বাধা প্রদানের অজুহাতে। অথচ এই দুই নেতা আমাকে গ্রেফতারের সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিতই ছিলেন না। এমনকি প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে 'বিশ্ব মাদক দিবসের' যে অনুষ্ঠানে আমি প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রেখেছি, সেই অনুষ্ঠানেও উনারা কেউ উপস্থিত ছিলেন না। এ থেকে প্রমাণিত হয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে ন্যূনতম পেশাদারিত্বের পরিচয় দিতেও ব্যর্থ হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় কারাগারের ২৬ সেলে জনাব শমসের মুবিনের সাথে অনেক বিষয়েই আলোচনার সুযোগ হয়। পররাষ্ট্র সচিব হিসাবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালনের কারণে তার অভিজ্ঞতা বেশ সমৃদ্ধ বলা চলে। তিনি বলতেন আমাদের বিরুদ্ধে এই ধরনের কাল্পনিক ভিত্তিহীন মামলায় জড়ানোর আসল লক্ষ্য 'যুদ্ধাপরাধী বিচার'। কিন্তু এটা তারা করতে পারবে কি পারবে না এ বিষয়ে তারা নিশ্চিত নয়। সেখানে অনেক অসুবিধা অনেক বাধ্যবাধকতা এবং সীমাবদ্ধতাও আছে। তাই এভাবে আলতু ফালতু মামলা দিয়ে আটকিয়ে রাখবে এবং হয়রানি করবে।

একটি প্রশ্ন রয়েছে অনেকের মনে, ২৯শে জুনে আদালতে হাজিরা দিলে সম্ভবত এত মামলায় গ্রেফতার দেখানো হত না। ২৯শে জুনের দুপুরে টেলিভিশন চ্যানেলের সংবাদ শুনে আমারও তাই মনে হচ্ছিল। কিন্তু ৩০ শে জুনে আদালতের দৃশ্য দেখে এবং ১৬/১৭ দিনের রিমান্ডে প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক অনেক বিষয়ের জিজ্ঞাসাবাদের ধরন দেখে আমার ধারণা পাল্টে যায়। বিষয়টি সম্পূর্ণ পূর্ব পরিকল্পিত। আগেই বলেছি, জেলখানার একজন অভিজ্ঞ সাথীর নিকট থেকে জেনেছি তরিকত ফেডারেশনের কোন এক নেতার আত্মীয় নাকি কোন একটি এজেন্সির গুরুত্বপূর্ণ কর্তা। তার মাধ্যমেই তরিকত ফেডারেশনের মামলাটা করানো হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী তড়িঘড়ি করে হরতালের সাথে সংশ্লিষ্ট করে কিছু মামলা সাজানো হয় এবং জামায়াতকে সে সবে জড়ানো হয় ।

www.pathagar.com

২৯শে জুন ২০১০ সালের বিকেলে যে মামলায় গ্রেফতার করা হল সে মামলার আর কোন আলোচনাই শোনা গেল না। শুনছিলাম ৬ই অক্টোবর কোর্টে হাজিরার তারিখ আছে, কিন্তু পরে আর কোন খোঁজ খবরই পেলাম না। এর আগে আরো ২/১ একটি মামলার হাজিরার তারিখ থাকায় শাওয়াল মাসের রোজা রাখতে পারলাম না। অথচ ঐ সব দিনে হাজিরা দিতেও যেতে হয়নি।

এবারের মাহে রমজানের শেষ দশদিন তাই কেটেছে একটা বড় রকমের মানসিক যন্ত্রণায়। তবে এবার রমজান কেটেছে এক নতুন অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি উপলব্ধির সাথে। তবে সবচেয়ে কষ্টের ছিল পবিত্র রমজান মাসের তিন দিন রিমান্ড উপলক্ষে ডিবি অফিসে অবস্থান। তবে ডিবি অফিসের তিন দিনের অবস্থান আমার অসুস্থতার কারণে যতই কষ্টকর হোক না কেন ডিবি অফিসের কর্মকর্তাদের মানবিক আচরণে আমি তাদের জন্যে আন্তরিকভাবে দোয়া করেছি সেই সাথে আল্লাহর দরবারে জানিয়েছি শুকরিয়া। ডিবি অফিসে পৌঁছেই ডিউটি অফিসারকে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের ডা. হাফিজ (আরএমও) সাহেবকে ফোনে খবর দিতে বলেছিলাম এবং আমাকে যে ডিবি অফিসে আনা হয়েছে এ খবরটাসহ ডাক্তারকে সাথে নিয়ে আসার জন্যে আমার ছেলেকেও তারা ফোনে জানিয়ে দেয়। এখানে না এলে কারাগারে থাকা অবস্থায় এত যত্নসহ চিকিৎসা পেতাম কিনা আল্লাহ ভাল জানেন। তাই আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যেই করেন একথার প্রতি আস্থা আরো বৃদ্ধি পায়। তারপর এখানে মানসিক কষ্টের প্রধান কারণ, একাকী ইফতার করা। আমার রুমে অন্যান্যদের সবাই হয়ত রোজা থাকে না তবে যারা রোজা থাকে তাদের ইফতারী আসে যা বলার মত নয়। আমার একার জন্যে যা আসে তার সবটা ওদের দিয়ে দিলেও তো ওদের সকলের তো দূরের কথা এক চতুর্থাংশেরও কিছু হবার নয়। তবুও আমি ওদেরকে শরীক করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সব আইটেম ওদের দিতে না পারায় মনে ভীষণ কষ্ট হত যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

ডিবি অফিসে পৌঁছে প্রথম রাতে একাকী হলেও তারাবিহ পুরোটাই পড়েছি। শেষ রাতে সেহরীর আগে তাহাজ্জুতও পড়েছি। ফজরের নামাজও রীতিমত দাঁড়িয়ে পড়ে বিশ্রামে গিয়েছি। কিন্তু বিশ্রাম শেষে বিছানা থেকে উঠতে গিয়ে দেখি দাঁড়াতে পারছি না। কষ্ট করে দাঁড়ালেও দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। এ সময় কামরায় উপস্থিত প্রায় সবাই আমার সাহায্যে এগিয়ে আসতে চেষ্টা করে। ২/৩ জন আমাকে ধরাধরি করে বাথ রুমে পৌঁছে দেয়, আবার বাথরুম থেকে ধরাধরি করে এনে বিছানায় পৌঁছে দেয়। ইতোমধ্যে ক্যান্টিনের রুহুল আমিন এক শিশি সরিষার তেল নিয়ে হাজির। সে দরজার শিকের ফাঁক দিয়ে তেলের শিশিটা পৌঁছে দিয়ে মাথাটা মালিশ করে দিতে এবং সেই সাথে হাত পাও একটু ম্যাসেজ করে দিতে বললেন। রুমে অবস্থান রত একটা ছেলে নাম জুয়েল। সম্ভবত মাদারীপুর বাড়ী। এসএসসি সবে মাত্র পাস করেছে। এইচএসসিতে ভর্তির চেষ্টা করা অবস্থায় পরিস্থিতির শিকার হয়ে ডিবি পুলিশের হাতে আটক হয়ে এখানে এসেছে। সে খুব দ্রুত বেশ আবেগসহ এসে আমার মাথায় তেল মালিশ করা শুরু করে দিল। কেউ কেউ এসে হাত পা ম্যাসেজ করার চেষ্টা করল। আমি কাউকে পায়ে হাত দিতে দিই না। তারপরও এদেরকে বারণ করা সম্ভব হল না। রুহুল আমিন বাইরে থেকে তাদের বলতে থাকে, পায়ের আংগুলগুলো টেনে দিতে।

১৮/০৫/২০০৮

রাত ৯টার দিকে খাবার টেবিলে বসে শোনা গেল গ্রেফতারের জন্যে পুলিশ এসেছে। দ্রুত রাতের খাবার শেষ করে নিজস্ব প্রস্তুতির জন্যে স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাকে দায়িত্ব দিয়ে একটু বিশ্রামের চেষ্টা করলাম। ঐদিনই হাইকোর্টে জামিন নামঞ্জুর হবার সাথে সাথে ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের দ্বারস্থ হলে ফুল বেঞ্চে শুনানির জন্যে ২০/০৫/০৮ দিন ধার্য হয়। গ্রেফতারের জন্যে আগত পুলিশ কর্মকর্তাদের এ সংক্রান্ত কাগজ দেখানো হলে তারা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ করে তাদের

www.pathagar.com

সিদ্ধান্তে বহাল থাকেন। রাত ১০-৩০ টার (অনুমানিক) দিকে আমাকে নিয়ে পুলিশ ক্যান্টনমেন্ট থানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। রওয়ানার আগে নেতৃবৃন্দ যারা বাসায় আসেন তারা হলেন, সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, আব্দুল কাদের মোল্লা, মাওলানা সাঈদী এবং আরো অনেকে। আমার স্ত্রী, বড় মেয়ে, জামাই, মেঝ ছেলে ও ছেলের বৌকে সান্ত্বনা বাণী শুনিয়ে বিদায় দিলাম। ঝড় বৃষ্টির কারণে গাড়িতে উঠার সময় অপেক্ষমাণ কর্মীদের উদ্দেশ্যে তেমন কিছু বলতে পারলাম না। সাংবাদিকদেরকে কিছু বলতে মানা ছিল।

বাসা থেকে মালিবাগ রেল গেট পর্যন্ত আসতে সময় লাগে প্রায় ১-৩০ ঘণ্টা। পুলিশ কর্তৃপক্ষ জনতার ভিড় দেখে খুবই বিরক্তি বোধ করতে থাকে। মাঝে মাঝে বেশ অসহিষ্ণু হয়ে উঠে। এ্যাকশনে যাবার কথাও বলতে থাকে। আমি তাদের এতটুকুই বলেছি, আমার তো এখন কিছুই করার নেই। মাইকের ব্যবস্থা থাকলে আমি বুঝিয়ে বলে এদের বিদায় করতে পারতাম। ভিড়ের কারণে গাড়ীর দরজা জানালা বন্ধের ফলে আমারই কষ্ট হচ্ছে বেশি। ২/৩ জন দায়িত্বশীল কর্মীকে এটা বুঝিয়ে বলার পর খিলগাঁও রেলগেট থেকে জনতাকে সরিয়ে নিতে সক্ষম হল। এতে আমি নিজেও একটু স্বস্তি পেলাম।

১৯/০৫/০৮

প্রায় সাড়ে বারটার দিকে ক্যান্টনমেন্ট থানায় উপস্থিত ও.সি'র অফিস রুমে মেঝেতে শুবার ব্যবস্থা হল। শুতে গেলাম রাত প্রায় ১-৩০টার দিকে। সাধারণত রাত ১১-৩০ টায় শুয়ে অভ্যস্ত আর জেগে অভ্যস্ত রাত ৩-৩০ টার দিকে। এ ব্যাপারে আমার স্ত্রীই আমাকে সাহায্য করে থাকেন। তিনি আগে উঠে এস্তেঞ্জা অজু সেরে আমাকে ডেকে তুলেন। এই নিশ্চিত ব্যবস্থা থেকে এই প্রথম বারের মত বঞ্চিত হই। আমার দেখা শোনার দায়িত্বে যারা ছিল তাদের বলেছিলাম ৩-৩০টায় ডেকে দিতে। কিন্তু আমার যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন ভোর ৪-১০ বাজে এ সময় ফজরের আযান শুনে উঠে যাই, তাই আজানের আগে এক ঘণ্টা থেকে ৩০ মিঃ যে কাজটুকু এতদিন নিয়মিত করে আসছিলাম তা বাধাগ্রস্ত হল।

বাদ ফজর ঘুমিয়ে আছি। এমন সময় খালেদ বাসা থেকে নাশতা নিয়ে থানায় পৌঁছলে আমাকে ঘুম থেকে উঠানো হয়। বলা হয় ছেলে প্রেসার চেক আপ করতে এসেছে। আমি উঠে তৈরি হয়ে যখন ডাকতে বললাম, তখন ঐদিন ক্যান্টনমেন্ট থানায় আমার ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত এ.সি. মেহেদী সাহেব বলল কাউকে এখানে আসতে দিতে পারি না। থানার ও.সি. আমাকে ঘুম থেকে উঠানোর সাথে সাথে আমি তাকে বললাম; মেঝে থেকে বিছানাটা গুছিয়ে নেয়ার পর ছেলেকে ডাকুন। সে এটা দেখলে মনে কষ্ট পাবে। বাসায় গিয়ে বললে বা বাইরে জানাজানি হোক এটা আমি চাই না। সাথে সাথেই সেটা সরানো হল। কিন্তু এ.সি. মেহেদী ছেলেকে প্রেসার মাপার জন্যে আসতে দিতে সহজে রাজি হতে চাইলেন না।

ছেলে জানে আমার প্রেসারের সমস্যা আছে। এখন যে পরিবেশের ও পরিস্থিতির মধ্যে রাতে এখানে আনা হয়েছে তাতে প্রেসার তো বাড়তেও পারে। অবশেষে রাজি হলে তাকে খালেদ প্রেসার দেখে চলে গেল। তাকে বলে দিলাম নেতৃবৃন্দরা যেন কর্মী সমর্থকদেরকে সু-শৃঙ্খলভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখে। তাকে এটাও বলে দিলাম গত রাতের কর্মীদের আবেগের কারণে যে অবস্থা সৃষ্টি হয় তাতে আমার নিজেরই কষ্ট হয়েছে বেশি। এটা যেন নেতৃবৃন্দকে বুঝিয়ে বলা হয়। সকাল ৯টার কিছু পরে সিএমএম আদালতের দিকে আমাকে নিয়ে পুলিশের কয়েকটি গাড়ী রওয়ানা দিল। গাড়ীর সংখ্যা আগে পিছে কতটা আমার মনে নেই।

সিএমএম আদালতের প্রায় ২ কিলোমিটার আগে থেকে রাস্তার দুই ধারে সারিবদ্ধভাবে সুশৃংখলভাবে দাঁড়ানো জনতার দৃশ্য দেখে মনটা ভরে গেল। আমি নিজেও ভেতরে ভেতরে আবেগ আপ্লুত হয়ে যাচ্ছিলাম। আমাকে কোর্টে হাজির করার দায়িত্বে নিয়োজিত পুলিশ কর্মকর্তা এই দৃশ্যের প্রশংসা করলেন, বললেন এমনটি খালেদা-হাসিনার জন্যেও হয়নি। আদালত প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের প্রচণ্ড ভীড়,

www.pathagar.com

সেই ভীড় ঠেলে আদালত পর্যন্ত যাওয়া সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠা ছিল এক অসম্ভব ব্যাপার। আদালতে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেবার সুযোগ পেলাম, যা পরের দিন আমার দেশ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় কারাগারে উপস্থিতি

আদালতে অসংখ্য নেতা-কর্মী মিডিয়াম্যান ও আইনজীবীদের ফাঁকে আমার ছেলে খালেদকে দেখলাম দূর থেকে। শুধু চোখে চোখে ভাব বিনিময় ছাড়া তাকে কেন যেন কাছে ডাকতে পারিনি সেও আসতে পারেনি। ঘটনাটি জেল সুপারকে বলার পর তিনি বেশ আন্তরিকতার সাথে ডিআইজি সাহেবের সাথে আলাপ করে ঐদিনই বিকেলে আমার পরিবারের সদস্যদের দেখা করার ব্যবস্থা করে দিলেন।
সুপারের অফিস রুমের পাশে সাক্ষাৎকারের জন্যে রাখা নির্দিষ্ট জায়গায় আমাকে প্রথমে বসানো হয় এবং প্রথম আনুষ্ঠানিকতা সেরে আমার জন্যে রাখা পূর্ব নির্ধারিত স্থানে বিএনপির নেতা আঃ মান্নান ভূঞা সাহেবের সাথে রাখা হল। ঐদিনই দুপুরে জীবনের প্রথম জেলের ভাত খেলাম ভূঞা সাহেবের সাথে বসে এক টেবিলে।
গ্রেফতারির পর প্রথম রাতটা কাটে ক্যান্টনমেন্ট থানায়। অধিক রাতে শোয়ার কারণে সেদিন প্রায় স্থায়ী রুটিন অনুযায়ী তাহাজ্জুদ পড়তে না পারার ব্যথা নিয়েই কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রথম রাতটিতেও কাকের আওয়াজ শুনে ঘুম ভাংলে দেখি আযানের সময় হয়েছে। দ্রুত অজু সেরে নামাজ পড়ার প্রস্তুতি নিতে আবারও মনে পড়ে গেল আমার নিয়মিত তাহাজ্জুদের জন্যে জাগিয়ে দেওয়ার যে দায়িত্ব এত দিন পালন করেছে আমার সহধর্মিনী আজ আমি তার সেই আন্তরিক সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত। সাথে কোন টেবিল ঘড়ি আনিনি যে এলার্ম শুনে জেগে উঠব। আমার জন্যে আল্লাহর এই নেয়ামতের কথা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে প্রাণভরে শুকরিয়া আদায়ের সাথে সাথে তাঁর কাছেই সাহায্য চাইলাম।
কারাগারের দ্বিতীয় রাতে ঘুমটি ভাংগল বেশ আগে। সুযোগ মত আল্লাহকে ডেকে নিলাম। ভয় ছিল এ সময়ে জাগার পর ফজরে অসুবিধা হয় কিনা। আল্লাহর মেহেরবাণীতে তা হয়নি। বুধবার সকালে কেন যেন পরিবারের সদস্যদের কথা বার বার মনে পড়ছিল। বিশেষ করে ফজরের আযানের এক ঘণ্টা বা ৪৫ মিনিট আগে আমাকে জাগিয়ে তোলার দায়িত্বটা যে এত দিন পালন করেছে সে যে আমার জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে কত বড় নেয়ামত তার উপলব্ধি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় মনের আকুতি কেমন যেন একটা অবস্থার সৃষ্টি করছিল বার বার। এমতাবস্থায় দুপুরে খানা খেয়ে বিশ্রামে গিয়েছি। ৪টার দিকে বিশ্রাম শেষে টয়লেট সেরে অজু করে পড়া শোনা আসরের নামাজের জন্যে এক সাথেই প্রস্তুতি নেয়ার নিয়ত করে টয়লেটে ঢুকেছি। বের হতেই শুনলাম আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী এসেছে তাই নিরাপত্তা কর্মীরা আমাকে নিতে এসেছে।
আমি জানতে চাইলাম কে এসেছে নাম কী? তারা কিছুই বলতে পারল না। জানতে চাইলাম পুরুষ না মহিলা? তাও তারা বলতে পারল না। চট জলদি প্রস্তুতি নিয়ে গিয়ে দেখি আমার স্ত্রী এবং ছেলে খালেদ ও ভাতিজা মিঠু অপেক্ষা করছে। হঠাৎ আসার কারণ হিসাবে তারা জানালো আমার চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র নিয়েই তারা এসেছে ডিআইজির সাথে আলাপ করে তার অনুমতিক্রমে।
সপ্তাহে মাত্র একদিন দর্শনার্থী আসার কথা। গত সোমবারের পরে আগামী সোমবারে আসার কথা। তারা তার আগেই বুধবারে এসেছে এরপর সোমবারে আসতে পারবে না। বুধবারে আসতে হবে। কর্মকর্তাটি অনুরোধের সুরেই বললেন তবে একটু বিরক্তির ছাপও দেখা গেল। আজকের এ সাক্ষাৎটি একান্তই আল্লাহর পক্ষ থেকে আয়োজিত মনে হয়েছে। আমার নিজের জীবনে এটাই প্রথম কারাগারে সাক্ষাতের ঘটনা। পরিবারের সদস্যদের সবার জন্যেই এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।
২০/০৫/২০০৮

www.pathagar.com

সুপ্রীম কোর্টের আপিল ডিভিশনের ফুল বেঞ্চে আমার জামিনের (আগাম) শুনানির বিষয়টির কী হল জানার আগ্রহ থাকলেও ঐ দিন কিছু জানা গেল না। পরের দিন আমার দেশ পত্রিকায় হেড লাইন দেখলাম। সুপ্রিম কোর্টের আপিল ডিভিশনের ফুল বেঞ্চে প্রধান বিচারপতির সভাপতিত্বে ২০/৫ এর শুনানির আগে আমাকে গ্রেফতার করা পুলিশের ঠিক হয়নি বলে মন্তব্য করা হয়েছে। এতে আমার কোন উপকার আপাতত না হলেও ভবিষ্যতে পুলিশ কর্তৃপক্ষ এটাকে সতর্কবাণী হিসাবে গ্রহণ করলে অনেকের উপকার হবে জেনে মনে কিছুটা হলেও সান্ত্বনা পেলাম।

জেলখানায় যে কয়টি পত্রিকা পাওয়া যায়-সেগুলো হলো- আমার দেশ, মানব জমিন এবং ইত্তেফাক। অন্যান্য পত্রিকায় আমার গ্রেফতারের খবর কিভাবে এসেছে দেশব্যাপী এর প্রতিক্রিয়া কেমন হয়েছে এটা বিস্তারিত জানার সুযোগ নেই এখানে। পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে যতটুকু জানা গেল তাতে মনোবল কিছু বৃদ্ধি হল বলে অনুভব করলাম। ২২-২৩ মে দু'দিনব্যাপী গণরোজার কর্মসূচিতে ব্যাপক সাড়া সত্যি উৎসাহ ব্যঞ্জক। মানুষ আল্লাহর জন্যে আল্লাহর দ্বীনের জন্যেই আমাকে এত ভালবাসে জেনে আমি আল্লাহর প্রতি আরো কৃতজ্ঞ হই।

২২/০৫/০৮

বৃহস্পতিবারের দিনটি কিভাবে যেন কেটেছে বুঝতে পারিনি। গ্রেফতারের পর থেকে আমার জন্যে যে বিষয়টি বেশি পীড়াদায়ক ছিল তাহলো ফজরের আজানের অন্তত ৪৫ মিঃ আগে ঘুম থেকে উঠতে পারা না পারার বিষয়টি। বৃহস্পতিবারের দিনগত রাতে অনেক আগে উঠে পড়ি এবং ফজর পর্যন্ত জেগে থাকতে বাধ্য হই, কারণ ঘুমিয়ে গেলে ফজরের ফরজ নামাজটি নফলের জন্যে সময় মত পড়তে না পারাটাও তো গ্রহণযোগ্য নয়। শুক্রবারের দিন গত রাতেও ঘটল একই অবস্থা। আল্লাহর মেহেরবাণী ফজরের আজানের আওয়াজ কানে আসা পর্যন্ত জেগে থাকলেও আল্লাবিল্লাহ করতে বিন্দুমাত্র ক্লান্তিবোধ হয়নি বরং হৃদয়ে অনুভব হয়েছিল অনাবিল প্রশান্তি।

২৩/০৫/০৮

দুপুর ১১-৩০টার দিকে নিরাপত্তা কর্মীদের একজন এসে জানিয়ে গেল নিরাপত্তাজনিত কারণে জুমআর নামাজে যাওয়া যাবে না। জেলবন্দীদের জন্যে জুমআ ওয়াজেব নয় এটা জানা থাকলেও জীবনের প্রথম এ ঘটনাটি হৃদয়ে যেন কাঁটা হয়ে বিঁধল। এটা জেনেও মনের এ কষ্ট দূর করতে পারলাম না যে পবিত্র জুমআ এই ফজলিতের দিনের বৃহৎ জামাআত থেকে যারা আমাকে বঞ্চিত করেছে এর পূর্ণ দায়-দায়িত্ব তাদের। এখানে আমার কিছু করার নেই, মহান আল্লাহ তো সব জানেন।

২৪/০৫/০৮

ফজরের নামাজের পর ঘুমাতে হল। কারণ ঘুম ভেঙ্গেছিল রাত ২-৩০ টায়। ফজর পর্যন্ত আর শুতে যাইনি। তাই ফজরের পর আর জেগে থাকতে পারছিলাম না। যথারীতি নাশতার আগে গোসল সেরে নিলাম। তার আগে একটু হেঁটেও নিলাম।

জেলখানায় পত্রিকা আসে মাত্র ৪টি। আমার দেশ, মানব জমিন, ইত্তেফাক এবং নিউজ টুডে। আমরা আমাদের কামরায় তিনটি পত্রিকা পেলাম ইংরেজীটা বাদে। জেলখানার সময়টা কাজে লাগানোর জন্যে কিছু একটা লেখার ইচ্ছা ছিল। বিশেষ করে 'রাসূলুল্লাহর মক্কার জীবন' লেখার পর আমার নিজেরও সিদ্ধান্ত ছিল এরপর মদিনার জীবন সম্পর্কে লিখতে হবে। মক্কার জীবন-এর পাঠকদেরও দাবি ছিল। কিন্তু সময় সুযোগ হচ্ছিল না। এবারে এজন্যে জেল জীবনকে সুযোগ হিসাবে বেশ জোরদার অনুভব করলাম।

প্রথম দিনেই আমার সাথে দেখা করতে এসে আমার বেগম সাহেব পূর্বের আলোচনার ভিত্তিতে তাফসীরের ফুল সেট, মানবতার বন্ধু মুহাম্মাদ (সা.), সিরাতে সরোয়ারে আলম ও সিরাতুন্নবী এইগুলো নিয়ে আসে। জেল কর্তৃপক্ষ প্রথম দিনে শুধু তাফসিরের এক খণ্ড রুমে পাঠায়। বাকীটার ব্যাপারে তাদেরকে বুঝিয়ে বলতে হল। তাফসীরের ছয়খণ্ড মিলে একটি বই। সিরাতে সরোয়ারে আলমের

www.pathagar.com

কয়েকখণ্ড মিলেও মূলত বই একটি এবং সিরাতুন্নবী মিলে বইয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় মোট ৪টি মাত্র। অতএব এক সাথে ছয়টি বইয়ের বেশি দেবার নিয়ম নেই। এটা মেনেই আমার বইগুলো তারা দিতে পারে। পরে অবশ্য বইগুলো আমার রুমে পাঠানো হয়। গত বুধবারে হঠাৎ সাক্ষাতে আসার সময় আমার 'রাসূলুল্লাহর মক্কার জীবন' বইটিও মিঠু সাথে নিয়ে আসলে ওটা বিনা আপত্তিতেই আমার হাতে দিয়ে দেয়া হয়। এ নিয়ে আমি আমার নিজস্ব বইয়ের মধ্য থেকে সর্বমোট পাঁচটি বই পেলাম পড়া শোনার জন্যে। এসবগুলো বইই আমি সাথে নিলাম 'রাসূলুল্লাহর মদিনার জীবন' বইটি লেখার জন্যে। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে মোনাজাত করছি তিনি যেন আমাকে দয়া করে আমার এই ইচ্ছাটুকু পূরণের তৌফিক দেন।

গ্রেফতারের আভাস ইঙ্গিত পেয়ে অনেকেই কয়েক দিন আগে থেকে দেখা সাক্ষাৎ করতে আসছিলেন। এর মধ্যে জাগপা প্রধান শফিউল আলম প্রধান দেখা করতে এসে একটি পরামর্শ দিলেন, গ্রেফতার যদি হয়েই যান তাহলে ২৬ সেলে থাকার জন্যে জেল কর্তৃপক্ষকে বলবেন। ওটাই ভাল হবে।

আমি সোমবার সকালে ১৯ তারিখে জেলগেটে পৌঁছেই সুপারকে বললাম আমাকে কোথায় রাখবেন। বললেন আব্দুল মান্নান ভূঞার সাথে একটি বেশ বড় ভাল রুমে। আমি আমার অভিজ্ঞ শুভাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শের কথাটি জানালাম। তিনি বললেন তারাও তাই ভাবছিলেন। কিন্তু আপাতত ওখানেই যেতে হবে। কিছুদিন পরে দেখা যাবে। ঐ দিনই বিকেলে আমার পরিবারের সদস্যগণ একা একরুমে থাকা পছন্দ করলেন এবং সে জন্যে চেষ্টা করতে তাকিদ দিলেন।

সোমবার ১৯/৫/০৮ দুপুর থেকে রোববার সকাল পর্যন্ত আব্দুল মান্নান ভূঞার সাথে মোটামুটি সময়টা ভালই কাটছিল। কিন্তু বুধবারে আমার ছেলে এবং স্ত্রী এসে আবারও তাকিদ দিয়ে গেল লেখার ও ইবাদত বন্দেগীর সুবিধার জন্যে সিংগেল রুমে যেতে। আমি একটু দ্বিধায় পড়ে যাই। আঃ মান্নান ভূঞাকে ছেড়ে গেলে তিনি আবার অন্য কিছু ভাবেন কিনা। আমার লেখাপড়া ও ইবাদত বন্দেগীর অনুকূল পরিবেশও চাই। জেল সুপারের পক্ষ থেকে পরে বিবেচনার যে আশ্বাস দেয়া হয়েছিল তার ভিত্তিতে আবার জেল জীবনের ঠিক সাত দিনের মাথায় রোববার ২৫ তারিখ সকাল ১০টার দিকে বলা হল ২৬ সেলে যেতে হবে। বলার সাথে সাথেই লোকজন এসে হাজির। তার বিছানা পত্র, বইপুস্তকসহ সকল মাল-সামানা নিয়ে ২৬ সেলের দিকে রওয়ানা করল। আমিও বেশ ভারাক্রান্ত হৃদয়েই ভূঞা সাহেব থেকে বিদায় নিয়ে ২৬ সেলের দিকে রওয়ানা করলাম।

এখানে আগে থেকে যারা এসেছেন তারা সবাই আশা করেছিলেন আমাকে তাদের সাথেই রাখা হবে। কিন্তু এটা না হওয়ায় তারা মনে মনে দুঃখিত ছিলেন। আমি এসে পৌঁছতেই তারা খুবই আনন্দিত হলেন। তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে এখানকার পরিবেশ সম্পর্কে আমাকে অবহিত করলেন। এখানে লেখাপড়া ইবাদত বন্দেগী ছাড়াও অন্তরঙ্গ পরিবেশে সময় কাটাবার একটা ভাল পরিবেশ দেখে বেশ ভালই লাগল। সবাই মিলে একসাথে জোহরের নামাজ আদায় ও দুপুরের খানা খাবার পরিবেশটা সত্যি গত একসপ্তাহের তুলনায় মনটা হালকা করার জন্যে খুবই সহায় হবে বলে মনে হল।

২৫/০৫/২০০৮

রোববার দিনগত রাতটি মোটামুটি ভালই কাটল। এখানে জোহর, আসর ও মাগরিবের নামাজ অন্যান্য সাথীদের সাথে জামায়াতে পড়লাম। কিন্তু রাতের খানা ও এশার নামাজ কামরায় একা একা সারতে হয়। গ্রেফতারের রাত থেকেই শেষ রাতে ফজরের আজানের বেশ কিছু আগে উঠতে অসুবিধা হচ্ছিল। হয় বেশি আগে ঘুম ভাংছিল না হয় উঠার সাথে সাথেই আযানের আওয়াজ কানে আসছিল। প্রকাশ থাকে যে, এখানে চক বাজার শাহী মসজিদের আযান খুব ভাল ভাবেই শোনা যায়।

আমার শেষ রাতে জেগে ওঠার অবলম্বন আমার সহধর্মিনী। আমরা বাসায় নিয়মিত ১১-৩০টায় বিছানায় যাওয়ার রুটিন মাফিক অভ্যাস সত্ত্বেও কোন কোন দিন বাইরের ফোনের কারণে অথবা ১১টায় সংগ্রাম

www.pathagar.com

পত্রিকা হাতে আসলে তাতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পেলে ১২-৩০ থেকে রাত ১টা পর্যন্তও জাগতে হতো। এরপর ফজরের আযানের ১ ঘণ্টা আগে ঘুম থেকে জেগে ওঠা ছিল বেশ কষ্টসাধ্য। কিন্তু আমার বেগম সাহেবার বদৌলতে এই কঠিন কাজটি ছিল আমার জন্যে খুবই সহজ। বেচারী আযানের এক ঘণ্টা বা ৪৫ মিঃ আগে ইস্তেঞ্জা অজু সেরে জায়নামাজ বিছায়ে নিজে নামাজ শুরুর আগ মুহূর্তে আমাকে ডেকে দিত। এই নির্ভরশীলতার ফলে বেশ অসুবিধা লাগলেও ধীরে ধীরে সামলিয়ে নিতে সক্ষম হই আল্লাহর রহমতে।

২৭/০৫/২০০৮

সকালে নাশতার সময় জানা গেল বড় পুকুরিয়ার কয়লার খনি ইজারা প্রদান সংক্রান্ত মামলার তদন্তকারী অফিসার জেল গেটে কয়েকজন সাবেক মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। ১০ টা থেকে ১১ টার মধ্যে ডাকতে পারে বিধায় প্রস্তুত হয়েই থাকতে হল। জেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে জিজ্ঞাসাবাদের সময় আইনজীবীর উপস্থিতির ব্যবস্থা করতে বলেছিলাম।

যথা সময়ে ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাকের সাথে আরো ৪ জন আইনজীবী এডভোকেট জসিমুদ্দিন সরকার, এডভোকেট মসিহুল আলম, এডভোকেট সোহরাব ও এডভোকেট ফরিদ জেল গেটে এসে উপস্থিত হতেই আমাকে এবং শামসুল ইসলাম সাহেবকে জেল গেটে নিয়ে যাওয়া হল। তদন্তকারী কর্মকর্তা তখনও এসে পৌঁছায়নি। এ সময়টা কুশল বিনিময়ে কেটে গেল। তদন্তকারী কর্মকর্তা আসার সাথে সাথেই আমি সুযোগ পেলাম জিজ্ঞাসাবাদের সুযোগটা নিতে। ব্যারিস্টার সাহেব আমার সাথে উপস্থিত থাকলেন।

মামলার ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত সংশ্লিষ্টতার তো কোন প্রশ্নই উঠে না। ক্রয় কমিটির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সার সংক্ষেপ, কেবিনেট সেক্রেটারীর অনুমোদনের ভিত্তিতেই ক্রয় কমিটির এজেন্ডাভুক্ত হয়েছে। বিধি অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের সার সংক্ষেপ কেবিনেট সেক্রেটারী অনুমোদনপূর্বক এজেন্ডাভুক্ত করার জন্যে কমিটির আহ্বায়ককে সুপারিশ পাঠানোর জন্যে তার ফাইলে নথিভুক্ত করার কথা। সেই ফাইলটি দেখতে চাইলে তদন্তকারী কর্মকর্তা জানালেন কেবিনেট ডিভিশন থেকে তাকে ঐ ফাইলটি দেয়া হয়নি। তার কথাবার্তা হাবভাব থেকে মনে হল এ ব্যাপারে তার তেমন কোন ধারণাও খুব একটা নেই। আমার আইনজীবীর সাথে হঠাৎ কোন বিষয়ে তার একটা বেফাঁস মন্তব্য শুনে বিস্মিত হলাম। দেশ বা রাষ্ট্র চালাবার জন্যে নাকি কাউকে কোন দায়িত্ব নেয়ার দরকার হয় না দেশ নাকি এমনি এমনিই চলে। ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক মন্তব্যটি সহজভাবে নিতে পারছিলেন না। আমি দেখলাম এরূপ অর্বাচীন কর্মকর্তার সাথে বিতর্ক করে লাভ নেই। ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাককে আমিই আর অগ্রসর না হতে বললাম। আমার তাৎক্ষণিক Impression হল কর্মকর্তাটি অনভিজ্ঞ এবং কাণ্ডজ্ঞান বর্জিত। সেই সাথে দারুণভাবে বায়াস্ড (Biased) এবং মটিভেটেড (Motivated), এমন কর্মকর্তা নিরপেক্ষভাবে এবং ইনসাফপূর্ণভাবে তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি করতে পারে বলে মনে হল না।

২৮/০৫/২০০৮

আমার ছেলে ডা. খালেদ আসার সময়ে আমার জন্যে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র গুছিয়ে সাথে দিয়েছিল, উচ্চ রক্তচাপের রোগটা হবার কারণে মাঝে মধ্যে বিশেষ করে নতুন জায়গায় ঘুমের কিছুটা অসুবিধা হয়েই থাকে। এজন্যে ছেলে খালেদের পরামর্শ ছিল রাতে শোবার আগে যেন একটা রিলাকজেন্ট (Relaxant) খেয়ে নেই। প্রথম দু'রাত আমি তার পরামর্শ অনুযায়ী চলেছি। এরপর মনে হল এটা অভ্যাস বানিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। তাই রিলাকজেন্ট ছাড়াই ঘুমানোর চেষ্টা করলাম। আলহামদুলিল্লাহ ঘুমের কোন অসুবিধা আর হয়নি। তবে শেষ রাতে উঠার ব্যাপারে কদিন কিছু সমস্যা হলেও ২-৩০ থেকে ৩ টার মধ্যে জেগে উঠতে আল্লাহ বিশেষভাবে সাহায্য করছেন। ফজরের আযান পর্যন্ত নামাজ ও দোয়ায় কাটিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করে ঘুমাবার আগের অভ্যাস রপ্ত হয়ে যাওয়ায় আল্লাহর দরবারে অশেষ শুকরিয়া।

www.pathagar.com

এদিন আমাদেরকে কোর্টে হাজির করার কথা থাকলেও পরে নেয়া হয়নি। একই দিনে পরিবারের লোকজনের সাক্ষাতের জন্যে আসার কথা। ভাবছিলাম দু'টোর সময়ের মধ্যে কোন অসুবিধা হয়ে যায় কিনা কিন্তু সাক্ষাতের কর্মসূচিই বহাল থাকল। আদালতে হাজিরা অন্য দিনে হবে বলে জানানোর ফলে কে যেন বলল আমার পরিবারের লোকেরা আজ দুপুর তিনটার দিকে দেখা করতে আসবে। আমি সেজন্যে অপেক্ষা করছিলাম। চারটা পেরিয়ে গেলেও খবর নেই দেখে একটু কেমন যেন লাগছিল। একটা ছেলে ফজলুল হক মিলনকে বলে দিল এ ব্যাপারে একটু খোঁজ নেয়ার জন্যে। ইতোমধ্যেই আমাকে নেয়ার জন্যে নিরাপত্তা বিভাগের লোক এসে গেল। আমি পৌঁছে দেখি তখনও কেউ এসে পৌঁছেনি। জেল কর্তৃপক্ষ জানালো তারা রওয়ানা করেছেন।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর আমার স্ত্রী, বড় মেয়ে, বড় জামাই, বড় বৌমা, তার মেয়ে নাজিফা ও তৃতীয় ছেলে ডা. খালেদ পৌঁছল। তাদের পৌঁছার কথা বিকেল ৪-৩০ টায়। তারা তাদের নির্ধারিত সময়েই পৌঁছল। বড় ছেলের বৌ এর সাথে তার মেয়ে নাজিফাকে আনতে আমি মানা করেছিলাম। খালেদের বৌ-এর সাথে তার মেয়ে নাঈমাকেও আনতে মানা করেছিলাম। তাদের দেখলে মনটা দুর্বল হতে পারে, আবেগ তাড়িত হতে পারি এমন একটা আশংকা থেকেই। মানা করেছিলাম পাঁচজনের বেশি আসার নিয়ম না থাকায় খালেদের স্ত্রী ও মেয়ে আসে নাই। হয়ত সামনে আসবে। নাজিফা নাকি পত্রিকায় আমার ছবি দেখে দাদাভাই বলে চুমো খেয়েছে। তাই তাকে নিয়ে এসেছে। সাক্ষাতের জন্যে নির্ধারিত ৩০ মি. দেখতে দেখতে পার হয়ে গেলে তাদেরকে বিদায় দিয়ে চলে এলাম নির্দিষ্ট থাকার স্থানে।

২৯/০৫/০৮

হাসপাতাল থেকে ২৬ সেলে আসার পাঁচ দিনের মাথায় আমার ফুট ফরমায়েশের জন্যে বাবুল নামের একটি ছেলেকে দেয়া হল। এ পর্যন্ত ডা. আব্দুল্লাহ তাহেরের জন্যে নিয়োজিত ছেলেটিই আমার কাজ করে দিচ্ছিল। তার নামও ছিল বাবুল। কেন্দ্রীয় কারাগারে আসার দিন থেকে (১৯-০৫-০৮ থেকে ২৫-০৫-০৮) ছিলাম জনাব আব্দুল মান্নান সাহেবের সাথে হাসপাতালের একটি বড় কামরায়। সেখানে ফুট ফরমায়েশের জন্যে যে ছেলেটা ছিল তার নাম খোকন ডাক নাম হৃদয়। জোহরের নামাজের সময় তাকে জিজ্ঞেস করে ফেললাম 'তুমি নামাজ পড়বে?' আবার নামের কারণে মনে হল ঠিক বললাম কিনা। ভূঞা সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম অমুসলিম না তো? ভূঞা সাহেব বললেন, না। ছেলেটি আমাকে বলল, স্যার আমি এখন থেকে নামাজ পড়ব। সত্যি সত্যি ছেলেটি এরপর থেকে নিয়মিতই আমাদের সাথে নামাজ পড়েছে। এবং একামত সেই দিত। এক ফাঁকে আমাকে জানাল সে মাদরাসায় ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে। অস্ত্র মামলায় তার ২০ বছরের সাজা হয়েছে। আট বছর ইতোমধ্যেই হয়ে গেছে। ছেলেটি একদিন অঝোরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। বলল স্যার আমি ভুল বুঝে বন্ধুবান্ধবের সাথে এই মামলায় জড়িয়ে যাই। আমার আসলে কোন দোষ ছিল না।

কারাগারে অল্প বয়সের যুবকদের অনেকেই এভাবে ২০ বছর ৩০ বছরের শাস্তি ভোগ করতে দেখে সত্যি মনটা কেমন যেন ভেতর থেকে উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় ভরে উঠল। এর কি কোন সংস্কার সম্ভব নয়?

জেল খানায় সময় কাটানোর একটা বড় উপায় বই পড়া ও লেখালেখি করা। সাথী সঙ্গীদের সাথে গল্পেও বেশ সময় চলে যায়। রাত্রিটাই নিঃসঙ্গ কাটে। রাতের খাবার মাগরিবের আগেই দিয়ে যায়। মাগরিবের কিছু পরেই লক আপ হবার কথা, কোন দিন একটু দেরিতেও হয়। আমি আগেই উল্লেখ করেছি, শেষ রাতে উঠার ব্যাপারে আমি কারাগারে আসার আগ পর্যন্ত অনেকাংশেই আমার বেগম সাহেবের উপর নির্ভরশীল ছিলাম। এখানে এসে এই ব্যাপারে আর কারো সহযোগিতা পাওয়া যাবে কিনা খোঁজও নেইনি। নিরাপত্তার দায়িত্বে যারা থাকে তাদের বললে চলে কিনা তাও কাউকে জিজ্ঞেস করিনি। আর শেষ রাতে একান্তে ইবাদত বন্দেগীর ব্যাপারে কাউকে জানান দেয়া সমীচীন মনে হয়নি। বিয়ের আগে এমনকি ছাত্র জীবন থেকেই আমার নিজে নিজে শেষ রাতে উঠার অভ্যাস ছিল। বিয়ের পরই এ ব্যাপারে

www.pathagar.com

বেগম সাহেবের উপর নির্ভরশীল হয়ে গিয়েছিলাম। এবার আবার স্বনির্ভর হবার চেষ্টা শুরু করলাম। এ পর্যন্ত তেমন কোন অসুবিধা হয়নি। তবে গত রাতের একটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারছি না।

গতরাতে সাড়ে দশটা থেকে ১১টার মধ্যেই ঘুমিয়ে যাই। ঘড়ি ও চশমা কখনো পড়ার টেবিলে থাকে কখনো মাথার পাশেও রেখে ঘুমিয়ে পড়ি। গত রাতে এটা যে কোথায় রেখেছিলাম ভাল করে মনে পড়ছিল না। গত কয়েক রাতেই কয়েক বার করে ঘুম ভেঙ্গে যায়। ১ম বারে ১২-৩০টায় দ্বিতীয় বারে ২-৩০ টায়। আবার ৩-৪০ এ ঘড়ি দেখেই শেষ রাতের কর্মসূচি আঞ্জাম দিয়ে থাকি। এ রাতে ঘুমটা প্রথমবারের মত মনে হল বেশ আগেই ঘুম ভেঙ্গেছে, সময়টা দেখার জন্যে ঘড়ি খুঁজে আর পাই না। টেবিলে নেই, মাথার পাশে নেই, বাথরুমেও নেই। মাঝে মধ্যে অজুর সময়ে ফতুয়ার পকেটে রাখার অভ্যাস কিন্তু কোন ফতুয়ার পকেটেও নেই। লক আপের পরে বাইরে থেকে কারো আসার বা নেয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। হলটা কী? বুঝতে পারছিলাম না। ফলে রাত যে কত তা আর অনুমান করার চেষ্টা না করে নামাজ ও দোয়ায় আত্মনিয়োগ করলাম।

শাহী মসজিদের ফজরের আযানের জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হওয়ায় মনে হল একটু বেশি আগে উঠে গিয়েছিলাম। যা হোক চকবাজার শাহী মসজিদের আযানের সাথে সাথেই ফজর পড়ে আবার ঘড়িটা তালাশ করলাম। সম্ভাব্য সব জায়গা খুঁজলাম কিন্তু কোন সন্ধান না পেয়ে অনেকটা হতাশ হয়ে শুয়ে পড়লাম।

সাধারণত সকাল ৫-৩০টায় লক আপটা খুলে দেয়া হয়। রাতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় আবার উঠতে একটু বিলম্বই হয়ে গেল। তারপর হাঁটার পালা। হাঁটতে হাঁটতে একজনকে ঘটনাটি বলতে চেয়েও গলার ভেতর থেকে বাধা পেয়ে বলা হল না। সকাল ৭ টা ৭-৩০ টার মধ্যে সাহায্যকারী ছেলেটা আসলে ওকে বললাম একটু খুঁজে দেখতে। ঘড়িটা কোথায় যে লুকিয়ে আছে! সে সম্ভাব্য জায়গাগুলো কয়েকবার দেখে শুনে বলল কই দেখছি না তো। হঠাৎ আমার মনে হল বালিশের পাশে একটা বইয়ের উপরে ঘড়িটা থাকার কথা। সেখান থেকে বালিশের কভার দিয়ে ভেতরে গেল কিনা একটু দেখা যাক। যে কথা সেই কাজ বালিশের কভারের পাশটা খোলা ছিল। বইয়ের উপর থেকে গড়িয়ে ঘড়ি ওখানেই লুকিয়ে যায়। আমি কিন্তু একবার এটা ভেবেছিলাম। কিন্তু কভার এর ভেতর দিয়ে ঘড়িটা অনেক দূর ঢুকে যাওয়ায় প্রাথমিক তালাশিতে ধরা পড়েনি। যাহোক একটা চিন্তার অবসান হল। সময় ঠিক পাওয়া বিশেষ করে রাতের সময় ঠিক পাওয়ার জন্যে এখানে ঘড়ির কোন বিকল্প নেই। ওটা না পেলে কয়েকদিন বেশ অসুবিধাই হত। আল্লাহ মেহেরবান এই অসুবিধা থেকে দ্রুত রেহাই দিলেন। ঘড়িটা পেয়ে দুশ্চিন্তামুক্ত হলাম। কিন্তু ঘড়িটার বেল্ট খুলে যাওয়ায় এখনো হাতে দিতে পারি নাই। শুক্রবারে পারা যাবে না আগামী কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

আজকের শুক্রবার জেল জীবনে আমার দ্বিতীয় শুক্রবার। ১ম শুক্রবারে নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের একজন এসে বেশ বিনয়ের সাথে বলে গেলেন নিরাপত্তাজনিত কারণে জুমআর জামাতে যাওয়া যাবে না। আজকেও তাই আর জুমআর নামাজে যাওয়ার আশা করার কোন সুযোগ নেই। তবে বরকতময় এই দিনে অন্যান্য মুসলমান ও মুসল্লিদের সাথে একত্রে নামাজ আদায়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া বড়ই দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক।

মাগরিবের নামাজের আগে সাধারণত আমাদের সাথী রেডিও টুডেতে খবরের হেড লাইন শুনে নামাজে দাঁড়ায়। আজকের দিনটি জুমার দিন সেই সাথে ২৯ মে হওয়ায় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাহাদাতের দিন। শুক্রবারে রেডিওতে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য খবর থাকার কথা না থাকলেও শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবর্ষিকী পালনের খবর জানার জন্যে সাথীরা উদগ্রীব ছিলেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা জিয়ার মাজারে ফুল দেয়ার খবরের পাশাপাশি বিএনপির দলীয় কর্মসূচির খবরটা বেশ ফলাও করেই প্রচারিত হল। খবর শুনে আমরা যথারীতি মাগরিব আদায় করলাম। ফরজ

www.pathagar.com

নামাজ শেষে ছোট ভাই ফজলুল হক মিলন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সুন্নত নামাজের পর শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের জন্যে দোয়ার প্রস্তাব রাখল। আমরা নামাজ শেষে প্রাণ ভরে তার জন্যে এবং দেশের জন্যে দোয়া করলাম। আমাদের সাথে এ দোয়ায় শেখ ফজলুল করিম সেলিমও অংশ নেন।
তারিখটা মনে রাখা সম্ভব হয়নি। মওদুদ সাহেব একটা চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছিলেন আলাপ আলোচনাকালে। ইতঃপূর্বে সে তথ্যটা নিয়ে রীতিমত হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল। তার অংশ বিশেষ সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করলেন সাবেক আইনমন্ত্রী জনাব মওদুদ সাহেব। বেশ কিছু দিন আগে কানাডার আইনজীবী মিঃ স্লোন গোটা বাংলাদেশ ঘুরে কানাডা যাবার পথে নিউইয়র্ক সাংবাদিকদের বলেছিলেন 'মাইনাস টু ফরমুলা' নাকি অনেক আগের এবং পূর্বপরিকল্পিত। এ জন্যে যে পরিস্থিতি তৈরি করা দরকার তাও ছিল পরিকল্পিত। ২৮ অক্টোবরের ঘটনাও নাকি ছিল ঐ পরিকল্পনার অংশ। তাকে নাকি এটা ২০০৫ সালে একজন এমপি এবং একজন সম্পাদক বলেছিলেন। ঢাকায় এ তথ্য নিয়ে জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোতে আলোচনা জমে উঠেছিল। সম্পাদক মহোদয় কে হতে পারেন এ নিয়ে জল্পনা কল্পনা দুটোর একটা হবেই এটা সবাই প্রায় ধরে নিচ্ছিল। মওদুদ সাহেব বললেন ২০০৫ সালের কোন এক বিশেষ দিনে ভারতীয় হাই কমিশনারের বাসভবনে জনাব আমীর হোসেন আমু এ কথাটি অবতারণা করেন। সাথে প্রথম আলো এবং ডেইলী স্টার-এর সম্পাদকদ্বয়ও ছিলেন। তারাও এতে সায় দেন।

৩০/০৫/০৮

মে মাসের ত্রিশ তারিখটা কিভাবে যেন কেটে গেল। ৪টি পত্রিকা ইত্তেফাক, আমারদেশ, মানব জমিন এবং নিউজ টু ডে-এর পাতা উল্টাতে উল্টাতেই সময়টা পার হয়ে যায়। আগের দিন সংলাপ সম্পর্কে হোসেন জিল্লুর রহমানের মন্তব্যের উপর নিউ এইজ পত্রিকার সম্পাদক জনাব নুরুল কবীরের মন্তব্যটা ছিল খুব যুৎসই। ৩০ তারিখে রেডিওটুডের মাধ্যমে জানা গেল হোসেন সাহেব নিজকে বিতর্ক মুক্ত করার প্রয়াস চালাতে বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।
এখানে মাগরিবের কিছু পর থেকেই নিঃসঙ্গ হয়ে যেতে হয়। আমি একটু সকাল সকাল শুয়ে পড়তে ইতোমধ্যেই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। তবে মুশকিল হচ্ছে ঘুমটাও খুব তাড়াতাড়ি ভেঙ্গে যায়। কোন দিন রাত ১টায় কোন দিন ২টায়। ঐ সময়ে শুয়ে পড়লে ফজরের আগে উঠতে পারা না পারার আশংকা থেকে যায়। গত রাতে ঘুম ভেঙ্গে যাবার পর উঠে দেখি ঘড়িতে বাজে মাত্র ২টা। এরপরে ঘুমিয়ে গেলে আযানের সময় টের পাব কি পাব না এ ব্যাপারে চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলাম আযান পর্যন্ত জেগেই কাটানো যাক। আযান হলেই যেন নামাজ আদায় করে ঘুমিয়ে যেতে পারি। আল্লাহ মেহেরবান, সময়টা এত তাড়াতাড়ি কিভাবে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। মনে হল, আরও একটু আগে উঠলেও কোন অসুবিধা হত না।

৩১/০৫/০৮

আজ পবিত্র মক্কা মোয়াজ্জামায় রাবেতার সম্মেলনে আমার অংশ গ্রহণের কথা ছিল। যাওয়া সম্ভব হলে সম্মেলনের ১ দিন আগে কাবা বায়তুল্লাহ তাওয়াফের সুযোগ পেতাম। আমার সফর সঙ্গী হিসাবে আমার বেগম সাহেবার এবং ড. আব্দুস সামাদ সাহেবেরও দাওয়াত এবং ভিসা এসেছিল। গ্রেফতার হবার কারণে সম্মেলনে যাওয়া হল না। সম্মেলনে যেতে না পারার চেয়ে মনে বড় ব্যথা অনুভব করলাম হারাম শরীফে হাজিরা দেয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবার কারণে। আল্লাহ চাইলে যেকোন সময়ে তাঁর ঘরে ডেকে নিতেই পারেন।

০১/০৬/০৮

আমাদের অন্যতম সিনিয়র সাথী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ সাহেব নাইকো মামলায় হাজিরা দেয়ার জন্যে কোর্টে গেলেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে কোর্টে দেখা হবার কথা। সবাই প্রতীক্ষায় ছিলেন সাক্ষাতের ফলাফল জানার জন্যে। মওদুদ সাহেব ফিরে আসতেই সবাই তার কাছ থেকে বেগম

www.pathagar.com

খালেদা জিয়া সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আদালতে তার বক্তব্যকে সবাই স্বাগত জানালেন। তিনি জরুরি আইন তুলে নিয়ে অক্টোবরের মধ্যে নির্বাচন দেবার দাবি জানান। প্রচলিত আইনে বিচারের দাবি জানান যা সকলের মনের কথা বলেই মনে হল। তিনি বর্তমান সরকারের ব্যাপারেও স্পষ্ট কথা উচ্চারণ করে উল্লেখ করেন দেশকে ২০ বছর পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। গতকাল বিকেল থেকে রেডিও টুডে ও বিবিসিতে বেগম খালেদা জিয়ার বক্তব্য বেশ ভাল প্রচার পায়।

০২/০৬/০৮

আজকের সকালে আমরা যে ৪টি দৈনিক পত্রিকা পাই তাতেও বেগম খালেদা জিয়ার বক্তব্য বেশ ফলাও করে প্রচার করা হয়। মানব জমিন ভেতরের পাতায় দিলেও জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের বক্তব্য বেশ গুরুত্বসহ প্রকাশ করে।

এফবিসিসিআই-এর সভাপতি আনিসুল হক সাহেবের মন্তব্য "সংলাপ সফল না হলে আর একটি ১/১১ হবে।" কথাটার মর্ম কি এ নিয়েও ২/১ জনের মধ্যে জানার ঔৎসুক্য দেখা গেল। একজন বললেন এর একজন ব্যবসায়ী নেতাই তো প্রথম জরুরি অবস্থা ঘোষণার দাবি করেছিলেন। তার মাত্র কয়েকদিন পরেই জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিল। এবারে এফবিসিসিআই সভাপতির বক্তব্য একেবারে হালকাভাবে নেয়া যায় না। তাদের কাছে কোন তথ্য থাকতেও পারে।

০৩/০৬/০৮

৩ জুন ০৮ বিকেল ৪টায় পরিবারের সদস্যদের সাক্ষাতের দিন ধার্য হওয়ার কথা জানা গেল ০২/০৬/০৮ এর বিকেল বেলা। দুপুরে খাবার পরে একটু ঘুমুতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ঘুম হল না। গত সপ্তাহে ওরা বলে গিয়েছিল আমার ছেলে খালেদের ৩ মাস বয়সী মেয়েকেও নিয়ে আসবে। বাসায় সেই ছিল আমার খেলার সাথী। জাগনা থাকলে তার মা অথবা আব্বা আমার কাছেই রেখে যেত। আমি বাসার বাইরে যাওয়ার সময় তাকে দেখে আদর করে বাইরে যেতাম। ফিরে এসে তাকেই আগে দেখার চেষ্টা করতাম। গ্রেফতারের রাতেও তাকে আদর করেই বাসায় থেকে বিদায় নিয়েছিলাম। এতদিন বারবার তার হাসি মুখটাই চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। কোলে নিতে দেরী হলে কেমন উচ্চ কান্নায় চেঁচিয়ে কোলে তুলতে বাধ্য করতো সে। ১৬/১৭ দিন পর তার মুখটা দেখার জন্যে মনের মধ্যে বেশ ব্যাকুলতা লক্ষ্য করলাম। ওদের আসার কথা পাঁচটায়, আমি ৪টার সময়ই প্রস্তুত হয়ে বসে থাকলাম ওদের আগমনী বার্তার জন্যে। ঠিক পাঁচটা বাজার কয়েক মিনিট আগে তাদের আসার খবর নিয়ে জেল কর্তৃপক্ষের লোক হাজির হল। তখন আমাদের আসরের নামাজ জামাতে আদায় করার সময় হয়ে আসছে। আমি নামাজ আদায় করেই যেতে চাইলাম। সাথীদের ক'জন বললেন যান দেখা করে এসেই নামাজ আদায় করবেন, তারা কতক্ষণ আর অপেক্ষা করবে।

আমি পৌঁছে গেলাম জেল গেটে। তারা এসে গেছে শুনলাম। তারপরও একটু দেরী হল। কারণ মুহসিনা আলাদা এসেছে তার দুই মেয়ে সাথে নিয়ে। তার পৌঁছতে কিছুটা বিলম্ব হওয়াতেই সবাই একটু বিলম্ব করে এক সাথে পৌঁছল। অনেক দিন পর আমার নাতনী খেলার সাথী নাঈমাকে দেখে মনে মনে বেশ আবেগ আপ্লুত হলাম। আমার কোলে এসে আগের মত আর হাসি দিল না। জোরে জোরে আওয়াজ দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টাও করল না। তার মুখ হঠাৎ কেন যেন বেশ লাল হয়ে উঠল কেমন যেন কষ্টের কান্নায় ওকে পেয়ে বসল। মা'সুম নিষ্পাপ শিশুর মনে আল্লাহর পক্ষ থেকেই বোধহয় একটা উপলব্ধি এসে থাকবে যে সে তার দাদাকে আগে যেভাবে পেয়েছে এখন আরো কতদিন যে সেভাবে পাবে না তা আল্লাহ ছাড়া কারো জানা নেই।

০৪/০৬/০৮

www.pathagar.com

বিশেষ আদালতে হাজিরার জন্যে সকাল ৮টায় নাশতা সেরে সাড়ে আটটার মধ্যে প্রস্তুত হয়ে যেতে হল। পৌনে ৯টায় কারাকর্তৃপক্ষের লোক এল জেল গেটে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। প্রথম যেদিন জেলগেটে এলাম সেদিন একটা স্ট্যান্ড ফ্যান দেয়া হয়েছিল, জেলসুপারের রুমের পাশের ওয়েটিং স্পেসে। এরপর আরও ২/১ দিন ওখানেই পাখা পেয়েছি। কিন্তু গতকাল আমার পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাতের সময়ও পাখা পাইনি। আজকে ৫ জন সাবেক মন্ত্রীসহ বিশেষ আদালতে হাজিরার জন্যে যাদের যাওয়ার কথা তাদের প্রিজন ভ্যানে তোলার আগেই গরমে অতিষ্ঠ হবার দশা। আমার শরীরটা একটু বেশি খারাপ বিধায় আমার অবস্থাই মনে হয় সব চেয়ে খারাপ বোধ হচ্ছিল। কাউকে বলেই কোন পাখার ব্যবস্থা করা গেল না। গাড়িতে উঠেও গরমে অতিষ্ঠ হয়ে যাই। সংসদ ভবনে স্থাপিত কোর্ট হাউজে পৌঁছলাম ঘর্মক্লান্ত শরীর নিয়ে। প্রিজন ভ্যান থেকে নেমে সংসদ ভবনে স্থাপিত জেল হাজতে ঢুকেই মনের উপরে কেমন যেন একটা নেতিবাচক অনুভূতি কাঁটার মত বিদ্ধ হতে লাগল। হায়, এই কি সেই সংসদ ভবন, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পদভারে যার সরগরম থাকার কথা! সংসদ ও সংসদীয় গণতন্ত্রকে অপমান করার এই প্রক্রিয়াটি যাদের মগজ থেকে বের হয়েছে তারা বাংলাদেশকে রাজনীতি শূন্য করে গণতন্ত্রকে নির্বাসনে দিয়ে দেশকে কোন অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে কে জানে? অতিরিক্ত ঘামার কারণে শরীরটাকে বেশ ক্লান্ত মনে হল। আমাদের কক্ষের দরজার কাছে দাঁড়ানো পুলিশদের একজনকে ডেকে একটু পানির ব্যবস্থা করার জন্যে অনুরোধ করলাম। এরপর থেকে বেশ কিছুক্ষণ আর কোন পুলিশ দেখা গেল না। পিপাসায় ছটফট করছিলাম। এমন সময় অর্ধ লিটারের দুটো পানির বোতল নিয়ে এল একজন সিপাহী, পরে শুনলাম ঐ পানির বোতল ২টি পাঠিয়েছিলেন আমাদের আইনজীবী বন্ধুগণ।

এরপর ১১:৩০ টার দিকে কোর্টের কাঠগড়ায় গিয়ে বসতে হল। আমাদের বন্ধু-বান্ধব পরামর্শ দিয়ে ছিলেন আদালতে যেন বক্তব্য দেই। ড. মোশাররফ সাহেব ও বেগম জিয়ার আগে বক্তব্য দেয়ার কথা। কিন্তু আদালতের পক্ষ থেকে শুধু বেগম জিয়াকেই কথা বলার অনুমতি দেয়ায়, আমাদের পক্ষ থেকে আর কোন বক্তব্য দেয়া সম্ভব হল না।

বিশেষ আদালতের কাঠগড়ায় আমরা বসার কিছু পরেই হুইল চেয়ারে করে হাত পা কম্পন অবস্থায় বেগম জিয়ার ছোট ছেলে কোকোকে উপস্থিত করা হলে এক করুণ দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। বেগম খালেদা জিয়া কাঠগড়ায় তার নির্দিষ্ট আসন গ্রহণের আগে অসুস্থ ছেলেকে জড়িয়ে ধরলে সেই করুণ দৃশ্যটি আরো করুণ হয়ে ওঠে। বেগম খালেদা জিয়া মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে কত শক্ত ব্যক্তিত্ব তার একটি জীবন্ত প্রমাণ ফুটে ওঠে এই মুহূর্তে। অসুস্থ ছেলের করুণ দৃশ্য দেখে কিছুক্ষণ আবেগ আপ্লুত থাকলেও মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নেন তিনি। এরপর তার সাবেক কেবিনেটের সহকর্মীদের সাথে দেখা ও কুশল বিনিময় সেরে শান্তভাবে বসে যান তার নির্দিষ্ট আসনে। আদালতের অনুমতিক্রমে প্রায় ২০ মিঃ বক্তব্য রাখলেন গ্যাটকোর সাজানো মামলা প্রসঙ্গে এবং দেশের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে। বেগম জিয়া যখন বক্তব্য রাখছিলেন তখনও তার চোখের সামনেই তার অসুস্থ ছেলে কোকোর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে আসছিল। তাকে এক পর্যায়ে অক্সিজেন দিতে হল। বেগম জিয়া তার বক্তৃতার মধ্যেই বললেন তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হোক।

তার বক্তৃতার শেষে আবারও কুশল বিনিময়ের পালা। আমরা কয়েকজন এক সাথে আছি জেনে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করে বললেন আপনারা তো ভালই আছেন, আমার তো চার দেয়ালের মাঝে আর কথা বলার কেউ নেই। আমি সাথে সাথেই বললাম, আল্লাহ আছেন, আপনি আল্লাহর সাথেই কথাবার্তা বলবেন। বেগম জিয়া সাথে সাথে বললেন হ্যাঁ, আমি তাই করছি। সারা রাতই আমি নামাজ পড়ি আল্লাহকে ডাকি ফজরের নামাজ পর্যন্ত জেগেই থাকি। ফজরের নামাজ শেষে ঘুমুতো যাই। বেগম জিয়ার বক্তব্যের শেষের দিকেই আদালতের পক্ষ থেকে ১০ই জুন পরবর্তী তারিখ ঘোষণা করা হল। আমরা আদালত কক্ষ থেকে বের হয়ে হাজত কক্ষে প্রবেশ করলাম। আদালতের দেয়া সিদ্ধান্তের আলোকে,

www.pathagar.com

আমাদের আইনজীবীগণের সাথে আধা ঘণ্টা সময় কথাবার্তা বলা বা পরামর্শের জন্যে বরাদ্দ করা হয়। এরপর কারাগারের উদ্দেশে রওয়ানা দেবার পালা। আমাদের ডাকা হল। রওয়ানা হলাম আবার বসতে বলা হল গাড়ী না থাকার কথা বলে। ভাল গাড়ী না থাকার কথা বলে। আমরা অবশেষে কারাগারে পৌঁছলাম বেলা পৌনে ৩টার দিকে। কারাগারে পৌঁছে জোহরের নামাজ ও দুপুরের খানা শেষে বিশ্রামে গেলাম। আজকে শরীরের অতিরিক্ত ঘাম নির্গত হবার কারণে শরীরটা বেশ দুর্বল ও ক্লান্ত মনে হল। অন্য দিনের মত আজ আর বিকেলে হাঁটা হল না।

০৫/০৬/০৮

গতকালের কোর্টে বেগম খালেদা জিয়ার বক্তব্য পত্রিকাগুলোতে বেশ ফলাও করে প্রচার করা হয়। আমাদের হাতে যে পত্রিকাগুলো আসে তার বাইরে কেমন কভারেজ পেয়েছে, সেটা অবশ্য জানার উপায় নেই। আমাদের সাথী জনাব এমকে আনোয়ার সাহেব আজ কোন এক সময়ে জেল গেটে গিয়েছিলেন সাক্ষাতের জন্যে। তিনি জেল অফিসে আনা দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকা দেখার সুযোগ পান। সংগ্রামের কভারেজ আরো ভাল হয়েছে বলে তিনি জানালেন।

০৬/০৬/০৮

আজকের পত্রিকায় বিএনপির ঐক্যের আহ্বান আওয়ামী লীগের প্রত্যাখ্যানের খবরটি বেশ হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির ইংগিত বলে মনে হল। এটা বাংলাদেশের অতীত ঐতিহ্যের পরিপন্থীও বটে। অতীতে যে কোন জাতীয় সংকট মুহূর্তে ঐক্যই সমাধানের পথ করে দিয়েছে। আওয়ামী লীগের মত একটি বড় দল ও অতীতের বিভিন্ন চড়াই উৎরাইয়ের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ দল এবার এটা বুঝতে পারছে না কেন? বিষয়টি আসলেই রহস্যপূর্ণ।

এপ্রিল মাসে সেনাবাহিনীর উচ্চ পর্যায়ে রদ বদলের পর গতকাল জেনারেল মাসউদ আর একজন সেনা কর্মকর্তাসহ রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করার একটা খবরও অনেকের কাছে প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে। এই সাক্ষাতের বিষয়টি তো কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। গতকালের রেডিও টুডের খবরে বলা হয়েছিল কতিপয় সচেতন নারী জরুরি আইনের বিরুদ্ধে রিট আবেদন পেশ করেছে। আজকের পত্রিকায় দেখা গেল জরুরি আইনের কতগুলো বিধিকে চ্যালেঞ্জ করে রিট করা হয়েছে। রীট করেছেন নিউএজ পত্রিকার সম্পাদক নুরুল করীম (কবীর), সাবেক উপদেষ্টা সুলতানা কামাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক। আইনজীবী হিসাবে আমীরুল ইসলামের নাম দেখে অনেকের মনেই প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হল। কারণ তিনি নাকি শেখ হাসিনার মামলা করতেও রাজি হননি।

০৭/০৬/০৮

বিএনপির মহাসচিবের পক্ষ থেকে ঐক্যের আহ্বান আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রত্যাখ্যান হওয়ায় আমাদের সাথী সঙ্গীদের সবাই হতাশা ব্যক্ত করলেন। আওয়ামী লীগের নেতা এবং মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের ভাগ্নে ফজলুল করীম সেলিম এবং জনকণ্ঠের আতিকুল্লাহ খান মাসুদ সাহেবও আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের বক্তব্যকে দারুণভাবে অপছন্দ করলেন। গত ৪ জুন বিশেষ আদালতে হাজিরা দিতে গিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা মুহাম্মদ নাসিমের সাথে এবং ওবায়দুল কাদেরের সাথে কথা হয়, তারা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের কথাকে দুঃখজনক বলে অভিহিত করলেন। একজন তো বলেই ফেললেন সেতো দালালি করছে।

আজকের মানব জমিনে এবং আমার দেশে জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের বক্তব্য ভেতরের পাতায় হলেও বেশ গুরুত্বসহই ছাপা হয়। কক্সবাজারে আয়োজিত জামায়াতের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের বৈঠকটি জাতীয় দৈনিকে গুরুত্বসহ ছাপা হওয়া বর্তমান সময়ের রাজনীতির বাস্তবতার বহিঃ প্রকাশ।

www.pathagar.com

আমার দাড়ি মোচ ঠিক করার কাজটা নিজে করার অভ্যাস না থাকায় কারাগারের নাপিত দিয়ে কাজ করতে হয়। তোজাম্মেল নামে একজন জনাব আব্দুল মান্নান ভূঞার সাথে থাকতে (কারাগারের হাসপাতালে) প্রথম এসেছিল। ২৬ সেলে (চম্পাকলিতে) আসার পর ১ম দিন এসেছিল যে ছেলেটি তার নাম আমিনুল ইসলাম মিন্টু বাড়ি জামালপুর। দ্বিতীয় দিনে ০৭/০৬/০৮ শনিবারে আবার তোজাম্মেল আসলো। সে সুযোগ পেলেই মনের কথাগুলো বলার চেষ্টা করে। ২য় মিথ্যা মামলার (হত্যা) আসামী হিসাবে ৩০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করছে। ১৫ বছর চলে গেছে, সে এক বছরের এক সন্তান সে রেখে এসেছিল। এখন তার বয়স ১৬ বছর। তার দেখা শোনার কেউ নেই। সেও নাকি আবার কোন মিথ্যা মামলার আসামী হয়েছে।

তোজাম্মেল মানুষের দুর্দশার একটা করুণ চিত্র বলল আমাকে। তার পরিচিত এক লোক প্রথম থেকে ঢাকায় এসে রিকশা চালানো শুরু করে। আস্তে আস্তে সে ১টা ২টা করতে করতে ১৪টি রিকশার মালিক হয়ে যায়। ছেলে একটা রিক্সা চালায় বাকীগুলো ভাড়া দেয় আর সে গ্যারেজ বানিয়ে রিকশা মেরামতের কাজ করে। মোটামুটি সুখেই চালাচ্ছিল সংসার। হঠাৎ তার ছেলের রিকশায় বেশি ভাড়া দিয়ে একজন উঠে সাথে একটা কার্টুন নেয়। কার্টুনে যে ফেন্সিডিল ছিল ছেলেটা বুঝতে পারেনি। পুলিশে টের পেয়ে ধরতে গেলে ভাড়াটে পালিয়ে যায়। ধরা পড়ে যায় গরীব রিকশাওয়ালা ছেলেটি। ছেলেকে ছাড়াতে বা বাঁচাতে গিয়ে নাকি ঐ লোকটা তার চৌদ্দটি রিকশাই বিক্রি করতে বাধ্য হয়।

০৮/০৬/০৮

আজকের ইত্তেফাকে নাটকীয় কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে মর্মে যে রাজনৈতিক প্রতিবেদনটি ছাপা হয় তার উপর সাথীদের অনেকেই ইতিবাচক নেতিবাচক মন্তব্য করলেন। এক পর্যায়ে মওদূদ সাহেব তার কোন বিদেশী বন্ধুর পক্ষ থেকে কোন বিষয়ে সতর্ক করার হয়েছিল, সে সম্পর্কে আমাকে জানালেন। কোন নির্দিষ্ট ঘটনা না বললেও ১/১১ এরপর থেকে যা কিছু এ যাবত ঘটেছে তার সাথে নাকি ঐ সতর্কবানীটা বেশ মিলে যায়। কদিন আগে তিনি বলেছিলেন মাইনাস টুর কথাটা নাকি তিনি ২০০৫ সালে ভারতীয় হাইকমিশনারের বাসায় আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য জনাব আমীর হোসেন আমুর মুখে শুনেছিলেন। মোদ্দা কথা আজকের বাংলাদেশে যা কিছু ঘটছে এটা কোন তাৎক্ষণিক ব্যাপার নয় পূর্বপরিকল্পিত। এটা একেবারে লক্ষ্যবিহীন নয়। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও নীলনকশার ভিত্তিতেই এটা ঘটানো হয়েছে। দেশের ভেতরের লোকদের সাথে বাইরের লোকদেরও এতে হাতে রয়েছে এ সম্পর্কেও কোন সন্দেহ সংশয়ের আর অবকাশ নেই। তাই আমাদের সাথীদের বিশ্লেষণ রাতারাতি কিছু হবার কোন সম্ভাবনা নেই। এ অবস্থা কোথায় গিয়ে শেষ হবে তাও একেবারেই অনিশ্চিত।

০৯/০৬/০৮

গতকাল বিকেল থেকেই রেডিওর খবরে জানা যাচ্ছিল, আওয়ামী লীগের সভানেত্রী সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে চিকিৎসার্থে বাইরে যেতে দেয়া হবে। শেখ হাসিনা মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন বলে জানিয়েছেন। অন্য দিকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া জানিয়েছেন তিনি দেশেই চিকিৎসা করতে চান। অবশ্য তার অসুস্থ দুই ছেলেকে বাইরে পাঠাতে চান।

আজ সকালের পত্রিকায় কালকের খবরই আমাদের সামনে আসে। সাথীদের অনেকেই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে থাকেন এর ফলশ্রুতিতে রাজনৈতিক চিত্রটা কী হতে যাচ্ছে। বাংলাদেশের আগামী দিনের রাজনীতিতে ইতিবাচক কোন শুভ সংবাদের সম্ভাবনাই কেউ খুঁজে পেলেন না এর মধ্যে। আল্লাহই ভাল জানেন আসলে কী হতে যাচ্ছে আগামী দিনের বাংলাদেশে।

৩০ বছরের কারাদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদী তোজাম্মেল আজকেও এসেছিল আমার চুল কাটার জন্যে। সে তার কাজের ফাঁকে ফাঁকে বেশ কথা বলে। আজকে সে একটি মজার গল্প শোনাল গ্রাম বাংলার। যার সার কথা "এক মোড়লের বাড়িতে মুরগী ৫ হালি ডিম পেড়ে বাচ্চা ফুটায়। এমন সময়ে বন্যায় আশপাশ ডুবে

www.pathagar.com

যাওয়ার কারণে পাশের জঙ্গল থেকে একটা শিয়াল এসে মোড়লের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। মোড়লের মুরগী বাচ্চা নিয়ে চলতে ফিরতে শিয়াল মুরগী খেয়ে ফেলতে পারে একথা বলে মোড়ল সাহেবকে লোকেরা পরামর্শ দিল শিয়ালটা বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্যে কিন্তু মোড়লের কথা বিপদের সময় এসে আশ্রয় নিয়েছে তাকে তাড়ানো যাবে না মারাও যাবে না। শিয়াল নিজেই যেহেতু বিপদগ্রস্ত সেও মুরগী খাবে না মুরগীর বাচ্চারও কিছু করবে না।

মুরগীর স্বভাব অনুযায়ী বাচ্চা নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে কাউকে সন্দেহ করলে তাকে তাড়া করে বা আক্রমণ করে বাচ্চাগুলোকে রক্ষা করার জন্যে। প্রতিদিন তাই মুরগীরটা বাচ্চা নিয়ে ঘোরার সময় শিয়াল দেখলেই ধেয়ে গিয়ে তার কপালে ঠোকর মারে, মাঝে মধ্যে পায়ের নখ দিয়ে খামচি মারার চেষ্টা করে। অনুরূপ ঘটনা ঘটতে থাকে বেশ ক'দিন যাবত কিন্তু শিয়াল পালানোর সুযোগ পাবে না ভয়ে সহ্য করতে থাকে। মুরগীকে কিছুই বলে না। কিছু দিন যাওয়ার পর যখন শিয়াল দেখল যে বন্যার পানি সরে গেছে এবার সে নিজের আস্তানায় নিরাপদে চলে যেতে পারবে, সেদিন আর মুরগীকে খাতির করল না, মুরগীকে দেখা মাত্র ধরে নিয়ে চলে যায় নিজের নিরাপদ গন্তব্য স্থলে।" এতটুকু বলার পর তোজাম্মেল সংক্ষেপে মন্তব্য করল দুনিয়াটা এ রকমই স্যার। আমাদের দেশের অবস্থাও এ রকমই মনে হচ্ছে স্যার। তার গল্পের উপস্থাপনা চমৎকার। কিন্তু এর মর্ম যে কী তা আমার পক্ষে বোঝা এখনও সম্ভব হয়নি। দেশের রাজনীতির এবং সমাজ চিত্রের সাথে মনে হয় এর যথেষ্ট মিল আছে।

আজ সাক্ষাৎ হবার কথা পরিবারের সদস্যদের সাথে। অন্যদিন পাঁচজন আসত সাথে ফাও হিসাবে আসত আমার নাতনীরা। আমার একমাত্র নাতি এ পর্যন্ত কোন সাক্ষাতে আসেনি। আমি নিজেই নাতি নাতনিদের আনতে মানা করেছিলাম। কারণ ওদের দেখলে মনটা একটু দুর্বল হতে পারে। আমার বড় মেয়ে মহসিনা এ পর্যন্ত প্রত্যেক সাক্ষাৎকারে এসেছে। কিন্তু এবারে এসেছে শুধু আমার বেগম সাহেবা, ছেলে খালেদ এবং মিঠু। মহসিনাকে না দেখে বেশ একটু খারাপই লাগল। খালেদ বলল এবার আর কাউকে আনিনি। বেশি লোক হলে কথা বলার সুযোগ হয় না তাই। আমার বেগম সাহেবা বার বার জানতে চাইল খারাপ লাগছেনা তো? আমি বললাম খারাপ লাগার কিছু নেই আমি তো বেশ ভালই আছি। কিন্তু বুঝতে পারছিনা দেশের কী হতে যাচ্ছে। তাছাড়া ছেলেমেয়েরা কে কেমন আছে সরাসরি জানতে না পারার একটা মনঃকষ্টতো থাকেই।

১০/০৬/০৮

আজকে বিশেষ আদালতে হাজির হবার দিন। এই হাজিরার দিনটাতে আসলে কোন কাজ করা যায় না। নাশতা অন্য দিনের তুলনায় একটু সকালে হয়। সকাল ৮-৩০ টায় প্রস্তুতি নিতে হয়। বেলা ৯টার কিছু আগেই জেল গেটে নিয়ে যায়। গেলেও কিছুক্ষণ গেটের পাশে সুপারের অফিসের কাছে সাক্ষাৎ প্রার্থীদের জন্যে রাখা নির্দিষ্ট স্থানে সোফায় কিছুক্ষণ বসতে হয়। ওখানে আগে একটা স্ট্যান্ড ফ্যান ছিল। এখন সেটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বসতে বেশ কষ্ট হয়। প্রিজন ভ্যানে ওঠার আগেই শরীরটা ঘেমে যায়। পরপর ক'দিন দৃষ্টি আকর্ষণের পরও এখানে কোন ফ্যানের ব্যবস্থা হয়নি। সাক্ষাৎ প্রার্থীদেরও বেশ কষ্ট হয় ওখানে বসে কথা বলতে। যাহোক আমরা যথাসময়ে প্রিজন ভ্যানে উঠলাম। এবং সংসদ ভবনে স্থাপিত বিশেষ আদালতের সাথে হাজত খানায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। পৌঁছতেই সংগ্রামের রিপোর্টার আরেফিন ও আইনজীবীদের দেখা পেলাম। কথা হল না শুধু ইশারায় পানি চাইলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে তারা এক বোতল পানি পাঠিয়ে দিলে তৃপ্তির সাথে পান করে পিপাসা মিটালাম। সাথে নেয়া বিস্কিটও খেলাম নিয়মমাফিক বেলা ১১টায় হালকা নাশতার অভ্যাস রক্ষার্থে। গ্রেফতারের পর প্রথম আমাকে নেয়া হয় সিএমএম আদালতে গ্রেফতারের রাত শেষে সকাল বেলায়। খালেদ সকালে ক্যান্টনমেন্ট থানায় নাশতা দিয়ে এবং আমার ব্লাড প্রেসার চেক করে বাসায় ফিরে যাওয়ার পর আদালতেও হাজির হয়। কিন্তু ভীড়ের মধ্যে আমার পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। শুধু দূরের থেকে দেখা আর চোখে চোখে কথা হয়। অবশ্য

www.pathagar.com

ঐ দিনই বিকেলে সে তার মাকে এবং মহসিনাকে নিয়ে হাজির হয় সাক্ষাতের জন্যে কেন্দ্রীয় কারাগারে। অবশ্য সাথে আমার বড় জামাই সাইফুল্লাহ মানসুর এবং আমার অফিস সহকারী (ভাতিজা) মুহাম্মদ আলী মিঠু।

আমাদের ছেলেদের মধ্যে তারেক বেশি চঞ্চল। খালেদ অতটা চঞ্চল না হলেও ভেতরে ভেতরে বেশ আবেগ প্রবণ। ক্যাডেট কলেজে পড়ার সময় একটানা ছয় বছর পরিবার থেকে মা-বাপ থেকে তাকে অন্য ভাই বোনদের তুলনায় একটু বেশিই দূরে থাকতে হয়েছে। পাকিস্তানে ডাক্তারী পড়তে গিয়েও ৬ বছর পরিবার থেকে দূরে থাকতে হয়েছে। মনে হয় সে কারণেই তার অনুভূতি একটু ভিন্ন রকম। উচ্চ শিক্ষার জন্যে তারও বাইরে যাবার কথা কিন্তু তারেক এবং মোমেন বাইরে আছে ওদের একজনের পিএইচডি অপর জন বার এ্যাট ল' শেষ করে দেশে না ফেরা পর্যন্ত তার বাইরে যাবার কোন চিন্তা নেই। আব্বা আম্মার সাথে থেকে এখান থেকেই যতটা পারা যায় উচ্চ ডিগ্রীর জন্যে সে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। গ্রেফতারের মুহূর্ত থেকে তার মনের অবস্থা যে কী আল্লাহ ভাল জানেন। এ পর্যন্ত প্রতি সাক্ষাতে সে এসেছে। বিশেষ আদালতের হাজিরার দিন আদালত থেকে কারাগার অভিমুখে রওয়ানা দেয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকে শেষ দেখাটার জন্যে। চেহারার দিকে তাকালে মনে হয়, তার প্রিয় আব্বার জন্যে তার মনে যেন একটা অব্যক্ত ব্যথা তাকে এভাবে অপেক্ষা করতে বাধ্য করছে। আল্লাহর কাছে প্রাণ খুলে দোয়া করছি, আমার কারণে যেন তার ক্যারিয়ার গঠন এবং পেশাগত উন্নতি অগ্রগতি কোন অবস্থায় বাধাগ্রস্ত না হয়।

১১/০৬/০৮

গতকালের সন্ধ্যা থেকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনার মুক্তি ও বিদেশে চিকিৎসার উদ্দেশে যাওয়া নিয়ে আমাদের সাথীদের মধ্যে বেশ প্রাণবন্ত আলোচনা জমে উঠল। সত্যি সত্যি দুপুর নাগাদ তিনি মুক্তি পেয়ে সুধা সদনের বাসভবনে পরিবার পরিজনের সাথে মিলিত হলেন। রাতে দলীয় শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের সাথে বৈঠক করলেন। সরকারের ৪ উপদেষ্টা তার বাস ভবনে গিয়ে তার সাথে বৈঠক করলেন। এ খবরটা কারাগারে বন্দী নেতৃবৃন্দের জন্যে যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনার খোরাক যোগাল।

১২/০৬/০৮

আজ সকালের খবরে ভিআইপি বরাত দিয়ে বেগম খালেদা জিয়াকেও অনুরূপভাবে মুক্তি দেয়া হতে পারে আভাস দেয়ায় রাজনৈতিক আলোচনায় একটা অতিরিক্ত মাত্রা যোগ হয়। একটি ইতিবাচক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্ভাবনা উজ্জ্বল বলেই অনেকে মনে করলেন। দেখা যাক আগামী সপ্তাহের মধ্যে নতুন কিছু ঘটে কিনা। সকলের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থবহ এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করার স্বার্থে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করার সম্ভাবনা ক্রমেই প্রবল হচ্ছে বলে আমাদের অনেকেই মনে করলেন, সেটা কিভাবে হবে এটাই এখন দেখার বিষয়।

১৩/০৬/০৮

গতরাত থেকে প্রচার হয়ে আসছে, জরুরি আইনে কিছু প্রয়োজনীয় সংশোধনের উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে সরকার। যাতে জামিনের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। এমনটি হলে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটা ভাল নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি হলেও হতে পারে। বিষয়টিকে আমাদের সবাই মোটামুটি ইতিবাচকভাবেই নেয়ার চেষ্টা করলেন। তারপর কারো কারো মন্তব্য থাকল, শেষ পর্যন্ত না দেখে কিছুই বলা যায় না।

শেখ হাসিনার সাময়িক মুক্তির পর বেগম খালেদা জিয়াসহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মুক্তির সম্ভাবনা সৃষ্টি হওয়ায় ড. কামালের দায়িত্বহীন ও বেসামাল বক্তব্যের বেশ মুখরোচক আলোচনা জমে উঠল। অন্য দিকে পিডিপির ফেরদৌস কোরেশীর পক্ষ থেকে হাসিনার মুক্তির পর অন্যদের জন্যেও একই

www.pathagar.com

ব্যবস্থা হওয়া উচিৎ বলে মন্তব্য করার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে এ নিয়েও বেশ কথা বলার সুযোগ আছে বলেও মন্তব্য করলেন অনেকেই।

১৪/০৬/০৮

বা হাতের ব্যথাটা ক্রমেই বাড়ছে। পানির গ্লাসটাও বাম হাতে ধরতে বা তুলতে পারছি না। আজ সকালে নাশতার সময় কারাগারের পক্ষ থেকে ডাক্তার এলেন। আমার মেডিকেল ফাইলটা অনেক আগেই জমা দেয়া ছিল। ডাক্তার সাহেব জানালেন তারা আজকেই পিজি হাসপাতালে বিষয়টি জানাবেন। আমি শুরু থেকে ডা. ইদ্রিসের চিকিৎসাধীন ছিলাম এবং এখনও আছি কথাটি উল্লেখ করা হবে বলেও তিনি জানালেন। একটু আশা জাগল হয়ত হাতের কষ্ট ২/৩ দিনের মধ্যে দূর হতে পারে।

এদিকে গতকাল থেকে জরুরি আইন সংশোধন সংক্রান্ত সরকারী উদ্যোগ নিয়ে বেশ আলাপ জমে উঠে। জামিনের সুযোগ সৃষ্টি হলে অনেকেই জামিনে মুক্তি পেয়ে যাবেন। এমন সম্ভাবনা দীর্ঘদিন থেকে কারাগারে আটক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মনে একটা আশাবাদের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। সকলের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থবহ ও গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন উপহার দিতে চাইলে সরকারের সামনে এর কোন বিকল্প পথ খোলা আছে বলে মনে করার কোন কারণ নেই। এ ক্ষেত্রে ড. কামালের উল্টো ভূমিকা নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ থেকে যায়। তিনি এমন কড়া বক্তব্য দিচ্ছেন কার ইংগিতে এবং কোন আশায়, নাকি হতাশায়?

১৫/০৬/০৮

আমার একটা বড় দুর্বল দিক হল, আমি নিজে নিজের দাঁড়ি মোচ ঠিক করার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারিনি। এজন্যে সপ্তাহে দুদিন পেশাদার নাপিতের সাহায্য নিতে হয়। কারাগারে এসেও একই অবস্থা অব্যাহত রাখতে হলো। তবে এখানে কোন পেশাদার নাপিতের সন্ধান এখনও পাইনি। এখানে সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্তদের মধ্য থেকে অনেকেই এ কাজে নিয়োজিত আছে। এ যাবত ২ জনকে একাজের জন্যে পেয়েছি। এর মধ্যে তোজাম্মেলই নিয়মিত আমার কাজ করে দিচ্ছে। মাঝখানে একদিন একজন এসেছিল। তার নাম আমিনুল ইসলাম মিন্টু।

তোজাম্মেল কাজের ফাঁকে দেশ সম্পর্কে বেশ কথা বলে। আজ সে কথা খুব বেশি বলল না। শুধু একটা কথাই সে ঘুরে ফিরে কয়েকবার বলল, স্যার আপনারা মনে হয় শিঘ্রই বের হয়ে যাবেন। গরিব মানুষের কথা একটু ভেবে দেখেন ৩০/৩১ বছরের জেল খাটলে মানুষের জীবনের আর কী থাকে।

১৬/০৬/০৮

আজ বিশেষ আদালতে হাজিরার দিন ছিল। এজন্যে অন্যদিনের তুলনায় বেশ একটু আগে নাশতা সেরে সাড়ে আটটার মধ্যে প্রস্তুতি নিতে হয়। আদালতে হাজিরার দিন আর কোন কাজই করা যায় না। প্রিজন ভ্যানে যাওয়া আসাই একটা বড় রকমের অশান্তি বলে আমার মনে হয়। আমার শরীরটা ঘামে একটু বেশি। আর এতে আমি মাঝে মধ্যে অসুস্থও হয়ে যাই। আমার পরিবারের সদস্যগণ এনিয়ে বেশ দুশ্চিন্তায় ভুগতে থাকে। সাক্ষাৎ করতে এসে জেল সুপারের কাছে এ ব্যাপারে আমার স্ত্রী এবং ছেলে দুজনই তাদের উদ্বেগের কথা জানায়। ১০/০৬/০৮ তারিখে আমাদের আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক আদালতের দৃষ্টিতেও বিষয়টি এনে এম্বুলেন্স যোগে নেয়া আনার ব্যবস্থা করার দাবি জানান। আদালত এ ব্যাপারে জেল কোড অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেছেন বলে জানা গেল। দেখা যাক কী ব্যবস্থা হয়।

এদিকে আমার হাতের ব্যথা বেড়েই চলেছে। ক'দিন আগে একজন ডাক্তার সাহেব এসেছিলেন। তাকে জানিয়েছিলাম আমার কষ্টের কথা। এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা হবার আশ্বাস পাচ্ছি না। সবরের পরীক্ষার জন্যেই হয়ত আল্লাহ তায়ালা এখানে এনেছেন, আশা করি সর্বাবস্থায় তিনি ছবরের শক্তি দেবেন।

১৭/০৬/০৮

www.pathagar.com

গতকাল আদালতে হাজিরা থাকার কারণে সাপ্তাহিক সাক্ষাতের দিন ও সময় নির্ধারিত হয় আজ সকালে। সাধারণত সকাল ১১টার দিকে এসে যায় সকালের সাক্ষাৎ প্রার্থীগণ আর বিকেলের দিকে সময় নির্ধারণ হলে তা বিকেল ৩টা থেকে ৫টা সাড়ে ৫টা পর্যন্তও গড়ায় কোন কোন সময়। আজ আমি সকাল থেকে সাক্ষাতের জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম। সাড়ে ১০টা পর্যন্ত কিছু লেখার কাজ সেরে অপেক্ষার এক পর্যায়ে একটু বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছি বিশ্রামের জন্যে, ইতোমধ্যেই একজন নিরাপত্তা কর্মী এসে বলে, আপনার অফিস কল আছে এখনই নিয়ে যেতে বলেছে। সাধারণত সাক্ষাতের জন্যে যারা আসে তাদের দরখাস্তের কপিটাই নিয়ে আসে যাতে কে কে আসছে তারও উল্লেখ থাকে। অফিস কল বলতে কি জেল কর্তৃপক্ষের সাথে কোন আলাপ না সাক্ষাৎ বুঝতে চাইলাম। ইতোমধ্যে সাক্ষাৎ প্রার্থীদের তালিকাও এসে গেল। তাতে আর বুঝতে বাকী রইল না যে, আমার পরিবারের সদস্যরাই এসেছেন সাক্ষাতের জন্যে।

রাবেতার সম্মেলন হয়ে গেল ৩১ মে থেকে ২ জুন পর্যন্ত। আমার যাবার কথা ছিল উক্ত সম্মেলনে। তার আগেই গ্রেফতার হয়ে যাবার কারণে যাওয়া হয়নি। সিনিয়র নায়েবে আমীর ও বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত আমীর মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মাদ ইউসুফ উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন আমার প্রতিনিধি হিসাবে। বৈশাখী টেলিভিশন চ্যানেলের পক্ষ থেকে সাংবাদিক হিসাবে উক্ত সম্মেলনে যোগদানের সুযোগ পায় আমার বড় জামাতা সাইফুল্লাহ মানসুর। এই সুবাদে রাবেতার সেক্রেটারী জেনারেলের সাথে তারও সাক্ষাতের সুযোগ হয় মাওলানা ইউসুফ সাহেবের সাথে। রাবেতার সেক্রেটারী জেনারেল আমার অনুপস্থিতির কারণ হিসাবে গ্রেফতারির কথা শুনে দুঃখ প্রকাশ করেন বলে জানা গেল এই সাক্ষাৎকারে। বাংলাদেশের প্রতি সৌদি আরবের বিভিন্ন পর্যায়ে যে সহানুভূতি ও সম্মানের আসন ছিল বর্তমান সরকারের ভূমিকার কারণে তা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশীরাও সেখানে দারুণ উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় আছে বলে শুনে মনে দারুণ ব্যথা অনুভব করলাম। বাংলাদেশে পোলট্রি শিল্পের উপর একটা আঘাত এসেছে সেই সাথে যদি সৌদি আরবে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশী ফিরে আসে তাহলে বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হবে বাংলাদেশ। আমি ঢাকাস্থ সৌদি রাষ্ট্রদূতকে বিষয়টি বিশেষ সহানুভূতির সাথে বিবেচনার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। আমার কথা প্রসঙ্গে তার বক্তব্যে দুটো বিষয় সামনে আসে, এক. আমাদের প্রশাসনের পক্ষ থেকে দূতাবাস প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পায় না বলে তিনি বেশ কড়া ভাষায় অভিযোগ করলেন। দূতাবাস ভিসা ইস্যুর পরও নানা অজুহাতে লোক পাঠাতে বিলম্ব করার কারণে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী বা সংস্থা অন্য জায়গা থেকে লোক নিতে বাধ্য হয়। যারা চাকরি পেয়ে সৌদি আরবে যায় তাদেরকে সৌদি আইন-কানুনে এবং কালচার সম্পর্কে ধারণা না দেয়ার ফলেও কিছু অবাঞ্ছিত অনাকাংখিত সমস্যা সৃষ্টি হয় সেদিকে সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া দরকার। দ্বিতীয় সমস্যাটির ব্যাপারে বাংলাদেশের কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার ও কার্যকর হওয়া দরকার। বিষয়টি মিডিয়া ক্যাম্পেইন সংক্রান্ত। সৌদি আরবে বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলাদেশীরা ভাল অবস্থানে আছে এতে অনেকের মধ্যে ঈর্ষাকাতর মনোভাব আছে। সেই মনোভাব নিয়ে মিডিয়ায় বাংলাদেশীদের চরিত্র হননের লক্ষ্যে অপপ্রচারের ফলেই বাংলাদেশ সেখানে শ্রম বাজার হারাতে বসেছে। বিষয়টি নিয়ে আমি প্রধান উপদেষ্টাকেও টেলিফোনে বলার চেষ্টা করেছিলাম। তাকে অনুরোধ করেছিলাম, তিনি যেন নিজেই সৌদি আরবে যান এবং সৌদি বাদশাহ অথবা যুবরাজের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করে তাদের ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ কামনা করেন। তার পক্ষে যাওয়া আদৌ সম্ভব না হলে যেন তিনি ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট আহমদ মুহাম্মাদ আলী সাহেবের সহযোগিতা নেয়ার ব্যবস্থা করেন। পররাষ্ট্র বিয়ষক উপদেষ্টা গেলেও যেন তার সহযোগিতায় সৌদি বাদশাহ অথবা যুবরাজ প্রিন্স সুলতান বিন আল আজিজের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে তাদের হস্তক্ষেপ কামনা করতে পারেন। কিন্তু পরবর্তীতে তারা এ ব্যাপারে কতদূর কী করলেন তা আমার জানার সুযোগ হয়নি। আজকে মানসুরের মুখে প্রবাসী বাংলাদেশীদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কথা শুনে মর্মাহত হলাম। কারাগারে বন্দী অবস্থায় এখন তো আমার কোন ভূমিকা পালনের

www.pathagar.com

সুযোগ নেই। আল্লাহর কাছে দোয়া করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। আল্লাহ বাংলাদেশের উপর রহম করুন। কায়মনোবাক্যে এ দোয়াই করছি তাঁর দরবারে।

১৮/০৬/০৮

গতরাতটা মোটামুটি ভালই কেটেছে। রেডিওটুডে এবং বিবিসিতে বন্দী মুক্তি দিবসের চারদলীয় জোটের প্রোগ্রাম বেশ ভাল কভারেজ পাওয়ায় এবং জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবিটা বন্দী মুক্তি দাবির সাথে বিশেষ গুরুত্বসহ উত্থাপিত হওয়ায় আমাদের সঙ্গী সাথীরা বেশ উৎসাহিত ও উৎফুল্ল হয়েছেন বলে মনে হল।

আমার রুটিন অনুযায়ী রাতের খাবারের পর এশার নামাজ শেষে বেশ কিছুক্ষণ কোরআন তেলাওয়াতের পর শুতে যাই। শুতে যাই প্রায়ই ১০টা থেকে ১০:৩০ টার মধ্যেই। এত সকালে জেলের বাইরে থাকতে শুতে যাওয়ার কথা তো কল্পনাও করা যেত না। শুলেও ঘুমানো সম্ভব হয় না টেলিফোনের কারণে। এখানে এ সবের তো বালাই নেই, অতএব সকাল সকাল শোয়ার অভ্যাস নতুন করে গড়ে উঠার পথে। তবে মুশকিল হয়েছে সকাল সকাল শোয়ার ফলে ঘুমও ভেঙ্গে যায় কখনও ১টায় কখনো ২টার দিকে। এরপর ফজর পর্যন্ত জেগে থাকাও ঠিক মনে হয় না। কারণ শেষ রাতে জেগে উঠার মজা এতে পাওয়া যায় না। আবার এ সময় জেগে ওঠার পরে ঘুমিয়ে গেলে ঝুঁকি থেকে যায় ফজরে ঠিক সময়ে জেগে ওঠা সম্ভব হবে কিনা। ঠিক তিনটায় উঠতে পারলেই সবকূল রক্ষা করা সম্ভব হয়। কিন্তু ১০টা ১০:৩০ টায় শুয়ে পড়ার ফলে প্রায়ই রাতে একটা অসুবিধা কিছুদিন যাবত চলতেই থাকল। গতরাতে ঘুম ভাঙ্গলে ঘড়িতে দেখি ১:১৫ মিঃ বাজে। সাহস করে আবার শুয়ে পড়লাম ঠিক ২ ঘণ্টা পরে যেন উঠতে পারি এ সংকল্প নিয়ে। আল্লাহ মেহেরবান, দ্বিতীয় বার ঘুম ভাঙ্গলে দেখি ঘড়িতে বাজে ঠিক ৩-১৫ মিনিট। এটাই সবচেয়ে সুন্দর এবং মুনাসিব সময়। ফজরের আযান পর্যন্ত নামাজ দোয়া স্বাচ্ছন্দ্যে করা যায়।

চকবাজার শাহী মসজিদের আযানের আওয়াজ কানে আসতেই শেষ রাতের কর্মসূচি সমাপ্ত করে প্রস্তুতি নেই ফজরের নামাজের এবং নামাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে আবার একটু ঘুমানোর পালা। ৫-৩০ টায় লক আপ খোলা হলে হাঁটার পালা। আজ ঘুম ভাঙ্গল ঠিক ৬-১৫ মিনিটে। আজ পিজি থেকে আমাকে দেখার জন্যে বিশেষ করে হাতের ব্যথার চিকিৎসার জন্যে ডাক্তার আসার কথা ছিল। গতকাল বিকেলে কারাকর্তৃপক্ষের দুজন কর্মকর্তা এ কথা জানিয়ে যান। আমি সেজন্যে বেলা দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত আজ কোন ডাক্তার এল না। ডাঃ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের সকালে পিজিতে গিয়ে দুপুরে ফিরে আসলে জানলাম ডাক্তার নাকি আগামী কাল আসবে। এ খবরটা কারাকর্তৃপক্ষই দেবার কথা। সম্ভবত তারা পিজির সাথে সময় মত কোন যোগাযোগ করতে পারেননি। যাহোক আগামীকাল আসবে জেনে আশ্বস্ত হলাম। যথাযথ যোগাযোগ না থাকলেও ব্যবস্থা একটা হচ্ছে, আল্লাহর রহমতে। আমি এখানে আসার পর থেকেই হাতের ব্যথাতেই বেশি কষ্ট পাচ্ছি। এবং বার বার যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণও করে আসছি। এত দিনেও কিছু না হওয়ায় মনে কষ্ট লাগা খুবই স্বাভাবিক। তারপরও সবরের কোন বিকল্প নেই।

১৯/০৬/০৮

আজ বেলা ১১:৩০ টার দিকে পিজি থেকে ডা. ইদ্রিস সাহেব এলেন। সাথে ডা. খালেদকেও নিয়ে আসলেন। আমাকে কারাগারের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। গ্রেফতারের আগের দিন পর্যন্ত আমার কোমরের ব্যথার জন্যে এবং হাতের ব্যথার জন্যে নিয়মিত ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থা ছিল ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের কাকরাইলে, এখানে আসার পর থেকে যা বন্ধ হয়ে যায়। অনেক বলার পর ঠিক এক মাসের মাথায় ডাক্তারের সাক্ষাৎ পেলাম। ফিজিওথেরাপিটা কিভাবে চালু করা যায় আলাপ হল। সপ্তাহে দুদিন অর্থাৎ শনিবার ও মঙ্গলবারে নিয়মিত আমি যেতাম কাকরাইলস্থ ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে। ওখানকার ফিজিওথেরাপিস্টকে সুযোগ দিলে তিনি নিয়মিত কারাগারে এসেও ফিজিওথেরাপি দিয়ে যেতে

www.pathagar.com

পারেন। কারাকর্তৃপক্ষ অবশ্য পিজিতে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে চান। কিন্তু প্রিজন ভ্যানে এভাবে সপ্তাহে দুদিন যাওয়া আসা কোমরের ব্যথার জন্যে আরো ক্ষতিকর হতে পারে। ডা. ইদ্রিস সাহেব সুপারিশ করলেন, বাইরে নিতে হলে এম্বুলেন্স ব্যবস্থা করতে হবে। হাতের ব্যথার জন্যে আগামী রোববার ডা. ইদ্রিস নিজেই এসে ইনজেকশন দিয়ে যাবেন বলে কারাকর্তৃপক্ষকে বলে গেলেন।

২০/০৬/০৮

যথারীতি ফজরের পর ১ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিয়ে ৪০ মিনিট হেঁটে নিলাম। হাঁটার পরপরই গোসল সেরে একটু হালকা নাশতা খেয়ে লেখাপড়ার দিকে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলাম। সব দিন বা সব সময় একইভাবে লেখা আসে না। লেখায় মনও বসতে চায় না। সকাল ৭ টায় বাসায় বসে ৮টি ইংরেজী দৈনিক এবং ১৬টি বাংলা দৈনিকের ফাইল পেতাম। নাশতার আগে পরে ৭টা থেকে ৯টার মধ্যে সবগুলো পত্রিকার ১ম ও শেষ পাতার হেড লাইন গুলো আগে দেখে নিতাম। এর মধ্য থেকে যে গুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে হত সেগুলো বিস্তারিত দেখার চেষ্টা করতাম। সম্পাদকীয় উপসম্পাদকীয় পড়তাম দুপুরে। তবে পড়ার মত সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় চিহ্নিত করতাম সকাল বেলাই। কিন্তু এখানে সকালে পত্রিকা পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া পত্রিকা আসে মাত্র ৪টি। যা এখানে আমরা সকলে মিলে দেখি বা পড়ি। হাঁটা, গোসল ও হালকা নাশতা শেষে মূল নাশতার (যা আমরা এক সাথে ৯টা থেকে ৯-৩০টার মধ্যে করে থাকি) মধ্যবর্তী সময়টা পত্রিকার জন্যে অপেক্ষায় কাটে। আজকের পত্রিকায় বর্তমান সরকারের আমলে দুর্নীতির চিত্র সংক্রান্ত টিআইবির রিপোর্ট, দুদকের ও অর্থ উপদেষ্টার ব্যাখ্যা নিয়ে হালকা কিছু আলোচনা হল সাথীদের মধ্যে। আমি আজকের দিনে তিন দফা লেখার চেষ্টা করলাম। খুব একটা এগুতে পারলাম না। লেখার চেয়ে পড়তেই মন চায় বেশি। কিন্তু পড়াও বেশিক্ষণ সম্ভব হয় না। পড়াশোনা করলেই কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমের আক্রমণে কাবু হয়ে যাচ্ছি। লেখার মাল মশলা জোগাড় করতে হলেও পড়া দরকার। কিন্তু কেন যেন জেল খানায় আসার পর থেকেই ঘুমের মাত্রা বেশ বেড়ে গেছে। ঘুমের কাছে বার বার হার মানছি, যা আমার জীবনের নতুন অভিজ্ঞতা। সময়টা লেখা এবং পড়ায় কাটাতে চাই। এ জন্যে আল্লাহর সাহায্যই মূল ভরসা। আমার অঙ্গীকারের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহর মদিনার জীবন লেখা শুরু করেছি। কিন্তু মক্কার জীবনটা একটানা যেভাবে স্বাচ্ছন্দ্যে লিখেছিলাম তেমনটি এখনও অনুভব করছি না।

২১/০৬/০৮

গত রাতে দুই বিড়ালের ঝগড়ার আওয়াজে ঘুম ভাঙ্গে ঠিক রাত দুটোর সময়। ফজরের আজান পর্যন্ত জেগে থাকতে কষ্ট হতে পারে ভেবে আবার শুয়ে পড়লাম। আল্লাহর মেহেরবাণীতে রাত ৩-১০ মিনিটে ঘুম ভেঙ্গে গেল। যথারীতি অন্য সময়ের মত ফজরের আযান পর্যন্ত রুটিন মাফিক শেষ রাতের কর্মসূচি শেষে চকবাজার শাহী মসজিদের আযানের সাথে সাথে ফজরের নামাজ শেষে ঘুমিয়ে যাই। ৫-৩০ টায় আমাদের রুমের লৌহ কপাটের তালাটা খুলে দেয়া হয়। তালা খোলার আওয়াজেই সাধারণত ঘুম ভেঙ্গে যায়। বৃষ্টি থাকলে আমরা বারান্দায়ই হাঁটি। বৃষ্টি না থাকলে ২৬ সেলের চৌকার চার দিক দিয়ে হাঁটি। আমি রুটিন করে নিয়েছি সকাল ও বিকেলে ৩০-৪০ মিঃ করে হাঁটার, কোন কোন সময় এর চেয়ে একটু বেশিও হয়ে যায়। আজ ৪০ মিঃ হাঁটলাম। হাঁটা শেষে গোসল সেরে একটু হালকা নাশতার পালা, এরপর থেকে প্রতীক্ষা পত্রিকার।

২২/০৬/০৮

গতরাতেও বিড়ালের উৎপাত দেখা গেল। দুই বিড়ালের ঝগড়ার শব্দে ঘুমিয়ে থাকাটা একটা অসম্ভব ব্যাপার মনে হল। গতরাতে দুই বিড়ালের ঝগড়া একবার হলো রাত ২টার দিকে আরেক বার ৪টার দিকে। মিয়া সাহেবেরা যারা রাতে ডিউটিতে থাকেন তারা একটু ভূমিকা রাখলে বোধহয় এই উৎপাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে।

www.pathagar.com

গতকাল নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ৪টি সিটি করপোরেশন এবং ৯টি পৌর সভার নির্বাচনী সিডিউল ঘোষণা করে মন্তব্য করা হল এটা যেহেতু স্থানীয় ও অরাজনৈতিক নির্বাচন তাই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের এ ক্ষেত্রে কোন কথা বলার নাকি সুযোগ নেই। সেই সাথে সংসদ নির্বাচনের সাথে উপজেলা নির্বাচন করিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্তও জানানো হল। নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে গেলে সরকার ঘোষিত রোড ম্যাপ অনুযায়ী ২০০৮ এর ডিসেম্বরের মধ্যে সংসদ নির্বাচন আদৌ সম্ভব হবে কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয় সঙ্গত কারণেই। গতকাল সন্ধ্যা ৭-৩০ টায় বিবিসির ফোনিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে তারই রিফ্লেকশন দেখা গেল বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত মন্তব্যে ও প্রশ্নে।

২৩/০৬/০৮

গতরাতে আর বিড়ালের উৎপাতের ঘটনা ঘটেনি। আমি ১০-৩০ টায় শুয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায় ১২-৩০টায়। সাহস করে শুয়ে গেলাম রাত তিনটার দিকে উঠার নিয়ত করে। বেশ সুন্দর ঘুম হল। জেগে উঠে ভাবছিলাম বোধহয় সকাল হয়ে গেছে। কিন্তু ঘড়ি দেখে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। কারণ শেষ রাতের যে সময়টি আমি বেশি মুনাসিব মনে করি ঠিক সেই সময়ই এবার জাগতে পেয়েছি। ঘড়ির তখন ঠিক ৩-১৫ মিঃ বাজে। ইস্তেঞ্জা অজু সেরে আযান পর্যন্ত প্রায় ১ ঘণ্টা সময় হাতে থাকে বিধায় বেশ প্রাণ খুলে ইবাদত বন্দেগী এবং দোয়া মুনাজাত করা যায়। রোজকার মতই চকবাজার শাহী মসজিদের আযান শুনে ফজরের সুন্নত আদায় করে ফজর পড়ে আবার শুয়ে পড়ি। বিশেষ অসুবিধার কারণে কাল বিকেলে হাঁটা হয়নি। আজকে হাঁটতে ইচ্ছে করল না। তাই অন্য দিনের তুলনায় আজ সকালে একটু বেশি করে ঘুমিয়ে নিলাম।

২৪/০৬/০৮

আজ বিশেষ আদালতে হাজিরার দিন। গতকাল সাক্ষাতে এসেছিল আমার স্ত্রী, বড় মেয়ে, বড় বৌমা, নাতনী নাজিফাদের সাথে ছেলে ডা. নাঈমুর রহমান খালেদ। আমার শারীরিক অসুবিধাগুলো সম্পর্কে এরা সবাই খুব উদ্বেগের সাথে জেল সুপারকে জানিয়ে অনুরোধ করে গেল আমাকে যেন প্রিজন ভ্যানের পরিবর্তে এম্বুলেন্সে করে আনা নেয়া করা হয়। ডিআইজি প্রিজনকে মাওলানা সাঈদী সাহেবের মাধ্যমে বলা হয় এবং স্বরাষ্ট্র সচিবকেও নাকি মাওলানা সাহেব বলেছেন। আমার আইনজীবী আদালতের দৃষ্টিতে বিষয়টি এনেছিলেন। পারিবারিক সূত্রের খবর আদালত জেল কোড অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। জেল কোডের আওতায় নাকি এম্বুলেন্স দেয়ার কোন সুযোগ নেই। আমার চিকিৎসক ডা. ইদ্রিস আমাকে দেখতে এসেছিলেন তিনিও এম্বুলেন্স ছাড়া আমার বাইরে যাতায়াত ক্ষতিকর হতে পারে বলে তার আশংকার কথা জেল সুপারকে জানিয়ে যান এবং সুপারিশও করেন।

বিশেষ আদালতে রওয়ানার সময় এম্বুলেন্সের বিষয়টি জানতে চাইলে ডেপুটি জেলার রফিক সাহেব বললেন আদালতের নির্দেশে কোন স্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট কথা নেই, আপনাকে অর্ডারটি দেখাব। অতএব সবই অরণ্যে রোদন। আমাকে ঘর্মক্লান্তভাবে প্রিজন ভ্যানেই যেতে হল বিশেষ আদালতে।

২৫/০৬/০৮

গতকাল সকাল বিকেল কোন বেলাই হাঁটিনি। আজ বিকেলে ২০ মিঃ হাঁটলাম। খালেদের পরামর্শে লুংগী পড়ে না হেঁটে পাজামা ও সুতি পাঞ্জাবী পরে হাঁটলাম। লুংগী পড়ে হাঁটতে যে অসুবিধাটা হচ্ছিল, মনে হল পাজামা পড়ে হাঁটলে সেই অসুবিধাটা হবে না। আজকে লেখায় তেমন বরকত হল না, বিকেলে কেন যেন মনটা একটু খারাপ হল। বড় বৌমা নাজিফাকে নিয়ে একাই আমেরিকায় রওয়ানা করবে ২৬-এর দিনগত রাতে। ২৭/০৬-এর ভোর ২-১৫ টায়। পথে তাকে দুটো ট্রানজিট পার হতে হবে। তার পিতা সাথে যাওয়ার জন্যে ভিসা পাওয়ার চেষ্টা করেও পায়নি। নাজিফাকে নিয়ে মেয়েটা দীর্ঘ ৩০ ঘণ্টার পথ দুটো ট্রানজিট পার হতে বেশ কষ্টই হবে। আমার তো এখানে বসে আল্লাহর দরবারে দোয়া করা ছাড়া আর

www.pathagar.com

কিছু করার নেই। তারা গন্তব্যে পৌঁছার খবর না পাওয়া পর্যন্ত মনকে দুশ্চিন্তা মুক্ত করা বেশ কঠিন মনে হচ্ছে।

২৬/০৬/০৮

আজ ফজরের সময় থেকে বাথরুমে পানি নেই। ধরে রাখা পানি নিয়ে অজু করে ফজর পড়েছি। এখন সকাল পৌনে নয়টা। পানির কোন খোঁজ নেই।

২৬/০৬/০৮

এখন বেলা ১০-৩৫ মিঃ এখনও পানি আসে নাই। বিদ্যুৎ আছে তবে ভোলটেজ খুবই কম হবার কারণে এখন পর্যন্ত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে পারে নাই। জীবনের দীর্ঘদিনের অভ্যাস নাশতার আগে গোসল করা বা গোসল করে নাশতা করা। আজকে সেই অভ্যাসের ব্যতিক্রম করতে হলো একান্ত অপারগতায়। পানির সমস্যা অব্যাহত থাকল সারাদিনব্যাপী। ছেলেরা অনেক কষ্ট করে ড্রামের সাথে বাঁশ বেঁধে কাঁধে করে পানি আনল ট্যাংকি থেকে। সেই পানিতেই আমরা পরে কোন মতে ইস্তেঞ্জা ও অজু এবং গোসল সারলাম। বড় বৌমা গত রাতে অর্থাৎ ২৭ জুন রাত ২-১৫টায় আমেরিকার উদ্দেশে রওয়ানা করার কথা। নাজিফাসহ বউমারা সোমবারে এসেছিল বিদায় নিতে। ছোট মেয়েটাকে সাথে নিয়ে তার একা একা সফর বড় কষ্টের হবার কথা। রাত ১১টায় শুতে যাবার আগ পর্যন্ত তাদের জন্যে দোয়া করলাম। আবার ঘুম ভাঙ্গল ১-১৫ টার দিকে। এস্তেঞ্জা ও অজু করে আবারও তাদের সফর যেন নিরাপদ হয় এ জন্যে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে মোনাজাত শুরু করলাম। তাদের প্লেনে উঠার সম্ভাব্য সময় পর্যন্ত দোয়া করতে থাকলাম। ফজরের পর থেকেও তাদের জন্যে মনটা বিচলিত ছিল বিধায় আবারও হংকং ট্রানজিটে পৌঁছার সম্ভাব্য সময়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকলাম যেন ট্রানজিটে কোন রকমের অসুবিধা না হয়।

২৭/০৬/০৮

গতকাল বিকেলে হঠাৎ ডেপুটি জেলার রফিক সাহেব এসে আমার বাসার ফোন নম্বর নিয়ে গেলেন। সাথে জামায়াত অফিসের এবং আমার বড় জামাইয়ের নাম্বারও দিয়ে দিলাম। তাদের সাথে ডিআইজি প্রিজন যোগাযোগ করার কথা। একটু পরেই রফিক সাহেব আবার এসে বললেন, এখনই যদি এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা হয় তাহলে আপনি হাসপাতালে যেতে প্রস্তুত কিনা। আমি তার কথা বুঝতে পারিনি। এরপর বললেন, আপনার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে আপনার পরিবারের পক্ষ থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। উচ্চ পর্যায়ে সম্ভবত যোগাযোগও হয়েছে তাই ডিআইজি সাহেব আমাকে এ ব্যাপারে আপনার সাথে আলাপ করে জানতে বলেছেন। আমি বললাম আমার যে চিকিৎসার প্রয়োজন আছে সে কথা এসেই জানিয়েছি। মেডিকেল ফাইলও দিয়েছি। আমার চিকিৎসার দায়িত্বে যিনি আছেন সেই ডাক্তারের অধীনে ভর্তির ব্যবস্থা হলে আপত্তি নেই। এটা নিশ্চিত হওয়া ছাড়া যেতে চাই না। গতকালের এই কথার পর আর কিছু জানা যায় নি। হঠাৎ সকালের দিকে জেল গেট থেকে একটু টুকরো কাগজ এলো যাতে ছোট করে লেখা মানে অফিস কল। সাক্ষাতের উদ্দেশে গিয়ে দেখি আমার ছেলে ও স্ত্রী এসে হাজির। ডিআইজি সাহেবের কথা মতই তারা এসেছেন হাসপাতালে ভর্তির ব্যাপারে কথা বলতে। তাদের সাক্ষাতের ফলে একটা দুশ্চিন্তা দূর হল, বৌমা ঠিক মত রওয়ানা করেছে এটা জানার ফলে। তাদের সাথে আলোচনায় ঠিক হল আগামীকাল অর্থাৎ ২৮/০৬/০৮ সকালের দিকে পিজি হাসপাতালে আমার চিকিৎসক স্পাইন সার্জন ডা. ইদ্রিসের অধীনে ভর্তির ব্যবস্থা হবে। হাসপাতালে ভর্তি হলে আমাদের নিজেদের খরচে এম্বুলেন্সে আদালতে যাওয়া আসা করা যাবে।

২৮/০৬/০৮

সকাল ১২টার দিকে আমাকে পিজি হাসপাতালে আনা হল। কিন্তু বলা হল কেবিন দিতে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন বা অনুমতি লাগবে। আপাতত সিসিউতে থাকতে হবে। এটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল

www.pathagar.com

না। কারণ, আমার স্ত্রীর সাথে ডিআইজি সাহেবের যে আলাপ হয় তাতে কেবিনের কথাই বলা হয়েছিল। আমি সিসিউতে যাওয়া কিছুতেই সমীচীন মনে করতে পারলাম না। বরং আজকের মত ফিরে যাওয়া যাক। কেবিনের ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন আসলেই আসা যাবে। তাই বেলা ২:১০ টায় রওয়ানা করে ২:৩০টার দিকে কেন্দ্রীয় কারাগারে আবার পৌঁছলাম। সবাই অবাক। দুপুরের খাবার আমরা এখানে একসাথে খেতাম। সে পর্ব শেষের দিকে আমি তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে দুপুরের খাবার খেতে খেতে সাথীদের কাছে কাহিনীটা ব্যক্ত করলাম। খেয়ে বিশ্রামে যাওয়ার পর তিনটার দিকে নাকি আবার নেয়ার কথা বলা হয়।

২৯/০৬/০৮

সকালে কয়েকজনের পিজি হাসপাতালে যাওয়ার স্লিপ আসল, তার মধ্যে আমার নামটাও ছিল। আগের দিন আমাকে অন্যদের সাথে নেয়া হয়নি বরং আলাদা নেয়া হয়েছিল। সাথে ডেপুটি জেলার রফিকুল ইসলাম সাহেবও ছিলেন। আজ সকলের সাথে নেয়ার আয়োজন দেখে একটু বিস্মিত হলাম। অন্যরা যাবেন ডাক্তার দেখাতে। আর আমাকে যেতে হবে ভর্তি হতে। আমি জানিয়ে দিলাম কালকের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হোক এটা আমি চাই না। যথাযথ কর্তৃপক্ষের চূড়ান্ত নির্দেশে কেবিনে ভর্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত না হলে আমি গতকালের মত বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে চাই না। ডা. আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহেরের পিজিতে যাবার কথা। আমাদের সিনিয়র সাথী সঙ্গীরা তাহেরকে বলে দিলেন কেবিনে ভর্তির বিষয়ে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত ছাড়া যেন আমাকে নেয়া না হয় এটা জানাতে। পরে আমাকে জানানো হল ডেপুটি জেলার রফিক সাহেব পিজিতে গেছেন। তিনি খবর পাঠালেই আমাকে নিয়ে যাওয়া হবে। দুপুরে খাবারের আগে তিনি এসে জানালেন তারা প্রস্তুত কেবিন ঠিক করা হয়েছে; দুপুরের খানা খেয়েই রওয়ানা করা যায়। দ্রুত দুপুরের খাবারটা সেরে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে রওয়ানা হলাম জেল গেটের দিকে। ২:৩০ টার দিকে রওয়ানা করে সম্ভবত বেলা ৩টায় পিজিতে পৌঁছলাম। এখন থেকে শুরু হল এই সংক্ষিপ্ত জেল জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। আগামীকাল কোর্টে যাবার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জানিয়ে দিয়ে আমি পিজির ২১০ নং কেবিনে অবস্থান নিলাম। কেবিনে আমার বিছানাপত্র ঠিক করার জন্যে আমার স্ত্রী বেগম সাহেবা এবং ছেলেকে উপস্থিত দেখলাম। ছেলে পিজির ডাক্তার তাই তাকে রুমে থাকতে দিলেও আমার স্ত্রীকে তারা দ্রুতই কেবিন ত্যাগ করার তাগিদ দিল। আমরা যেহেতু আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাই আমার স্ত্রী দ্রুতই কেবিনের বাইরে চলে যায়।

৩০/০৬/০৮

আজ বিশেষ আদালতে হাজিরার দিন। প্রিজন ভ্যানে যেতে আমার দু'ধরনের কষ্ট হত, কোমরে ব্যথা বৃদ্ধির ভয়ে আতংকে থাকতে হত, আর অস্বাভাবিক ঘামে বুকে কফ জমার এবং শ্বাস কষ্ট বৃদ্ধির আশংকায় মানসিক চাপে থাকতাম। আজ সকালে এম্বুলেন্সে যাবার ব্যবস্থা হওয়ায় এই কষ্ট থেকে রেহাই পেলাম। এর আগে যে কয়দিন প্রিজন ভ্যানে গিয়েছি, শরীর ঘর্মক্লান্ত হবার ফলে বেশ দুর্বল হয়ে পড়ত। চরম অস্বস্তি ভোগ করতে হত। আজ এদিক দিয়ে আল্লাহর মেহেরবাণীতে বেশ আরামেই আদালতে পৌঁছলাম। অন্য সময়ে আদালতের হাজত খানায় পৌঁছেই গেঞ্জি বদলাতে হত। কিন্তু এবারে আর তার প্রয়োজন হয়নি। অবশ্য আদালত মোটামুটি একটা গ্যাস চেম্বারের মত হওয়ার কারণে সেখানে অবস্থানকালে ঘামে গেঞ্জিটা পুরো ভিজে যায়। আদালত শেষে হাজতখানায় ঢুকেই গেঞ্জি পাল্টালাম। তবে অন্য দিন দুবার গেঞ্জি পরিবর্তন করতে হয়েছে এবার একবারই করতে হল। আমি এখন হাসপাতালে ভর্তি একজন কারাবন্দী হিসাবে। অতএব এখানে কারাগারের চেয়ে কড়াকড়িতে কোন কমতি নেই। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে একটু বেশিই। কারাগারে ফুট ফরমায়েশের জন্যে ফালতুর ব্যবস্থা আছে। প্রয়োজনে অন্য বন্দীর জন্যে নির্ধারিত ফালতুরও সহায়তা পাওয়া যায়। এখানে এই সুযোগ নেই। বিশেষ অনুমতিক্রমে ব্যবস্থা হয়। তবে লিখিত পড়িত কোন ব্যবস্থা নেই। এখানে কারা রক্ষীদের খবরদারী একটু

www.pathagar.com

অতিরিক্ত বলেই মনে হয়েছে। ৫ই জুলাই ২০০৮ থেকে আমি ২১০ নম্বর কেবিন থেকে ২১৯ নম্বর কেবিনে আছি। এখানে দক্ষিণে একটা ছোট্ট বারান্দা আছে। দরজা খুলে দিলে দক্ষিণের উন্মুক্ত বাতাসও পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে এসি বন্ধ করে দক্ষিণের দরজা এবং জানালা খুলে দিয়ে একটু প্রাকৃতিক আলো বাতাস উপভোগ করার সুযোগ আছে এখানে।

এখানে রুটিন মাফিক সকালে এবং বিকেলে ৪০/৪৫ মিঃ করে হেঁটে নেই। রাত ১০ টা থেকে ১০:৩০ টার মধ্যে ঘুমিয়ে যাই। তিনটার দিকে উঠি। কোন দিন বেশ আগেও ঘুম ভেঙ্গে যায়। এখানে আসার পর ৩০ জুন বিশেষ আদালতে হাজিরা দিতে যাই। এরপর দ্বিতীয় দফায় যাই ৯ জুলাই। ৫ জুলাই বিকেল থেকে ২১৯ নম্বর কেবিনে আসতেই আমার ছেলে ডা. খালেদ একটা টেবিল এনে দিল যা বুক শেলফেরও কাজ করে। সেই সাথে কাপড় চোপড় গুছিয়ে রাখার জন্যে একটি মিনি আলনারও ব্যবস্থা করে দিলো। মিঠুকে সাথে নিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই সে এগুলো কিনে আনে।

জরুরি অবস্থা জারির পর ২ মাসের মধ্যেই রাসূলুল্লাহর মক্কার জীবন লেখার কাজটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হলেও ওয়াদা অনুযায়ী 'রাসূলুল্লাহর মদিনার জীবন' লেখায় হাতই দিতে পারছিলাম না। ১৯ মে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছার পরই এ লেখায় হাত দিব চিন্তা করে তাফহীমুল কোরআন এবং সিরাত সংক্রান্ত তিনটি গ্রন্থ ছাড়া আর কোন বই কারাগারে আনাইনি। কিন্তু লেখায় তেমন মন বসে না। ২৫ জুন ২৬ সেলে যাওয়ার পর কিছুটা লেখার চেষ্টা নেই। খুব অগ্রগতি না হলেও এ বিষয়ে পড়া শোনাটা মোটামুটি ভালই চলতে থাকে। পড়ার তুলনায় লেখার পরিমাণ বেশ কম। পাশাপাশি 'স্মৃতির পাতা' থেকে শিরোনামে কিছু লেখারও নিয়ত ছিল দীর্ঘ দিনের ওটাও কিছুটা শুরু করি। 'স্মৃতির পাতা থেকে' শিরোনামে লেখাটা পিজি হাসপাতালে আসার পর একটু এগুলে 'রাসূলুল্লাহর মদিনার জীবন' এর উপর এক লাইনও লিখতে পারিনি।

আমি যাতে কারাজীবনটা লেখাপড়ায় কাটাই এটা আমার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, জামাই সকলের আশা। কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকতেই তারা জেল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় লেখার জন্যে আমাকে ৫/৬টি বড় প্যাড পাঠিয়ে দেয়। আমি লজ্জিত যে তাদের মনের আশা পূরণের মত লেখা লেখির কাজটা আমার দ্বারা এবার কেন যেন হয়ে উঠছে না। মূল কারণ মনের অবস্থা। দেশের ভবিষ্যৎটা আসলে কী? কী হতে যাচ্ছে দেশে এ চিন্তাই অন্য সব সৃজনশীল চিন্তা বা গঠনমূলক লেখালেখির পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে আছে। এ অবস্থা কি শুধু আমারই না দেশ ও জাতি নিয়ে যারা চিন্তা ভাবনা করে তাদের সকলেরই?

ইতোমধ্যেই দেশের অর্থনীতি পংগু হবার পথে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বিশেষ করে চাল, ডাল, আটাসহ খাদ্যদ্রব্যের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার এবং নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে কোন উন্নতির লক্ষণ নেই। অথচ ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ পুলকিত। তারা নাকি রাজনীতিবিদদের চেয়ে দেশটা বেশ ভালই চালাচ্ছেন। ২০০৬-এর ২৭ অক্টোবর থেকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪ দলীয় জোট জনগণের নাম করে যে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল, রাজপথে মানুষ পিটিয়ে হত্যা করে নিহত মানুষের উপর পৈশাচিক নর্তন কুর্দন করে যে বীভৎস্য দৃশ্যের জন্ম দিয়েছিল, জানুয়ারীর ১১ তারিখে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করায় সেই অবস্থা ও পরিস্থিতি থেকে জনগণ স্বস্তি পাওয়ায় বর্তমান সরকার সাময়িকভাবে কিছুটা প্রশংসা পেলেও আজকের অবস্থা তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। দেশে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নেই, তাই রাজনৈতিক অঙ্গনের সংঘাত, সংঘর্ষও আপাতত নেই। তবে ছিনতাই, রাহাজানি, খুন, চুরি, ডাকাতি, খোদ রাজধানী শহরেই তো উদ্বেগজনক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাই এ সরকারের প্রধান সাফল্য বলে সরকার ও সরকারের গুণগ্রাহীরা দাবি করে থাকেন। টিআইবির সাথে দুদক কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দুর্নীতি উচ্ছেদে জোরেশোরে তৎপরতা শুরু করে। কিন্তু সেই টিআইবি আজ দাবি করছে, মাঠ লেভেলে ঘুষ এবং দুর্নীতির পরিমাণ ও রেট উভয়ই বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আবুল বারাকাত নামক একজন অর্থনীতিবিদ একুশে টিভির এক টকশোতে দাবি করেছেন এ সরকারের এক

www.pathagar.com

বছরে নাকি দুর্নীতি আড়াই গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আবুল বারাকাতের বক্তব্য খণ্ডন করে আজ পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে কোন বক্তব্য দেয়া হয়েছে বলে আমার জানার সুযোগ হয়নি। দুর্নীতি উচ্ছেদের শ্লোগান দিয়ে যারা, রাজনীতি তথা গণতন্ত্রকে গলাটিপে হত্যা করতে চাচ্ছেন, তাদের সময়েও যদি দুর্নীতি বৃদ্ধি পায় তাহলে তাদের ক্ষমতায় থাকার অর্থ কী? এতটুকু কথা লিখতে হল মনের সেই অবস্থাটা ব্যক্ত করার জন্যে যে প্রেক্ষাপটে প্রচুর অবসর সময় পেয়েও প্রয়োজনীয় লেখাপড়ার কাজটি পরিকল্পিতভাবে করতে পারছি না।

সম্প্রতি কানাডার একজন আইনজীবী ঢাকা সফর শেষে তার দেশে ফেরার পথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে যে চাঞ্চল্যকর তথ্য উদঘাটন করেছেন তা থেকে প্রতীয়মান হয় দেশের ভেতরের ও বাইরের একটি চক্র বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে গলাটিপে হত্যা করার জন্যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে নস্যাৎ করার জন্যে দীর্ঘদিন থেকে পরিকল্পনা করে আসছিল। যার ফসল ২৮ অক্টোবরে লোম হর্ষক পৈশাচিক ঘটনাসহ অবরোধের দ্বারা দেশকে অচল করে ১/১১ তে জরুরি অবস্থা ঘোষণার প্রেক্ষাপট তৈরি হওয়া। এই প্রেক্ষাপট তৈরিতে মাঠে আওয়ামী জোট ভূমিকা পালন করেছে। নেপথ্যে সক্রিয় ভূমিকায় ছিল ইউরোপীয় ইউনিয়ন, ভারত, বৃটেন, আমেরিকাসহ গোটা পশ্চিমা বিশ্ব। অমিত সম্ভাবনাময় তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশকে অকার্য ও ব্যর্থ রাষ্ট্র প্রমাণ করে আগ্রাসী প্রতিবেশী দেশটির তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যই এর পেছনে কাজ করেছে, এতে আজ আর সন্দেহ সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। সম্প্রতি ড. কামাল সাহেবের ঘোষণা, তারা নাকি চার বছর ধরে অব্যাহতভাবে কাজ করেছেন, তাদের কাঙ্ক্ষিত ১/১১ এর প্রেক্ষাপট তৈরির জন্যে। অতএব এর সুবিধাটা ভোগ করার অধিকার যাদের আছে তিনি তাদের মধ্যে অবশ্য অগ্রগণ্য ব্যক্তি বিবেচিত হবেন। এটা তার স্বাভাবিক প্রত্যাশা। তাই মাঝে মাঝে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সম্ভাবনা দেখলেই তিনি মনে ব্যথা পান, চিন্তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। কারণ গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে এলে তার মত লোকের কোন রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নেই এটা সর্বজন বিদিত।

১২-০৭-০৮

আমরা পিজি হাসপাতালে কারাবন্দী হিসাবে যারা আছি তারা কারাগারের চেয়েও কঠোরভাবে কারাগারের নিয়ম-কানুন মেনে চলার চেষ্টা করি। অন্তত আমি এ ব্যাপারে খুবই নিষ্ঠা ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকার চেষ্টা করি। তবুও কোন কোন সময় কারাবন্দীদের কারো কারো বাড়তি খবরদারী বেশ বিরক্তির জন্ম দেয়। মনে মনে খারাপ লাগলেও কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করি না। কারাগারের নিয়মেই হাসপাতালেও মাত্র ৪টি পত্রিকা আনার এবং পড়ার ব্যবস্থা করি। কারাগারে পত্রিকা সরবরাহ করেন কারা কর্তৃপক্ষ। আর এখানে আমাদের নিজেদেরই ব্যবস্থা করতে হয়। আমরা সকালের নাশতা নিয়ে আসার সময় কারাগারের জন্যে অনুমোদিত ৪টি পত্রিকা ১) ইত্তেফাক, ২) আমারদেশ ৩) মানব জমিন এবং ৪) নিউজ টুডে নিয়ে আসা হয়। ১১ই জুলাই সদ্যগঠিত জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা পরিষদ-এর জাতীয় প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১২ ই জুলাইয়ের পত্রিকায় উল্লেখিত ৪টিতে উক্ত সম্মেলনের খবর দেখার চেষ্টা করলাম। আমার দেশে প্রথম পাতায় ছবিসহ বেশ ভাল কভারেজ দেয়া হয়। মানব জমিনে ভেতরের পাতায় মোটামুটি মধ্যম মানের খবর ছাপা হয়। তাতে একটা তির্যক মন্তব্য জুড়ে দেয়া হয় এই বলে 'জামায়াত সমর্থিত মুক্তিযোদ্ধা সম্মেলন'। সেই সাথে সম্মেলনে আগত একজনের প্রতিবাদের কথাও ছাপা হয় এবং তাকে নাকি নাজেহাল করে সম্মেলন থেকে বের করে দেয়া হয়। অবশ্য সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানালো সে কোন প্রতিনিধি ছিল না। প্রতিনিধি সম্মেলনে প্রতিনিধি বা আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের বাইরে কারো উপস্থিত হবার কথা নয়। তাহলে ধরে নেয়া যায় ঐ ব্যক্তি পরিকল্পিতভাবে একটা গণ্ডগোল পাকানোর উদ্দেশ্য নিয়েই সেখানে গিয়ে থাকবে। ইত্তেফাকে এবং নিউজ টুডেতে এ সম্মেলন সম্পর্কে কোন খবরই দেখলাম না।

www.pathagar.com

১৩-০৭-২০০৮

আজ ইত্তেফাকে দেখলাম ঐ সম্মেলনে নাকি সাংবাদিক এবং মুক্তিযোদ্ধার সাথে খারাপ আচরণ করা হয়েছে তারই প্রতিবাদ ছাপা হয়েছে। যেটা নৈতিকভাবে অশোভনীয়। আগের দিন যে পত্রিকা ঐ সম্মেলনের ইতিবাচক সংবাদ হিসাবে একটি লাইনও ছাপাতে পারল না তারা উক্ত সমাবেশের কোন কাল্পনিক ঘটনার প্রতিবাদ ছাপে কোন যুক্তিতে? মানব জমিনে গতকালের পত্রিকায় একজন মুক্তিযোদ্ধার প্রতিবাদের কথা উল্লেখ করলেও কোন সাংবাদিকের উপস্থিত হবার কথা ছাপেনি। খোদ ইত্তেফাকেও এমন নিউজ ছাপা হয়নি। সিরডাপ মিলনায়তনে ভারতীয় সমর নায়ক মানেক শা স্মরণে মুক্তিযোদ্ধা সমন্বয় পরিষদের অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ নেতা (সংস্কারবাদী) জনাব আমীর হোসেন আমু। উক্ত জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা পরিষদ গঠন, তাদের সম্মেলন অনুষ্ঠান এবং তাতে কথিত সাংবাদিক ও মুক্তিযোদ্ধা নিগৃহীত হবার প্রতিবাদে দেয়া বক্তব্যে বিস্মিত হবার কোন কারণ নেই। তাদের পক্ষে বাংলাদেশের রাজনীতিতে জনগণের ইসলামী চেতনার বাস্তবতা যেমন মেনে নেয়া সম্ভব নয়, তেমনি ভারত তোষণ ছাড়া এবং ইসলামী আকিদা বিশ্বাসসহ কেউ মুক্তিযোদ্ধা হতে পারে বা থাকতে পারে এটা মেনে নেয়া তাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। আমার মনে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে থাকলো ঐতিহ্যবাহী জাতীয় দৈনিক ইত্তেফাকের পক্ষদুষ্ট ভূমিকাটাই।

১৩-০৭-২০০৮

আজ সকালে আমাদের জন্যে অনুমোদিত ঐ চারটি পত্রিকার কোন কোনটায় দেখলাম জরুরি অবস্থার মহা সুযোগে সদ্য গঠিত রাজনৈতিক দল পিডিপির নেতা ড. ফেরদৌস আহমদ কোরেশী খালেদা জিয়াসহ তার পুত্রদ্বয় তারেক রহমান ও আরাফাত রহমান কোকোকে উন্নত চিকিৎসার জন্যে বিদেশে পাঠানোর প্রস্তাব করেছেন। শুধু তারেক রহমান এবং আরাফাত রহমান কোকোর জন্যে এ সুপারিশ করায় অবশ্যই তাকে সাধুবাদ জানাতাম। কিন্তু তাদের সাথে তিনি খালেদা জিয়াকেও এই সুযোগে বিদেশে পাঠানোর প্রস্তাব করেছেন মূলত মাইনাস টু ফরমুলা বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই এতে কোন সন্দেহ সংশয়ের অবকাশই থাকতে পারে না। কারণ, ফাঁকা ফিল্ডে গোল দেয়ার জন্যেই তার রাজনীতিতে আবির্ভাব ঘটেছে এ রহস্য কারো অজানা নয়। তাছাড়া এমন প্রস্তাবটি কি তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানবিক অনুভূতি নিয়ে করেছেন না কোন মহল বিশেষের ইচ্ছায় দিয়েছেন এ নিয়েও প্রশ্নের অবকাশ আছে সচেতন রাজনৈতিক মহলে। কথায় বলে গরজ বড় বালাই।

ফাঁকা ফিল্ডে গোল করার নেশায় কাতর আরেকজন সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদ সাহেব বিএনপির সাথে সরকারের সংলাপের কঠোর সমালোচনা করে দেয়া বক্তব্যের খবরও দেখলাম ইত্তেফাকে এবং অন্য দুএকটি পত্রিকাতেও। এতেও বিস্ময়ের কোন কারণ দেখি না। ২৮ শে অক্টোবরের পৈশাচিক ঘটনার প্রেক্ষাপটে সংঘটিত ১/১১ কে যারা মহা সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করেছেন, আর যাই হোক তারা দেশ ও জাতির স্বার্থ বড় করে দেখে, গণতন্ত্রকে সমর্থন করে এমনটি ভাবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। এরশাদ একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে অস্ত্রের মুখে ক্ষমতাচ্যুত করেছিলেন। একটি নির্বাচিত পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিয়েছিলেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে দেশকে কোথায় নিয়েছিলেন, যার ফলশ্রুতিতে তার বিরুদ্ধে ৯০ এর গণঅভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছিল। এই ইতিহাস কি জাতি এত তাড়াতাড়ি ভুলে যেতে পারে? 'কথায় বলে মানিকে মানিক চেনে' গণতন্ত্র হত্যাকারী ব্যক্তি গণতন্ত্র হত্যার আয়োজনে সাড়া দেবে এটাই স্বাভাবিক তার কয়েক দিনের বক্তব্যে এমনটিই মনে হচ্ছে। ফাঁকা ফিল্ডে ক্ষমতা দখলের চিন্তায় যারা অস্থিরতায় ভুগছে, গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষীণতম সম্ভাবনা দেখা দিলেই তারা বেসামাল বক্তব্য দিচ্ছেন এটা বেশ লক্ষণীয়।

১৮ই মে রাতে আমাকে গ্রেফতার করা হয়, ১৯ শে মে সকালে সিএমএম আদালত হয়ে আমাকে নেয়া হয় কেন্দ্রীয় কারাগারে। গ্রেফতার হবার পূর্ব দিন পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের কাকরাইল শাখায়

www.pathagar.com

সপ্তাহে দুই দিন (শনিবার এবং মঙ্গলবার) ফিজিওথেরাপি চলছিল মেরুদণ্ডের ব্যথার জন্যে। গ্রেফতারের পর থেকে আজ অবধি ঐ চিকিৎসা আর চালু করা সম্ভব হয়নি। গ্রেফতারের পরের দিনই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আমার স্ত্রী এবং ছেলে এ সম্পর্কে জেল সুপারকে অবহিত করে। তিনি মেডিকেল রিপোর্ট চাইলে তারা দ্রুত সময়ের মধ্যে মেডিকেল ফাইল আমার কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে। আমি যথাযথ নিয়মে উক্ত ফাইল কারাগারে মেডিকেল বিভাগে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করি। কিন্তু কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে প্রতি সপ্তাহের সাক্ষাতের সময়ে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকি। ইতোমধ্যে আমার হাতের ব্যথাটা ভীষণ বেড়ে যায় এবং ডা. ইদ্রিস সাহেবকে কল করার জন্যে অনুরোধ জানাই। সেই সাথে ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থা করার জন্যেও অনুরোধ করতে থাকি। ইতোমধ্যে ডা. ইদ্রিস খালেদকে সাথে নিয়েই কেন্দ্রীয় কারাগারে আসলে, কারাগারস্থ হাসপাতালে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়। আলোচনা শেষে কিছু ওষুধ লিখে দিয়ে যায় এবং পরের দিন ইনজেকশন দেবার জন্যে আনার কথা বলে যায়। যথারীতি পরের দিন কি দুদিন পরে জেল সুপারের রুমেই আমার বাম হাতের কনুইতে ইনজেকশন দিয়ে যায়। আল্লাহর রহমতে হাতের ব্যথার উপশম হয়। কিন্তু কারাগারে থাকা অবস্থায় অর্থাৎ ১৯ থেকে ২৯ জুন পর্যন্ত ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। এরপর ২৯ জুনের বিকেলে পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হল। সেদিন থেকে ফিজিওথেরাপির কিভাবে ব্যবস্থা করা যায় এ নিয়ে আলাপ চলছিল। ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থা আছে ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগে সেখানে গিয়ে দিয়ে আসা হবে, না টেকনিশিয়ান আমার কেবিনে এসে দিয়ে যাবে এ নিয়ে কথাবার্তা শলাপরামর্শ চলতে থাকে।

১৪-০৭-২০০৮

আজ পিজির এ বিভাগের ইনচার্জ ড. মঈনুজ্জামান চৌধুরী সাহেব সকাল ১০টার দিকে দেখা করলেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মনে হল কেবিনেই থেরাপির ব্যবস্থা করা হবে। দেখা যাক কী হয়। উনি '৯৮ সালে উনার নিজস্ব চেম্বারে আমার ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থা করেছিলেন। কাজেই আমার সমস্যা তার বুঝতে খুব বেশি সময় লাগার কথা নয়। আশা করি তার আন্তরিকতাপূর্ণ সহানুভূতি পাওয়া যাবে।

এদিকে গতকাল ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক সাহেব সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আমার জামিনের আবেদন করেছেন বলে জানলাম। যার শুনানি আজ অথবা কাল হতে পারে। কোর্টের সিদ্ধান্ত কী হয় জানার অপেক্ষায় রইলাম। আমার এই লেখার ফাঁকেই একজন ফিজিওথেরাপিস্ট আসলেন এবং ক'টি ব্যায়াম দেখিয়ে দিলেন বা শিখিয়ে গেলেন। যার কিছু আমার আগের জানা কিছুটা নতুন। মেশিনসহ আগামীকাল আসার কথা বলে গেলেন।

৯-০৭-০৮ তারিখে বিশেষ আদালতে ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক সাহেব কয়েকটি বিশেষ যুক্তির ভিত্তিতে আমার জামিনের আবেদন করেন। আমাদের এ মামলায় বেগম খালেদা জিয়ার আইনজীবী আব্দুর রাজ্জাক খান সাহেব এটাকে অপছন্দ করছিলেন। তার যুক্তি ছিল দুদকের এই মামলার দুর্বলতাগুলো এখানে উপস্থাপন করলে সরকার পক্ষ সংশোধনের সুযোগ নিতে পারে। আমরা এ দুর্বলতাগুলো তুলে ধরে হাইকোর্টে কোয়াশমেন্ট করব। বেগম খালেদা জিয়া এটা শুনে আমাকে বললেন ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক সাহেবকে এটা উপস্থাপন না করতে। ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক আমাদের থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিচ্ছিলেন। আমি তাজুল ইসলামকে ডেকে এদের কথা জানালাম। তাজুলই দ্রুত আব্দুর রাজ্জাক সাহেবকে এটা জানালে তিনি বলে পাঠালেন এতে কোন অসুবিধা হবে না। বিএনপির এবং খালেদা জিয়ার আইনজীবী খোকন এবং আরও একজন আইনজীবী বললেন ব্যারিস্টার রাজ্জাক সাহেবের কৌশল ঠিকই আছে। এতে কোন অসুবিধা হবে না।

বিশেষ আদালতে জামিন না মঞ্জুর হল। বিশেষ আদালতের হাজত খানায় ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক সাহেবকে বিএনপি নেতৃবৃন্দের সিনিয়র আইনজীবী আব্দুর রাজ্জাক খান সাহেবের মতামতটা জানালাম।

www.pathagar.com

আঃ রাজ্জাক সাহেব বললেন উনি বুঝেননি। এ ব্যাপারে সিনিয়র আইনজীবী রফিকুল হক সাহেবের পরামর্শ নেয়া হয়েছে।

নিম্ন আদালতে জামিনের আবেদন নাকচ হবার পর হাইকোর্টে জামিন চাওয়া এবং পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এই কৌশল হিসেবেই এখানে এটা আনা হয়েছে। ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক সাহেব তার এই কৌশলের ভিত্তিতে আগামী ১৩ই জুলাই রোববারে হাইকোর্টে জামিনের আবেদন পেশ করবেন বলে শুনলাম। ১৩-০৭-০৮ এর দুপুর পর্যন্ত বেশ আগ্রহ নিয়ে হাইকোর্টের খবর জানার অপেক্ষায় ছিলাম। খালেদ এসে জানাল আবেদন করা হয়েছে এবং তা গৃহীত হয়েছে। আগামীকাল বা পরশু শুনানি হবে। তাই ১৪-০৭-০৮ এর সকাল থেকেই খালেদকে যোগাযোগ রাখতে বলে দিলাম। সে অবশ্য নিজ উদ্যোগেই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করে। দুপুরের খাবারের পর বিশ্রামের সময় খালেদ এসে খবর দিল শুনানি শুরু হয়েছে। দুপুর ২টায় শুনানি শুরু হবার পর ৪টা পর্যন্ত কোন খবর না পেয়ে একটু উদ্বেগ বাড়ছিল। খালেদ বলল সবাই বোধহয় ভেতরে আছে। কেউ ফোন ধরছে না। ৪:৩০ পর্যন্তও কোন খবর না পেয়ে ভাবছিলাম, নো নিউজ এর অর্থ কখনও ভাল খবর পাবার কখনও মন্দ খবরও হয়ে থাকে, এখানে কোনটা বুঝব। এটা ভাবতে ভাবতেই খালেদ এসে বলল ২ মাসের অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছে এবং স্থায়ী জামিন কেন দেয়া হবে না এই মর্মে সরকারও দুদককে কারণ দর্শাও নোটিশ দেয়া হয়েছে।

প্রকৃত অবস্থা জানার জন্যে খালেদ মিঠুকে সাথে নিয়ে হাইকোর্টে ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাকের চেম্বারে গেল। সেখানে সবাই ব্যস্ত এখন হাইকোর্টের জামিনের আদেশের সার্টিফায়েড কপি বের করা নিয়ে। কারণ ওটা নিয়ে ডিসি অথবা নিম্ন আদালতের পক্ষ থেকে কারাকর্তৃপক্ষের কাছে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পৌঁছালে মুক্তির ব্যবস্থা চূড়ান্ত হবে। গতকাল (১৪-০৭-০৮) রাত পর্যন্ত এটা বের করা সম্ভব হয়নি। আজ (১৫-০৭-০৮) দিনের প্রথমার্ধে ওটা পাওয়া যাবে বলে জানানো হল। আজ সকাল থেকে এ প্রক্রিয়ার অগ্রগতি জানার জন্যে উদগ্রীব ছিলাম। জোহরের নামাজ এবং দুপুরের খাবারের পূর্ব পর্যন্ত কোন খবর পাচ্ছিলাম না। এদিকে খবর আসছিল দুদক নাকি জামিন স্থগিতের জন্যে আপিল করবে আজ ২টার দিকে। এই খবরের সাথেই কোর্ট আদেশের সার্টিফায়েড কপি পেয়ে যাওয়ারও খবর পেলাম। খালেদ আমাকে জানাল ঐ রায়ের কপি নিয়ে কয়েকজন সিএমএম আদালতে যাচ্ছে আর ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক সাহেব কজনকে সাথে নিয়ে দুদকের আপিল আবেদনের মুকাবিলার জন্যে সেখানে উপস্থিত থাকবেন।

আপিল করা হচ্ছে জেনে একটু খারাপ লাগল। সাথে সাথে অজু করে আবার আল্লাহর দরবারে দোয়ার প্রস্তুতি নিলাম। এজন্যে ২+২= ৪ রাকাত নফল নামাজ পড়ে দোয়া করতেই মফিজ দরজা ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকেই জানাল আব্দুর রাজ্জাক সাহেব নাকি জানিয়েছেন সরকারের পক্ষে আর আপিলের কোন সুযোগ নেই। প্রকৃত ঘটনা যে কী তা এখনও আমার কাছে পরিষ্কার নয়। আমি নিজে আইনের ফাঁকফোঁকর খুব একটা বুঝি না। তবে ইতঃপূর্বে ২/১ বার কোর্টে দেখেছি হাইকোর্টের রায়ের সাথে সাথেই উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ আপিল করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে থাকে। দুদক বা সরকার পক্ষ গতকাল তাৎক্ষণিকভাবে এরূপ ইচ্ছা ব্যক্ত করে নাই। আপিলের সুযোগ না থাকার কারণ কি এটাই না অন্য কিছু জানার ঔৎসুক্য মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারতে থাকল। একটু আগে মফিজ জানিয়েছিল, সার্টিফায়েড কপিতে বিচারপতির স্বাক্ষর হবার পর এডভোকেট মসিহুল আলম নাকি বলেছে, ইনশাআল্লাহ আজকেই বের হওয়া যাবে। তবে অন্যরা নাকি বলছেন আজকে নাও হতে পারে। দেখা যাক কার অনুমান সঠিক হয়। আপিল করার খবর পেয়ে একটু হলেও থমকে গিয়েছিলাম। এবার আপিলের সুযোগ নেই শুনে একটু চাঙ্গা হলাম। আজ বিকেলের মধ্যে বের হওয়া লাগতে পারে এজন্যে কোন মানসিক প্রস্তুতি নেওয়ার প্রয়োজন মনে করছি না। তবে চূড়ান্ত খবর এলেই গোছানোর কাজে হাত দেওয়ার কথা ভেবে বিশ্রামে গেলাম।

www.pathagar.com

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অনুভূতি- ০১

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ঐতিহ্যবাহী পুরানো ঢাকার চকবাজার শাহী মসজিদের সন্নিকটে অবস্থিত। কেন্দ্রীয় কারাগারের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে ঢাকার ঐতিহ্যবাহী শাহী মসজিদটি অবস্থিত। কারাগারের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে আর একটি মসজিদের সুউচ্চ মিনার দৃশ্যমান। এটি উর্দু রোড মসজিদ নামেই পরিচিত। কারাগারের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে আরেকটি ঐতিহ্যবাহী মসজিদ অবস্থিত, যেটি মৌলবীবাজার জামে মসজিদ নামে পরিচিত। বাংলাদেশের তথা উপমহাদেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা মুফতী দ্বীন মুহাম্মাদ খান মরহুমের বাস ভবন এই মসজিদ সংলগ্ন। তিনি এ মসজিদে তাফসির করতেন, খতিবও ছিলেন। সম্ভবত মুতাওয়াল্লীও ছিলেন।

ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রথম এসেছিলাম তথাকথিত ১/১১ এর পর ২০০৮ সালের ১৮ মে। ৫৬ দিন পরে মুক্তি পেয়ে আবার নভেম্বর মাসে আসতে হয়েছিল ১০ দিনের জন্যে। এবারে ২৯ জুন ২০১০ এর বিকেলে ডিবি পুলিশ গ্রেফতার করে ডিবি অফিসে নিয়ে যায়। একরাত ও একদিনের প্রথমভাগে সেখানে অবস্থানের পর আদালতে হাজিরার পর ৩০ শে জুন বাদ মাগরিব আজ আবার আসতে হয়েছে এই কেন্দ্রীয় কারাগারে। সেই থেকে দেখতে দেখতে ৯ মাস কেটে গেল এই কারাগারে। এর মধ্য থেকে ২০ দিন রিমান্ডে ডিবি অফিসে কাটাতে হয়। বাদ বাকী পুরো সময়টা এভাবেই কাটছে ২৬ নং ভিআইপি সেলে। এখানে বারান্দা থেকেই তিনটি ঐতিহ্যবাহী মসজিদের মিনার চোখে পড়ে। ২৬ সেলের চত্বরে পায়চারী করার সময়ও মসজিদ তিনটির মিনার আমার হৃদয়ে এক অদ্ভুত উপলব্ধি জন্ম দেয়। বিশেষ করে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আযান তিন মসজিদ থেকে প্রায় কাছাকাছি সময়েই ধ্বনিত হয়। আযানের মুহূর্তের অনুভূতি প্রকাশ করার মত ভাষা আমার জানা নেই। ছোট বেলায় কবি কায়কোবাদের লেখা আযান কবিতা যদিও মুখস্থ নেই, কিন্তু কবি তার কবিতার মধ্যে হৃদয় নিংড়ানো যে আবেগ প্রকাশ করেছেন আমার হৃদয়কেও সেই আবেগ মাঝে মাঝে বেশ নাড়া দেয়। "কে ঐ শুনালো মোরে আযানের ধ্বনি" সত্যি মর্মে মর্মে স্পর্শ করে আমার অন্তরের অন্তঃস্থলকে। আমাদের গ্রামের বাড়িতেই গ্রামের মসজিদটি অবস্থিত। আর ঐ মসজিদ সংলগ্ন ঘরটিতেই (আমার আব্বার পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত) আমার জন্ম। সুতরাং শিশুকাল থেকেই মসজিদ এবং মসজিদের আযান ও জামায়াতে নামাজের সাথে আমার আত্মার সম্পর্ক গড়ে উঠে গভীর ও নিবিড়ভাবে।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে শুধু এই তিন মসজিদেরই নয়, আরো অনেক মসজিদের আযান কানে ভেসে আসে রাত্রির শেষ প্রহরে। বংশাল রোডে অবস্থিত আহলে হাদিসের কেন্দ্রীয় মসজিদে ফজরের আযান হয় সবার আগে। এরপর থেকে প্রায় ৩০/৪০ মিঃ পর্যন্ত কানে ভেসে আসে বিভিন্ন মসজিদের মিনার থেকে ফজরের আযানের সুমধুর আওয়াজ। কান পেতে গভীর মনোযোগ সহকারে শুধু আযানের আওয়াজ শুনতেই থাকি। বন্দীদশায় কোন একটি মসজিদে এমনকি নিকটতম মসজিদটিতেও আযানের ডাকে সাড়া দিয়ে নামাজের জামায়াতে শরীক হওয়ার কোন সুযোগ নেই এখানে।

২৬ নং ভিআইপি সেলে একজন সেবকের নাম সেলিম। ২৬ শে ফেব্রুয়ারী (আনুমানিক) দুপুরের দিকে শুনলাম ১৫ দিন আগে নাকি তার পিতা ইন্তেকাল করেছেন কিন্তু ১৫ দিন আগে তার কাছে খবরটি পৌঁছেনি। ছেলেটা ওয়ার্ডে গিয়ে খবর পেয়ে কান্নাকাটি করছে বলে খবর পেলাম। পরে তাকে ২৬ সেলের মেট এবং পাহারা ২৬ সেলে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করে। খবর পেয়ে আমিও তাদের ১১ নং রুমে গেলাম সান্ত্বনা দিতে। কিন্তু নিজেই আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়লাম।

আমার মনে পড়ে গেল আমার বড় মামার মৃত্যুর খবর আমি পেয়েছি ২/৩ দিন পরে। আব্বা আম্মার ইন্তেকালের পরে বড় মামাই ছিলেন আমার মুরুব্বী, বট বৃক্ষের ছায়াতুল্য। তিনি আমাকে বলে

www.pathagar.com

গিয়েছিলেন, তার জানাযাটি যেন আমিই পড়াই। মৃত্যুর বেশ আগ থেকেই আমি জেলে আছি, এটা জেনে ঠিক মৃত্যুর আগ মুহূর্তে তিনি বলে গেছেন, আমার মেঝ ছেলে মোমেন যেন অবশ্যই তার জানাযার ইমামতি করে। জেলের ভেতর থেকে এ খবর জানার কোন সুযোগ ছিল না। ফোনে সাঁথিয়া থেকে বাসায় খবর জানানোর সাথে সাথে আমার বুদ্ধিমতী স্ত্রী মেঝ ছেলে মোমেনকে সাথে নিয়ে সাঁথিয়ায় উপস্থিত হয়। মামার বিকল্প প্রত্যাশা অনুযায়ী আমার পরিবর্তে আমার মেঝ ছেলে মাওলানা নাজিবুর রহমান মোমেন (বারএট'ল) জানাযার ইমামতির দায়িত্ব পালন করে ঢাকায় ফিরে আসে। আমার সাথে পরিবারের সাক্ষাতের জন্যে সপ্তাহের নির্ধারিত দিনটিতে তারা সাক্ষাতে এসেই আমাকে এই খবরটি জানায়। আমার সেদিনের অনুভূতি আবার জেগে উঠে হৃদয়ের মাঝে সেলিমের পিতার মৃত্যুর খবর ১৫ দিন পর জানার কথা শুনে। আসলে জেলখানা একটি অন্ধকূপের মতই মনে হল আমার এই মুহূর্তে। প্রয়োজনে পরিবারকে যেমন কিছু জানানো যায় না, তেমনি পরিবারের কোন জরুরি খবর পাওয়ারও সুযোগ নেই যথাসময়ে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সংলগ্ন ঐতিহ্যবাহী তিনটি মসজিদের অবস্থান যেমন মনকে আবেগ আপ্লুত করে তেমনি আবার এই আবেগের আতিশয্য, হৃদয়কে বেশ ভারাক্রান্ত করে তোলে। দিনের প্রতি ওয়াক্তের নামাজের আযান শুনতেই মনটা ছুটে যায় ছোট বেলায় পড়া কবি কায়কোবাদের আযান কবিতার সৃষ্ট ভাবের জগতে। কবি বলেছেন-

"কে ঐ শুনাল মোরে আযানের ধ্বনি।
মর্মে মর্মে সেই সুর বাজিল কি সুমধুর
আকুল করিল প্রাণ নাচিল ধমনী।
আমিতো পাগল হয়ে সে মধুর টানে
কি যে এক আকর্ষণে, ছুটে যাই মুগ্ধমনে
মসজিদের পানে।"

কায়কোবাদের হৃদয় নিংড়ানো আবেগ উচ্ছ্বসিত এই আযান কবিতার অংশটুকু মনে যে ভাবের সৃষ্টি করে, তার সাথেই মনে পড়ে পল্লী কবি জসিমউদ্দিনের 'কবর' কবিতায় উল্লেখিত আযান সংক্রান্ত দুইটি পংক্তিও।

'মসজিদ হতে ভেসে আসে বড় সুকরুণ সুর
মোর জীবনের রোজ কিয়ামত ভাবিতেছি কতদূর?

আমার কারাবাস জীবনের প্রতি দিনই আযানের মুহূর্তগুলো একইভাবে যুগপৎভাবে আবেগ আপ্লুত করে, সেই সাথে করে ভারাক্রান্তও।

১৯৫৪ সন থেকে প্রতিবছর আল কোরআনের মাস পবিত্র রমজানে মাসব্যাপী যেমন রোজা পালন করে আসছি, তেমনি নিয়মিত মসজিদে মাসব্যাপী তারাবির নামাজ আদায় করে আসছি জামায়াতের সাথে। আমার বড় চাচাজান মরহুম মৌলভী ফয়জুল হক খান এলাকার একজন সম্মানিত ব্যক্তি এবং আলেমে দ্বীন হিসাবে ছিলেন সুপরিচিত। তিনি প্রথম জীবনে আমাদের দাদার উত্তরসূরী হিসেবে 'সলঙ্গী' ও 'মনমথপুর' নামক দুই গ্রামের মধ্যবর্তী স্থানের একটি ঈদগাহে ইমামতি করতেন। পরবর্তী সময়ে তিনি সাঁথিয়া থানার দক্ষিণাঞ্চলে হুইখালী মামপুর ও কল্যাণ গ্রামের লোকজনের অনুরোধে হুইখালী গ্রামে অবস্থিত ঈদগাহের ইমামতি গ্রহণ করেন। আর আমাদের নিজেদের ঐ ঈদগাহের ইমামতির দায়িত্ব অর্পণ করেন আমাদের বংশের আর একজন দ্বীনদার ও সম্মানিত ব্যক্তি ডা. রাফাতুল্লাহ খান সাহেবের উপর। প্রতি রমজান মাসের শেষের দিকে আমাদের পারিবারিক এবং গ্রামের মসজিদে ডা. রাফাতুল্লাহ মরহুম ইতেকাফ করতেন। তার সাথে দুই গ্রামের আরো কয়েকজন দ্বীনদার ব্যক্তিও ইতেকাফে বসতেন। আমাদের পরিবারের শরীকগণ মিলেমিশে ভাগাভাগি করে তাদের মেহমানদারীসহ সকল খেদমত আঞ্জাম দিতেন। শিশু কিশোর অবস্থায় এগুলো দেখে অভ্যস্থই শুধু হইনি, এর একটা নৈতিক ও আত্মিক প্রভাবও

www.pathagar.com

পড়ে আমার মনের উপরে। বড় চাচা রমজানের শেষে ঈদের জামায়াতের ইমামতির উদ্দেশ্যে হুইখালী যেতেন। তিনি শুধু ঈদের জামায়াতের ইমামতির জন্যে নয় বরং হুইখালীর ঐতিহ্যবাহী মীর বাড়ির মসজিদে এতেকাফ করতেন। আমি যখন আলিম ক্লাসের ছাত্র তখন থেকে বড়চাচাজানের নির্দেশে এবং আব্বা আম্মার সম্মতিতে আমিও রমজানের শেষের দিকে চাচাজানের সাথে হুইখালীর ঐ মসজিদে ইতেকাফে শরীক হতাম এবং ঈদের নামাজও ঐখানেই আদায় করতাম।

প্রথমে আব্বা আম্মার একমাত্র ছেলে হওয়ার কারণে বাড়ীর বাইরে ঈদ করার ইচ্ছা আমার হত না। একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বংশের মুরুব্বী বড় চাচার নির্দেশ পালনের জন্যেই যাই। এখানে উল্লেখ করা যায় আমাদের সাঁথিয়া থানার মধ্যে কটি গ্রামে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকের বসবাস ছিল তুলনামূলকভাবে একটু বেশি। ঐ ঈদের মাঠে প্রথম নামাজ আদায়ের পর বড় চাচা নির্দেশ করলেন কিছু বক্তৃতা রাখার জন্য। আমি প্রচলিত ওয়াজের মত ওয়াজ করা পছন্দ করতাম না। আধুনিক যুগে সেমিনার সিম্পোজিয়ামে বা সুধী সমাবেশে যে ধরনের বক্তব্য হয়ে থাকে আমি কতকটা ঐ প্যাটার্ণে বক্তব্য রেখে অভ্যস্থ ছিলাম। মাদ্রাসার বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে আমি এভাবেই বলতাম। আর এটাই ছিল আমার নিজস্ব রুচির সাথে সংগতিপূর্ণ। মুরুব্বীর আদেশ শিরোধার্য, তাই প্রস্তুতি ছাড়াই মিনিট দশেক কথা বললাম। মাঠে বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষিত লোক ছিলেন যারা ছুটিতে ঈদ করতে বাড়ী এসেছেন। তারা আমার বয়স অনুপাতে বক্তব্যকে খুবই পছন্দ করে, আমার অসাক্ষাতে চাচাজানের কাছে তাদের মন্তব্য জানায়। এসব কথা সরাসরি আমার কানে আসেনি। তবে আমার সমবয়সী বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তিরা আমাকে বেশ উৎসাহ যোগায় তাদের প্রশংসাসূচক মন্তব্যের মাধ্যমে। আমি অবশ্য তাদের কথা তেমন আমলে নেই নি। কারণ একেতো পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়া বক্তব্য প্রদান করায় বক্তব্য খুব একটা ভাল হবার তো কথা নয়। তাছাড়া বড় চাচার সামনে কথা বলার মত সাহস আমাদের পরিবারের কারো ছিল না। বড় চাচা পেশায় শিক্ষক ছিলেন। তার ছাত্ররা তার সামনে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে, জানা জিনিস ভুলে যেত। এমন ভয় তার সম্পর্কে আমার মনেও ছিল। তবে তিনি আমাকে আমাদের বংশের সকল চাচাতো ভাইদের মধ্যে আমাকেই সর্বাধিক স্নেহ করতেন, সেই ভরসায় ভয়টা ঐদিন তেমন কোন কাজ করেনি। চাচাজান বাড়িতে ফিরে এসে আমার বক্তব্য সবার পছন্দ হবার কথা প্রকাশ করায় আমাদের বংশের সবাই খুশী হন। বিশেষ করে আমার আব্বা আম্মা খুবই খুশী হন এবং আমার ব্যবহারে আশাবাদী হয়ে উঠতেন। আব্বা প্রায় আত্মীয় স্বজনদের ও বিশ্বস্ত লোকদেরকে বলতেন, আমি মাঝে মাঝে আমার ছেলের ব্যাপারে যে সব স্বপ্ন দেখি তাতে মনে হয় আল্লাহ তাকে বড় কিছু একটা হওয়ার তৌফিক দেবেন।

আব্বা তার স্বপ্নের বিস্তারিত কাউকে বলেন নি। শুধু আগাম ইংগিত দিয়ে মানুষের কাছে দোয়া চাইতেন "আমি স্বপ্নে আমার ছেলের ব্যাপারে যে ইশারা ইংগিত পাচ্ছি, সবাই দোয়া করবেন যেন আল্লাহ তাকে সেই রকম একজন হবার তৌফিক দেন।" আমার মূল বক্তব্য ছিল, জীবনের কিশোর কাল থেকে রমজান মাসটা কিভাবে কাটিয়ে এসেছি। জেলে এসে তার ব্যত্যয় ঘটায় মনের আবেগ অনুভূতির অবস্থাটা কেমন তা তুলে ধরা। ছাত্র জীবন শেষে সংসার জীবনে এবং বাস্তব জীবনে এসেও রমজান মাসকে কোরআন নাজিলের মাস হিসাবে একইভাবে উদযাপনের চেষ্টা করে এসেছি। বিশেষ করে তারাবিহ এবং এতেকাফকে আমি সাধ্যমত গুরুত্ব দেবার চেষ্টা করেছি। আমার পরিষ্কার মনে আছে কখনও আগামসিহ লেন থেকে কখনও আগা সাদেক রোড থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী হল ফজলুল হক মুসলিম হল মসজিদে যেতাম তারাবিহ আদায় করতে। কারণ তখন ঐ মসজিদের ইমাম সাবেক একজন ভাল হাফেজ, একজন আলেমে দ্বীন এবং শিক্ষিত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার তেলাওয়াতও ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ, সাবলীল এবং হৃদয়গ্রাহী। তিনি যেহেতু অর্থ বুঝে তেলাওয়াত করতেন, তারাবিহতে একটু বেশি সময় নিতেন, তারপরও খুব মজা পেতাম বলেই ওখানে ছুটে যেতাম মনের আবেগ নিয়ে তারাবিহ আদায় করতে। তার জুমআর খুৎবাহ হতো শিক্ষণীয় এবং আকর্ষণীয়।

www.pathagar.com

বাস্তব জীবনে আমার এইভাবে রমজানের মাসকে আল কুরআনের মাস হিসেবে পালনের ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়েনি বরং দ্বীনের এবং কোরআনের বুঝ বৃদ্ধির সাথে সাথে রমজানের যথাযথ মর্যাদাসহ উদযাপনের অভ্যাস আরো বৃদ্ধি পেয়েছে আল্লাহর বিশেষ রহম ও করমে। ১৯৮০ সন থেকে মাহে রমজানের শেষ ১০ দিন বা ৯দিন ইতেকাফের কর্মসূচি এবারের গ্রেফতারের আগ পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ কোন বছর বাদ যায়নি। অবশ্য সরকারী দায়িত্বে থাকাকালে কোন কোন বছর ১০ দিনের স্থলে ৫ দিনে কমিয়ে এনেছি। কিন্তু ইতেকাফ বাদ দেইনি। এবারের কারাগারে রোজা পালনের অনুভূতি ছিল তাই সবচেয়ে বেশি বেদনাদায়ক।

১৯ শে রমজান পর্যন্ত বড় বড় ইফতার মাহফিলে যোগদানের স্মৃতি মনকে বেশ পীড়া দিত। একাকী লক আপের সেহরী গ্রহণ ছিল সবচেয়ে পীড়াদায়ক। কারাপ্রাচীরের বাইরে তিন দিকের তিনটি ঐতিহ্যবাহী বড় মসজিদের জমজমাট তারাবিহর জামায়াতের আয়োজন আমরা হৃদয়ের গভীরে উপলব্ধি করছি। কিন্তু তাদের সাথে শরীক হবার কোন সুযোগ না থাকায় হৃদয়বিদারক ব্যথা বেদনা ব্যক্ত করার কোন ভাষাই আমার জানা নেই। আল্লাহর দরবারে হাত উঠালেই বলতাম, রমজান মাস ব্যাপী কারাবাস আল্লাহ তুমি ইতেকাফ হিসাবেই কবুল কর।

১৯৮০ থেকে ৮৫ পর্যন্ত ৫ বছর আজিমপুর ছাপড়া মসজিদে ইতেকাফ করেছি। তারাবিহও ঐ মসজিদেই আদায় করেছি। ১৯৮৫ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেট সংলগ্ন চাঁন মসজিদে তারাবিহ এবং এতেকাফ করেছি। চাঁন মসজিদের খতিব জনাব হযরত মাওলানা আব্দুল হালিম একজন ভাল হাফেজে কোরআনও বটে। আমি মিন্টু রোডের (মন্ত্রী পাড়ার) সরকারী বাসভবন থেকে সপরিবারে তারাবিহ আদায় করতাম ঐ চান মসজিদে গিয়ে এবং এতেকাফও করেছি ঐ মসজিদেই। এবারের রমজান মাস কেটে গেল কারাগারে। তার ৩/৪ দিন গেল রিমান্ডের দুঃসহ এক প্রতিকূল পরিবেশে।

আমি নিজেকে একদিক দিয়ে খুবই ভাগ্যবান মনে করি। ১৯৫৪ সাল থেকে নিয়মিত পূর্ণ মাস রোজা পালনে আজ পর্যন্ত একটি রোজাও কাজা করার মত কোন রোগ ব্যাধি আমাকে স্পর্শ করেনি। রিমান্ডে থাকা অবস্থায় ব্লাড সুগার অস্বাভাবিকভাবে কমে আসছিল। রিমান্ডে যাওয়ার আগে (রমজানে) পিঠের ডান পাশে হারপিচ নামক কি একটা যন্ত্রণাদায়ক রোগ দেখা দেয় যার উৎস আগের রিমান্ডে ১২ দিন অস্বাস্থ্যকর কম্বলের বিছানা ব্যবহারের ফলশ্রুতি। কারাগারের সঙ্গীদের কেউ কেউ রোজা না রাখার পরামর্শ বা উপদেশ দিয়েছেন। ডিবি অফিসে রোজা অবস্থায় রিমান্ড চলাকালে বাসায় সুগার ফল করার খবর পৌঁছায়। ফলে বাসা থেকে আমার স্ত্রী এবং বড় মেয়ে খবর পাঠায় রোজা না রাখার জন্যে। তারা এর পরিবর্তে ফিদিয়া আদায় করার ব্যবস্থা করবে বলে জানায়। আমি আল্লাহর দরবারে প্রাণ উজাড় করে দোয়া করি যেন রোজা রাখার বরকত থেকে আমাকে বঞ্চিত হতে না হয়। আল্লাহর মেহেরবাণীতে কোন দুর্ঘটনা ছাড়াই রমজান মাসটি কেটে গেল। ঈদ করতে হল ২৬ সেলের বারান্দায় ১৫/১৬ জনের একটি ছোট্ট জামায়াত নিয়ে। এ ঈদ ছিল শুধু মাসব্যাপী রোজা পালনের আল্লাহর নির্দেশ পালনে সক্ষম হবার শুকরিয়া স্বরূপ। তাছাড়া ঈদের দিনের স্বাভাবিক সকল আনন্দ উৎসব ছিল আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। পরিবারের সদস্যদের সেদিনের অনুভূতি কেমন ছিল তা আলেমুল গায়েব আল্লাহই ভাল জানেন। তবে আমি আমার হৃদয়ের গভীরে যে আবেগ অনুভূতি উপলব্ধি করছি, তাদের হৃদয়ের গভীরের ব্যথা বেদনা এর চেয়ে কম নয়, বরং বেশি হবারই কথা। তারা ঈদের জামায়াত শেষে কালবিলম্ব না করেই চলে আসে কেন্দ্রীয় কারাগারের গেটে। সেদিনের সেই মুহূর্তের অনুভূতি কেমন ছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা কোন দিনই সম্ভব হবে না।

প্রতীক্ষার বিড়ম্বনা

www.pathagar.com

কারাগারে হাজতিদের জন্যে সপ্তাহে একদিন ৩০ মিনিটের জন্যে সাক্ষাতের একটা ব্যবস্থা আছে। ইতঃপূর্বে ১/১১ এর জরুরি সরকারের আমলে ১ম বার ৫৬ দিন এবং ২য় বার ১০ দিনের জন্যে কেন্দ্রীয় কারাগারে আসতে হয়েছিল। তখন এই নিয়মেই পরিবারের লোকেরা সাক্ষাৎ করেছেন। বিচারাধীন মামলায় আইনজীবীদের সাথে সাক্ষাৎ এবং শলা পরামর্শেরও সুযোগ আছে জেল কোডে। আইনজীবীদের সাথে সাক্ষাতের কারণে পরিবারের সদস্যদের জন্যে নির্দিষ্ট সাক্ষাৎ বন্ধ করার কথা কারাগারের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তির মুখেই শুনি নাই। এবারেও প্রথম দিকে আইনজীবীগণ আমার এবং আমাদের সাথী সঙ্গীদের সাথে বেশ কয়েকবার দেখা করেছেন, তাতে পারিবারিক সাক্ষাতের কোন প্রসঙ্গ কোন দিনই উঠানো হয়নি। কিন্তু এবারের চিত্রটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আইনজীবীদের সাথে আমি সাক্ষাতের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাদেরকে পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে খবর পাঠিয়েও তাদের সাক্ষাতের সুযোগ পাচ্ছি না। এ জন্যে সুবেদারের মাধ্যমে জেলার অথবা জেল সুপারের সাথে আলাপের ইচ্ছা প্রকাশ করি। আলাপের সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম মনে হওয়ায় সুবেদারকেই বলে ফেললাম, আমার আইনজীবীদের সাক্ষাতের নাকি অনুমতি দেয়া হচ্ছে না। যদি তাই হয় তাহলে মামলা চলবে কিভাবে? ১৭ই মার্চ রোজ বৃহস্পতিবার আমার সাপ্তাহিক সাক্ষাতের নির্দিষ্ট দিন। সাধারণত ১১টা থেকে ১২টার মধ্যেই এ পর্যন্ত সাক্ষাৎ হয়ে আসছে। আমি যথারীতি ১১টা থেকে তৈরি হয়ে বসে আছি সাক্ষাতের স্লিপ পাওয়ার আশায়। কিন্তু না কোন খবরই আসছে না। ১২-৩০ টায় আমাদের ২৬ সেলের পাহারা এবং সেবক বিপ্লবকে জেল গেটে পাঠালাম এতক্ষণে না আসার কারণ জানার জন্যে। বিপ্লব জেল গেটের সার্জেন্টের সাথে আলাপ করে এসে জানাল, আজ তারা আসবে না বলে ফোনে জানিয়েছে। না আসার কারণ সাক্ষাতে বলবে। তাদের কথায় মনে হল আজ বৃহস্পতিবারে না আসলেও আগামীকাল শুক্রবারে হয়ত আসবে। আমি তাই শুক্রবারেও ১১টা থেকে প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষায় থাকলাম। কিন্তু জুমআর সময় পার হয়ে গেল, কোন খবর পেলাম না। ছবরের চূড়ান্ত মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই জেলে এসেছি। তারপরও নির্ধারিত দিনে সাক্ষাৎ না হওয়া, পরের দিনেও না আসার কারণ বুঝে না আসায় মনের পেরেশানী নিয়ন্ত্রণ করা কোন মতেই সম্ভব হচ্ছিল না। জেল জীবনের এই দুটো দিন ও রাত কাটে সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তায়।

শনিবার সকালে ক'জন কারা রক্ষী না সিআইডির লোক এসে আমাকে বলে গেল আজ নাকি আইনজীবীগণ আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসবেন। আমি যেন ১১টার দিকে তৈরি থাকি। নির্দিষ্ট সময়েই আইনজীবীদের সাথে সাক্ষাতের জন্যে আমাকে জেল গেটে নেয়ার জন্যে লোক আসল। আমি পূর্ব থেকেই তৈরি ছিলাম। তাদের সাথে আলাপের মাধ্যমেই জানতে পারলাম এক সপ্তাহে দুবার সাক্ষাৎ নাকি হতে পারে না। এই জন্যে বৃহস্পতিবারে পরিবারের সদস্যদের সাক্ষাৎ বন্ধ রেখে শনিবারে ওনাদের সাক্ষাৎ অনুমোদন করা হয়েছে। আমার পরিবারের সদস্যরা নাকি সোমবারে আসবে। বিষয়টি আমার কাছে মোটেই বোধগম্য হয়নি। কারণ পরিবারের সদস্যদের সাক্ষাৎ আর আইনজীবীদের সাক্ষাৎ তো কোন মতেই এক হতে পারে না। অতীতে কোন দিন এ প্রশ্ন উঠেনি, এবারে এ প্রশ্ন উঠছে কেন? যাহোক আইনজীবীদের সাথেও পরিবারের সদস্যদের মতই ৩০ মি. সাক্ষাৎ শেষ করে চলে এলাম আমার যাওয়ার জায়গায় ২৬ সেলে।

এরপর থেকে সোমবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত দীর্ঘ প্রতীক্ষার পালা। সপ্তাহের যেদিনটি সাক্ষাতের জন্যে নির্দিষ্ট, ঐদিন পর্যন্ত এক সপ্তাহ সময়কাল যেন এক বছরের চেয়েও দীর্ঘ মনে হয়। আমার সাক্ষাতের ৩০ মি. সময়টা মনে হয় যেন কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। সাপ্তাহিক সাক্ষাতের দিন যেহেতু একটু উলট পালট হয়ে গেল, তাই আমার ছেলে নাজিব মোমেনকে বললাম, পরবর্তী সাক্ষাতের ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে আলাপ করে যাবে যাতে কোন সমস্যা না হয়। আমাদের সাক্ষাতের সময় শেষে বিদায়ের মুহূর্তে আমার ছেলে নাজিব মোমেন জেলার সাহেবের সাথে সাক্ষাতের কথা বললে, তাকে বসতে বলা

www.pathagar.com

হল। বলা হল, জেলার সাহেব একটা মিটিংয়ে আছেন। মিটিং শেষ হলেই কথা বলবেন। আমাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থাপনার যারা দায়িত্ব পালন করেন, তারা আমাকে অনুরোধ করে বললেন, "স্যার আপনি চলে যান, উনারা বসে একটু অপেক্ষা করুন, জেলার সাহেব মিটিং শেষ হলেই কথা বলবেন।" আমি সরল বিশ্বাসে ফিরে এলাম এ ধারণা নিয়ে, যে আইনজীবীদের জন্যে এবার কিছুটা ব্যতিক্রম হলেও সামনের জন্যে আগের সিডিউলই ঠিক থাকবে। আইনজীবীদের কারণে তো একটা সাপ্তাহিক সাক্ষাৎ আমার বাতিল হয়েই গেল। সামনে তাদের আসার কেন ব্যত্যয় ঘটবে?

আমি বৃহস্পতিবারে সাক্ষাতের অপেক্ষায় আবারও বেলা ১১টা থেকে তৈরি হয়ে বসে আছি। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে গেল কোন খবর নেই। একটু পরে জোহরের নামাজের পরপরই জেল গেট থেকে কিছু জিনিসপত্রসহ একজন লোক আসল। এতে বুঝলাম, তারা সাক্ষাতের জন্যে এসেছিল, তাদের ফিরিয়ে দিয়ে মালামাল আমার রুমে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার যেহেতু সাক্ষাৎ হল না তখন ধরে নিয়েছিলাম গত সপ্তাহে যেহেতু সোমবারে সাক্ষাৎ হয়েছে, এবারের সাক্ষাৎ সোমবারেই হবে। আমি সেভাবেই প্রস্তুতি নিয়ে বসে আছি। ইতোমধ্যে মাওলানা সাঈদী সাহেবের সাক্ষাতের স্লিপ আসল। উনার সাথে গেল বিপ্লব। মাওলানার ছেলেদের কাছ থেকে মাওলানা জিজ্ঞেস করে জেনেছেন আমার পরিবারের সাক্ষাৎপ্রার্থীদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। তবে তাদের সাথে আনা মালামাল ফলমূল রুমে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। তাদেরকে জেলকর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, আইনজীবীদের সাক্ষাতের কারণে গত দুই সপ্তাহের বৃহস্পতিবারের সাক্ষাৎ না হলেও এখন থেকে আবার প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবারেই সাক্ষাৎ হবে।

নয় মাসের জেল জীবনে বেশ কয়েকবার অসুস্থ হয়েছি। ইতোমধ্যে আমার একমাত্র মুরুব্বী বড় মামার ইন্তেকালে মানসিকভাবে বড় রকমের আঘাত পেয়েছি। কিন্তু পরিবারের সদস্যদের সাক্ষাতের জন্যে এসে দুই বৃহস্পতিবারে ও এক সোমবারে ফিরে যাওয়ার ঘটনায় মনের উপর চাপ পড়েছে অনেক বেশি। আমার তিন ছেলে ও এক মেয়ে দেশের বাইরে আছে, কারাগারে আসার আগে প্রায়ই তাদের সাথে কথা হত, অন লাইনে দেখাও হত। এখন শুধু সপ্তাহের একটি দিনের সাক্ষাতের সময় তাদের খবর পেয়ে থাকি। দুই সপ্তাহ সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকাটা আমার জন্যে ছিল দুঃসহ। প্রতিদিনের ন্যায় ফজরের নামাজের পর এক থেকে দেড় ঘণ্টা ঘুমানোটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। সেইভাবে ২৭ শে মার্চের সকালে ঘুমিয়ে আছি। এমন সময় আমাদের অন্যতম সেবক লেবু মোল্লা আমাকে ডেকে বললো, স্যার, আপনার তো আজ কোর্ট আছে। তাড়াতাড়ি উঠুন এবং প্রস্তুত হয়ে নিন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোর্ট আছে এ খবর কখন পেয়েছ? সে বলল, গতকাল বিকেলে তার কাছে নাকি স্লিপ দিয়ে গেছে। কিন্তু সে ভেবেছে আমি হয়ত জানি, তাই সাথে সাথে আমাকে জানায়নি। আগের দিন বিকেলে ২৬ সেলের চত্বরে হেঁটেছি। তারপর বিকেলে বারান্দায় এসে সবার সাথে এক সাথে চা নাস্তা করেছি। বিকেলে কোর্ট সংক্রান্ত কোন ম্যাসেজ দিলেতো সরাসরি আমাকেই দিতে পারতো। অথবা ২৬ সেলের কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাছেও দিতে পারতো। লেবুমোল্লা ২৬ সেলের একজন সেবক হলেও সে বিকেলে ৫-০০ টার দিকে লক আপের আগেই, তার ওয়ার্ডে চলে যায়। সাধারণত সে বিকেলে ওয়ার্ডে লক আপে যাওয়ার আগে বলে যায় সালাম দিয়ে যায়। গতকাল কেন সে স্লিপটার কথা না বলেই তার ওয়ার্ডে চলে যায় এটা বুঝে আসল না।

যাহোক এটা জেনেই আমি প্রস্তুতি নেয়ার আগে মুহতারাম মাওলানা সাঈদী সাহেবকে জানালাম। উনি তখন প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন বাইরে মেডিকেলে যাওয়ার জন্যে। এর আগে রেডিওতে খবর এসেছিল, আমাকে নাকি রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যে ট্রাইব্যুনালের কাছে তদন্তকারী কর্মকর্তার পক্ষ থেকে আবেদন করা হয়েছে। ২৭ শে মার্চে সেই আবেদনের উপর শুনানির জন্যে নাকি আমাকে কোর্টে হাজিরার ব্যবস্থা করতে জেল কর্তৃপক্ষকে ২৬ মার্চ বিকেলেই জানানো হয়েছে। রিমান্ড মঞ্জুর হলে জেলে ফেরত

www.pathagar.com

পাঠিয়ে পরেও রিমান্ডে নিতে পারে। আবার কোর্ট থেকেও তাদের নির্ধারিত স্থানে রিমান্ডের জন্যে নিয়ে যেতে পারে। এ ব্যাপারে আমাদের কারাগারের সাথীদের মধ্যে এডভোকেট আব্দুস সালাম পিন্টু সাহেব বেশি অভিজ্ঞ, তাই এব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, অন্যত্র জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে কোর্ট থেকেই নিয়ে যেতে পারে প্রস্তুতিটা সেভাবেই নিয়ে যাব কিনা। তিনি বললেন, ওখান থেকেও নিয়ে যেতে পারে। তবে আমার মনে হয় আগে জেলে ফেরত পাঠিয়ে পরে নেবে। ইতোমধ্যেই মাওলানা সাঈদী সাহেবের বাইরের মেডিকেলে রওয়ানার সময় হয়ে যাওয়ায় তাকে বিদায় দিলাম। এবং আমি তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। বিপ্লবকে বলে প্রয়োজনীয় কাপড় চোপড় এবং ওষুধাদিসহ ব্যাগটা সাজিয়ে কাপড় পরে আমি প্রস্তুতি পর্ব সেরে বারন্দায় সোফায় বসে সাথীদের সাথে আলাপ করছিলাম। সাধারণত কোর্ট ৯টা থেকে ৯:৩০ টার মধ্যে নিয়ে যায়। দেখতে দেখতে বেলা ১০টা ১০:৩০ টা পার হয়ে গেল। কোর্টে নেয়ার জন্যে যাদের আসার কথা ছিল তাদের কোন আভাস না পাওয়ায় অনেকেই বলাবলি শুরু করলো, মনে হয় আজ কোর্টে নাও নিতে পারে। ইতোমধ্যেই মুহতারাম মাওলানা সাঈদী সাহেবকে বাইরের মেডিকেলে যাবার জন্যে গেট পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে ফিরে এসে একজন সেবক বলল, স্যার আপনাকে আজকে কোর্টে নেবে না। একথা তাকে এক ডেপুটি জেলার জানিয়েছে। সে এও বলল, যারা কোর্টে যাওয়ার জন্যে এসেছিল তারা ফিরে গেছে। এটা নতুন নয়, এখানে এরূপ ঘটনা মাঝে মধ্যেই হয়ে থাকে। পরে রেডিও টুডের খবরে জানা গেল আগামী ৫ই এপ্রিল শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। এর আগে উল্লেখ করেছি গত বৃহস্পতিবারে সপ্তাহের নির্ধারিত সাক্ষাৎটি হতে পারেনি। আশা করেছিলাম সোমবার সাক্ষাৎ হবে। ছেলের কাছ থেকে হয়ত এ ব্যাপারে আমাদের আইনজীবীদের মতামত ও প্রস্তুতির কথা জানা যাবে। আমি বেলা ১১টা থেকেই সাক্ষাতের স্লিপ হাতে পাওয়ার আশায় বারান্দায় বসে প্রতীক্ষা করছি। ইতোমধ্যে সাঈদী সাহেবের সাক্ষাতের স্লিপ আসল। ভাবলাম হয়ত একটু পরেই আমারও সাক্ষাতের স্লিপ আসবে। কিন্তু না কোন লক্ষণই দেখা গেল না। ইতোমধ্যে বিপ্লব মাওলানাকে গেটে রেখে উনার মাল নিয়ে এসে জানাল, আমার সাক্ষাতের জন্যে পরিবারের সদস্যরা এসেছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাদেরকে আগামী বৃহস্পতিবারে আসতে বলে দিয়েছে। তাদের সাথে আনা মাল রুমে এসে যাবে। একরাশ হতাশা নিয়ে বিষণ্ন মনে আমি জোহরের নামাজের প্রস্তুতি নিয়ে জামায়াতে শরীক হলাম। আমি আগেও উল্লেখ করেছি, উ"চ শিক্ষার খাতিরে বর্তমানে আমার তিন ছেলে ছোট মেয়ে (জামাইয়ের সাথে) দেশের বাইরে থাকে। বাসায় ওরাই বেশি ফোন করে খোঁজখবর নেয়। অনলাইনে মাঝে মধ্যে দেখা সাক্ষাৎও হত। ৯ মাস যাবত আমি কারান্তরালে বন্দী জীবন যাপন করছি। এই সময়ের সপ্তাহের একটি দিন ৩০ মি. পরিবারের সাথে সাক্ষাতের মুহূর্তটি খুবই দুর্লভ এবং মূল্যবান মুহূর্ত। এই ৩০ মিনিটের সাক্ষাতের জন্যে ৭ দিনের প্রতীক্ষার সময়টা যেন বছরের চেয়েও বেশি মনে হয়। গত বৃহস্পতিবারে প্রতীক্ষায় থেকে হতাশ হতে হয়েছে। আজ সোমবারেও তাই হল, এটা এক ধরনের মানসিক নির্যাতনের পর্যায়ে পরে কিনা আলেমুল গায়েব আল্লাহ সুবহানাহুতায়ালা ভাল জানেন।

যাহোক পরবর্তী বৃহস্পতিবারে অবশেষে সাক্ষাৎ হল। তাও বেশ বিলম্বে। এবারে আমি আগে থেকে প্রস্তুতি নেইনি, কারণ যদি আগের মতই কিছু ঘটে। তবে স্লিপ আসার সাথে সাথেই প্রস্তুতি নিয়ে রওয়ানা করলাম ২৬ সেল থেকে বেলা ১২-১৫ টায়। গেটে গিয়ে শুনলাম তারা ১০টায় এসে গেটে অপেক্ষা করছে। এবছর আমার ভাগ্নী মনোয়ারা ও তার ছেলে জুবায়ের আসায় একটু ভাল লাগল, সেই সাথে একটু আবেগের পরিবেশ সৃষ্টি হল। আমার পরিবারের সদস্যগণ গেটে ১০টায় আসা সত্ত্বেও আমাকে কেন ১২-১০ মিনিটে স্লিপ পাঠানো হল তার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণই খুঁজে পেলাম না।

আমি রুম থেকে রওয়ানা দিলাম ১২-১৫ মিনিটে। কিছু দিন থেকে আমার পায়ের ব্যথাটা বেড়েছে। অবশ্য এ ব্যথা নতুন নয়, অনেক পুরাতন। মাঝে মধ্যে সহনীয় পর্যায়ে থাকে আবার কখনও অসহনীয় পর্যায়ে চলে যায়। কদিন এই অসহনীয় ব্যথার সাথে পরিবারের নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ ব্যাহত হওয়ায়

www.pathagar.com

মনের ব্যথাও যুক্ত হয়। আমি আমাদের সেবক বিপ্লবের কাঁধে ভর করে ২৬ সেল থেকে জেল গেটে পৌঁছতে স্বাভাবিক সময়ের একটু বেশি সময় লেগে যায়। সুতরাং আমার পরিবারের সদস্যদের গেটের বাইরে যেমন প্রায় দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় তেমনি ভিতরে এসেও বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছে। আমি ১২-১৫ তে রওয়ানা করে ১২-২০ এর দিকে গেটে পৌঁছেছি। পৌণে একটা বাজার আগেই একজন কর্মকর্তা সময় শেষ ঘোষণা করে কথা শেষ করতে বললেন। আমি তাকে বললাম এখনও পৌণে একটা বাজেনি। আমি ২৬ সেল থেকে ঘড়ি ধরে ১২-১৫ রওয়ানা করেছি, সময় শেষ হল কিভাবে? আমরা যারা আইন মানি তাদের সাথেই কাউকে কাউকে বৈরি আচরণ করতে দেখে মনটা বিষিয়ে উঠে। গত বৃহস্পতিবারের সাক্ষাৎ ছিল বহু প্রতীক্ষিত। সেই সাথে আমার ভাগিনী মনোয়ারার উপস্থিতিও ছিল আমার জন্যে বেশ আবেগের ব্যাপার। ও এসএসসি পাস করার পর থেকেই আমাদের সাথেই বিয়ের আগ পর্যন্ত ঢাকায় থেকেছে। আমার ছোট মেয়ে খাদিজা তার কোলেই মানুষ হয়েছে। মনোয়ারা একটু আড়াল হলেই খাদিজা কান্নাকাটি শুরু করত। যখন খাদিজা কথা বলা শিখেনি, তখন একদিন মনো কোন কাজে বেশ কিছু সময় বাসার বাইরে ছিল। আমরা তখন আজিমপুরের বাসায় ভাড়া ছিলাম। মনোয়ারা ফিরে না আসা পর্যন্ত খাদিজাকে আমরা কেউ সামলাতে পারছিলাম না। মনোয়ারা বাসায় আসতেই খাদিজার চোখে মুখে যে আবেগ জড়িত কান্না ও মনোকে জড়িয়ে ধরে আদর করার ও নেয়ার ভাষাহীন তৎপরতা ছিল সত্যি চোখে পড়ার মত। খাদিজাকে পাশে নিয়ে মনো বিছানায় শুয়ে তাকে সান্ড্না দেয়ার চেষ্টার মুহূর্তটি এখনও আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে। চোখের চাহনী আর মুখের দুর্বোধ শব্দে সে তার একান্ত প্রিয় আপাকে কী যে বুঝাতে চেষ্টা করতো বুঝা না গেলেও তার মনো আপার প্রতি মায়া মমতার এটা ছিল একটা অকৃত্রিম প্রকাশ।

আমার এই ছোট মেয়ে একবার জ্বরে অজ্ঞান হয়ে পড়ায় তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজের জরুরি বিভাগে। তারা কোন চিকিৎসা ছাড়াই শিশু হাসপাতালে নিতে বলে তাদের দায়িত্ব শেষ করে। ভাগ্যক্রমে ঐ দিন বিকেলে সৌদি এয়ারলাইন্সের কোন একজন কর্মকর্তার স্ত্রী একটা মাইক্রোবাস নিয়ে আমার বেগম সাহেবার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। তার মাইক্রোবাসে করেই আমার মেয়েকে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজে নেয়া হয়। পরে শিশু হাসপাতালেও ঐ গাড়ি করে নেয়া হয়। শিশু হাসপাতালে ভর্তির জন্যে ৫০০ টাকা জমা দেয়ার নিয়ম। কিন্তু আমার বা আমার বেগম সাহেবার কাছে ঐ সময় এত টাকা ছিল না, আমাদের মেহমান হিসাবে আসা ঐ ভদ্র মহিলা সাথে সাথে ৫০০ টাকা বের করে দিয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করে দিলেন।

শিশু হাসপাতালে শিশু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের এবার দেখা-শোনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পালা শুরু হল। কিন্তু জ্ঞান ফিরতে সময় লাগল অস্বাভাবিক। সেই রাতেই জ্ঞান ফিরেছিল না পরের দিন সকালে, সেটা ভাল করে মনে করতে পারছি না। তবে খাদিজার জ্ঞান ফেরার সাথে সাথেই তার মুখে উচ্চারিত প্রথম কথাই ছিল মনো আপা যাবো, মনো আপা যাবো। পরে মনোকে নিয়ে হাসপাতালে গেলাম। মনোকে কাছে পেয়ে খাদিজার খুশির অন্ত নেই। কিন্তু কিছুক্ষণ অবস্থান করে মনোকে নিয়ে আমি যখন বাসায় রওয়ানা করি, তখন খাদিজার কান্না ছিল হৃদয়বিদারক। আমার ভাগ্নি মনোয়ারাও তার কান্নায় বেশ অস্থিরতা প্রকাশ করে বলল ও কতক্ষণ এভাবে কান্নাকাটি করবে, আমি না হয় থেকেই যাই। কিন্তু বাসায় অন্য ছেলে মেয়েদের দেখার কেউ নেই। মহসিনা, তারেক, মোমেন, খালেদ তখনও বেশ ছোট। তাই একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও খাদিজার কাছে শুধু তার মাকে রেখে খাদিজাকে কান্না অবস্থায় রেখেই মনোকে নিয়ে আমি বাসায় চলে আসি। আমার ভাগ্নি মনোয়ারা সাথে আমার ছেলে মেয়েদের সম্পর্ক খুবই গভীর ও অকৃত্রিম। বন্দী জীবনের নয় মাসের দিকে তার সাথে প্রথম সাক্ষাতে আমার আবেগ আপ্লুত হওয়া ছিল খুবই স্বাভাবিক।

www.pathagar.com

আমার আব্বা আম্মার সন্তান হিসেবে আমরা ছিলাম দুই বোন এক ভাই। আম্মা ইন্তেকাল করেন ৮৭ সনের নভেম্বর মাসে, আর আব্বা ইন্তেকাল করেন তার ঠিক একবছর পরে ৮৮ সনের নভেম্বর মাসে। আব্বার ইন্তেকালের ছয় মাস পর ইন্তেকাল করেন আমাদের সবচেয়ে ছোট বোন এখন আমার বোনদের মধ্যে একজনই বেঁচে আছেন। ইনিই মনোয়ারার আম্মা। এই বোন আমার ইমিডিয়েট বড় বোন হওয়ার কারণে তার সাথে মায়া মমতার সম্পর্ক আরো গভীর। পরিবারের সদস্যদের প্রত্যেক সাক্ষাতের সময় আমার এই বোনের কথা জিজ্ঞেস করতে কখনও ভুল হয় না। আমার বেগম সাহেবার কাছে শুনেছি, মনোয়ারার আম্মা তাকে বলেছে, মনো যেন নিজে আমাকে দেখে গিয়ে তার মাকে ফোন করে জানায়, আমি কেমন আছি। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, এবারের সাক্ষাতে আমার পরিবারের এখন একমাত্র মুরুব্বী আমার মায়া মমতার প্রতীক বোনটি কেমন আছে, জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। সপ্তাহে একটি দিনের প্রতীক্ষায় থাকি কাকে কি বলতে হবে, অনেক চিন্তা ভাবনা করে কূল কিনারা পাই না, সাক্ষাতের সময় যেন প্রায় সব কথাই ভুলে যাই। এবারে মনো আসবে আগে জানতাম না। স্লিপ হাতে পাওয়ার পরেই জানলাম। কিন্তু দেখা হবার মুহূর্তে তাকে ঘিরে আমার ছেলে মেয়েদের বিশেষ করে খাদিজার মায়া মমতায় জড়ানো সম্পর্কের স্মৃতি মানসপটে ভেসে উঠতেই যেন সবই ভুলে গেলাম। ছোট ছেলে তালহাকে নিয়ে এখন চিন্তা বেশি। তার কথাটি নিয়ে কিছু পরামর্শ করতেই সময়টা এবার কেটে গেল। ইতঃপূর্বে কয়েকবারের সাক্ষাতে শুনেছি খালেদের মেয়ে নাঈমা আমার দুবছরের খেলার সাথী, তার দাদীর সাথে ফোনে কথা বলার সময় বলে, "আমার দাদাকে দাও," অবুঝ এই শিশুটি জানে না কেন তার দাদার সাথে সে ফোনে কথা বলতে পারছে না। বার বারই নাকি সে বলতে থাকে, দাদাকে দাও। অবুঝ শিশুর মনের এই আবেগ আমার হৃদয়কে দারুণভাবে নাড়া দেয়, আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি, "আল্লাহ এই অবুঝ শিশুর মনের আশাটা পূরণ করার একমাত্র মালিক তুমি, জানি না কবে তুমি তার এই আশাটা পূরণ করবে।

তারেকের বড় মেয়ের বয়স হবে চার বছরের কিছু বেশি। আমার বেগম সাহেবা এবং মেঝ ছেলে মোমেন বলল, ওর কোরআন শরীফের শেষ পারা মুখস্থ হয়েছে। সূরায়ে আল ইমরানের ১০০ আয়াতের মত মুখস্থ হয়েছে। অথচ ও কোরআন শরীফ পড়া এখনও শিখেনি। ক্যাসেটে শুনে শুনে মুখস্থ করেছে। এর ছোট নাজিরাও নাকি কুরআনের ক্যাসেট শোনায় ভক্ত। বড়টা নাকি যা শুনে তাই মুখস্থ হয়ে যায়, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ ওদেরকে মানুষের মত মানুষ হওয়ার তৌফিক দিন।

সাক্ষাতের প্রতীক্ষা ও বিড়ম্বনা আমার আইনজীবীগণ বার বার চেষ্টা করেও কেন যেন জেল কর্তৃপক্ষের অনুমতি পাচ্ছিলেন না, আমার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে। অবশেষে জেল কর্তৃপক্ষের পরামর্শে আমার পরিবারের জন্যে সপ্তাহের নির্ধারিত সাক্ষাতের পরিবর্তে আইনজীবীদেরকে একদিনের সাক্ষাৎ মঞ্জুর করা হয়। পরিবারের জন্যে নির্ধারিত সাক্ষাৎটি হবার কথা ছিল ১৭ই মার্চ বৃহস্পতিবারে। কিন্তু আইনজীবীদের সাক্ষাতের অনুমতি দেয়া হয় ২৯ শে মার্চ শনিবারে অর্থাৎ পরের সপ্তাহে। আর পরিবারের সাক্ষাৎটি নেয়া হল সোমবারে। আগেই উল্লেখ করেছি এই সিডিউল রদবদল হবার কারণে সামনের সাক্ষাতের ব্যাপারে জেল কর্তৃপক্ষের সাথে আমার ছেলেকে আলাপ করে যেতে বলেছিলাম। এজন্যে জেল কর্তৃপক্ষ আমার আলাপের সময় শেষে আমাকে বিদায় দিয়ে তাদেরকে বসিয়ে রাখল। আমি চলে এলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পূর্ব নির্ধারিত সিডিউল অনুযায়ী এ সপ্তাহের বৃহস্পতিবারেও সাক্ষাৎ হল না। পরবর্তী সপ্তাহের সোমবারেও হল না। এর পরের বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ২১/৩ থেকে ৩১/৩ পর্যন্ত দীর্ঘ ১০ দিনের প্রতীক্ষার পর ৩১/৩ এর দুপুর ১২:১০ মিনিটে সাক্ষাতের স্লিপ পেলাম। আমি পায়ের ব্যথার কারণে বিপ্লবের কাঁধে ভর করে জেল গেটে পৌঁছি ১২-২০ মিনিটে। যাহোক "লেট বেটার দ্যান নেভার" প্রবাদটি মনে করে আমি পরিবারের সদস্যদের সাথে মিলিত হই। মনের এতদিনের লালিত আবেগের কিছুটা হলেও প্রশমিত হয়। কিন্তু এটা শুনে বিস্মিত হলাম, তারা নাকি প্রায় ২ ঘণ্টা ধরে গেটে অপেক্ষা করেছে।

www.pathagar.com

গেটের দায়িত্বে নিয়োজিত গেট সার্জেন্টকে জিজ্ঞাসা করলাম এদেরকে এত সময় অপেক্ষা করতে হল কেন? তার উত্তর ছিল, জেল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বশীল কারো স্বাক্ষর দরকার হয়। উনাদের কেউ ঐ সময়ে অফিসে না থাকার কারণেই নাকি এমনটি হয়েছে। এতে তাদের কিছু করার নেই।

এর এক সপ্তাহ পরের নির্ধারিত সাক্ষাৎটি যথারীতি ৭ই এপ্রিল বৃহস্পতিবারেই অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এবারেও প্রতীক্ষা করতে হয় দীর্ঘক্ষণ। এই দিন আমার সায়াটিকার ব্যথা ছিল খুবই তীব্র। ভাবছিলাম হুইল চেয়ারে যাব কিনা। আগের দিন বিকেলে বলেও রেখেছিলাম। ডান পায়ের কোমরের জয়েন্ট থেকে হাঁটুর জয়েন্ট পর্যন্ত তীব্র ব্যথার কারণে জেল গেট পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া সম্ভব হবে কিনা এ ব্যাপারে সন্দিহান ছিলাম। কিন্তু মনে হল হুইল চেয়ারে বসে সাক্ষাতে গেলে পরিবারের সদস্যদের মনের কষ্ট আরও বেড়ে যাবে। তাই একটু বেশি কষ্ট হলেও আগের মতই বিপ্লবের কাঁধে ভর করে গেট পর্যন্ত পৌঁছাই। ইতঃপূর্বে পরিবারের সদস্যদেরকে জানানো হয়েছিল, ওষুধের কোন পরিবর্তন দরকার কিনা এ ব্যাপারে আমার ডাক্তারের সাথে যেন পরামর্শ করে আসে। পরিবারের সদস্যগণ বেশ দায়িত্বশীলতার সাথে আমার নির্দিষ্ট ডাক্তার যিনি এত দিন দেখা শুনা করেছেন, (কারাগারে বন্দী জীবনের পর থেকে আর তার সাথে আলাপ আলোচনার বা তার সাথে দেখা শোনার কোন সুযোগই নেই) তার সাথে আলাপ করে একটা সুপারিশ ও বিকল্প ওষুধ নিয়ে এসেছেন। তবে এটা জেনে বিস্মিত হলাম, আজকেও তাদেরকে প্রায় দু'ঘণ্টা গেটের বাইরে অপেক্ষা করার পর ঢুকতে দেয়া হয়েছে। আমি ১২-২০ মিনিটে পৌঁছে তাদের সাথে আলাপ শুরু করতেই সময় শেষের সংকেত দিলেন একজন। আমি তাকে ঘড়ি দেখিয়ে বললাম ১২-২০ মিনিটে বসেছি। এখনও পাঁচ মিনিট সময় হাতে আছে। আমার ব্লাড প্রেসারের উঠা নামা সংক্রান্ত বিষয়ে ডাক্তারের পরামর্শ কী এবারের আলোচনা অনেকটা এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। তারপর বিভিন্ন এজেন্সীর লোকের সন্দেহ প্রবণ উঁকি ঝুঁকি এবং মাঝে মধ্যে সময় থাকতেও সময় শেষের সংকেত প্রদান যথেষ্ট বিরক্তিকর হলেও মনে মনে তা হজম করতে হয়। কারণ, এখানেও কিছু লোক আছে যাদের কাছে দাড়ি টুপি এবং বোরকা অসহনীয়। আবার যারা এগুলোর প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল ও শ্রদ্ধাবোধ মনে মনে ধারণ করেন তারা অনেকটাই ভীতসন্ত্রস্ত। আমার মনের এই অনুভূতি হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি।

তথাকথিত ১/১১ এর সরকারের আমলে ২ বারের জন্যে জেলে এসেছিলাম, এবারে ৯ মাস পার করে দশ মাসও অতিক্রান্ত হবার পথে। এতদিনে এখানে যা দেখেছি এবং লক্ষ্য করেছি তারই একান্ত স্বতঃস্ফূর্ত উপলব্ধিই প্রকাশ পায় মাঝে মধ্যে আমার কথা ও লেখায়। আমি ১৯৯২ সন থেকে কোমরের ব্যথা বা সায়াটিকা রোগে আক্রান্ত। ১৯৯৮ সালে এটা খুবই মারাত্মক রূপ নিয়েছিল। চিকিৎসার জন্যে সৌদি আরবের কিং ফয়সল স্পেশালাইজড হসপিটাল-এ গিয়েছিলাম। মাঝে মধ্যেই এতে কষ্ট পাই। উপরন্তু ২০০৯ এর ৩১ জুলাই একটা মৃদু ব্রেইন স্ট্রোকের কারণে ডান হাত ও ডান পা আধা অবশ। ঐ সময় থেকে আমার লেখার কাজটি প্রায় বন্ধই হয়ে যায়। ডায়াবেটিসের জন্যে হাঁটার প্রয়োজন। কিন্তু আমি অন্যদের মত এখানে হাঁটাহাঁটি করতে পারছি না। গ্রেফতারের আগের দিন পর্যন্ত একদিন পর পর ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে গিয়ে ফিজিওথেরাপি নিতাম। গ্রেফতারের পর থেকে আর কোন সুযোগ হচ্ছে না ওভাবে ফিজিওথেরাপি নেয়ার। আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও হচ্ছে না। অনেক বলাবলির পর এবং কোরবানীর ঈদের আগে কোমরের ব্যথা পায়ে রেডিয়েট করার পর পিজি থেকে ফিজিক্যাল মেডিসিনের ডাক্তার এসে দেখে যান, তিন মাসের জন্যে ওষুধের প্রেসক্রিপশন দিয়ে যান। আর কিছু ব্যায়াম শিখিয়ে দিয়ে যান যা নিজে নিজেই করতে হবে। আমি এত পুরানা রোগী এবং নিয়মিত একজন সিনিয়র ফিজিওথেরাপিস্টের অধীনে থেরাপি নিচ্ছিলাম। ৯ মাস এটা বন্ধ আছে। এই বিষয়টির প্রতি তারা মোটেই গুরুত্ব দিলেন বলে আমার মনে হল না। এবার নিয়ে তিন বার বলার পর আমি ও আমার পরিবারের মনে হয়েছে, এখানে মানবিক দৃষ্টিকোণের কোনই স্থান নেই। আর আইনও প্রযোজ্য কেবল নিরীহ লোকদের জন্যে। যাদেরকে নিয়ে ভয়ের কোন কারণ আছে অথবা যারা অন্য কোনভাবে ম্যানেজ

www.pathagar.com

করার যোগ্যতা রাখে তাদের জন্যে অনেক কিছুই সহজ এবং সোজা। ঘটনাক্রমে আমি বা আমার মত লোকেরা এই দুই ক্যাটাগরির কোনটাতেই নেই। অতএব, অসহায়ের মত নীরবে নিভৃতে সকল ব্যথা বেদনা সয়ে যাওয়া বা হজম করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।

আমার সামনের সাক্ষাৎ পূর্বনির্ধারিত দিন আগামী বৃহস্পতিবার ১লা বৈশাখ বা বাংলা শুভ নববর্ষের দিন। ঐদিন নির্ধারিত সাক্ষাৎ নাও হতে পারে। যদি না হয়, তাহলে আবার অতিরিক্ত এক সপ্তাহ প্রতীক্ষায় থাকা আমার জন্যে হতে পারে, সাংঘাতিক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। গত সাক্ষাতে পরিবারের সবাই জেনে গেছে আমার সায়াটিকার ব্যথাটা বেশ বেড়ে গেছে। নিয়মিত সাক্ষাতে ছেদ পড়লে তারাও পেরেশানিতে থাকবে। আমি নিজেও পেরেশানিতে থাকব। তারা বুদ্ধি করে জেল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে এক দিন আগে অথবা একদিন পরে আসার ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল হবে। কিন্তু তারা এটা করতে পারবে কিনা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না। তাই এ পর্যন্ত প্রায় ১০ মাসের জেল জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখতে পেলাম, এখানে মানসিক এবং মনস্তাত্ত্বিক পেরেশানি ও অস্থিরতাই মূল সমস্যা। আর এটা কোনভাবে প্রায় প্রতিদিনই ঘটে থাকে। আগের দুটো সপ্তাহ যেমন পেরেশানিতে কেটেছে বর্তমান সপ্তাহটাও মনে হয় তেমনি যাবে। তবে আল্লাহ চাইলে, এর ভেতর দিয়েও কোন কল্যাণকর পথ বেরিয়ে আসতে পারে।

মানবতাবিরোধী অপরাধের তদন্ত প্রতিবেদন পেশ না করে রিমান্ডের আবেদন রহস্যপূর্ণ। মাননীয় ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান এব্যাপারে ১ম দিন শুনানি না করে তারিখ দিলেন এবং কোথায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তাও জানতে চাইলেন। শুনানির নির্দিষ্ট দিনে আমাদের আইনজীবীর বক্তব্যের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে মাননীয় আদালত জেল গেটে একটি কক্ষে জিজ্ঞাবাদের জন্যে সময়ও নির্দিষ্ট করে দিলেন। ১ দিন জিজ্ঞাসাবাদ করবে, সকাল ১০টা থেকে ৫টা পর্যন্ত। জেলখানায় একটি অলিখিত নিয়ম চলে আসছে, তাহলো কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত পত্রিকা ছাড়া কোন পত্রিকা পড়ার বা পাওয়ার সুযোগ নেই। কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত পত্রিকার দায়ভার বহন করতে হয় আমাদেরকেই। কোন পত্রিকার কোন খবর কর্তৃপক্ষের কাছে অবাঞ্ছিত হলে সেই পত্রিকা সেদিন সরবরাহ করা হয় না। হলেও সংশ্লিষ্ট খবরটা কেটে ছিঁড়ে তারপর দেয়া হয়। গতকাল আমাদেরকে জনকণ্ঠ দেয়া হয়নি। কারণ জানতে গিয়ে জানা গেল, আমাদের জেল গেটে জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপারে ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তানুযায়ী জেল কর্তৃপক্ষ নাকি কোন রুম বরাদ্দ দিতে চাচ্ছে না। যেটা বাস্তবে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। আমাদের জেল খানার অভিজ্ঞ সাথীদের কারো কারো ধারণা সরকারই হয়তবা জেল কর্তৃপক্ষকে চাপ দিয়ে থাকতে পারে। যাতে ট্রাইব্যুনাল সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বাধ্য হয় এবং সরকার পক্ষের মর্জিমাফিক নির্যাতন সেলে নিয়ে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জবানবন্দী দিতে বাধ্য করতে পারে। কাল বিকেল থেকেই সরকারের এই দুরভিসন্ধিমূলক ভূমিকা নিয়ে চিন্তা ভাবনার ফাঁকেই সাপ্তাহিক সাক্ষাতটা নিয়ে সমস্যার আশংকা দেখা দেয়ায় মনটা আবার একটু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। জেলখানা এমনই একটি জায়গা যেখান থেকে আপনজনের সাথে এমনকি আইনজীবীদের সাথেও আলাপের সুযোগ নেই। প্রয়োজনের মুহূর্তে কোন কথা পৌঁছানোর নেই কোন সুযোগ। অনেক দিনের দেন দরবারের পর গতকাল ১০ই এপ্রিল ২০১১ তারিখে পিজি থেকে ডাক্তার এসেছিলেন। তারা আমার আগের রেকর্ডগুলো ফাইল থেকে বেশ মনোযোগের সাথেই দেখলেন। সাথে একজন ফিজিক্যাল মেডিসিনের ডাক্তারও ছিলেন তিনি কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কিছু ব্যায়াম শিখিয়ে দিলেন। মূল ডাক্তার সাহেব রেকর্ড দেখলেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করলেন। অবশেষে বললেন, তারা চিন্তা ভাবনা করে তাদের পরামর্শ বা প্রেসক্রিপশন দিয়ে যাবেন। আমি তাদেরকে পিজি থেকে জেল গেট পর্যন্ত আসার জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে ২৬ সেলে ফিরে এলাম। ব্লাড প্রেসারের উঠানামার ব্যাপারে একটি নতুন ওষধ সম্পর্কেও তাদের সাথে আলাপ আলোচনা হল। ডাক্তার সাহেব আমাকে সান্ড্রা দিয়ে বললেন, ডায়াবেটিসের রোগীদের উপরের প্রেসারটা একটু বেশি থাকে। নীচেরটা যেহেতু মোটমুটি নরমাল রেঞ্জের

www.pathagar.com

মধ্যেই আছে অতএব তেমন চিন্তার কোন কারণ নেই। পিজির ডাক্তারদের সাথে আলাপ সেরে আমি আমার রুমে চলে আসলাম। পরের দিন কারাগারের হাসপাতালের সহকারী সার্জন শামসুদ্দিন সাহেব আসলেন এবং জানালেন উনারা অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ওষধের পরামর্শ দিয়ে গেছেন। তিনি নিজেই বিপ্লবকে এ ব্যাপারে গাইড করলেন। বিপ্লব জেল গেট থেকে ঐ প্রেসক্রিপশন নিয়ে মেডিকেলে গিয়ে ওষুধগুলো নিয়ে এলো। প্রেসক্রিপশনের একটা ওষধ ও একটা বিশেষ ধরনের কোমরের বেল্ট বাইরে থেকে কিনতে হবে বলে জানালেন। ওষুধের পরিমাণ বা সংখ্যা বেশি হবার কারণে এবং কোন কোন, ওষুধের বিকল্প থাকার কারণে আমাকে আবার ডাক্তার সাহেবের প্রয়োজন হল সাহায্যের। আলমগীর এবং বিপ্লব দুজনই ডাক্তার কল করার দায়িত্ব নিল। সন্ধ্যার দিকে মেডিকেল থেকে আসাদ সাহেব এসে আমাকে কিছু বুঝিয়ে দিলেন। কয়েকটি বিকল্প ওষুধ দেয়া হলেও কি পরিমাণ খেতে হবে তা লেখা ছিল না। তিনি দেখার পর এটা ঠিক করে দিলেন, বললেন আরো সহজবোধ্য একটি চার্ট পাঠাবেন। রাতে নতুন ওষুধ ব্যবহার থেকে বিরত থাকলাম। সকালে নিজেই প্রেসক্রিপশনের সাথে ওষুধগুলো মিলিয়ে দেখে, কোনটা নাস্তার আগে, কোনটা নাস্তার পরে, এটা বুঝে নিয়ে, দুটো ওষুধ গ্রহণ করলাম। সেই সাথে আলমগীর এবং বিপ্লবকে দায়িত্ব দিলাম যে আসাদ সাহেবকে সেই সহজ চার্টটা আনার জন্যে, যাতে ওষুধ ব্যবহারে কোন অসুবিধা না হয়।

আজকে একটু বেশি কিছু লেখার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু নাস্তার কিছু পরেই লাইব্রেরীয়ান সাহেব এলেন। তার সাথে আমাদের কারাগারের অন্যতম সিনিয়র সাথী আ জ ম রেজা ভায়েরই যোগাযোগ বেশি। কারণ উনি বেশ বই পড়ে অভ্যস্থ। আমি এই লাইব্রেরিয়ানের সাথে প্রথম সাক্ষাতেই দুটো বই চেয়েছিলাম। একটি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু লিখিত "ডিসকভারী অব ইন্ডিয়া," আরেকটি মওলানা আবুল কালাম আজাদ লিখিত 'ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম'। উনি বললেন, বই দুটি আছে, তবে পড়ার মত অবস্থায় নেই। পোকায় খেয়ে নাকি বেশ নষ্ট হয়েছে। আ জ ম রেজা সাহেবও বই দুটির ব্যাপারে খুবই আগ্রহ দেখালেন। একদিন উনি আমাকে বলেছিলেন, স্যার, যদি আপনার কোন সোর্স থেকে বই দুটো আনার সুযোগ থাকে, তাহলে আমাকে একটু পড়ার সুযোগ করে দেবেন। আজকেও লাইব্রেরিয়ানের সাথে আলাপ প্রসঙ্গে তিনি ঐ বই দুটির প্রসঙ্গ তুললেন। জবাব আগের মতই। আমরা সর্বশেষ তথ্যসমৃদ্ধ কিছু বই, লাইব্রেরীতে আনার জন্যে, ইতঃপূর্বে পরামর্শ দিয়েছিলাম। বাজেট সমস্যার কথা শুনে, এ সম্পর্কেও আমরা কিছু পরামর্শ দিয়েছিলাম। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বাজেট সম্পর্কে এবারের অর্থবছরে, না হয় সামনের অর্থবছরে, কিছু করা যায় কিনা, এজন্যে কোথায় কাকে কিভাবে কী বলতে হবে, বলার আগে হোমওয়ার্ক করতে হবে। সব কথাই আমাদের আলোচনায় এসে যাওয়ায়, কালকের চিন্তা অনুযায়ী, আজ লেখার কাজে হাত দিতে অনেক বেশি দেরি হয়ে গেল। একটু পরেই জোহরের নামাজ ও দুপুরের খাবারের সময় হয়ে যাবে, তাই আজ আর এগুতে পারলাম না। সাপ্তাহিক সাক্ষাৎ নিয়ে কয়েকবার বিভ্রাট হবার কারণে আমার মনটা মাঝে মাঝে একটু বেশি ভারাক্রান্ত হয়ে আসে।

কারণ পরিবারের এবং সংগঠনের সাথে অতিরিক্ত আবেগের সম্পর্কটাই প্রধান। তাছাড়া অসুস্থতা নিয়ে জেল জীবন মনোকষ্টের প্রধান কারণ। আমার মূল অসুখের চিকিৎসাই হল ফিজিওথেরাপি। দশ মাস হয়ে গেল এই ফিজিওথেরাপির কোন ব্যবস্থাই করা গেল না। দুবার পিজি থেকে ফিজিক্যাল মেডিসিনের ডাক্তার এসে কিছু ব্যায়াম শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। একগাদা ওষুধের প্রেসক্রিপশন দিয়ে গেছেন এই ব্যাস। এবারেও দুজন ডাক্তার এসে একগাদা ওষুধ দিয়ে গেলেন। ইতঃপূর্বে তিন মাস ব্যাপী অনেক ওষুধ খেয়েছি। সমস্যা যেখানে ছিল, সেখানেই আছে বরং মাঝে মধ্যে বাড়ছে। যেমন আজ ৪/৫ দিন হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, ডান পায়ের উরুতে ভীষণভাবে লাগে হাঁটার সময়। অসুস্থ অবস্থায় সংগঠনের ভাইদের সাক্ষাতে এবং পারিবারিক পরিবেশে যে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করি এখানে তার ন্যূনতম সুযোগও নেই। তাই সপ্তাহের একটি দিন পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ জেলজীবনের জন্যে সবচেয়ে মূল্যবান। এতে

www.pathagar.com

বিভ্রাট হলে মনের উপর ভীষণ চাপ অনুভব করি যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এবারের সাক্ষাতের নির্ধারিত দিনটি আবার ১লা বৈশাখ শুভ বাংলা নববর্ষ। ঐ দিন সাক্ষাৎ না হওয়ার আশংকাই বেশি। তাই মন চাচ্ছে, পরিবারের পক্ষ থেকে যেন জেলকর্তৃপক্ষের সাথে, আলাপ করে একদিন আগে বা পরে আসার চেষ্টা করে। এটা আদৌ সম্ভব হবে কি হবে না এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারছি না। অবশ্য বিপ্লব জানালো, জেল গেটের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের একজন বলেছেন, আমার পরিবারের লোকেরা এবার বৃহস্পতিবারের পরিবর্তে শুক্রবারে আসবে। আজ মঙ্গলবার, আমি শুভ শুক্রবারের প্রতীক্ষায় প্রহর গুনে মনকে সান্ত্বনা দেয়ার পথ বেছে নিলাম।

আজ পহেলা বৈশাখ, বাংলা শুভ নববর্ষের শুভদিন। জেলকর্তৃপক্ষ এদিনের জন্যে ইলিশ মাছ বরাদ্দ দিয়েছে। সকাল বেলার নাশতায় আজ পান্তা ইলিশসহ মোটামুটি অন্যান্য দিনের তুলনায় বৈচিত্র্যময় খাবার খেয়েই শুরু নববর্ষের প্রথম দিনের প্রথম প্রহরটি। নববর্ষের দিক দিয়ে বাসায় থাকলে হয়ত এর চেয়ে বেশি কিছু খেতাম না এবং এত দাম দিয়ে ইলিশ মাছ হয়ত এই দিনের জন্যে কিনতাম না। আগের কেনা ইলিশ ফ্রিজ থেকে বের করে খাওয়া ছাড়া ১লা বৈশাখকে সামনে রেখে চড়াদামে ইলিশ নয় শুধু কোন কিছুই কেনা কাটার মত বিলাসিতা আমাদের পরিবারে নেই বললেই চলে।

নববর্ষের প্রথম দিনটি উদযাপন শুধু খাওয়া দাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এদিন রাজধানীর রাজপথে জনতার ঢল নামে, জনস্রোতে ভাসমান হয়ে উঠে গোটা মহানগরীর পথ, প্রান্তর, অলিগলি থেকে শুরু করে প্রতিটি জনপদ। আমি নাস্তায় ইলিশ খেলাম। জনতার ঢলে একাত্ম হবার সুযোগ সেতো কল্পনা, কারোরই সুযোগ নেই কারাজীবনে। ইতঃপূর্বে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের আবেদনের উপর ট্রাইব্যুনাল শুনানির পর, জেল গেটে আইনজীবীর ও ডাক্তারের উপস্থিতিতে জিজ্ঞাসাবাদ করার সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় কারাগারে নাকি এর জন্যে অবকাঠামোগত সুবিধা না থাকার কারণে সরকার পক্ষ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্যে ট্রাইব্যুনালে আবেদন করে। যার উপর গতকাল শুনানি শেষে সরকার পক্ষের আগের প্রস্তাব মেনে নেয়া হয়। তবে শর্ত দেয়া হয় আইনজীবী ও ডাক্তারের উপস্থিতির এবং সেই সাথে সকাল ১০টায় জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে ঠিক বিকেল ৫টায় জেলে পৌঁছে দেবার নির্দেশনা দেয়।

আগের সিদ্ধান্তে জেল গেটে জিজ্ঞাসাবাদের ব্যবস্থা হওয়ায় শুভকাঙ্ক্ষীগণ সবাই খুশি হন। আবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হওয়ায় অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করেন। কেউ কেউ মনে করেন শর্ত দিয়েছে তাতে খুব একটা অসুবিধার কিছু নেই। তবে ট্রাইব্যুনালের নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনটা অনেকের কাছে দুর্বোধ্য এবং রহস্যজনক মনে হল। শুক্রবারের ব্যাপারে আমার মনে কোন শংকা নেই। আমি নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার আলেমুল গায়েব আল্লাহর কাছেও পরিষ্কার। এলাকার মানুষের কাছেও আমার ব্যাপারে কোন নেতিবাচক তথ্য নেই। আওয়ামী ঘরানার কিছু লোকের রাজনৈতিক প্রতিহিংসা পরায়ণতারই প্রকাশ ঘটেছে, আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বানোয়াট কাহিনী প্রচারের মাধ্যমে।

ডিবি অফিস থেকে ৩০ শে জুনে সিএমএম আদালতে আমাদেরকে হাজির করার সময় আদালতের ভেতরে ও বাইরে যে উচ্ছৃঙ্খল পরিস্থিতি দেখেছিলাম, জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে যেখানে নেয়া হবে, তার আশেপাশের পরিবেশ পরিস্থিতিটা মোটেই সুখকর হবার কথা নয়। পরিস্থিতিটা প্রতিকূল হতে পারে কেবল আল্লাহ আলেমুল গায়েবই তা জানেন। মাঝে মাঝে মনে তাই অজানা আশংকা অনুভব করি। আল্লাহর কাছে পানাহ চাই, আল্লাহ যেন এদেশের ইসলামী আন্দোলনকে হেফাজত করেন। এবং ইসলামী আন্দোলনের মান রক্ষায় আমাকে সাহায্য করেন। ১লা বৈশাখের দিনে জেলখানায় মোটামুটি একটা আমোদ-ফূর্তির আমেজ লক্ষ্য করা যায়। কারা কর্তৃপক্ষ ইলিশ পান্তার ব্যাপারে বেশ সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। কারাগারের সাথীদের মাঝে একাত্ম হয়ে ইলিশ ভাজা দিয়ে এবং কয়েক প্রকারের ভর্তা দিয়ে মনে হয় অন্য দিনের তুলনায় একটু বেশিই খেয়ে ফেললাম। নাস্তার ২ ঘণ্টা পর সব দিন না হলেও মাঝে মধ্যে ব্লাড সুগার টেস্ট করে থাকি। আজকের পান্তা একটু বেশি পরিমাণে খাওয়ার কোন প্রভাব

www.pathagar.com

পড়ল কিনা, জানার জন্যেই ঠিক ২ ঘণ্টা কয়েক মিনিট পরে টেস্ট করলাম। দেখলাম ব্লাড সুগার বেশ বেড়েছে। ১৩.৩ এ পর্যন্ত আমার কখনও হয়নি। কয়েক দিন আগে দুপুরের খাবারের ২ ঘণ্টা পর ১০.৩ হয়েছিল। আজকেরটাই সর্বোচ্চ। কারো কারো মতে টেনশনের কারণেও হতে পারে। এত বেশি হওয়ার কারণে আবার বিকেলে দুপুরের খাবার এর ২ঘণ্টা পরে টেস্ট করলাম। রেজাল্ট আসল ৬.৪। এতে নিশ্চিত হলাম, অনেক দিন পর একটু বেশি পরিমাণে নাস্তা খাওয়াই কারণ। আজ সকালেও আবার ফাস্টিং সুগার টেস্ট করলাম। এটা রেঞ্জের মধ্যেই পেলাম ৬.৯। তবে আমার অন্যান্য দিনের তুলনায় একটু বেশি। গতকাল পয়লা বৈশাখে বাসার খাবার পাঠানোর সুযোগ থাকায় আমাদের অনেকের বাসা থেকেই রান্না করা খাবার আসে। অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাহেবের বাসা থেকেই প্রথমে আসে। এরপর সাঈদী সাহেব, আঃ সালাম পিন্টু এবং আমার বাসা থেকেও বেশ অনেক খাবার এবং নাস্তা আসে। বিকেলের নাস্তায় আমার বাসা থেকে পাঠানো টুনা মাছের স্যানডুইচ ও অন্যান্য ফলমূল দিয়েই খেলাম। মুজিব সাহেবের বাসা থেকে আসা কালাইয়ের রুটি ছিল এর মধ্যে।

১লা বৈশাখ উপলক্ষে এত চড়া দামে ইলিশ তো সবার পক্ষে কেনা সম্ভব নয়। তারপরও দেখলাম সাঈদী সাহেব ও পিন্টু সাহেবের বাসা থেকে বড় বড় টুকরার ইলিশ মাছের বিশেষ করে সরষে ইলিশ প্রচুর পরিমাণে এসেছে। দুপুরে আমাদের খাবার এর সাথে সাঈদী সাহেবের জন্যে পাঠানো বেশ ভাল পরিমাণে কাব্সা আছে। কাব্সা কে পাঠিয়েছেন লেখা নাই। তবে মনে হচ্ছে উনার বড় ছেলে বুলবুলের নতুন বেয়াই শহীদ মক্কী পাঠিয়েছেন। এটার অভিজ্ঞতা তারই বেশি। পয়লা বৈশাখ বৃহস্পতিবার আমার নিয়মিত সাক্ষাৎ না হওয়ার কারণে শুক্রবারে আসতে পরিবারের সদস্যদের বলা হয়েছিল। এদিনে বেশ সকাল সকাল তারা এসে হাজির হয়। অন্য সময় আমি প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করার অনেক পরে স্লিপ আসে। এবার আমি তৈরি হবার আগেই একজন সিআইডি বা কারারক্ষী এসে দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, স্যার আপনার 'দেখা' এসেছে। আমি তাকে একটু বসতে বলে প্রস্তুতি শুরু করি। আমার সাথে সাধারণত বিপ্লবই যায়। একটু আগে তার সাক্ষাতের স্লিপ আসায় সে এখন আর আমার সামনে নেই। গতকালের খাবারের পাত্রগুলো আজ ফেরত যাবার কথা। এগুলো ও ম্যানেজ করে। জুমআর দিন পরিবারের লোকেরা সাক্ষাৎ শেষে বনানী গিয়ে জুমআর নামাজ আদায় করবে। আমার জন্যে যেন তাদের দেরী না হয় তাই অগত্যা সেলিমকে বিকল্প হিসাবে সাথে নিয়ে রওয়ানা হই। অন্য দিন আমি গেটে পৌঁছারও অনেক পরে তাদেরকে সাক্ষাতের জায়গায় আসতে দিত। এবার আমার পৌঁছার আগে তাদেরকে সাক্ষাতের স্থলে উপস্থিত পেলাম। এবারে আমার স্ত্রী, বড় মেয়ে, জামাই এবং মেঝ ছেলে মোমেনের সাথে বড় মেয়ের ছেলে এবং দুই মেয়েও এসেছে। ওদের জন্যে আমি 'লাভ ক্যান্ডি' নামের চকলেট এনে রাখা সত্ত্বেও ভুলে রেখে গেছি। বিপ্লব ঐ সময় উপস্থিত থাকলে হয়ত এমনটি হত না। সেলিমকে রুমে পাঠিয়ে ওটা আনার জন্যে একজন কারারক্ষীকে দায়িত্ব দিলাম, সেলিমকে ডেকে আনার। তাদের যেহেতু গেটের ভেতর থাকতে দেয় না, তাই সাক্ষাতের নির্দিষ্ট আধা ঘণ্টা সময় ওরা একটু গেট থেকে দূরেও চলে যায়। তাই কারারক্ষীর পক্ষে সেলিমকে ডেকে আনা সম্ভব হল না, তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই বিপ্লব এসে হাজির। তাকে বললাম ঐ চকলেটতো তুমিই এনেছ। তুমি রেখেছ। আমরা ভুলে আনতে পারিনি। তুমি দৌড়ে গিয়ে নিয়ে আস। বিপ্লব ১০/১২ মিনিটের মধ্যে ওটা নিয়ে হাজির হওয়ায় মনে স্বস্তি পেলাম। কারণ, আমার বেগম সাহেবের কাছে ইতঃপূর্বে শুনেছি আমার নাতি অর্থাৎ বড় মেয়ে মুহসিনা ফাতিমার ছেলে মাহসিন নাকি ঐ চকলেটটা খুবই পছন্দ করে। আমার বাসায় এলেই নাকি আমার টেবিলের ড্রয়ারে হাত দিয়ে খুঁজতে থাকে চকলেটটা আছে কিনা। এবারে না পেলে তাদের মনটা কেমন হবে ভেবে একটু অস্বস্তি বোধ করছিলাম। চকলেটের প্যাকেটটা চলে আসায় সে অস্বস্তিটা আপাতত কেটে গেল।

এবারের সাক্ষাতে স্ত্রী, মেয়ে জামাই ও ছেলে সকলের মুখে একই সুরে সান্ত্বনার বাণী। আল্লাহর উপর ভরসা রাখার উপদেশ, অবশ্য অনুরোধের ভাষায়। প্রতি সপ্তাহের সাক্ষাতেই মনটা বেশ হালকা হয়।

www.pathagar.com

এবারের সাক্ষাতে মনের অবস্থা আরো অনেক বেশি ভাল মনে হল। পারিবারিক বন্ধনটা আল্লাহর একটি বিশেষ রহমত ও নিয়ামত। আল্লাহ আমাকে এক সুন্দর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের পারিবারিক জীবন বা পরিবেশ দান করেছেন, যা অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও আমার মনে এনে দেয় এক অনাবিল প্রশান্তি। তাই এই সাক্ষাতটি কারাজীবনে খুবই দুর্লভ মুহূর্ত। তবে আমার একটা বড় দুর্বল দিক হলো দেখার আগে যতকথা বলার চিন্তা করে যাই, ওদের মাঝে পৌঁছার পর তার অনেক কথাই ভুলে যাই। অনেকে আমাকে নোট করে যাওয়ার পরামর্শ দিলেও আমার পক্ষে কেন যেন নোট করে যাওয়াও হয়ে উঠে না। সাক্ষাতে তাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসার সাথে সাথে বাইরে থাকা তিন ছেলে ও এক মেয়ে এবং ছেলেদের স্ত্রী ও সন্তানদের কথা অবশ্যই জিজ্ঞেস করে থাকি। কখনও জিজ্ঞাসা না করতেই আমার বেগম সাহেব নিজের পক্ষ থেকেই বলে ফেলে। ছোট ছেলে তালহাকে নিয়েই আমার চিন্তা হয় একটু বেশি। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়ায় তার অনার্স কোর্স শেষ হল। রেজালল্টও নাকি ভাল করেছে। গতকাল বিকেল ৪ টায় ঢাকা পৌঁছার কথা। আমার বেগম সাহেবা বললেন আগামী সাক্ষাতে তাকে সাথে নিয়ে আসবে। গতকাল বিকেল থেকে ভাবছি ছোট ছেলে আমার বড়ই নিরীহ প্রকৃতির, বাসায় এসে আমাকে না পেয়ে তার কেমন লাগবে। প্রায় দুই বছর পরে দেশে আসল আদরের ছোট ছেলেটি। অথচ তাকে দেখার জন্যে আমাকে অপেক্ষা করতে হবে আরো এক সপ্তাহ। এর মধ্যে আবার আমাকে নিয়ে কোন চক্রান্ত ষড়যন্ত্র শুরু হয় কিনা তাও তো আলেমুল গায়েব আল্লাহ ছাড়া কারো জানা নেই। সেই আল্লাহর কাছেই দোয়া থাকল, আল্লাহ যেন আমার ছেলে মেয়ে এবং পরিবারের সকল সদস্যদেরকে সকল প্রকার প্রতিকূলতা ও পরীক্ষা থেকে হেফাজত করেন। সংগঠনও আমার পরিবারের মতই। সংগঠনের ভাই বোন দেশে বিদেশে যারা আমার জন্যে আল্লাহর দরবারে দোয়া করছে, তাদেরকেও যেন আল্লাহ সকল প্রকার বিপদ আপদ বালা মুছিবত থেকে হেফাজত করেন। অতীতের নেকবান্দাহদের আল্লাহ যেরূপ পরীক্ষা নিয়েছেন আমাদের মত দুর্বল বান্দাদের যেন সে ধরনের পরীক্ষা থেকে হেফাজত করেন। সূরা বাকারার শেষ আয়াতটির ভাষা আমাদের সেই শিক্ষাই দিয়ে থাকে। আমার বেগম সাহেবের কথা অনুযায়ী ইতোমধ্যেই তালহার এসে যাওয়ার কথা। তথাকথিত ১/১১ এর পর দুইবার করে জেলে আসতে হয়। তখন সে ছিল দেশের বাইরে। এবারের গ্রেফতারের খবরও শুনেছে দেশের বাইরে থেকেই। এখন সে দেশে পৌঁছালেও আমাকে কবে দেখতে পাবে বা আমি কবে দেখতে পাব, তাতো আল্লাহই ভাল জানেন। দুটি মেয়ে এবং চারটি ছেলের সকলের সাথে আমার হৃদয় মনের বিশেষ আবেগ জড়িত স্নেহ, মায়া মমতার সম্পর্ক জড়িত। তালহা সবার ছোট হবার কারণে তার জন্যে আবেগ অনুভূতি একটু বেশি হওয়াই স্বাভাবিক।

আমি যখন ১৯৯১ সালে পঞ্চম জাতীয় সংসদের সদস্য হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে তার অফিশিয়াল চেম্বারে সভা চলাকালে সন্ত্রাসী হামলার শিকার হই এবং নিজেকে শহীদ হওয়ার জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত করি তখন তালহা খুবই ছোট। ওর বয়স তখন ৫ কিংবা ৬ বছর। ঐ সন্ত্রাসী হামলার মুহূর্তে আমার চোখের সামনে শুধু ওর ছবিটাই ভেসে উঠছিল বারবার। ২০০২ সালে হজ্বে গিয়েছিলাম সৌদি আরবের রয়েল প্রটোকলের মেহমান হিসাবে। আমার সাথে ছিল আমার স্ত্রী, ছোট মেয়ে খাদিজা তাহেরা, ছোট ছেলে তালহা, আর সৌদি আরবের রিয়াদস্থ আল ইমাম ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত আমার মেঝ ছেলে নাজিব মোমেন। হজ্বের মূল আনুষ্ঠানিকতার শেষের দিকে তাওয়াফে ইফাদা ও সায়ীর শেষে ফজরের নামাজ আদায়ের পর, আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট গাড়ির ড্রাইভারের পরামর্শানুযায়ী, আমরা হারাম শরীফের চত্বরে আসতেই খাদিজা বলল, আব্বা, তালহা কৈ? তালহা আগে আগে হাঁটছিল। তার পিছে মোমেন, খাদিজা, আমার স্ত্রী এবং সর্বশেষে আমি। সারা রাত্রি নির্ঘুম কাটার কারণে আমি ও স্ত্রী একটু বেশি ক্লান্তি বোধ করছিলাম। আমাদের হাঁটার গতি একটু ধীর হওয়ায় তালহা একটু বেশি এগিয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে আমাদের সকলের দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়।

www.pathagar.com

সেই দিন তাকে খুঁজে কাছে না পাওয়া পর্যন্ত যে পেরেশানিতে পড়েছিলাম, এমনটি আর জীবনে কখনও হয়নি। মোমেন তাকে খুঁজে পেয়েই খুব জোরে চিৎকার করে বলল, "আব্বা তালহাকে পাওয়া গেছে।" মোমেনের আওয়াজ কানে আসতেই আবেগে ছুটে গেলাম তার কাছে। বুকে টেনে নিয়ে মুখে চুমু খেয়ে দূর করার চেষ্টা করলাম মনের সব পেরেশানি। শুকরিয়া জানালাম মহান আল্লাহর দরবারে, ছেলে হারানোর মত বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে। তালহাও আমাদেরকে না পেয়ে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিল। তবে সে স্বভাবগতভাবেই একটু চাপা, মনের অবস্থা সহজে প্রকাশ করে না। তার মাথায় ঐ মুহূর্তে এতটুকুই বুদ্ধি এসেছিল, গাড়িতো এই জায়গায়ই আসবে। সেই সাথে সে কাছে দেখতে পায় আমাদের একই গাড়ির যাত্রী এবং রয়েল প্রটোকলের মেহমান আলজিরিয়ার ধর্মপ্রতিমন্ত্রীকে, যিনি আমাদের দিকে নজর রাখার চেষ্টা করেছেন আর সঙ্গী হিসাবে আমরাও উনার কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করেছি। সকল দুশ্চিন্তার পাহাড় আল্লাহ সরিয়ে দিলেন বুকের উপর থেকে। আমরা যথারীতি ফিরে এলাম অন্যান্য সাথীদের সাথে সপরিবারে মীনার রেস্ট হাউজে। আমি তালহাকে নিয়ে ভাবতে গেলে মাঝে মাঝে মসজিদে হারামের চত্বরের সেদিনের ঘটনা ও আমাদের পেরেশানি ছোট ভায়ের জন্যে খাদিজার বুকফাটা কান্নার দৃশ্য ভেসে উঠে। সেদিন আবেগ আপ্লুত হয়ে ছেলের মায়ায় আমার কান্না পেয়েছিল এমন বেশি যেমনটি আর কখনও কোন দিন ঘটেনি। আল্লাহ সেদিন যেভাবে বিপদ ও পেরেশানি থেকে অতি সহজেই হেফাজত করেছিলেন, সেই আল্লাহর উপর ভরসা করেই সকল পেরেশানি থেকে বেঁচে আছি। ভবিষ্যতেও আল্লাহর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার কোন বিন্দুমাত্র আশংকাও যেন আমাকে, আমার সংগঠন এবং পরিবারের কাউকে স্পর্শ না করে, আল্লাহর দরবারে বার বার এই আকুল আবেদনটা রেখে আসছি। গতকালের সাক্ষাতের জন্যে যাওয়ার পথে আমার অচেনা অপরিচিত এক বৃদ্ধ কারাবন্দী দৌড়ে এসে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "কোন ভয় নাই আল্লাহর সাহায্যে বিজয় নিশ্চিত।" মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্যে গঠিত ট্রাইব্যুনাল আমার এবং মুজাহিদ সাহেবের জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে রিমান্ডের আবেদন শুনানির পর, জেল গেটে কোন একটি কক্ষে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদের সিদ্ধান্ত দিয়েছিল। ইতঃপূর্বে জেল গেটে এরূপ জিজ্ঞাসাবাদের বহু নজির থাকা সত্ত্বেও সরকারী চাপে ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়। ট্রাইব্যুনাল নিজের সিদ্ধান্ত বহাল না রেখে সরকার পক্ষের চাপের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। এখন যে কোন দিন জেল কর্তৃপক্ষ সকাল ১১টায় নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানোর এবং পুনরায় জেলে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিতে পারেন। তাদের সেই নির্দেশ কবে আসবে কখন আসবে সেই প্রতিক্ষায় সময় কাটছে।

মাঝখানে আমার পায়ের ব্যথা আবার বেশ বেড়ে গিয়েছিল। প্রায় ১০/১২ দিন হাঁটা বন্ধ রাখার ফলে ব্লাড সুগারও বেশ বেড়ে যায়। ব্লাড প্রেসারের ঊর্ধ্বমুখী ভাব এবং সুগার প্রায় ভালভাবে এত দিন নিয়ন্ত্রিত ছিল বলে সাথী সঙ্গীদের অনেকেই বলতেন, আপনার আসলে ডায়াবেটিস নেই। ব্লাড সুগার গত ক'দিন থেকে বৃদ্ধি পাওয়ায় মনের দুশ্চিন্তার মাত্রাও একটু যেন বাড়তে থাকে। গতকাল ১৬/০৪/১১ এর বিকেল থেকে আবার আস্তে ধীরে হাঁটা শুরু করলাম। অবশ্য ২০ মিঃ থেকে ৩০ মিঃ এর বেশি হাঁটা এখনও ঠিক মনে করছি না। আজ সকালে ৭.৩০ টা থেকে শুরু করে ২৫ মিঃ হেঁটেছিলাম। পুরো ৩০ মিনিটই হাঁটতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ডান পায়ের দুর্বলতা ও ব্যথার কারণে ২৫ মিঃ হেঁটেই শেষ করলাম। আজ সকালের হাঁটার পরে অন্যকোন ওয়ার্ডের একজন কয়েদী কোন কাজ উপলক্ষে কারারক্ষীদের সাথেই আমাদের সেলে এসেছিল। এক পর্যায়ে আমার সামনে পড়ে যায়। সে কিছু বলার অনুমতি চেয়ে সামনে দাঁড়িয়ে গেল। বলা শুরু করল "আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজেই আপনাদের জন্যে দোয়া করি। ইনশাআল্লাহ আবার একদিন আপনারা ক্ষমতায় আসবেন। তখন আমাদের মত গরিব লোকদের কথা মনে রাখবেন। আল্লাহ আপনাদের উপর রহমত করবেন"। একজন সাধারণ কয়েদীর মুখের এই কথাগুলো ছিল, একান্তই মনের

www.pathagar.com

গভীর থেকে উচ্চারিত কথা। আল্লাহ তার এই বান্দার কথা কবুল করুন। আমাদেরকেও ভবিষ্যতে যেখানে যে অবস্থায়ই আল্লাহ রাখেন, তাদের মত অসহায় লোকদের কথা যেন মনে রাখি।

আমার ছোট ছেলে তালহা নিরীহ প্রকৃতির ছেলে। প্রায় দু'বছর পর গত শুক্রবার ১৫ই এপ্রিলে দেশে আসার কথা। হয়ত এসেই গেছে। কিন্তু জেলখানা এমন জায়গা যে সময় মত বাইরের কিছু জানার বা বাইরে কিছু জানানোর সুযোগ নেই। সে এতদিন পর বাড়ী এসে তার আব্বাকে না দেখে কেমন করছে, কী ভাবছে, আল্লাহ আলেমুল গায়েব ছাড়া কারো জানা নেই। তার আম্মা আমাকে আশ্বস্ত করে গেছে, আগামী বৃহস্পতিবারের সাপ্তাহিক সাক্ষাতে তাকে নিয়ে আসবে। আগামী বৃহস্পতিবারের সাক্ষাতের জন্যে তাই বেশ ব্যাকুলতার মধ্যেই দিন কাটছে। আবার কোন কারণে এটা হতে না পারলে, তালহাসহ পরিবারের সকলের যেমন খারাপ লাগবে, তেমনি বরং তার চেয়ে হয়ত অনেক বেশি খারাপ লাগবে আমার। তাই নিজেকে এ চিন্তা থেকে মুক্ত রাখতে পারছি না।

আল্লাহকে বলছি, "আমার সর্বকনিষ্ঠ ছেলেটি যেন বৃহস্পতিবারের সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত না হয়, এজন্যে তোমার কুদরতি ব্যবস্থায় এ পথের সকল বাধা প্রতিবন্ধকতা দূর করে দিও, তোমার বিশেষ মেহেরবানিতে।

মিডিয়ার তেলেসমাতি

গতকাল বিকেলের দিকে আমাদের ২৬ সেলে হঠাৎ করে দুজন মেহমান এলেন। এরা প্রথমত চাঞ্চল্যকর দশ ট্রাক অস্ত্র চোরাচালানোর সাথে সংশ্লিষ্ট মামলার আসামী। পরবর্তীতে ২১ আগস্ট ২০০৫ এর গ্রেনেড হামলা মামলারও আসামীভুক্ত হয়েছেন। আজ সকালে তাদেরকে ঢাকার সিএমএম কোর্টের কোন চেম্বারে হাজির করা হবে। সম্ভবত পুনরায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে রিমান্ড চাওয়া হবে। কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে জনকণ্ঠ, সংবাদ, যুগান্তর প্রভৃতি জাতীয় দৈনিক আমাদের পড়তে দেয়া হয় বা পড়ার সুযোগ হয় আমাদেরই পয়সার বিনিময়ে। আমাকে জড়িয়ে এসব পত্রিকায় অনেক কিছুই লেখালেখি হয়েছে। আমরা বিকেলে ২৬ সেলের বারান্দায় বসা অবস্থায় কোন প্রসঙ্গ ছাড়াই তাদের একজন বলে ফেললেন, আমাকে নিয়ে নাকি তাদের কারো সাথে কোন আলাপই হয়নি। পত্র-পত্রিকায় যা কিছু এসেছে সবই মিডিয়ার কল্পিত আজগুবি প্রতিবেদন ছাড়া আর কিছুই নয়। এবারের জেলের অভিজ্ঞতার মধ্যে মিডিয়ার দায়-দায়িত্বহীনতা সম্পর্কে অভিন্ন মন্তব্য শুনলাম, রাজনৈতিক বন্দী থেকে শুরু করে পারিবারিক কারণে জেলে আছেন এমন প্রায় সবার কণ্ঠে। এতদিন ভাবতাম, আমরা ইসলামী আন্দোলনের সম্পৃক্তরাই কেবল মিডিয়ার সমালোচনা করি, মিডিয়ার দায়-দায়িত্বহীন সংবাদ পরিবেশন, মানুষের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন খবর ছেপে চরিত্র হননের মত অপকর্মগুলোকে আমরাই তথ্য সন্ত্রাস নামে অভিহিত করি। গ্রেফতারের পর থেকে ১৭+৩ দিন মোট ২০ দিনের রিমান্ডে ডিবিতে অবস্থানকালে প্রতিষ্ঠিত একটি জাতীয় দৈনিকের সিনিয়র রিপোর্টারের ছেলের কথাটি কোন দিনই ভুলতে পারব না। সে আক্ষেপের সাথে বলছিল, যদিও তার বাবাও একজন সাংবাদিক, কিন্তু তার দুঃখ বেদনা ও বিপদ আপদ বৃদ্ধিতে এক শ্রেণীর সাংবাদিকদের ভূমিকাই ছিল সবচেয়ে দুঃখজনক।

২৬ সেলে এসে আরো দুজন কারাগারের সাথীদের সাথে আলাপচারিতায় জানতে পারলাম, তাদের কেসটাকে নাকি এক শ্রেণীর সাংবাদিকরাই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে জটিল করে তোলার কারণে তারা ভোগান্তির শিকার হয়েছেন। বিকালের দুই মেহমানের একজনের কথায় পেলাম অভিন্ন সুর। তথ্য সন্ত্রাসে লিপ্ত কিছু মিডিয়া এদেশের জন্যে অভিশাপ বৈ আর কিছুই নয়। ২০ শে এপ্রিল আমাদেরকে 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল' এ হাজির হতে হয়। ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম সাধারণত দুপুর একটা পর্যন্ত চলে। ঐদিন শুধুমাত্র মাওলানা মুহতারাম সাঈদী সাহেবের জামিনের আবেদন এবং চিকিৎসার বিষয়াবলী আলোচনাতেই সময় শেষ হয়ে যায়। আমাদের চারজনের বিষয় আলোচনার জন্যে পরের দিন অর্থাৎ ২১

www.pathagar.com

শে এপ্রিল রোজ বৃহস্পতিবার ধার্য করা হয়। মুহতারাম মাওলানা সাঈদী সাহেবের জামিনের আবেদন নাকচ করা হল; আর চিকিৎসার জন্যে নিজ খরচে বারডেমে চিকিৎসার সুযোগ দেওয়ার জন্যে জেল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয়া হল। আন্তর্জাতিক মান রক্ষা করে মানবতার বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধে অপরাধীদের বিচার করার জন্যে গঠিত ট্রাইব্যুনালের মাননীয় চেয়ারম্যানের একটি উক্তি থেকে আমার মনে এ ধারণাটি বদ্ধমূল হল যে, এখানে ন্যায়বিচার পাওয়ার কোন সুযোগই নেই। মাওলানা সাঈদী এখন দেশের ভেতরে বাইরে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী হিসাবে শুধু পরিচিতই নন, এনামেই তিনি কোটি কোটি মানুষের মনের মনিকোঠায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন। আমি বিগত ৩৫/৩৬ বছর থেকে সরাসরি তাকে দেখে আসছি। ছাত্রজীবন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত অনেকবার পিরোজপুর সফর করেছি। তাকে তার নাম বিকৃত করে 'দেলু' নামে বা 'দেইল্লা' নামে কেউ ডাকে এমন কথা কখনও কোন ভাবেই আমার কানে বা আমাদের কারো কানেই আসেনি। কুরুচিপূর্ণ রাজনীতি চর্চা করে যারা অভ্যস্ত, তারাই এই সম্মানিত ব্যক্তিকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্যে জনসম্মুখে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের পাত্রে পরিণত করার জন্যে, স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পরে, তার মা বাপ ও মুরুব্বীদের রাখা সুন্দর নামটিকে, কোটি কোটি ভক্তদের শ্রদ্ধেয় নামটিকে বিকৃত করে সরকারী প্রসিকিউটরের বক্তব্যের ব্যাপারে, জনাব সাঈদী সাহেবের আইনজীবী ব্যারিস্টার তানভীরের প্রস্তাবিত বক্তব্য খণ্ডনের দায়িত্ব নিলেন স্বয়ং ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান। এমন একজন সম্মানিত ব্যক্তির নাম বিকৃতিকে যিনি যৌক্তিক প্রমাণের জন্যে, অনুমানের আশ্রয় নিয়ে, এমনটি তো তার এক সময়ের নাম হতে পারে, অনেকেরই তো ডাক নাম বা নিক নাম থেকেও থাকে বলে মন্তব্য করে, সাঈদী সাহেবের আইনজীবীর উপস্থাপিত সংশোধন নাকচ করলেন। এমন নিচুমানের ও মনের লোকদের জন্যে ট্রাইব্যুনালের ঐ চেয়ারে কি আসলে মানায়?

ঠিক ঐদিনই কিংবা এর একদিন পরে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ট্রাইব্যুনালের সদস্য, প্রসিকিউটর ও তদন্ত কর্মকর্তাদের সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, এরা সবাই নাকি ঘাদানিকের সাথে সংশ্লিষ্ট, অর্থাৎ ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি নামে যে কমিটি গঠিত হয়েছিল আওয়ামী বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে অধ্যাপক গোলাম আযমের নাম জামায়াতে ইসলামী নির্বাচিত আমীর হিসাবে ঘোষণার পর। এরা গণ আদালতের নামে ১৯৯২ সালে দেশে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন এবং দেশব্যাপী তারা আইন হাতে তুলে নিয়ে অনাচার সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়েছেন। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে আইনী লড়াইয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায় আসে অধ্যাপক গোলাম আযমের পক্ষে। সেদিনের পরাজয়কে তারা মেনে নিতে পারেনি। এরপর থেকে অবিরাম অবিরত জামায়াতে ইসলামী ও এর নেতৃবৃন্দের চরিত্র হননের জন্যে তথ্য সন্ত্রাস চালিয়ে আসছে। তাদেরই পক্ষ থেকে মাওলানা সাঈদী সাহেবের নাম বিকৃত করা হয়েছে। ট্রাইব্যুনাল চেয়ারম্যানও তাদের একজন হিসাবে এটাকে যৌক্তিক বলে অভিহিত করতে একটু দ্বিধাবোধ করলেন না!

মুহতারাম মাওলানা সাঈদীর বিরুদ্ধে প্রসিকিউটরের একটি খুবই অপমানজনক মন্তব্যকেও মাননীয় চেয়ারম্যান তার পক্ষ থেকে অতিরিক্ত একটা নেতিবাচক বিশেষণ যোগ করে সমর্থন দিয়ে জামিনের আবেদন নাকচ করলেন। অবশ্য নিজ খরচে বারডেমে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্যে জেল কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিলেন।

বেলা দুপুর একটার পর আর আদালত চলে না। আমাদের চার জনের জামিনের আবেদন ও অন্যান্য ব্যাপারে আগামীকাল আলোচনা হবে মর্মে মাননীয় চেয়ারম্যান নির্দেশ দিয়ে বললেন সাঈদী সাহেব ছাড়া বাকী চারজনকে আগামীকাল আসতে হবে। আমরা আদালত থেকে বের হবার মুহূর্তে জনাব সাঈদী সাহেব আমার মেঝ ছেলে ব্যারিস্টার মোমেনকে বললেন, "শুনেছি তালহা দেশে এসেছে। ওকে সাথে আনো নাই কেন?" মোমেন উত্তরে বলল, আনিনি এজন্যে যে আব্বা ওকে দেখে আবেগ আপ্লুত হতে পারেন। আমি অবশ্য তাকে এই পরিবেশে না আসাই ভাল মনে করেছি। সাপ্তাহিক সাক্ষাতের নির্দিষ্ট দিন

www.pathagar.com

তো একদিন পরেই, তাই সেখানে দেখা হবে কথাও হবে। দু'বছর পরে এসেছে, তার সাথে কথা বলা যাবে না শুধু একটু দেখা হবে এটা আমার মনের চাহিদা মিটাতে তো যথেষ্ট হতে পারে না।

পরের দিন আমাদের জামিনের শুনানির তারিখে সাঈদী সাহেবের কথায় প্রভাবিত হয়ে হয়ত সাথে নিয়ে আসতে পারে। এজন্যে আমি চাচ্ছিলাম না যে নির্দিষ্ট সাক্ষাতের আগে সে ট্রাইব্যুনালের শুনানির ঐ পরিবেশে উপস্থিত হোক কিন্তু কোর্টে উপস্থিত হয়ে দেখি আমাদের মামলার সাথী মুহাজিদ সাহেব নারায়ণগঞ্জ জেল থেকে এবারে আমাদের আগেই এসে উপস্থিত। গতকাল তার আসতে বেশ কিছুটা বিলম্ব হয়েছিল। আজ একটু আগে এসে সেটা পুষিয়ে দেয়া হলো। তার কাছেই শুনলাম তাকে নাকি হাত নেড়ে তালহা সালাম জানিয়েছে। কিন্তু আমি পৌঁছার সময় তাকে চোখে পড়েনি। আমাদের জন্যে অপেক্ষা করার নির্দিষ্ট রুমটার সামনে দিয়েই এ বিল্ডিংয়ের দোতালায় আদালতের জন্যে নির্ধারিত স্থানে আইনজীবীগণ, সাংবাদিক ও সীমিত সংখ্যক দর্শকবৃন্দ (মূলতঃ আসামীদের নিকট আত্মীয়স্বজন) যাওয়া আসা করে বা উঠা নামা করে। আমাদের আইনজীবী তাজুল ইসলামকে কয়েকবার উঠা নামা করতে দেখলাম, আমার ছেলে ব্যারিস্টার মোমেনও কয়েকবার উঠানামা করল। তারা হাত নেড়ে সালামও জানিয়ে যায়। মোমেনের সাথে তালহাকে না দেখে মনে হল সেকি তা হলে মোমেনের সাথে না এসে আমাদের সাথীদের সন্তানদের সাথেই এসেছে?

আদালতে আমাদের ডাকা হল। আমি দুতালায় সিঁড়ি বেয়ে উঠতে কারো সাপোর্ট ছাড়া উঠতে পারি না। গতকাল একজন পুলিশের কাঁধে ভর করে উঠেছিলাম। আজকেও তেমনি একজনের সাপোর্ট চাইলাম। একজন বয়স্ক পাকা দাড়িওয়ালা পুলিশ এগিয়ে আসতে দেখে আমি একটু সংকোচবোধ করলাম। পরে অপেক্ষাকৃত একজন কম বয়সের পুলিশকে আমি বললাম, ভাই আপনার কাঁধে একটু হাত রেখে আমি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে চাই। উনি আমাকে হাত ধরে উঠাতে চাইলেন। আমি বললাম ওতে আমার সুবিধা হবে না বরং আপনার কাঁধে আমার হাতটা রাখতে দিলে আমি একটু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করব। আমার হাতে ও পিঠে বেশি ব্যথা না থাকলে আমি রেলিং এ ভর করে নিজে নিজেই উঠা নামা করতে পারতাম। পুলিশ ভাইটি খুশি মনেই তার কাঁধে ভর করে আমাকে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে সাহায্য করল।

আদালতে ঢুকে আমাদের জন্যে নির্দিষ্ট স্থানে (যাকে সাধারণত কাঠগড়া বলা হয়ে থাকে) যেতে তালহাকে বসা দেখতে পেলাম। ২ বছর পরে ছোট ছেলে বিদেশ থেকে বাড়ী এসেছে, তাকে এই পরিবেশে দেখার জন্যে আমি মানসিকভাবে তৈরি ছিলাম না। তাকে এখানে এভাবে দেখে আমার মনের প্রতিক্রিয়া কেমন হয়েছিল, সেটা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। আমি অতিকষ্টে নিজের মনে আবেগ অনুভূতিকে হজম করে তার গায়ে হাত বুলিয়ে ব্যথাভরা মনে তাকে জিজ্ঞেস করলাম "আব্বু কেমন আছ" এরচেয়ে বেশি কথা বলার সুযোগ এখানে ছিল না। আদালতের কার্যক্রম চলা পর্যন্ত মাঝে মাঝে ট্রাইব্যুনালের মাননীয় চেয়ারম্যান ও অন্যান্য বিচারপতিদের প্রতি তাকাই। কখনো তাকাই সরকারের প্রসিকিউটরদের প্রতি। ফাঁকে আমার ছোট ছেলে একান্ত স্নেহের ছেলে তালহার মুখের দিকে তাকাই। ভাবছি তার আব্বুর এই অবস্থায় পড়তে হচ্ছে, এ ভাবনা তার মনকে কতটা আবেগ আপ্লুত করছে। এই পরিবেশে আমার সবচেয়ে নিরীহ প্রকৃতির এই ছেলেটি আসুক, এটা কেন যেন মন থেকে কখনই মেনে নিতে পারছিলাম না। মোমেনকে তাই বললাম, কালকেই তো জেলগেটে দেখা হবার কথা। আজকে এই পরিবেশে ওকে কেন এনেছিলে? মোমেন বলল, না কোন অসুবিধা নেই।

আদালতে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপারে প্রথম সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হওয়ার বিষয়টি নিয়ে আগে আলোচনা হল। আমাদের আইনজীবী খুব সুন্দরভাবে বিষয়গুলো উপস্থাপন করেন। তার উপস্থাপনার প্রশংসা ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সদস্যরাও করলেন। কিন্তু রায় থাকল যথাপরং। আমাদের আইন উপস্থাপনা অনেক সুন্দর হলেও জেল গেটে অতীতে জিজ্ঞাসাবাদের নজীর উপস্থাপনা করা হয়নি। এই সময়ের মধ্যেই আমাদের মহানগরী আমীরের জিজ্ঞাসাবাদ জেল গেটেই হয়েছে। ১/১১ এর পরে

www.pathagar.com

আমরা যখন জেলে তখন আমার, ড. মুশাররফ, এমকে আনোয়ার এবং শামসুল ইসলাম সাহেবের জিজ্ঞাসাবাদ জেল গেটেই হয়েছিল। অতএব যে যুক্তিতে জেল গেটে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে ট্রাইব্যুনালের নিজস্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়েছে সেটা মোটেও যৌক্তিক ছিল না।

জামিনের আবেদনের সাথে স্বাস্থ্যগত অবস্থা ও চিকিৎসা বিষয়ক আলোচনাকে সামনে রেখে বারডেমে নিজ নিজ খরচে চিকিৎসার সুযোগ দেবার নির্দেশনা দিয়ে জামিন নামঞ্জুর করা হল। এরপর আদালত থেকে বিদায় নিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে জেলের উদ্দেশে রওয়ানা দিলাম। তালহার সাথে পরের দিনে দেখা ও কথা হবে। আমাদের নিয়মিত সাপ্তাহিক সাক্ষাতের জন্যে পরিবারের সদস্যগণ বৃহস্পতিবারেই এসে থাকে। মাঝে মাঝে বিভিন্ন কারণে কিছুটা ব্যতিক্রমও করতে হয়েছে। দুই বার দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সাক্ষাৎ হতেও পারেনি। এবারের বৃহস্পতিবারে ট্রাইব্যুনালে হাজির হওয়ার কারণে সাক্ষাতের দিন ধার্য হয় শুক্রবারে। এবারের সাক্ষাতে অন্যদের সাথে আসবে আমার ছোট ছেলে তালহা যে দুবছর পর দেশে এসেছে, পরীক্ষার একটা অংশ বাকী রেখেই, মনের আবেগকে সংযত করতে না পেরে। আমি ভেবেছিলাম, পরীক্ষা সব শেষ করে এসেছে। অনার্স শেষ হওয়ার পর সুযোগ পেলে দেশের বাইরে যাবে, না হলে দেশেই কোন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স ডিগ্রীটা সেরে নেবে।

সাক্ষাতে জানা গেল, মূল সাবজেক্ট অর্থনীতির সব বিষয়ের পরীক্ষাই শেষ করে এসেছে। কিন্তু একটা অতিরিক্ত বিষয় আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়ার জন্যে যেটা জরুরি অর্থাৎ আরবী বিষয়ের পরীক্ষাটা রেখেই চলে এসেছে। শুধু আমাদেরকে দেখতেই এসেছে। আবার তাকে যেতে হবে ঐ পরীক্ষাটার জন্যেই। তাছাড়া শুনে খুব ভাল লাগল, ওখানেই নাকি মাস্টার্স করতে পারবে। পূর্ণ আস্থার সাথেই বলল, ইনশাআল্লাহ সে ওখানে মাস্টার্স পড়তে স্কলারশীপও পেতে পারে অথবা এসিস্টেন্টশীপও পেতে পারে। এর আগে আমার বড় ছেলে ওখান থেকে বিবিএ করে, দেশে এসে দেড় বছর চাকরি করে পরে আমেরিকার "মেইন ইউনিভার্সিটি"তে গিয়ে প্রথমে এমবিএ, পরে এমআইএস করেছে। তখন শুনেছিলাম, বাইরের ছাত্ররা নাকি ওখানে মাস্টার্স করার সুযোগ পায় না। অতএব চিন্তায় ছিলাম, তাকে মাস্টার্স ডিগ্রীর জন্যে কোথায় পাঠাবো। খালেদ অস্ট্রেলিয়ায় আছে, তারেক আছে আমেরিকায়, এই দু'দেশের যেখানেই হোক খালেদ বা তারেকের তত্ত্বাবধানে থাকার সুযোগ হলে তো ভাল। না হলে অন্যকোথাও একা তাকে পাঠাতে আমার মন যেন কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না। আমি মাঝে মাঝে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি, এখনও করছি, আল্লাহ আমার তালহাকে মালয়েশিয়াতেই মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ করে দিও। তালহার কথায় মনে হল, মেহেরবান আল্লাহ তাকে সেখানেই মাস্টার্স ডিগ্রী নেয়ার সুযোগ দেবেন। সেই সাথে এসিস্টেন্টশীপটাও যদি পেয়ে যায় তাহলে ভবিষ্যতে ঐ আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয়টিতে শিক্ষকতার সুযোগও পেয়ে যেতে পারে। কারাবন্দী মজলুম পিতা হিসাবে আমার নিরীহ এই পুত্রটির জন্যে, আল্লাহ, আমার প্রাণ উজার করে করা দোয়া কবুল কর।

সপ্তাহে একদিন পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাতের প্রতিটি মুহূর্তই আবেগের; তালহার উপস্থিতি সেই আবেগে আর একটা অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করে। সাক্ষাতের সময়টা যেন মুহূর্তেই শেষ হয়ে গেল। সাক্ষাতের জন্যে যারা এসেছিল তারা চোখের আড়ালে গেলেও মনে হয় যেন এখনও ওরা আমার সামনেই আছে। যে কথাগুলো বলা হয়নি মনে মনে তাদের সাথে যেন সেই সব বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করেই চলছি। আমার সাক্ষাতের জন্যে প্রদত্ত দরখাস্তে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনায় থাকে, সকল সংস্থার উপস্থিতিতে কড়া নিরাপত্তার অধীনে হতে পারে।

অতএব এ সাক্ষাতে পরিবারের সদস্যরা কে কেমন আছে, অন্যান্য আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব ময়-মরুব্বী কে কেমন আছে, যৎ কিঞ্চিৎ জানা গেলেও, আমার জীবন যে প্রিয় সংগঠনের জন্যে নিবেদিত তার অবস্থা প্রকৃত অবস্থা জানার কোন সুযোগ নেই। আত্মীয় পরিবার ছাড়া তো কারো সাথে সাক্ষাতেরই অনুমতি নেই। দেশের রাজনীতির গতি প্রকৃতি নিয়েও কোন আলোচনা করার সুযোগ নেই। তাই সাক্ষাৎ শেষে

www.pathagar.com

জেলখানায় আমার নির্দিষ্ট সেলে ফিরে আসতে আমার মনে এবং বুকে কোনদিনই হালকা অনুভব করতে পারিনি। বরং মাঝে মধ্যে মনের উপর কেন যেন চাপ একটু বৃদ্ধিই পায়।

আল্লাহ সুবহানাহুতায়ালাই দয়া করে মেহেরবানী করে বাংলাদেশের চরম প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্য দিয়েও জামায়াতে ইসলামীর মত একটি ইসলামী সংগঠনকে একটা স্বীকৃত রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে এ পর্যায়ে এনে পৌঁছিয়েছেন। এ আন্দোলনের অতীতের ইতিহাসের আন্দোলনকারীদেরকে, আল্লাহ ঈমানের পরীক্ষা নিয়েই বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়েছেন। অতীতের মত বড় রকমের কোন পরীক্ষা না আসুক এজন্যে আল্লাহতায়ালা নিজেই তাঁর কাছে দোয়া করার ভাষা শিখিয়ে দিয়েছেন সূরায়ে বাকারার শেষ আয়াতটিতে, আমাদের আকুল আবেদন তাঁর শাহী দরবারেঃ

হে আমাদের পরওয়ারদেগার, আমাদের ভুল ভ্রান্তির ও ত্রুটি বিচ্যুতির কারণে তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করোনা, অতীতের ঈমানদার লোকদের উপর যেরূপ বোঝা চাপিয়েছ (পরীক্ষার বোঝা) আমাদের উপর অনুরূপ বোঝা চাপিয়ো না। আমাদের উপর এমন বোঝাও চাপিয়ো না যা বহন করার ক্ষমতা আমাদের নেই। হে আমাদের রব, তুমি আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি মার্জনা কর, গোনাহখাতা মাফ কর, আমাদের প্রতি রহম কর এবং কুফরী শক্তির উপর আমাদের বিজয় দান কর, আমীন। আল্লাহর শিখানো ভাষায় এই দোয়া শুধু দোয়া নয়, এতে আছে ঈমানদার লোকদের জন্যে নির্দেশনাও। আল্লাহ আমাদেরকে সেই নির্দেশনা বোঝার ও অনুসরণ করার তৌফিক দিন। গত শুক্রবারের সাক্ষাতের দিন শুনেছিলাম, সকালে হাঁটার সময় ট্রাক চাপা পড়ে জামায়াতের দুজন কর্মী নিহত হয়েছে। বৃহস্পতিবারে কোর্টে যাবার আগে আমাদের কারাগারের সাথী আঃ মান্নান পিন্টু সাহেব রেডিও টুডের নিউজ শুনে এ খবরটি আমাকে জানালেন। এরপর নির্দিষ্ট সময়ে সকাল ৯-৩০ টার দিকে আমরা ট্রাইব্যুনালে হাজিরা দিতে যাবার সময় বিষয়টি নিয়ে আমার আরো দুজন সাথীর সাথে আলাপ হল, আমি নাম জানতে চাইলাম। মোল্লা সাহেব বললেন ঝিনেদা জেলা তো আমি দেখাশোনা করি, নাম জানলে চিনতাম। আমার বেগম সাহেবের পৈতৃক নিবাস ঝিনেদা। সকালের সাক্ষাতে তাকে এটা জিজ্ঞেস করতেই বলল, একজন তরতাজা যুবকের কথা, তার ডাক নাম 'লালটু' এই নামেই সে পরিচিত। আমার বেগম সাহেবের পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া জায়গায় ওখানকার একজন স্কুল চালাচ্ছে। তার কাছ থেকে ভাড়া আদায়ের দায়িত্ব এক পর্যায়ে এই যুবক ছেলেটাই পালন করতো। তার দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুতে সংগঠন যেমন একজন নিবেদিত প্রাণ কর্মী হারাল, তেমনি আমরা পারিবারিকভাবে হারালাম একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে।

আজ শনিবার ২৩ শে এপ্রিল, সকালে 'জনকণ্ঠ' পত্রিকা পড়ে জানা গেল, আমাদের কর্মপরিষদ সদস্য সাতক্ষীরার সাবেক জেলা আমীর জনাব ইজ্জতুল্লাহ সাহেবকে ফরিদপুর থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি নিছক সাংগঠনিক সফরে ওখানে গিয়েছেন। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ফরিদপুরের জেলা সংগঠনের সাথে ঘরোয়া বৈঠকে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি জানার জন্যেই তিনি ওখানে গিয়েছেন। জামায়াতে ইসলামী এখনও নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন দল নয়। সংসদ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান বাবু সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত জানিয়েছেন '৭১ এর সংবিধান পুনর্বহাল হলেও জামায়াতে ইসলামীসহ সকল নিবন্ধনপ্রাপ্ত ইসলামী দলই থাকবে। তারপর এই রিপোর্ট, সাংগঠনিক সফরে যাওয়ার কারণে একজন কেন্দ্রীয় নেতাকে রাতের আঁধারে গ্রেফতার করা এবং গ্রেফতারের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠার জন্যে পুলিশ কর্মকর্তার পক্ষ থেকে নাশকতামূলক কাজের তথ্য থাকার ভুয়া অজুহাত উপস্থাপন করা, রীতিমত তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। এভাবে সরকার তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্যে মিথ্যা অজুহাত সৃষ্টি করে একের পর এক রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের উপর জুলুম নির্যাতন বাড়িয়েই চলেছে। এই সব উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যে গোটা রাষ্ট্র সংস্থাকে তথ্য সন্ত্রাস ও জঘন্য মিথ্যাচারের যন্ত্রে পরিণত করা হয়েছে। পুলিশের ব্রত দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন। এখন এই পুলিশকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমনের হাতিয়ারে পরিণত করা হচ্ছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্যে সজ্ঞানে তাদেরকে

www.pathagar.com

দিয়ে বিবেকের বিরুদ্ধে মিথ্যা বলানো হচ্ছে, মিথ্যা অভিযোগ তৈরি করানো হচ্ছে। উদ্দেশ্য একটাই, মাঠে যেন সরকারের দেশ ও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কোন কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ করার মত কেউ না থাকে। সরকারের এই ভূমিকা রাষ্ট্রযন্ত্রকে যেমন কলুষিত করছে তেমনি পুলিশ বাহিনীকে দলীয় প্রাইভেট বাহিনীতে পরিণত করছে। এ পরিস্থিতি প্রমাণ করে দেশে কোন গণতন্ত্র নেই। এখন যা চলছে তাকে একদলীয় বাকশালী শাসন ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

আমরা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বলতে গেলে কোন পত্রিকাই পাই না। যে চারটি পত্রিকা আমাদেরকে দিনের দ্বিপ্রহরের দিকে দেয়া হয় সেগুলোর মূল্য কেটে রাখা হয় পিসিতে জমা রাখা আমাদের টাকা থেকেই। আমাদের টাকায় যে পত্রিকা পাই তার কোনটাতেই আমাদের নিজস্ব পছন্দ অপছন্দের কোনই মূল্য নেই। সরকার যে চারটি পত্রিকা জেলখানায় আনার অনুমতি দিয়েছে সে চারটি হল ডেইলী স্টার, জনকণ্ঠ, সংবাদ এবং যুগান্তর। এই চারটি পত্রিকার এক একটির বিল আমাদের চার জনের পিসি থেকে মাসে মাসে কেটে রাখা হয়। বাস্তবে এটা আমাদের টাকায় কেনা পত্রিকা। তারপরও সময়মত পাওয়া যায় না। কোন কোন দিন কোন একটা পত্রিকায় অবাঞ্ছিত খবরের জন্যে গোটা পত্রিকাই জেলকর্তৃপক্ষ আটকে দেন। আবার কখনও কোন কোন খবর কেটে রেখে, কাটা ছাঁটা করে আমাদেরকে দেয়া হয়। আমাদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কোন পত্রিকা জেলখানায় আসার পর থেকে দেখার সুযোগ হয়নি। আল্লাহতায়ালা দেশে এবং দেশের বাইরে আমাদেরকে যতটা মানমর্যাদা দান করেছেন তাতো আমার এই প্রিয় সংগঠন জামায়াতে ইসলামীর জন্যেই। আবার ইসলামের চিহ্নিত বৈরি শক্তির মনে যতটা হিংসা বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছে বা সৃষ্টি করা হচ্ছে আমাদের বিরুদ্ধে, তা এই প্রিয় সংগঠনের তিলে তিলে বেড়ে উঠাকে কেন্দ্র করেই। কিন্তু আজ পর্যন্ত সংগঠনের, রাজধানী শহর থেকে তৃণমূল পর্যায়ের অবস্থা পরিস্থিতি জানার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকাটাই মনঃকষ্টের বড় কারণ। ইজ্জতুল্লাহ সাহেব ফরিদপুরে সফরে গিয়ে রাত্রিযাপন অবস্থায় মিথ্যা অজুহাতে গ্রেফতার হওয়ার এই নেতিবাচক খবরটি জনকণ্ঠ বেশ মজা করে প্রচার করেছে। মিডিয়ার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এবং সরকার ও প্রশাসনের বর্তমান তৎপরতা থেকে মনে হয়, তারা বুঝে নিয়েছে, যুদ্ধাপরাধ অথবা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত করে যাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোন প্রমাণ তাদের কাছে নেই। '৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের শাসন আমলে এদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের কোন থানায় খুন, ধর্ষণ, লুণ্ঠন এবং অগ্নিসংযোগের মত কোন অভিযোগে একটি মামলারও কোন রেকর্ড নেই। ৪০ বছর পর সাজানো ঘটনা, সাজানো সাক্ষী নিয়ে জামায়াতে ইসলামীর মত একটি নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক সংগঠনকে শেষ করে দেয়ার হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই ইতিহাসের জঘন্যতম মিথ্যাচারের আশ্রয় নেয়া হচ্ছে। যা হয়ত শেষ পর্যন্ত হালে পানি নাও পেতে পারে। তাই যেন তেন প্রকারে নাশকতামূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে উগ্র জঙ্গিবাদী মৌলবাদী সংগঠন হিসাবে চিহ্নিত করার অপকৌশল গ্রহণ করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে মিডিয়ার একটি অংশই সরকারকে বেশি উস্কানি দিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের লোকেরা খুব ভাল করেই জানে, জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে কোন সমাজ বিরোধী অপরাধী নেই, সন্ত্রাস ও নাশকতামূলক কাজের সাথে দূরতম কোন সম্পর্কও নেই এ সংগঠনের। তারপরও তারা হয় সরকারের চাপে বিবেকের বিরুদ্ধে জামায়াতকে নাশকতামূলক কাজের সাথে জড়াতে চায়, নতুবা অতিউৎসাহী হয়ে সরকারের আশীর্বাদ পাওয়ার আশায় এরূপ বানোয়াট অভিযোগ সৃষ্টি করে আসছে। ফরিদপুরে ইজ্জতুল্লাহ সাহেবের গ্রেফতার ও গ্রেফতারের কারণ সংক্রান্ত পুলিশ কর্মকর্তার বক্তব্য থেকে একথাই প্রমাণিত হয় সুস্পষ্টভাবে। তবে এই অপকৌশল একদিন সরকারের জন্যে অপরিণামদর্শী পদক্ষেপ হিসাবে প্রমাণিত হলে তাতে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। জনাব ইজ্জতুল্লাহ সাহেবের গ্রেফতারের পর থেকে ভাবছি, গোটা দেশের সংগঠনের নেতাকর্মীরা কী অবস্থায় আছে। আমার মন বলে তারা আমাদের চেয়েও অনেক বেশি মনের কষ্টে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। চোখের সামনে অন্যায় অনাচারের

www.pathagar.com

সয়লাব দেখেও প্রতিবাদের হক আদায় করতে না পারার মর্মযাতনা তাদেরকেই বেশি ভোগ করতে হচ্ছে। আল্লাহ তাদের হেফাজত করুন।

ইতঃপূর্বে জামায়াতে ইসলামীর অন্যতম সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাহেবকে ২৮ শে অক্টোবর গ্রেফতার করা হয় বানোয়াট ও মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে। তিনি মাহফিলে গিয়ে উক্ত মাহফিলে উপস্থিত ১৮ জনসহ গ্রেফতার হন। জামিনে তারা সবাই মুক্ত হয়ে বাসায় যাওয়ার কথা। কিন্তু পুলিশ জেল গেট থেকেই তাদেরকে নিয়ে রাষ্ট্র বিরোধী মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে কেন্দ্রীয় কারাগারে ফিরিয়ে আনে। তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে বলা হয়, তারা নাকি কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে সবাই (আবার বাড়ীতে না গিয়ে) একত্রিত হয়ে মিটিং করেছে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কাজ করার জন্যে। এতবড় নির্জলা মিথ্যা অভিযোগ করতে পুলিশ কর্মকর্তাদের বিবেকে একটুও বাধল না। এথেকেই বুঝা যায় দেশকে একটা বড় রকমের নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে। যাদেরকে পুলিশ ভ্যানে জেল গেট থেকে সোজা মীরপুর থানায় রাখা হল, তারা কিভাবে কোথায় গিয়ে রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা গ্রহণের জন্যে মিটিং করল? এই প্রশ্নতো ন্যূনতম বিবেক বুদ্ধি যাদের আছে তাদের সকলের মনেই জাগার কথা। আদালতে দাঁড়িয়ে পুলিশ কর্মকর্তা এই নির্জলা মিথ্যা প্রতিবেদন পেশ করে তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা সম্মানিত রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে পুনঃ গ্রেফতারের প্রস্তাব রাখলেন। তার মধ্যে ন্যূনতম লাজলজ্জাও ছিল না। এতবড় মিথ্যা মামলা সাজাতে যাদের একটু লজ্জাবোধ হয় না, তাদের হাতে দেশের মানুষের জানমাল ইজ্জত আবরুর হেফাজত বা নিরাপত্তা কি আদৌ সম্ভব?

এ ধরনের মিথ্যাচারের ভিত্তিতে আজ যারা জুলুম নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, যা বলতে গেলে সীমালংঘনের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। এমন মিথ্যাচারীর জন্যে আল্লাহর ঘোষণা রয়েছে সুস্পষ্ট, লানাতুল্লাহ আলাল কাজেবীন। মিথ্যাবাদীদের উপরে পতিত হোক অভিশাপ। মজলুমের হৃদয়ের কান্না অন্তরের ফরিয়াদ একদিন আল্লাহর আরশে পৌঁছবেই।

গতকাল মুহতারাম মাওলানা সাঈদী সাহেবের এনবিআরের মামলায় কোর্টে হাজিরা ছিল। ফিরে এসে জানালেন আগামী মাসের (জুন) ২৫ তারিখ পুনরায় দিন ধার্য করা হয়েছে। এছাড়া তিনি আমার শুভাকাঙ্ক্ষীদের বরাত দিয়ে একটি সতর্ক বার্তা জানালেন। রিমান্ডে যেদিনই নিক আমি যেন ওখানে অবস্থান কালে তাদের পরিবেশিত কোন খাবার না খাই। এমন কি এক ফোটা পানিও পান না করি। নিজের জন্যে প্রয়োজনীয় পানি এবং শুকনো খাবার সাথে নিয়ে যাওয়াই ভাল হবে। বার্তাটা দুশ্চিন্তার মাত্রা একটু হলেও বাড়িয়ে দিল। আসলে যারা আমাদেরকে মিথ্যা বানোয়াট কাহিনী বা নাটক সাজিয়ে ১০ মাস কারাগারে আটকিয়ে রেখেছে তাদের নিয়ত ভাল কি মন্দ ব্যাপারটি আলেমুল গায়েব আল্লাহই ভাল জানেন। তবে এ পর্যন্ত তাদের আচার আচরণে যা প্রকাশ পেয়েছে তা থেকে একটি গভীর ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদ ইতঃপূর্বে হয়েছে। এবারেও কারো কারো হয়েছে। আমাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়ে পাল্টালেন কেন? এ থেকে এমন সন্দেহ তো হতেই পারে।

জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপারে আমার মনে কোন দুর্বলতা নেই। ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের একাংশে বলা হয়েছে, জেল কর্তৃপক্ষ যেন সকাল ১০ টায় তাদের কথিত সেফ হোমে ধানমন্ডির নির্দিষ্ট বাড়িতে, আমাকে পৌঁছানোর এবং বিকেল ৫ টায় জেলগেটে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে। তারা কোন দিন কোন তারিখে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, তাও আমাদের আইনজীবীকে জানাবে ৪৮ ঘণ্টা আগে। আইনজীবী ৪৮ ঘণ্টা আগে জানবে বটে কিন্তু আমি জানব কিভাবে, বা আমাকে জানানো হবে কিভাবে তা বলা হয়নি। তবে ইতঃপূর্বে দেখেছি রিমান্ডের জন্যে নিয়ে যাওয়ার স্কোয়াড হঠাৎ করে এসেই হাজির হয়। তবে এবার তো সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। ট্রাইব্যুনাল চেয়ারম্যানের নির্দেশনা হল

www.pathagar.com

১০টায় পৌঁছানোর ও ৫টা ফেরত আনার দায়িত্ব জেল কর্তৃপক্ষের। অতএব জেল কর্তৃপক্ষকে তারিখ জানালেই তারা প্রস্তুতি নেবে। প্রস্তুতির অংশ হিসাবে আমাকেও জানানোর কথা।

আমি প্রতিদিন সকালের গোসল নাস্তা সেরে ১০টা পর্যন্ত, এমন কি কখনও ১০-১৫ টা ১০-৩০ টা পর্যন্ত অপেক্ষা করি। কোন আলামত দেখা না গেলে নিজের মনকে কোন কাজে নিয়োগ করার বা ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করি। ২০০৮ এ ডান হাতের আংগুলে দরজার চাপে যে আঘাত পেয়েছিলাম, তার জের এখনও কাটেনি। তাই লিখতে চাইলেও লিখতে পারি না। খুবই কষ্ট করে লেখাটা চালু করার জন্যে মনে যা আসে তাই লিখে হাতটাকে লেখার উপযোগী করার জন্যেই মাঝে মধ্যে হাফ পাতা লেখার চেষ্টা করি। হাতের লেখার শক্তিটা প্রায় ফেরার পথে। কিন্তু লেখার মূল প্রাণশক্তি মনের পরিকল্পনা বা ভাব, যা মুখে বা কলমে প্রকাশ পাওয়ার কথা। এবারে জেলে আসার পটভূমি সম্পূর্ণই ভিন্ন। দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়াই প্রতিহিংসার আগুনে উত্তপ্ত। এই পরিস্থিতিতে মিডিয়ার একাংশের স্নায়ুযুদ্ধের শিকার আমরা। এমন পরিবেশ পরিস্থিতিতে যেন লেখা পড়া কোনটাতেই কেন যেন আমি মন বসাতেই পারছি না। শুধু তেলাওয়াতে কোরআন, নামাজ এবং দোয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারছি না। তাছাড়া এবারের দশ মাসের অধিকাংশ সময়টাই আমার কাটে অসুস্থতায়।

২০০৯ এর ৩১ শে জুলাই রাতে ঘুমাতে পারিনি চরম মাথা ব্যথার কারণে। পরের দিন দিনব্যাপী মজলিসে শূরা যে কিভাবে পরিচালনা করেছি তা আল্লাহ ছাড়া আর কারো জানা নেই। ঐ দিনের পর সিটি স্ক্যানে ধরা পড়ে হালকা ধরনের একটা ব্রেইন স্ট্রোক হয়ে যাওয়ার প্রমাণ। ডান হাত আর ডান পাটা তখন থেকেই আধা অবশ। এজন্যে চিকিৎসাধীন ছিলাম। প্রথমে প্রতিদিন এরপর একদিন পরপর ফিজিওথেরাপি নিচ্ছিলাম। জেলে এসে জেল কর্তৃপক্ষকে, ডিবিতে রিমান্ডে থাকা অবস্থায় পুলিশ হাসপাতালের ডাক্তারকে এবং কেন্দ্রীয় কারাগারের ডাক্তারদের মাধ্যমে পিজির ডাক্তারদেরও আমার স্বাস্থ্যগত অবস্থা জানানো হয়েছে। পিজির পক্ষ থেকে দুবার ডাক্তার এসে আমাকে দেখে গেছেন। তাদের ব্যবস্থাপত্র মতে একটানা তিন মাস ওষুধ খেয়ে তেমন কোন অগ্রগতি অনুভব করিনি। অবশ্য পরবর্তী পর্যায়ে, দেশবরেণ্য কার্ডিওলজিস্ট অধ্যাপক সজল ব্যানার্জি আসেন একজন ফিজিক্যাল মেডিসিনের ডাক্তারকে সাথে নিয়ে। তার ব্যবস্থা পত্র মতে ওষুধ খেয়ে কিছুটা আরোগ্য অনুভব করছি। তবে আমার মূল প্রয়োজন যে ফিজিওথেরাপির, তার কোন ব্যবস্থাই করা যাচ্ছে না। ফিজিক্যাল মেডিসিনের ডাক্তার ৬টি ব্যায়াম শিখিয়েছিলেন আগেও। এবারে তার সাথে আরো একটা ব্যায়াম যোগ করে গেলেন। জেলের পরিবেশে যারা ইচ্ছা করে তারা খুব ভাল ভাবেই শরীরচর্চা করতে পারে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, ছোট বেলা থেকেই শরীরচর্চামূলক কাজের অভ্যাস গড়ে তুলতে পারিনি। এখন প্রচুর অবসর সময় থাকা সত্ত্বেও কেন যেন ব্যয়ামগুলো নিয়মিত করা হয়ে উঠে না।

২৫ শে এপ্রিলের বেশ কয়েকটি পত্রিকায় আওয়ামী লীগের মাদারীপুর জেলার রাজৈর উপজেলার দুই গ্রুপের রক্তক্ষয়ী সংঘাতের রিপোর্ট ছাপা হয়। সচিত্র প্রতিবেদন ছাপা হয় দৈনিক যুগান্তরে এমনকি ডেইলী স্টার এর মত পত্রিকাতেও। যে দলটি এখন ক্ষমতায়, তাদের নিজেদের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার নিয়ে, চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজি নিয়ে এধরনের সংঘাত সংঘর্ষ নতুন কোন ঘটনা নয়। '৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত যখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় তখনও তাদের অংগ সংগঠন ছাত্রলীগের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে ঘটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭ জন ছাত্রলীগ কর্মীর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। আওয়ামী লীগ এবারে ক্ষমতায় এসে টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি ও উপদলীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায়, অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি সংঘাত সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে, যা কোন শাসক দলের জন্যে কোন অবস্থাতেই মানানসই হতে পারে না। মাদারীপুরের রাজৈরে, আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের একে অপরের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অবস্থানের, যে ছবিটি যুগান্তর ও ডেইলী স্টারে ছাপা হয়েছে, তা শাসকদলের নেতাকর্মীদের বীভৎস চরিত্রকেই উন্মোচিত

www.pathagar.com

করেছে। যারা শাসন ক্ষমতায় গিয়ে নিজেরাই এভাবে সংঘাত ও সংঘর্ষে লিপ্ত, তারা দেশ চালাবে কিভাবে? তাদের কাছে সুশাসনের আশা করা আদৌ কি সম্ভব?

আজ ২৭ শে এপ্রিল, আবার আমাদের জেলখানার পত্রিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের খবর চোখে পড়তেই মনটা আঁতকে উঠল। পরশু দিন দেখলাম, মাদারীপুরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শাসকদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের লোমহর্ষক দৃশ্য। আজকের পত্রিকায় আসল দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আবাসিক হলে শাসকদলের ছাত্র সংগঠনের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের খবর। সে সংঘর্ষেরও মূল কারণ উপদলীয় কোন্দল এবং প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার লড়াই। এ লড়াইতে দেশীয় অস্ত্রের সাথে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার এবং বোমাবাজির উল্লেখ হয়েছে আমাদের কাছে আসা সবকটি পত্রিকাতেই। এরপরও কি আমাদের দেশের সুশীল সমাজ বলতে চান দেশ বেশ ভালই চলছে? বিশেষ করে সুশীল সমাজের যে অংশটি চার দলীয় জোট সরকারের সময় কথায় কথায় জ্ঞান বিতরণ এবং সুশাসনের উপদেশ দিতেন ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তেন সোচ্চার কণ্ঠে, গোলটেবিলে আর টক শোর নামে অকাতরে ব্যবহার করতেন ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্টিং মিডিয়াকে, আজ কোন রহস্যজনক কারণে তারা নীরব ভূমিকা পালন করছেন, অন্য কথায় সরকারের বিভিন্ন অংগ সংগঠনের চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ও প্রাধান্য বিস্তারের জন্যে সংঘাত সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়াকে তারা তেমন কিছু নয় বলে উড়িয়ে দিচ্ছেন। নাকি এই পথ ধরে গণতন্ত্রের উপর আবার যদি আঘাত আসে, ঘটে যায় তথাকথিত ১/১১ এর মত কোন ঘটনা দুর্ঘটনা, তাহলে তাদের ভাগ্যে ক্ষমতার হালুয়া রুটির কোন অংশ মিলে যেতে পারে, এমন কোন স্বপ্নে বিভোর হয়েই এই সব অপকর্মের সম্পর্কে তারা নীরব আছেন। অথবা নীরবে এর পেছনে সমর্থন যুগিয়ে যাচ্ছেন। জেলখানায় বসে নির্দিষ্ট কয়েকটি পত্রিকাই পড়ার সুযোগ পাই। সরকারী দলের চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ও প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্যে হানাহানি সংঘাত সংঘর্ষের ঘটনার পাশাপাশি ইভটিজিং বা মেয়েদের হয়রানির ঘটনা অতীতের যে কোন সময়ের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। বরং উত্তরোত্তর আরো আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাখাটেদের এই বখাটেপনা আওয়ামী আমলে হঠাৎ এ পর্যায়ে কেন বৃদ্ধি পেতে পেতে সকল সীমা ছাড়িয়ে গেল? এর প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিজের মেয়ে, বোন, ভাগ্নে, ভাতিজী, নাতি-নাতনীদের সম্ভ্রম রক্ষার জন্যে প্রতিবাদ করায় কত মেয়ের বাপ, ভাই, বা দাদা, নানা, চাচা, মামাকে জীবন দিতে হচ্ছে? কত মেয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে? তথাকথিত সুশীল সমাজকে এখানেও আমরা নীরব দেখতে পাচ্ছি। এমনটি কেন হচ্ছে, হতে পারছে, এর সামাজিক পারিপার্শ্বিক কারণসমূহ উদঘাটনের জন্যে দেশের সমাজ বিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে গবেষণামূলক কিছু দিক নির্দেশনাও আসতে হবে। সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক কারণের সাথে শাসক গোষ্ঠীর নৈতিক ও চারিত্রিক কোন প্রভাব প্রতিক্রিয়া এমন সব অবাঞ্ছিত ঘটনার পেছনে কাজ করছে কিনা, তা ভেবে দেখার দাবি রাখে বলে আমি মনে করি।

গতকাল বৃহস্পতিবার ছিল সাপ্তাহিক সাক্ষাতের নির্ধারিত দিন। এই একটি দিনের জন্যে সপ্তাহব্যাপী প্রতীক্ষায় থাকতে হয়। অনেকের মুখেই শুনেছি, এই একটি সপ্তাহ প্রায় এক বছরের মত মনে হয়। নির্ধারিত এই দিনের সকাল থেকে প্রতীক্ষার পালা শুরু হয়। সাক্ষাতকারীগণ, সাধারণত ১১ টা ১১-৩০ টার মধ্যেই এসে যায়। গতকাল ১১-৩০ টা পার হল ১২টা প্রায় বাজেবাজে, এখন পর্যন্ত কোন খবর না পেয়ে বেশ অস্থিরতায় পেয়ে বসে। কারণ, আমি জেনেছিলাম ঐ দিনই রাতে তালহার ফ্লাইট। ঠিক ১২টায় স্লিপ আসল। কিন্তু স্লিপ যে নিয়ে আসল তার পক্ষ থেকে বলা হল, স্যার আপনি প্রস্তুত হয়ে থাকেন। ১২টা তো গুণতির সময়। গুণতি হয়ে গেলেই সি,আই,ডির লোক এসে নিয়ে যাবে। সোয়া বারোটায় সি,আই,ডি লোক আসলে রওয়ানা দিলাম। এবারে অবশ্য আমার পৌঁছার আগেই পরিবারের লোকেরা সাক্ষাতের নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত। সাক্ষাতের প্রথমেই জানলাম তালহার ফ্লাইট পরবর্তী বৃহস্পতিবারের দিনগত রাতে। সে আগামী বৃহস্পতিবারের সাক্ষাতেও আসতে পারবে। শুনে ভালই

www.pathagar.com

লাগল। এবারের সাক্ষাতেও যা বলতে চেয়েছিলাম সব বলা হল না। এবারে অবশ্য আধা ঘণ্টা সময়ের কিছু অতিরিক্ত হলেও কেউ কিছু বলেনি। তবে আমি নিজেই বিদায় নিলাম ও বিদায় দিলাম। রিমান্ডের জন্যে নির্দিষ্ট তারিখটা আমার আইনজীবী ৪৮ ঘণ্টা আগে জানবে। আমি কখন কিভাবে জানবো? ছেলেকে বিষয়টি বলতে কেন যেন ভুলেই গেলাম। যা হোক সবাই আমাকে সাহস ও সান্ত্বনা দিয়ে বিদায় হল। সেই সাথে সকলে মিলে অনুরোধ করে গেল রিমান্ডের সময় ওদের দেয়া কোন খাবার যেন না খাই। এক ফোটা পানিও যেন না খাই। এমনকি, কোন ওষুধও যেন না খাই।
সাক্ষাৎ থেকে ফিরে এসে, কাপড় পাল্টে অজু করে নামাজের জন্যে প্রস্তুতি নিতে নিতে, এই প্রথম এখানে জামায়াত ধরতে ব্যর্থ হলাম। এখানে জোহর পড়া হয় দুপুর ১-১৫ মিঃ এ। সাক্ষাৎ শেষে রুমে পৌঁছাই ০১-০৬ মিনিটে। ১০ মিনিট দ্রুত পার হয়েছে টের পাইনি। ঘড়ির দিকেও তাকানো হয়নি। আজ আমাকে কেউ, জামায়াত দাঁড়িয়ে যাচ্ছে মর্মে ডাকও দেয়নি। জামায়াতের নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দেখি ঘড়িতে ১-৩০ মিনিট বাজে। অর্থাৎ জামাত শেষ হয়েছে। আমি রুমে ফিরে এসে একা একাই জোহরের নামাজ আদায় করে দুপুরের খাবারের জন্যে তৈরি হই। এখানে ২৬ সেলের অন্যান্য সাথীদের সাথে মাঝে মধ্যে সবারই সুখ দুঃখের আলোচনায় সময় কাটে। কখনও সামষ্টিকভাবে খাবার টেবিলে, পত্রিকা পড়ার সময়, কেউবা হাঁটাহাঁটির সময়ও আলোচনা করে থাকে। সাক্ষাৎ শেষের অনুভূতি নিয়েই আসরের নামাজের পর বারান্দায় সবাই বসে পত্রিকা দেখছি। ফাঁকে ফাঁকে আমাদের এক সাথির (জেলে যার অভিজ্ঞতা প্রায় ৪০ বছরের) সাথে কথা শুরু হল। তিনি আমাকে তার ফাঁসির সেলে আড়াই বছরের অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে আমাকে একটি তথ্য বললেন, বেশ দরদ ভরা মন নিয়ে। তথ্যটি হল, প্রতি বছরে ২৫ শে ডিসেম্বরে খ্রীষ্ট সমাজের বড় দিন উপলক্ষে, ফাঁসির সেলের প্রত্যেক আসামীর নামে নামে কিছু ফলমূলসহ খাবার পাঠানো হয়। কিন্তু বছরের দুটো ঈদের দিন কোন ইসলামী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেই এদের কোন খোঁজ-খবর নেয়ার বা কিছু খাবার পাঠানোর কোন ব্যবস্থা করতে আমি দেখি নাই। এই দুঃখজনক অবস্থার যেন পরিবর্তন হয়, এমন একটি আশাবাদ নিয়েই তিনি আমাকে কথাটা বললেন। আমি আল্লাহর কাছে তৌফিক চাই, আল্লাহ যেন এই দুঃখ বোধ দূর করার সুযোগ দেন।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অনুভূতি- ০২

৫ই মে রোজ বৃহস্পতিবার আমাকে ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ধানমন্ডিতে তাদের সেফ হোমে যেতে হয় জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে। আইনজীবীর পাশে থাকার কথা, কিন্তু তার কোন ভূমিকা রাখার সুযোগ ছিল না। আমাকে ওখানে সকাল ১০ টায় পৌঁছানোর কথা। সকাল ৬ টায় ২৬ সেলের মেট-কে খবর দেয়া হয় ৬-৪৫ ঘঃ অর্থাৎ পৌনে সাতটায় যেন আমি তৈরি হয়ে থাকি। আমরা সাধারণত এখানে ২৬ সেলে সকালে ৯টার দিকে নাস্তা করি। ১০ টায় পৌঁছতে হলে এখান থেকে ৯ টার দিকে রওয়ানাই যথেষ্ট হতে পারত। আমাকে তাড়াহুড়ো করে গোসল এবং নাস্তা সেরে ৭-৩০ টার দিকে জেল গেটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করতে হল। ৭-৩০ মিনিটে আমাকে নিয়ে প্রিজন ভ্যান ধানমন্ডির উদ্দেশে রওয়ানা করে ৮-৩০ টায় নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাল। আমাকে একা একা ৮-৩০ থেকে ১০ টা পর্যন্ত বসে থাকতে হল। ৯ টার দিকে বা কিছু পরে আমার আইনজীবী তাজুল ইসলাম সাহেবকে সামনের রুমে গ্লাসের মধ্য দিয়ে বসা দেখলাম। ১০ টার একটু আগে সমন্বয়ক সাহেব আমাকে বললেন আপনার আইনজীবীকে সব বলা হয়েছে। উনি আপনাকে পরামর্শ দেবেন। আমি জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে নির্দিষ্ট রুমে যাওয়ার আগে আইনজীবীকে এব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন শুধু সময়সূচি বলা হয়েছে। ১০টা থেকে ১-৩০ পর্যন্ত এটা জিজ্ঞাসাবাদ চলবে। এরপর ৩০ মিনিটের বিরতি হবে নামাজ ও খাবারের জন্যে, আবার ২ টা থেকে শুরু হবে। আমার আইনজীবী রুমটি দেখার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। কিন্তু তাকে রুম দেখার অনুমতি

www.pathagar.com

দেয়া হয়নি। দুপুরে খাবার সময় আইনজীবীকে বলা হল জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে তিনি আমার কাছ থেকে কিছু জানতে চাইতে পারবেন না। জিজ্ঞাসাবাদের শুরুতে '৭১ এর পঁচিশে ডিসেম্বরের গণহত্যার দৃশ্য এর ভিডিও দেখানোর সময় রুমের বাইরে থেকে এসে হঠাৎ সম্ভবত টিমের প্রধান, ধমকের সুরে আমাকে বললেন এগুলো কী? আমার কাছে এটাকে থ্রেট মনে হলেও আমি তেমন কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিনি। দুপুরে আইনজীবীকেও এটা বলতে যাইনি। কারণ যিনি থ্রেট করছিলেন তিনি ৩ বার আমাদের দুজনেরই সামনে বললেন।

নামাজ ও খাবারের বিরতির পর, আরেকজন সিনিয়র ব্যক্তি খুবই কড়া গলায় রাগের স্বরে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন এককথায় জবাব দিন, হিটলার বা মুসোলিনী কি নিজে হাতে কাউকে খুন করেছিল? আমি মৃদু স্বরেই বললাম, তাদের সাথে কি আমার কোন তুলনা হতে পারে? আমি এটাকে আমার প্রতি থ্রেট মনে করি। কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা সমীচীন মনে করিনি। তিনি একটানা আমাকে লক্ষ্য করে বললেন "আপনার কি লজ্জা করে না? আপনার পিতা বেঁচে থাকলে কি লজ্জা পেতেন না। আপনার ছেলে মেয়েরা কি আপনাকে ঘৃণা করে না, নাকি তারাও আপনার মতই বেশরম?" ইতঃপূর্বেকার থ্রেটের পর্যায়ের কথায় আমার মনে প্রতিক্রিয়া না হলেও এই কথাটা হজম করা আমার পক্ষে ছিল খুবই কঠিন ব্যাপার। এরপরও শুধু এতটুকু বলেছি ছেলেমেয়েরা আমাকে নিকট থেকে যেভাবে দেখে আসছে, তাতে তাদের পিতার বিরুদ্ধে প্রচারিত অপপ্রচার তারা বিশ্বাস করতে পারে না। লোকটার অসৌজন্যমূলক ও অভদ্রজনিত কথার জবাব দেবার আমার রুচি ছিল না। কিন্তু তার প্রতিউত্তরে আমার বলার ছিল অনেক কিছুই। তার প্রথম প্রশ্নেই আমি নিশ্চিত হয়েছি আমার বিরুদ্ধে তাদের কাছে সরাসরি কোন মানবতাবিরোধী অপরাধের প্রমাণ নাই, তাই আমাকে হিটলার মুসোলিনীর পর্যয়ে নিয়ে যেতে চায়; যার কোন যৌক্তিকতাই থাকতে পারে না।

ওখান থেকে বিদায়ের আগে জোহরের অজু ছিল বিধায় দ্রুত আসরের নামাজটা সেরে বাইরের রুমে আসি। আমার আইনজীবী তখন টিম লিডারকে বলেন পাঁচটায় তো জেলখানায় পৌঁছিয়ে দেবার কথা। টিম লিডার নির্ভয়ে বললেন জেলের কাস্টোডি এখানে উপস্থিত, ওদের কাছে সোপর্দ করলেই হবে। তাও কিন্তু ৫-১৫ এর বেশি সময় পার হয়ে গেছে। এখানেও আইনজীবী কিছু জানতে চাইলে, টিম লিডার বলেন, জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে কোন আলোচনা করা যাবে না। তবুও আমি টিম লিডারের সামনেই গালি দেবার বিষয়টি খুব সংক্ষেপে এভাবে তুলে ধরি। মোটামুটি পরিবেশ ভালই ছিল, কিন্তু একজনের কথা আমার খারাপ লেগেছে। তিনি বলেছেন, আপনার কি লজ্জা করে না, ছেলে-মেয়েরা কি আপনাকে ঘৃণা করে না, না তারাও আপনার মতই বেশরম! টিম লিডার আমার কথাটি ভালভাবে শুনেছেন, না কি অন্য দিকে তার মন ছিল, এটা তিনি জানেন, আর জানেন আলেমুল গায়েব আল্লাহ।

আমার সাপ্তাহিক সাক্ষাতের নির্ধারিত দিন বৃহস্পতিবার। আর এই দিনেই ছিল জিজ্ঞাসাবাদ, তাই পরিবারের সদস্যদের পক্ষ থেকে জেল কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ করে, বুধবারে একদিন আগে, দেখা করতে এসে জেল গেটে দুঘণ্টা অপেক্ষা করে চলে যায়। বৃহস্পতিবারের পরিবর্তে পরের দিন শুক্রবারে অবশ্য সাক্ষাতের সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু আমার ছোট ছেলে তালহা বৃহস্পতিবারের দিবাগত রাতের ফ্লাইটে মালয়েশিয়ায় চলে যায়। সে ওখানে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র; তার অনার্স পরীক্ষা চলছে। মাঝখানে একটু সময় পেয়ে চলে এসেছিল দেখা করার জন্যে। তার সাথে একদিন ট্রাইব্যুনালে দেখা হয়, আর দুই বৃহস্পতিবারে জেল গেটে এসে দেখা করার সুযোগ পায়, পরিবারের সবার সাথে এসে। শেষ দিন সেফ হোমে যাওয়া না লাগলে বিদায়ী সাক্ষাতের জন্যে আসতে পারে। এরকম অবস্থায় জেল কর্তৃপক্ষ সাধারণত মানবিক দৃষ্টিতে বিবেচনা করে থাকে। ইতঃপূর্বে আমাদের এক ভায়ের ছেলে বিদেশে যাবে ফলে দরখাস্ত করায় সাক্ষাৎ নির্দিষ্ট দিনের একদিন আগে করতে দেয়া হয়েছিল। আমার ছোট ছেলেটা বিদেশে যাবার আগে, জেল গেটে ২ ঘণ্টা অপেক্ষা করেও সুযোগ পেল

www.pathagar.com

না। কেন এটা যেমন আমার বুঝে আসে না, তেমনি এই কষ্টটাও ভুলতে পারছি না। অন্যদের জন্যে যে সুযোগ জেল কর্তৃপক্ষ দিতে পারলেন, ফোনে আলাপের প্রেক্ষিতে আসতেও বললেন, অথচ এভাবে ফিরিয়ে দিলেন কেন? এ প্রশ্নটা মনের মাঝে একটি বিষাক্ত কাঁটার মত বিদ্ধ হয়ে থাকল।

সেফ হোম থেকে আমি জেলগেটে এসে পৌঁছেছি "আফটার লক আপ"। এমনকি আমি রুমে পৌঁছে অজু করে মাগরিবের জামায়াত ধরতে পারিনি। অথচ আমার পরে ৮ই মে আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ সাহেব, ১০ই মে সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী সাহেব, ১২ই মে সাঈদী সাহেব সেফ হোম থেকে ফিরে এসেছেন মাগরিবের নামাজের এবং 'লক আপের' বেশ আগে। অথচ জিজ্ঞাসাবাদ যারা করেছেন তারা দাবি করছেন আমাকে নাকি তারা কোর্টের দেয়া সময়ের মধ্যেই ছেড়েছেন। আমার আসরের নামাজ পড়ার জন্যেই নাকি এতটা বিলম্ব হয়েছে। অথচ একটু আগে বলেছি, আসরের নামাজের জন্যে আমার আর অজু করতে হয়নি। অতএব জিজ্ঞাসাবাদ শেষে, চেয়ার থেকে নেমেই জায়নামাজে দাঁড়িয়ে, চার রাকাত নামাজ আদায় করতে কত মিনিট সময় লাগতে পারে, যেকোন নামাজী ব্যক্তির পক্ষেই এটা অনুমান করা সহজ।

"আমাকে নিয়ে কোথায় যেন কি একটা ব্যাপার আছে"

আমি ১৯৯২ সাল থেকে সায়েটিকার রোগী। তদুপরি ২০০৯ সালের ৩১ জুলাই রাতে আমার মৃদু ব্রেইন স্ট্রোক হবার ফলে ডান হাত ডান পা আধা অবশ। বিগত দুবছর আমি কিছুই লিখতে পারিনি। এখনও লিখছি অতি কষ্টে। ২/৩ পৃষ্ঠা লিখতেই ডান হাতের আংগুলগুলো বেঁকে আসে এবং বেশ ব্যথাও করে। ২০১০-এর ২৯ জুন পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে একদিন পর পর ফিজিওথেরাপি নিচ্ছিলাম। ২৯ জুন ২০১০-এর বিকেলে ডিবি কর্তৃক গ্রেফতার হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত আর ফিজিওথেরাপি ব্যবস্থা হয়নি। কোর্ট অর্ডার সত্ত্বেও হয়নি। আমার প্রধান আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক সাহেব জেল কর্তৃপক্ষকে নিজে জানিয়ে আসার পরও ফিজিওথেরাপির কোন ব্যবস্থা হয়নি। বিগত কোরবানীর ঈদের দুই সপ্তাহ আগে থেকে, ডান পায়ের হাঁটু ও গোড়ালীতে অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণা শুরু হবার পরে, ডাক্তার কুদ্দুস বাবু (আমাদের এলাকার লোক) পিজিতে লেখার পরে, দুইবার পিজি থেকে ডাক্তার এসে কিছু ওষুধ দিয়ে যায় এবং কিছু ব্যায়াম শিখিয়ে যায়। কিন্তু ফিজিওথেরাপির বিষয়টি আমলে নেয়নি।

গত এপ্রিল মাসের ২০ তারিখে আমাদের পাঁচ জনকেই ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। একদিন শুধু সাঈদী সাহেবের বিষয়ই আলোচনা হয়। তার জামিনের আবেদন নাকচ করে নিজ খরচে বারডেমে চিকিৎসার অর্ডার দেয়া হয়। আর আমাদের চার জনের জন্যে ২১ শে এপ্রিলে পুনরায় ট্রাইব্যুনালে হাজির হতে বলা হয়। ঐদিন জিজ্ঞাসাবাদের ব্যাপারে ট্রাইব্যুনালের প্রথম আদেশ পরিবর্তন করার সিদ্ধান্তটি রিভিউ করা হয়। প্রসিকিউশন থেকে ওয়াদা করা হয় তাদের সাথে সেফ হোমে সম্মানজনক আচরণ করা হবে। অতএব, সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন নেই। জামিনের ব্যাপারেও মাওলানা সাঈদী সাহেবের আবেদন যে ভাষায় নাকচ করা হয়, সেই একই ভাষায় আমাদের বিষয়টাও নাকচ করা হয়। তবে চিকিৎসার ব্যাপারেও অভিন্ন সিদ্ধান্ত দেয়া হয় অর্থাৎ নিজ খরচে বারডেমে চিকিৎসা করানো যাবে।

২০ শে এপ্রিলে সাঈদী সাহেবের জন্যে বারডেমে চিকিৎসার অর্ডার এলেও তিনি বারডেমে চিকিৎসার জন্যে যাওয়ার প্রথম সুযোগ পান ১৪ই মে তারিখে। আর আমার ও আমাদের ব্যাপারে মাত্র ১ দিনের ব্যবধানে নেয়া সিদ্ধান্ত নাকি এখনও জেল কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছায়নি। এ ব্যাপারে দায়িত্ব প্রাপ্ত একজন ডেপুটি জেলার থেকে জানা গেল, আমার ব্যাপারে অর্ডারের ফটো কপি তারা পেয়েছে। মূল কপি অফিসিয়ালি তারা এখনও পায়নি। তার মুখে শুনলাম কোর্ট অর্ডারের কপি আইনজীবীকে দেয়া হয়েছে। আইনজীবীর পক্ষ থেকেই তাদের কাছে এসেছে। আমাদের আইনজীবী একই ব্যক্তি, আমাকে এবং সাঈদী সাহেবকে তার এক ও অভিন্ন দৃষ্টিতেই দেখার কথা। এর ব্যতিক্রম হতেই পারে না। অথচ আমার ব্যাপারে ট্রাইব্যুনালের অর্ডার আসতে এত অস্বাভাবিক দেরি কেন হচ্ছে, এর বাস্তবসম্মত কোন যুক্তি খুঁজে

www.pathagar.com

পাচ্ছি না। একেকবার মনে হয়, আল্লাহ পরীক্ষায় ফেলেছেন, যা কিছু বলার একমাত্র তাঁর কাছেই বলি। এদের কাছে বার বার সমস্যার কথা বলেও যখন কোন লাভ হয় না, তখন আর এদের কাছে কোন সমস্যার কথা, অসুবিধার কথা বলার দরকার নেই। এটা আত্মমর্যাদায়ও দারুণ আঘাত হানে। শারীরিক কষ্টের উপরে মানসিক কষ্ট বৃদ্ধির কারণ ঘটায়, যা আমার জন্যে অধিকতর কষ্টদায়ক ও অসহনীয়। হযরত ইয়াকুব আলাইহি সালাম-এর ভাষায় বলতে হয়।

"আমার দুঃখ, ব্যথা বেদনার ও দুশ্চিন্তা কেবল মাত্র আল্লাহর কাছেই পেশ করি, আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে নয়।"

এখানে মানবিকতার কোন মূল্য নেই। যারা আইন মানে ভদ্র ব্যবহার করে, তাদেরকেই বেশি ছোট নজরে দেখা হয়। তাই বলে আমরা আমাদের চরিত্র ও নীতি নৈতিকতা পাল্টাতে চাই না। গতকাল ২২ শে মে তারিখে সুবেদারের মাধ্যমে জেল সুপার অথবা জেলারের সাথে দেখা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলাম। উনাদের অফিসে ডাকলে, সেখানেই যাব, আর যদি উনারা দয়া করে এসে দেখা করেন, তাহলে তো আরো ভাল। তবে আমি উনাদের অফিসে গিয়েই দেখা করতে চাই। তাদের সাথে কী আলাপ করতে চাই, তা সম্ভবত নিজেরাও জানেন। তাই দুই অবস্থার কোন একটাতেও তাদের সাড়া, এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। সাধারণত তারা এ ধরনের কোন প্রস্তাবেই সাড়া দেন না। অন্তত ১১ মাসের কারা জীবনে এটাই আমার তিক্ত অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধি। চিকিৎসার বিষয়ে যে ডেপুটি জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত, তাকেও সাক্ষাতের জন্যে আসতে মেসেজ দেয়া হয়েছিল। তিনিও সাড়া দেননি। অবশ্য উনি ইতঃপূর্বে একদিন এসেছিলেন, কিছু তথ্য দিয়েছিলেন। আমার সাক্ষাতের দিন ছেলের সাথে আলাপ করে উক্ত তথ্যের সত্যতা পাওয়া যায়নি। একই আদালতে একই আইনজীবী অথচ একজনের কাগজ আসার দুই সপ্তাহ পরেও আমার কাগজ কেন আসছে না, বুঝতে আসলেই কষ্ট হচ্ছে। এ ব্যাপারে আলাপের জন্যে একজন ডাক্তারকে আসার জন্যে বলা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় কারাগারের হাসপাতালের সহকারী সিভিল সার্জন ডাক্তার শামসুদ্দীন সাহেব অবশ্য বেশ আন্তরিকতার সাথেই দেখা করে বিষয়টি বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলেন। তার কথার সার নির্যাস হল, কোর্ট থেকে মেসেঞ্জারের মাধ্যমে অথবা ডাক যোগে কোর্টের অর্ডারটি সরাসরি জেল কর্তৃপক্ষের কাছে আসতে হবে। মাওলানা সাঈদী সাহেবেরটি নাকি সেভাবেই এসেছে। কিন্তু আমারটা দুই সপ্তাহ পরেও আসেনি। আসলেই উনারা ব্যবস্থা নেবেন। আমি বিষয়টি ইতঃপূর্বেও আমার পরিবারের সদস্যদেরকে জানিয়েছিলাম। আগামী সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত এবিষয়ের অগ্রগতি জানার জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া আমার জন্যে আর কোন পথ খোলা নেই। চলমান ফিজিও থেরাপি এক বছর যাবত বন্ধ আছে, কাউকে বলেও কিছু হচ্ছে না। এখন আর এ সমস্যার কথা, কাউকেই বলতে ইচ্ছে হয় না। আল্লাহর কাছে আমার সব সময়ের এ ফরিয়াদ, "আল্লাহ আমাকে আর কারো মুখোপেক্ষী করো না, আমি একমাত্র তোমারই মুখাপেক্ষী হয়ে যেন জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি। এখানে ট্রাইব্যুনালের অফিস থেকে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে, না কি কারা কর্তৃপক্ষের কোন হাত আছে, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। আমি একবার চিকিৎসার ব্যাপারে আর কাউকে কিছু না বলার সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করলে, এখানকার নিকটতম সাথী বন্ধুরা মান অভিমান না করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ আর কিভাবে নেয়া যায় তা করার পরামর্শ দেন।

আমি একজন অজপাড়া গাঁ থেকে উঠে আসা মানুষ ভাগ্যগুণে জামায়াতে ইসলামীর মত একটি বড় এবং খালেছ ইসলামী দলের আমীরের দায়িত্বে এসেছি। এটা যেমন দেশের ভেতরে বাইরে কিছুটা হলেও মান-মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে, তেমনি ইসলাম বিরোধী দেশি বিদেশী চক্রের ঈর্ষা থেকে হিংসা প্রতিহিংসাও বাড়িয়ে দিয়েছে। আমার আজকের অবস্থা এরই ফলশ্রুতি। অতএব এজন্যে মানবীয় দুর্বলতার কারণে মনে যেমন কষ্টও আছে, তেমনি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধও আছে। আল্লাহর এই শিখানো ভাষায় দোয়া করি, হে আল্লাহ হে পরওয়ারদেগার, ভুলত্রুটি যদি কিছু করেই থাকি তাহলে ক্ষমা করে দিও, সে জন্যে পাকড়াও করো না। অতীতে তোমার প্রিয় বান্দাদের উপর

www.pathagar.com

যত বড় বোঝা চাপিয়েছ (যত বড় পরীক্ষা নিয়েছ) আমাদের উপর অতবড় পরীক্ষার বোঝা চাপিও না। আমাদের উপর সে ধরনের কোন বোঝা (পরীক্ষার) চাপিও না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের ত্রুটি বিচ্যুতি মার্জনা কর, গোনাহ খাতা মাফ কর, আমাদের উপর রহম কর, এবং সর্বোপরি কুফরী শক্তির উপর বিজয় দান কর।" (বাকারা শেষ আয়াত) আরো প্রার্থনা করি "হে আমাদের পরওয়ারদেগার আমাদেরকে পর্যাপ্ত মানের ধৈর্য ধারনের শক্তি দাও, সুদৃঢ়ভাবে ময়দানে টিকে থাকার তৌফিক দাও, আর বিজয় দান কর কুফরী শক্তির উপর।"

৫ ই মে "সেফ হোমের" একটি বিষয় ভুলতে পারছিনা, জীবনেও বোধ হয় ভুলে যেতে পারব না। এক জনের অসৌজন্যমূলক আচরণ ও অভদ্রজনিত উক্তির আমি তাৎক্ষণিক জবাব দেওয়া তখন সমীচীন মনে করিনি। কারণ তাদের আচরণ ছিল পক্ষপাতদুষ্ট, "ঘাদানিক"দের প্রতিনিধিত্বের মত। আমার মন বলছে, তার সেই প্রশ্নের জবাবটা আমি দেশবাসীর কাছে দিয়ে যাই। তার প্রশ্ন ছিল, "আপনার লজ্জা করে না? আপনার ছেলে মেয়েরা আপনাকে ঘৃণা করে না? নাকি তারাও আপনার মতই বেশরম!"

সেফ হোমে জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালের কাছে প্রসিকিউটরদের অঙ্গীকার ছিল, উনারা সম্মানিত লোক, উনাদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করা হবে। উপরিউক্ত আচরণটা তাদের সেই ওয়াদার পরিপন্থী অথবা এটাই তাদের দৃষ্টিতে সম্মানজনক আচরণ।

আমি তাদের একাধিকবার হুমকি বা ধমকের সুরের কথায় তেমন মনের মধ্যে ক্ষোভ বা প্রতিক্রিয়া অনুভব করিনি। কিন্তু এই অভদ্রজনিত প্রশ্নের কারণে মনে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এই ক্ষোভ নিয়ে অসৌজন্যমূলক ও অভদ্রজনিত কথার জবাব দিতে গেলে আমি নিজেকে কতটা সংযত রাখতে সক্ষম হতাম সেটা ভেবেই এটাকে উপেক্ষা করি। কিন্তু মনের মধ্যে তার কথার বিষাক্ততা আমাকে বার বার ব্যথিত করেছে, এর প্রশমনের জন্যেই তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ এই অসভ্য উচ্চারণ এর জবাবটা আমি লিখিতভাবে জানিয়ে যাই।

'৭১ এর মুক্তি যুদ্ধের সমাপ্তি বা চূড়ান্ত বিজয়ের পরও আমার মরহুম পিতা ১৭/১৮ বছর বেঁচে ছিলেন। '৮৩ সন পর্যন্ত তার পৈত্রিক বাড়িতেই অবস্থান করেছেন। তার একমাত্র পুত্রের কারণে এখানকার দলমত নির্বিশেষে সবার কাছে শ্রদ্ধার পাত্রই ছিলেন। কোন দিন কারও পক্ষ থেকেই লজ্জা পেতে হয়নি। '৮৩ সন থেকে '৮৭ সন পর্যন্ত সাঁথিয়া উপজেলা হেড কোয়ার্টারে বসবাস করে গেছেন। উপজেলার দলমত নির্বিশেষে সকলের কাছে তিনি আমার পিতা হিসাবেই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হতেন। আজ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রাখলে, আমার কারাবরণের কারণে মনে কষ্ট পেতেন অবশ্যই। কিন্তু তার লজ্জিত হবার মত কোন কারণ ছিল বলে আমি মনে করি না।

আজকে ছাত্র জীবনের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। আমরা প্রায় তিন গ্রামের ছেলেরা এক সাথে স্কুলে এবং মাদরাসায় যেতাম। এর মধ্যে মাদরাসার ছাত্র ছিলাম আমি একাই। আমাদের খান পরিবারের অন্যরাও স্কুলে যেতো, আমাদের পরিবারের স্কুলে কলেজ পড়ুয়া চাচাতো ভাইয়েরাও আমাকে মাদরাসায় পড়তে নিরুৎসাহিত করত। এক পর্যায়ে আমার মন একটু দুর্বল হয়ে আসে। আমি আমার স্নেহময়ী মায়ের কাছে খুবই সংগোপনে মাদ্রাসা ছেড়ে স্কুলে পড়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করি। এবং আব্বাকে রাজী করার জন্যে আম্মাকে অনুরোধ করি। আব্বার কাছে আমার সরাসরি বলার সাহস হয়নি। তাছাড়া আমাদের খান পরিবারের বড় মুরুব্বী আমার বড় চাচা, যিনি একজন স্বনামধন্য আলেমও ছিলেন, আব্বা তাকে বড়ভাই হিসাবে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। আমাকে মাদরাসায় পড়তে দেওয়ার ক্ষেত্রে তার নৈতিক প্রভাবও এখানে একটা বড় ভূমিকা রেখেছিল। আমার অন্যান্য চাচাতো ভায়েরা বলতেন তোমার বড় চাচা রিয়াজের কোন ছেলেকে তো মাদরাসায় পড়াচ্ছেন না, তোমাকে কেন মাদরাসায় পড়তে বলছেন, তোমার আব্বা গরীব সেই জন্যে কি? অথচ এ তথ্য পুরোপুরি সত্য ছিল না। আমার বড় চাচার বড় ছেলে রাজশাহীর সরকারী নিউস্কিম মাদরাসা থেকে হাই মাদরাসা পাশ করে পরে কলেজে পড়াশুনা করেছেন। যা হোক আমার

www.pathagar.com

মনের অবস্থা আম্মাকে জানানোর পর, আম্মা আব্বাকে বিষয়টি তার মত করে অবহিত করেন। এর মধ্যে একদিন দেখি আব্বা মাদরাসায় গিয়ে উপস্থিত। সোজা আমাদের ক্লাসরুমে শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে ঢুকলেন। বসার পর আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, উক্ত মাদরাসার হেড মৌলভী, জনাব মাওলানা আব্দুল আজিজ সাহেবকে বললেন, আমি শুনলাম, আমার ছেলে তার মাকে বলেছে, সে আর মাদ্রাসায় পড়তে চায়না, হাই স্কুলে ভর্তি হতে চায়। আমি আপনার কাছে এসেছি ওকে বুঝানোর দায়িত্ব দেওয়ার জন্যে। ও আমার একমাত্র ছেলে, লেখা পড়া শিখে আয় রোজগার করে আমাদের খাওয়াবে পরাবে এজন্যে তাকে পড়তে দেইনি। এটা আমরা ঘুর্ণাক্ষরেও কামনা করি না। আমি চাই আমার ছেলে যেন দ্বীনের খেদমতের কাজে লাগে। আল্লাহ যেন তাকে দ্বীনের খেদমত করার সুযোগ দেন। আমার আম্মার ইন্তেকালের পর ১৯৭৯ সালের নভেম্বর থেকে '৮৮ সনের নভেম্বর পর্যন্ত, তিনি আমাদের সাথে ঢাকার বাসায় ছিলেন। আমরা শুরু থেকেই আব্বা আম্মা দুজনকেই ঢাকায়, আমাদের সাথে থাকার জন্যে বার বার অনুরোধ করতাম। আব্বা গ্রামের বাড়ি ছেড়ে, এলাকা ছেড়ে, এলাকার আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীদের ছেড়ে ঢাকার যান্ত্রিক জীবনে আসতে কিছুতেই রাজি হননি। মাঝে মধ্যে চিকিৎসার প্রয়োজনে এসেছেন, কিন্তু কিছু দিন থাকলেই হাঁপিয়ে উঠতেন, এলাকায় যাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠতেন। কিন্তু ১৯৭৯-এর নভেম্বর আম্মার ইন্তেকালের পর একেবারে একা একা কি করে গ্রামের বাড়িতে থাকবেন, তাই একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এলাকা ছেড়ে ঢাকায় আসতে রাজি হলেন। আমরা একটি বছর সরাসরি তার খেদমতের সুযোগ লাভ করি। আব্বার ইন্তেকালের সপ্তাহে তার সকালের অজিফা শেষে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে আমার জন্যে যে দোয়াটি করেছেন, আমার নিজের কানে সেটা শোনার সৌভাগ্য না হলেও, আমার জীবন সঙ্গিনী শুনে আমাকে জানিয়েছেন আমার জন্যে আমার আব্বার শেষ প্রার্থনা ছিল, আমার একমাত্র ছেলেকে, হে আল্লাহ, তোমার দ্বীনের খেদমতের জন্যে দিয়েছিলাম, তুমি আমাদের মনের আশা পূরণ করে তাকে তোমার দ্বীনের পথে রেখেছ, আমি তার প্রতি সন্তুষ্ট আছি, তুমি তার প্রতি সন্তুষ্ট থেক এবং তাকেও তোমার প্রিয় রাসূলের 'ছায়া' বানিও।"

আমার সেই মহান পিতা আজ বেঁচে থাকলে তার ছেলের জন্যে লজ্জা পাওয়ার প্রশ্নতো দূরে থাক তিনি গর্ব করতেন। এবার আমার নিজের প্রসঙ্গে আসি। '৭১ কে কেন্দ্র করে যত প্রোপাগাণ্ডা করা হোক না কেন আমার নামে বাংলাদেশের কোন থানায় '৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত আওয়ামী এবং বাকশালী শাসনামলে মানবতাবিরোধী কোন অপরাধের অভিযোগে একটি জিডি পর্যন্ত নেই, তাকে লজ্জা পেতে হবে কেন? কোন অপরাধের অভিযোগ থাকলে স্বাধীনতার পরপরই তা দায়ের করার কথা। সে সময় নির্যাতিতরা বা তার স্বজনরা অনেক লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়েরও করেছে।

আমার নিজ এলাকার মানুষ সাক্ষী, তাদের এলাকার ব্যাপক উন্নয়ন একমাত্র আমার হাত দিয়েই হয়েছে। এমনকি মুক্তিযোদ্ধা সংসদের উপজেলা অফিসের পাকাবিল্ডিংটিও আমিই করে দিয়েছি। আমাকে লজ্জা পেতে হবে কেন?

আমি জোট সরকারের আমলে প্রথমে কৃষিমন্ত্রী হিসাবে বৃক্ষ রোপণ অভিযানে ফলবৃক্ষরোপণের ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা নেয়ার ফলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থাকে ফলবৃক্ষরোপণে সম্পৃক্ত করা হয়, ফলে আজ দেশে দেশীয় ফলের উৎপাদন দ্বিগুণেরও বেশি হচ্ছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিয়ে, একযুগেরও বেশি সময় পরে চিনি শিল্পকে লোকসান কমিয়ে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলাম, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সকলের জানা। লবণের উৎপাদন ৮/৯ লাখ মেট্রিক টন থেকে ১৫ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত করেছি। ১/১১ এর পরে দূরবীন দিয়ে তালাশ করেও আমাদের মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত কোন অনিয়ম ও দুর্নীতির ন্যূনতম প্রমাণও যেখানে বের করা সম্ভব হয়নি, আমি সেই ব্যক্তিটা লজ্জা পাব কেন? আরেকটি বিষয় বলতে চাচ্ছিলাম না, তারপরও বলতেই হচ্ছে বিশ্বে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা এখন দেড়শত কোটিরও বেশি। সম্প্রতি পশ্চিমা জগতের একটি প্রভাবশালী দেশের গবেষণায় বা অনুসন্ধানে বিশ্বের

www.pathagar.com

পাঁচশত প্রভাবশালী মুসলিম ব্যক্তিদের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তার মধ্যে টপ ফিফটির একটা আলাদা তালিকাও করা হয়েছে, সেই তালিকায়ও এই অধমের নাম দেখে, আমার বা আমার পিতা মাতা ও ছেলে মেয়েদের লজ্জা করার প্রশ্নটা কি প্রাসঙ্গিক না ঘাদানিকের কদর্য মনমানসিকতার সহজাত ও স্বাভাবিক প্রকাশ, দেশবাসীর কাছে এ বিচারের ভার দেয়ার জন্যেই একথাগুলো আমাকে লিখতে হলো। এজন্যে আমার বা আমার ছেলেমেয়ের মনে কখনও যেন কোন গর্ব অহঙ্কার স্থান না পায়, বরং আল্লাহর প্রতি শোকর গোজার হওয়ার এবং সদা বিনয়াবনত হয়ে তার নেয়ামতের হক আদায়ের তৌফিক দেন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। দেশবাসীর কাছে, সারা দুনিয়ার মুসলিম উম্মাহর কাছে দোয়ার দরখাস্ত পেশ করছি আমার মনে আসা আবেগ অনুভূতি দিয়ে।

৫ ই মের জিজ্ঞাসাবাদের সময় সেফ হোমের এই কদর্য ব্যবহারের কথা আমি কাউকে জানাতে চাইনি। কিন্তু মানমর্যাদাকে আঘাত দিয়ে বলা কথাটা চেপে রাখা সম্ভব হয়নি। সেফ হোম থেকে বের হবার মুহূর্তে তদন্তসংস্থার সমন্বয়কারীর সামনে টেবিলে বসা অবস্থায় আমার আইনজীবীর জিজ্ঞাসার জবাবে এই একটি মাত্র ঘটনার একটু আভাস দিয়েছিলাম। অবশ্য সমন্বয়কারী, আমার আইনজীবীকে বার বার নিষেধ করেছেন জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন না করতে। সময় একটু বেশি নেয়ার বিষয়টি নিয়ে আইনজীবীর সাথেই সমন্বয়কারীর কথা হয়। আমি আগেই উল্লেখ করেছি, দুবার দুজনের ধমকের স্বরে কথা বলাকে আমি অবশ্যই থ্রেট মনে করেছিলাম, কিন্তু কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিনি। কিন্তু লজ্জা শরমের প্রসঙ্গটাকে চেপে যাওয়া ঐ মুহূর্তে সম্ভব হলেও আমার মনকে বার বার পীড়া দিচ্ছে।

৮ ই মে মুজাহিদ সাহেব জিজ্ঞাসাবাদ থেকে ফিরে এসে জানালেন আমার পক্ষ থেকে নাকি আদালত অবমাননার মামলা করা হয়েছে এবং এতে উনারা খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এ কারণেই পরবর্তী পর্যায়ে তাদের ব্যবহার আরো রূঢ় হতে পারে বৈরিতা বৃদ্ধিও পেতে পারে। যাহোক ২৪ শে মে ট্রাইব্যুনাল এ মামলা খারিজ করে দেয়, আর তাদের পক্ষে এটাই ছিল স্বাভাবিক। এখন সামনের দিনগুলো কেমন হবে তা আল্লাহই ভাল জানেন। আল্লাহর কাছে দৃঢ় এস্তেকামাত ও ছাবেতেকদমীর দোয়া করা ছাড়া আর কিই করার আছে? আল্লাহ যেন সাধ্যের অতীত কোন পরীক্ষায় না ফেলেন এজন্যে তাঁরই শিখানো ভাষায় বার বার দোয়া করছি। আলেমুল গায়েব আল্লাহ সবচেয়ে ভাল জানেন, মানবতাবিরোধী কোন অপরাধের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন সম্পর্ক বা সম্পৃক্ততা আমার নেই, নেই দূরতম কোন সংশ্লিষ্টতা। থাকলে '৭২ থেকে '৭৫ এর আওয়ামী শাসনের আমলে কোন থানায় কোন ধরনের কেসের রেকর্ড নাই কেন? তখন এমন কী বাধা ছিল, যে কারণে আমার বিরুদ্ধে কোন মামলা করা হয়নি? দেশের সর্বময় কর্তৃত্বতো ছিল তাদের হাতে। আমার যতদূর মনে পড়ে ২০০০ সালের ডিসেম্বরে জামায়াতের আমীর নির্বাচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমাকে নিয়ে কোন মহলেই কোন কথা উঠেনি। এমনকি মিডিয়াও হৈ চৈ করেনি। আমীর নির্বাচিত হবার পর থেকে তৎকালীন সরকারের আমলে (আওয়ামী লীগ) বিটিভিতে এনিয়ে প্রোপাগাণ্ডার সূচনা করা হয়। এমনকি ১৬ ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসে তাদের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির দাওয়াতে বঙ্গভবনে গেলে আওয়ামী লীগের একটি চক্র আমাকে মারার চক্রান্ত পর্যন্ত করে। অথচ ইতঃপূর্বে তাদের সরকারের আমলের প্রতিটি বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে আমি বঙ্গভবনে গিয়েছি। কোন সময়ই এমনটি হয়নি।

এবারের সেফ হোমের জিজ্ঞাসাবাদে একজন প্রশ্ন করলেন, গোলাম আযম সাহেব আমীরের পদ থেকে চলে গেলেন। আপনি রয়ে গেলেন কেন? এ প্রশ্নের মধ্য দিয়েই তাদের মনের গোপন অবস্থাটির প্রতিফলন ঘটে। আর তাহলো আমীর হওয়াই মূল অপরাধ। আমি তাকে এ ব্যাপারে উত্তরে বলেছিলাম, গোলাম আযম সাহেব দুইবার নির্বাচনের আগে অব্যাহতি চেয়ে কর্মপরিষদের কাছে প্রস্তাব রেখেছেন। কর্মপরিষদ প্রথমবারে তার প্রস্তাব গ্রহণ করেনি। দ্বিতীয়বারে গ্রহণ করে। আমি নির্বাচনের আগে কর্মপরিষদের কাছে একইভাবে প্রতিবারই অব্যাহতি চেয়ে আসছি, কিন্তু কর্মপরিষদ বা সংগঠন এখন

www.pathagar.com

পর্যন্ত আমার অব্যাহতির আবেদন গ্রহণ করেনি। এখানে আমার কিছু করার নেই। প্রশ্নকারী অবশ্য পরে নিজেই বলেন, তা হলে সংগঠন আপনাকে ছাড়তে রাজি হয় নাই? আমি আর কথা না বাড়িয়ে শুধু এতটুকুই বললাম আমীর নির্বাচিত হবার আগে আমাকে নিয়ে কোন কথাবার্তাই আলোচিত হয়নি। আমার মন বলে আমীরের দায়িত্বে নির্বাচিত না হলে হয়ত আজ আপনাদের সামনে আমাকে আসতেই হত না। অতএব যত যাই কিছু বলা হোক না কেন? আমার মূল অপরাধ জামায়াতের আমীর হওয়া।

এক সপ্তাহ শেষে আজকে আমার পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাত হবার কথা। সপ্তাহটি যেন শেষ হতেই চায় না। আবার নির্দিষ্ট দিনের সকাল থেকে ১১টা কখনও ১২টা পর্যন্ত প্রতীক্ষায় কেটে যায়। বড্ড যন্ত্রণাদায়ক এই প্রতীক্ষার মুহূর্তটা। ইতঃপূর্বে দুই সপ্তাহ প্রতীক্ষা করেও সাক্ষাৎ না হওয়ার কথা যেন প্রতি সপ্তাহেই মনের মধ্যে বেশ উঁকি ঝুঁকি মারতে থাকে।

আমার বারডেমে ফিজিওথেরাপি নেয়ার ব্যাপারে কোর্ট অর্ডারটা নাকি প্রপ্রার চ্যানেলে আসেনি। ডাক যোগে অথবা কোর্ট কর্তৃপক্ষের ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমেই নাকি আসতে হবে। আজ আমার ছেলের কাছ থেকে এটাই জানার ইচ্ছা- আসল ব্যাপারটি কী? উকিলের সহযোগিতায় কোর্টের রেজিস্ট্রারের সাথে যোগাযোগ করে ম্যাসেঞ্জারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় কারাকর্তৃপক্ষের কাছে প্রোপার চ্যানেলে অর্ডারটা পৌঁছানোর কোন ব্যবস্থা এ পর্যন্ত নিয়েছে কিনা, না নিয়ে থাকলে আজকেই যাতে উকিলকে বলে এটার ব্যবস্থা নেয়, এটাই বলার ইচ্ছা নিয়ে সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় আছি।

অবশেষে দুপুর ১২টার দিকে পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ হল। আমার ছেলে ব্যারিস্টার নাজিব মোমেন জানাল কেন্দ্রীয় কারাগারের (ঢাকা) অন্যতম ডেপুটি জেলার আবু মুসা জানিয়েছেন, আমার বারডেমে চিকিৎসার ব্যাপারে এবং ওটা ডাক্তারের কাছে আছে। শুনে ভাল লাগল, হয়ত তাড়াতাড়িই আমার প্রায় একবছর গ্যাপদেয়ার পরে, আবার ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থা ২/১ দিনের মধ্যেই হতে যাচ্ছে। সাক্ষাতের ফাঁকে, ডাক্তারের রুমে গিয়ে নাজিব মোমেন খোঁজ নিয়ে জানাল, ওটা ডাক্তারের হাতে এখনও পৌঁছায়নি। তবু আশা নিয়ে ফিরলাম। হয়ত ডাক্তারদের হাতে শিঘ্রই অর্ডারটা পৌঁছবে। আমি রুমে ফিরেই ডাক্তার কল করলাম। ডাক্তার রফিক সাহেব এলেন এবং কথা প্রসঙ্গে বললেন যে অর্ডারটা এসেছে, এটা অস্পষ্ট, এর ভিত্তিতে ওনারা আমাকে বারডেমে পাঠানোর কোন ব্যবস্থা করতে পারবেন না। কথাটা শোনার পরে আমার মনটা আবার ভীষণ খারাপ হল। ছেলের বোকামি না আইনজীবীদের অমনোযোগিতা কোনটা এর জন্যে দায়ী বুঝে উঠতে পারলাম না। এখানকার ডাক্তারগণ যদি এই সমস্যাটা সময় মত আমাকে জানাতেন, তাহলে হয়ত এতদিনে এ সমস্যার একটা কূলকিনারা করা যেতো। যাক একেই বোধহয় বলে ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। একই আদালত, একই আইনজীবী, চিকিৎসার প্রয়োজনও একই ধরনের, বিশেষ করে আমি সায়েটিকার পুরোনো রোগী। গ্রেফতারের দিন পর্যন্ত ফিজিওথেরাপি নিয়ে আসছিলাম। গ্রেফতারের পরে তাও কারাকর্তৃপক্ষকে এটা জানানো হয়। হাইকোর্ট থেকে ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থাসহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্যে কোর্ট অর্ডারের কথা জেল কর্তৃপক্ষকে ব্যারিস্টার আঃ রাজ্জাক সাহেব নিজেই জানিয়ে গিয়েছিলেন। তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত এর কোন ব্যবস্থা হল না। এবার ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে মুহতারাম মাওলানা সাঈদী সাহেবের বারডেমে যাওয়া আসা শুরু হয়েছে। কিন্তু আমাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত অস্পষ্ট থাকার কারণে, আমাকে চিকিৎসাবিহীন থাকতে হল। পরিবারের লোকেরা ধারণা নিয়ে গেছেন, বারডেমে চিকিৎসা শুরু হতে যাচ্ছে। আমি তাদেরকে বিদায় দিয়ে এসেই ডা. রফিক সাহেবের সাথে কথা বলে নিজের জন্যে যত না চিন্তিত হয়েছি, তার চেয়ে বেশি চিন্তিত হয়েছি পরিবারের সদস্য স্ত্রী, পুত্র, কন্যার ব্যাপারে। তাদেরকে বিষয়টি জানানোরও কোন সুযোগ পাচ্ছি না। জেলখানার বড় বিড়ম্বনা এটাই, যত জরুরি বিষয়ই হোক সময়মত পরিবারের কাছে পৌঁছানোর কোন পথ খোলা নেই। এর সাথে আরেকটা ভুল করে ফেললাম, অজ্ঞতাবশত আমার বি,পি মেশিনটা আজকে ফেরৎ দেয়ার কথা, নতুন আরেকটা নিয়ে আসার কথা।

www.pathagar.com

মেশিনের সাথে স্টেথিস্কোপ আলাদা থাকে। ওটা ছাড়া প্রেসার মাপাই যায় না। আমি মনে করেছি নতুনটার সাথে ওটাও থাকবেই, তাই পুরাতন মেশিনের সাথে ওটাও দিয়ে দিলাম। পরে মনে হল, মেশিনের সাথে ওটা তো নাও থাকতে পারে। যে কথা সেই কাজ, খুলে দেখি শুধু বি.পি. মেশিন। এখন প্রেসার মাপার দরকার হলে আর কোন উপায় দেখছি না। বাসায় ওরা ভুল বুঝতে পারলে ভাল, না হয়তো এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অনুভূতি- ০৩

১৯ মে ২০১১ তারিখের সাক্ষাতের দিন পরিবারের সদস্যগণ জেনে যায়, বারডেমে আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা হচ্ছে। তবে, এটাও জেনে যায় যে ডেপুটি জেলার ডাক্তারের কাছে অর্ডারের কপি থাকার কথা বললেও, ডাক্তার বলেছেন, কখনও তারা কোন অর্ডারের কপি পাননি। আমি ফিরে এসে ডাক্তার কল করলে পরপর তাদের দুজন এসেই জানালেন, সাঈদী সাহেবের অর্ডারে যেমন স্পষ্ট কথা উল্লেখ আছে, আমাদের চার জনের জন্যে একই অর্ডার আসায় এতে স্পষ্ট কিছু তারা বুঝতেই পারছেন না। তাছাড়া এতে ভাল গাড়ী দেবার কথাই মুখ্য, হাসপাতালে চিকিৎসা ও ফুডের ব্যাপারে ইতঃপূর্বে কয়েকবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ থাকলেও জেল কর্তৃপক্ষের কাছে নাকি তেমন কিছুই পৌঁছায়নি। যাহোক ডা. শামসুদ্দীন সাহেব এবং ডা. রফিক সাহেব দুজনই আমাকে আশ্বস্ত করে গেলেন, তারা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে আমাকে আগামী সপ্তাহের মধ্যে পাঠানোর ব্যবস্থাই করবেন, ইনশাআল্লাহ, এভাবে আশ্বস্ত করে আমাকে হতাশ হতে বা দুশ্চিন্তা করতে মানা করে গেলেন।

২২/০৫/১১ তারিখে সন্ধ্যার একটু আগে ডেপুটি জেলার আবু মুসা সাহেব আমাকে বলেছেন, আগামীকাল অর্থাৎ ২৩/০৫/১১ সোমবারে আমাকে বারডেমে নেয়া হবে। আমি যেন সকাল ৯টা থেকে প্রস্তুত থাকি। আমি বাসায় খবর দেয়ার জন্যে অনুরোধ করলাম কারণ, চিকিৎসা হবে নিজ খরচে। বাসা থেকে যদি টাকা নিয়ে কেউ না আসে তাহলে বোকার মত ফিরে আসতে হবে। তিনি কথা দিলেন বাসায় খবর পৌঁছাবেন বলে। পরে জেনেছি খবর ঠিকই দেয়া হয়েছিল।

আমি যেমন এখানে রুমে, কখনও বারান্দায়, সকাল ৯টা থেকে প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করেছি জোহরের নামাজ পর্যন্ত, তেমনি পরিবারের লোকেরা বারডেম হাসপাতালে আমার জন্যে অপেক্ষা করেছে দুপুর ১টা পর্যন্ত। এখানে যেমন আমাকেও আর কিছুই জানানো হয়নি, তেমনি পরিবারের সদস্যদেরকেও কোন সংবাদ দেয়া হয়নি। আমি এখনও জানি না সেদিন কেন নেয়া যায়নি।

এবার আমাকে আমাদের এলাকায় ডিউটিরত জমাদার মিন্টু খানের মাধ্যমে জানানো হল, আমাকে মঙ্গলবারে বা বুধবারে নিতে পারে। আমি তাদেরকে জানিয়ে দিলাম, বুধবারে কোর্ট আছে। আর মঙ্গলবার তো আগামীকালই, এ কারণে পরিবারের লোকদের সাথে যোগাযোগ ছাড়া আমি যেতে পারব না। বৃহস্পতিবার আমার পরিবারের সাথে সাক্ষাতের নির্ধারিত দিন, ঐ দিন তাদের সাথে পরামর্শ করে পরবর্তী শনিবারে যাওয়ার দিন ধার্য হতে পারে। আমি বিষয়টি জমাদারের মাধ্যমে যেমন জানালাম, তেমনি ফার্মাসিস্ট মুনির সাহেবকেও বললাম, ডাক্তার শামসুদ্দিন সাহেবকে বলতে এবং তিনি যেন জেল কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

বুধবারে ১ জুন ট্রাইব্যুনালে হাজির হলাম। ওখানে ছেলে নাজিব মোমেনের সাথে দেখা হল। ঐদিন চিকিৎসার বিষয় নিয়ে ট্রাইব্যুনালেও আলোচনা হল। সরকারী আইনজীবীর পক্ষ থেকে বলা হল, কোর্টের অর্ডার নিয়ে তারাও জেল কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলবেন, সেই সাথে এটা বললেন, কোর্ট অর্ডার ছাড়াও তো কারও চিকিৎসার প্রয়োজন হলে জেল কর্তৃপক্ষই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এরপরের দিনই ছিল বৃহস্পতিবার, ২ জুন, আমার পরিবারের সাথে সাক্ষাতের নির্ধারিত তারিখ। ১১ টা থেকে সকাল ১১-৩০

www.pathagar.com

টার মধ্যে সাক্ষাৎ প্রার্থীদের এসে যাওয়ার কথা থাকলেও এ পর্যন্ত দুপুর ১২টার আগে কোন দিন সাক্ষাতের সুযোগ হয়নি। এর কারণ নাকি অনেক। যাই হোক ১২টার দিকে দেখা করার সুযোগ পেলাম। এর আগে সব সময় দেখতাম সাক্ষাত প্রার্থীরা সাথে ফলমূল যা নিয়ে আসে তাদের সাথেই ভেতরে ঢুকতে দেয়, এবং আমার সাথে যে সেবক যায়, সে সাথে সাথেই ওগুলো নিয়ে এসে রুমে রেখে যায় এবং সাক্ষাৎ থেকে আমাকে নিয়ে আসে। এবারে দেখলাম সাক্ষাৎ প্রার্থীরা নির্দিষ্ট জায়গায় বসা থাকলেও তাদের আনীত মাল সামানা যেখানে থাকার কথা সেখানে নেই। কারণ জেলার সাহেব মিটিংয়ে আছেন, তার পক্ষ থেকে ক্লিয়ারেন্স ছাড়া মাল ভেতরে আসতে দিচ্ছে না।

যাহোক গত সোমবারে হাসপাতালে তারা যে কতক্ষণ অপেক্ষারত ছিল সেটাই আগে শুনলাম, আর আমি কতক্ষণ অপেক্ষায় ছিলাম তাও তাদেরকে জানালাম। নাজিব মোমেন বলল, আগামী শনিবারে নাকি নিতে পারে, এ ব্যাপারে ডেপুটি জেলার আবু মুসার সাথে নাকি তার কথা হয়েছে। আমি এবারে আর আগের মত প্রস্তুতি নেইনি। কারণ, এদের ভূমিকায় এ পর্যন্ত আশ্বস্ত হবার মত কিছু পাইনি। আগের দিন কেন যাওয়া হল না, এর কারণটি জানানো ছিল তাদের ন্যূনতম ভদ্রতার দাবি। কিন্তু আজ পর্যন্ত ঐ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে খবর দিয়েও দেখা পাওয়া যায়নি। নিজের পক্ষ থেকেও সে কিছু জানানোর মত সৌজন্য বোধের পরিচয় দিতে পারেনি। বেলা ১১-৩০ টায় পরিষ্কার হয়ে গেল আজও যাওয়া হচ্ছে না। তারপরও একটু খবর নেয়ার চেষ্টা করলাম। আমাদের ২৬ সেলের 'পাহারা', বিপ্লব পিসিতে যাচ্ছিল। তাকেই বললাম আমার ব্যাপারে খবরটা জেনে আসতে। সে ফিরে এসে জানালো, আজ হাসপাতালে নেয়ার কোন সিদ্ধান্ত নেই। কবে নিতে পারে প্রশ্ন করায়, ডেপুটি জেলার উত্তর দেয়, ওটা জানিয়ে আবার বিপদে পড়ব নাকি? কোন ধরনের বিপদের আশংকায় সে এরূপ উত্তর দিল, তা মোটেও বোধগম্য হবার মত নয়। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় এটা দায়িত্ব এড়ানোর একটা কৌশলী উত্তর ছাড়া আর কিছুই নয়। ঐদিন অর্থাৎ ০৪/০৬/১১ শনিবারে পরিবারের লোকেরা তাদের পাওয়া সংবাদের ভিত্তিতে হাসপাতালে গিয়ে আগের দিনের মতই অপেক্ষা করেছে কিনা এটা জানার কোন সুযোগ নেই। যদি কোন কারণে আগামী বৃহস্পতিবারের সাক্ষাৎ বিঘ্নিত না হয়, তাহলে জানা যাবে ঐ দিনটি তাদের কেমন কেটেছে। আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছি, জেলে থাকা অবস্থায় আর চিকিৎসা নিয়ে দেনদরবার করার দরকার নেই। বরং আল্লাহ যেন কুদরতিভাবে কোন ব্যবস্থা করেন, সেই দোয়াই করছি তার মহান দরবারে।

আজ ৫ জুন রোববার। বৃহস্পতিবার আসতে এখনও মাঝখানে আরো তিন দিন আছে। আজ ছাড়া বাকী তিনটি দিন প্রতীক্ষায় থাকতে হবে। তারপরও সাক্ষাৎ যে হবেই তার কোন নিশ্চয়তা নেই। আল্লাহ যেন মাঝখানে আর কোন সমস্যা সৃষ্টি হতে না দেন, সেজন্যে দোয়া করছি কায়মনোবাক্যে। আল্লাহ মজলুমের দোয়া অত্যন্ত দ্রুত সময়ের মধ্যে কবুল করে থাকেন বলে তার প্রিয় নবী আমাদেরকে শুভ সংবাদ দিয়েছেন। সেই শুভ সংবাদের প্রতি সুদৃঢ় আস্থা রেখে এখনতো কেবল দোয়াই করে চলেছি, দেশের জন্যে, দেশের জনগণের জন্যে, বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের জন্যে, আমার প্রিয় সংগঠনের জন্যে, সংগঠনের নেতৃবৃন্দের ও কর্মীদের জন্যে, সেই সাথে নিজের ও নিজের পরিবারের জন্যে। আল্লাহর রাসূলের বাণী, আল্লাহর নিজের ঘোষণা অসত্য হতে পারে না। অতএব আমরা যে যেখানে যে অবস্থায় দোয়া করি আল্লাহ আমাদেরকে নিরাশ করবেন না, খালি হাতে ফেরত দেবেন না। তবে এখন কিভাবে আমাদের চাওয়া পাওয়া পূরণ করবেন এটা একান্তই আল্লাহ তায়ালার নিজস্ব এখতিয়ারের ব্যাপার। এখানে কারো কিছু করার নেই। তবে নিরাশ হতে আল্লাহ স্বয়ং নিষেধ করেছেন, ঈমানদার কখনও আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হতে পারে না। যাদের ঈমান নেই তারাই কেবল নিরাশ হয়। আল্লাহ তার প্রিয় বান্দাদের সবারই পরীক্ষা নিয়েছেন। আমরা অবশ্য দুর্বল মোমেন, তাই কঠিন পরীক্ষা থেকে সব সময় আল্লাহর দরবারে পানাহ চাই।

www.pathagar.com

গতকাল ৫ই মে, দিনব্যাপী বেগম খালেদা জিয়ার ডাকে পালিত হয়েছে সর্বাত্মক হরতাল সারা দেশে। এই হরতাল এর আগের দিন যাদেরকে গ্রেফতার করা হয়, তাদের একজন প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র সচিব, বর্তমানে বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা জনাব জাফর সাহেব। মাগরিবের নামাজের পরেই কারা রক্ষকদের মাধ্যমে খবর এলো তিনি ইতোমধ্যে জেলগেটে এসে গেছেন। তার জন্যে রুম রেডি করার জন্যে এখানে কর্মরত সেবক ও পাহারাকে দায়িত্ব দিয়ে দেয়া হয়। বেচারা আমাদের অনেকেরই পূর্ব পরিচিত। অতএব তার জন্যে প্রায় সবাই মোটামুটি অপেক্ষমান থাকলাম। আমাদের রাতের খাবার এখন রাত ৮টায় খেতে হয়। এশার নামাজ শেষে এতদিন রাতের খাবার গ্রহণ করে আসছিলাম, কিন্তু এশার নামাজের সময় এখন শুরুই হয় ৮ টা কয়েক মিনিটে। আমরা ৮টায় এশা পড়া শুরু করতেই আশে পাশের মসজিদ থেকে আযান শুরু হয়। ফলে ইমামের কেরাত শোনা যায় না, তাই আমরা রাতের খাবারটা এশার নামাজের আগে খেয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করেছি। খাওয়া শেষে আমাকে দাঁতের ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী একটা পেস্ট দাঁতে নিয়ে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে, তারপর দাঁত মাজার কথা, এরপরে একটা মাউথওয়াশ ব্যবহারের কথা। আমি খাওয়া শেষে এসব নিয়ে ব্যস্ত এমন সময় উনি এসে পৌঁছান। অতএব সাথে সাথে আমি উনার সাথে দেখা করতে পারিনি। তবে আমার এইসব কাজ শেষ করেই আমি উনার সাথে দেখা করতে গেলাম। হরতালের আগের দিনের মিছিল থেকে উনাকে গ্রেফতার করা হয়। উনাকে ধরার সময় পুলিশের বক্তব্য সম্পর্কে উনি বললেন, যেহেতু উনার মুখে দাড়ি আছে তাই একজন পুলিশ (সাদা পোশাকের) উনার জামার কলার ধরে বলে উঠল একজন জামায়াত পেয়েছি। কথাটা ছোট হলেও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, পুলিশের এই উক্তি মূলত সরকারের এবং সরকারের অনুগত কর্মকর্তা কর্মচারীদের নয়। মূলতঃ আমাদের নিকট প্রতিবেশী দেশটির ইচ্ছা ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যে, ইসলামের পক্ষের একটি সংগঠিত শক্তিকে নির্মূল করার জন্যে, দীর্ঘ ৪০ বছর পরে যুদ্ধাপরাধের বিচারের নামে ইসলামী শক্তি নির্মূলের অভিযান শুরু করেছে সরকার। সরকার দেশের মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি খেয়াল রেখে সংবিধানে বিসমিল্লাহ এবং রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম রাখার ব্যাপারে নেতিবাচক না হলেও ঘাদানিক ও সেক্টর কমান্ডার ফোরামের পক্ষ থেকে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে, মূলতঃ আমাদের প্রতিবেশীদের ডিকটেশনেই। 'বিসমিল্লাহ' এবং 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' যদি সংবিধানে রাখা হয়, তাহলে সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম এর হরতাল দেবার হুমকি প্রদর্শন থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম মূলতঃ ইসলামের বিরুদ্ধেই অবস্থান নিয়েছে এবং প্রতিবেশী দেশের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। তথাকথিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবীতে তাদের আন্দোলনের পেছনের রহস্যও এটাই। এতদিন তা খুব স্পষ্টভাবে জনসম্মুখে না এলেও এখন 'বিসমিল্লাহ' ও 'ইসলাম রাষ্ট্র ধর্ম' এর বিরুদ্ধে হরতাল করার হুমকি দিয়ে তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করেছেন। এখন জাতির কাছে এনিয়ে আর কোন সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ থাকার কথা নয়, যে যাদের কাছে সংবিধানে 'বিসমিল্লাহ এবং ইসলাম রাষ্ট্র ধর্ম' থাকাটা সহ্য হয় না, তারাই যুদ্ধাপরাধের বিচারের ধুয়া তুলে সরকার কে ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে বাধ্য করতে যাচ্ছে। আমি ইতিপূর্বে কয়েকটি জনসভায় সরকারের উদ্দেশ্যে বলেছি, ঘাদানিকদের আর সেক্টর কমান্ডারদের দায়িত্ব আর সরকারের দায়িত্ব এক নয়। "ঘাদানিক" কোন দিনই গঠনমূলক এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে নাই। আর সেক্টর কমান্ডার্সদের অতি সম্প্রতি বিসমিল্লাহর বিরুদ্ধে এবং রাষ্ট্রধর্মের বিরুদ্ধে দেওয়া বক্তব্য এবং হরতালের হুমকিও কোন দায়িত্বশীল বা গঠনমূলক ভূমিকার পরিচয় বহন করে না। দেশে বিশৃংখলা বা নৈরাজ্য সৃষ্টি হলে, যাদের কোন দায়দায়িত্ব নেই, দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নষ্ট হলে যাদের কিছু যায় আসে না, তাদের কথা মত চললে হবে না। সরকারের দায়িত্ব দেশের প্রতি, দেশের সকল মানুষের প্রতি, সেই দায়িত্বপালনে ব্যর্থ হলে, কেউ ঘাদানিকদের বা সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামকে দায়ী করবে না বা তাদের উপর কোন দায়দায়িত্ব বর্তাবে না। দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণ বহন করতে হবে সরকারকে।

www.pathagar.com

অবশেষে ৬ ই জুন রোজ সোমবারে আমাকে জানানো হল ৭ ই জুন রোজ মঙ্গল বারে আমাকে বারডেম হাসপাতালে নেওয়া হবে। আদৌ নেওয়া হবে, না আগের মতই প্রতীক্ষা শেষে হতাশ হতে হবে, এমন সন্দেহ সংশয় থেকে মনটাকে মুক্ত করা সম্ভব না হলেও প্রস্তুতি নিলাম। অবশেষে সত্যি সত্যি সকালে বেলা ১১টার দিকে বারডেম হাসপাতালে যাওয়া সম্ভব হল। ওখানে নিজ খরচে চিকিৎসার ব্যাপারে কোর্টের অর্ডার থাকায়, একটু দুশ্চিন্তায় ছিলাম। বাসায় যদি খবর পৌঁছে না থাকে, এবং টাকা নিয়ে বাসা থেকে কেউ হাসপাতালে না পৌঁছে তাহলে বোকার মত বিনা চিকিৎসায় ফিরে আসতে হবে। যাহোক হাসপাতাল গেটে পৌঁছতেই আমার ছেলে নাজিব মোমেন ও ভাতিজা মিঠুকে দেখে আশ্বস্ত হলাম। আমাকে প্রথমে ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগে নেওয়া হল, কর্তব্যরত ডাক্তার, কারা হাসপাতালের ডাক্তারদের পাঠানো কাগজপত্র ও আমার সাথে রাখা ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালের ফিজিওথ্যারাপিস্টের সুপারিশযুক্ত কাগজপত্র দেখে একটানা ১০দিন ফিজিওথ্যারাপি নেওয়ার ব্যবস্থা পত্র দিলেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরকে নির্দেশও দিলেন। অপর দিকে মেডিসিনের প্রফেসরকে রেফার করলেন। তার সাথে ফোনেও কথা বললেন, তার চেম্বারের কাছেই নির্দিষ্ট রূমে আমার ১০ দিনের ফিজিওথ্যারাপির প্রথম দিনের কার্যক্রম শুরু হল। ফিজিওথ্যারাপি শেষ হবার পর অল্প সময়ের ব্যবধানে মেডিসিনের প্রফেসর আমাকে দেখলেন, আমার কাগজপত্র দেখলেন, মুখেও অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করলেন, এরপর তিনি পিজির কার্ডিওলজির প্রফেসর সজল ব্যানার্জির দেওয়া প্রেসক্রিপশনটাও দেখলেন। এরপর তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন, ১০ দিনের জন্যে ভর্তি করে নেওয়ার, কারণ হিসেবে বললেন, উনাকে এতগুলো ঔষুধ খেতে হচ্ছে, এর কোনটা কখন বাদ দিতে হবে, কোনটা অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে, এব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিতে রোজ মনিটরিং দরকার। এজন্যেই তাকে ১০ দিনের জন্যে হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে। আমি নিজেও হাসপাতালের পক্ষ থেকে এত আন্তরিক ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত হবে এটা ভাবতে পারিনি। প্রতিদিন কারাগার থেকে হাসপাতালে গিয়ে থ্যারাপি নেওয়ার চেয়ে ভর্তি হয়ে থাকাই ভাল মনে হলেও মানসিক প্রস্তুতি ছিল না, তবে আমার ছেলে নাজিব এবং ভাতিজা মিঠু ভর্তি হয়ে যাওয়ার পক্ষেই মত দেয়। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তারা নিজেরাই যত শিঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা করার কথাও বলল। কিন্তু বাধ সাধল কারাকর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি ডেপুটি জেলার আবু মুসা সাহেব। তার প্রথম কথা ছিল একসাথে জেলখানার বাইরে একাধিক বন্দীর চিকিৎসা করার সমস্যা আছে। দ্বিতীয় জেল সুপারের অনুমতি লাগবে। এটা ছাড়া নাকি সম্ভব নয়। অথচ ১/১১ এর পরে পিজি হাসপাতালে বেশ কয়েকজন রাজবন্দীকে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা দেয়ার নজির আছে। পিজিতে প্রিজন সেলের বাইরে কেবিনেও রাজবন্দীদের ভর্তি করা হয়েছে। আমি নিজেও ১৩ দিন ভর্তি ছিলাম। ডেপুটি জেলারের আপত্তির মুখে ভর্তি হওয়া হল না। আমরা এ সরল বিশ্বাসে এটা মেনে নিলাম যে, ফিজিওথেরাপি নিতে তো আসতেই হবে। এখানকার মেডিসিনের প্রফেসরের কাগজপত্র বা ব্যবস্থাপত্র দেখে যদি সুপার সাহেব অনুমতি দিয়ে দেন, তাহলে পরের দিন এসেই ভর্তি হওয়া যাবে। এমন একটা আশাবাদ নিয়ে কারাগারে ফিরে এলাম। আমাকে কারাগারের অভিজ্ঞ সাথীদের কেউ কেউ বললেন, ভর্তি হয়ে যাওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু কারাকর্তৃপক্ষের প্রতিনিধির আপত্তির মুখে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কিছু করার ছিল না। মেডিসিনের প্রফেসর সাহেবের ব্যবস্থাপত্রটা ডেপুটি জেলার আবু মুসা সাহেব নিজের হাতে নিয়ে নিলেন, কথা দিলেন ফিরে গিয়ে এনিয়ে সুপারের সাথে আলাপ করে পরবর্তী সুব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

আমি সরল বিশ্বাসে ইতিবাচক ধারণা নিয়ে পরের দিন অর্থাৎ ৮ ই জুন বুধবার সকাল থেকে প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম। এক পর্যায়ে কিছু ধৈর্যহারা এবং কিছুটা হতাশাগ্রস্ত হয়ে এলাকার ডিউটিরত জমাদারকে ডেকে জানলাম, আমাকে হাসপাতালে নেয়ার ব্যাপারে কারাকর্তৃপক্ষের কোন সিদ্ধান্ত নেই। যার অর্থ হল ভর্তি তো হওয়া যাবেই না, ১০ দিনের ফিজিওথেরাপি যা একটানা নেয়ার কথা তাও আর

www.pathagar.com

হচ্ছে না। একদিনের থেরাপি এবং থেরাপি বাবদ ২৫০০ টাকা খরচটা বেকার গেল। কারণ আবার যদি কোন দিন সুযোগ আসে তাহলে ঐ একদিন আর হিসাবে ধরা হবে না। ওর কোন কার্যকারিতাও থাকবে না। আমি ভাবতে পারিনি, এভাবে একটা অমানবিক সিদ্ধান্ত কারাকর্তৃপক্ষ নিতে পারে।

পরের দিন আমার পরিবারের লোকদের সাথে সাপ্তাহিক সাক্ষাতের নির্ধারিত দিন। সাক্ষাতের জন্যে তারা ১১টায় জেল গেটে এসে উপস্থিত হলেও আমাকে স্লিপ পাঠানো হয় যা আমার কাছে আসে ১২-১৫ মিনিটে। যাহোক এটা নিয়ে এখানে কোন কথাবার্তা বলার সুযোগ নেই। বলে কোন লাভও নেই। যত দেরিতেই হোক না কেন সপ্তাহের একটা দিন ৩০ মিনিটের জন্যে এই সাক্ষাতের মূল্য অনেক বেশি। এই সাক্ষাতের সুযোগে ডেপুটি জেলার আবু মুসা সাহেবকে ডেকে পাঠালাম হাসপাতালে ভর্তি এবং ফিজিওথেরাপির ব্যাপারে তাদের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত কী জানার জন্যে। বারডেমের ডাক্তারদের দেওয়া কাগজপত্র সবই তার কাছে, আমাকে দেয়া হয়েছে শুধু ফিজিওথেরাপির কার্ডটা, যেটা ফিজিওথেরাপির নির্দিষ্ট রুমে ঢোকার আগে দেখাতে হয়। আমাদের সাক্ষাতের সময় মুসা সাহেবের সাথে আমার ছেলের কিছু কথাবার্তা হয়, কোর্ট অর্ডার সম্পর্কে এবং বারডেমের ডাক্তারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন নিয়ে। এতে এক পর্যায়ে আবু মুসা সাহেব বলেন দেখুন, আপনারা যেভাবে কথা বলছেন এটাই যদি সুপারকে জানানো হয় তাহলে হিতে বিপরীত হতে পারে। আমি সাথে সাথে আবু মুসা সাহেবকে বললাম, ভাই সাহেব আপনার মা বাবাতো আছে, তাদের কোন কষ্টের কথা শুনলে কি আপনার খারাপ লাগবে না? আমি ১১ মাস এই জেলে অবস্থান করছি। এসেই জানিয়েছি, আমি ফিজিওথেরাপি নিচ্ছিলাম, এর ব্যবস্থা করা দরকার। ইতঃপূর্বে ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক সাহেব নিজে এসে বলে গেলেন ফিজিওথেরাপিসহ আমার যাবতীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে জেল কর্তৃপক্ষকে হাইকোর্ট থেকে অর্ডার দেয়া হয়েছে।

সেই অর্ডারের কোন হদিসই পাওয়া গেল না। এবারের কোর্ট অর্ডার নিয়ে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। অবশেষে বারডেমে যাওয়া হল, কিন্তু তাদের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী চিকিৎসা হতে পারছে না, এ ব্যাপারে আমার ছেলে মেয়েদের পরিবারের মনে কোন কষ্ট কি লাগতে পারে না? আর সেই কষ্টের প্রকাশ হলে আপনি হিতে বিপরীত হবার মত কথা বলবেন এটা কি বলতে পারতেন, আপনার নিজের মা বাপের কষ্টের কারণে আপনার মনের অনুভূতি কেমন হতে পারে এটা মনে করলে? এরপরে তার সাথে আর কথা বলা সমীচীন মনে হয়নি। এদের সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা শুনে আসছি তাই সত্য এবং বাস্তব মনে হলো। এবারের সাপ্তাহিক সাক্ষাতের সময়টার বেশ কিছু অংশ ডেপুটি জেলার আবু মুসার সাথে অনেকটা অহেতুক বাকবিতণ্ডার মধ্য দিয়েই কেটে গেল। পারিবারিক ব্যাপারে বা আত্মীয় স্বজনদের ব্যাপারে তেমন কোন খোঁজ নেয়ার সুযোগ হল না। মনের উপর এর একটা চাপ অনুভব করলাম, পরের দিন জুমাবারেও এর জের চলতে থাকে। আজও মনের মধ্যে একটা কেমন যেন অস্বস্তিকর অবস্থা অনুভূত হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে, জেলে শরীরটা ভাল না যাওয়ায় আত্মীয় স্বজনের অভাব অনুভব করি। তাছাড়া তেমন একটা খারাপ লাগে না। দেশ ও জাতির প্রতি দায়িত্ব পালনের সুযোগ থেকে যারা আমাকে এবং আমার সাথী সঙ্গীদের বঞ্চিত রেখেছে, এর দায়-দায়িত্ব বা জবাবদিহিতা যদি জাতির কাছে, শেষ বিচারে আল্লাহর কাছে করতে হয় তাহলে তাদেরকেই করতে হবে। আলেমুল গায়েব আল্লাহ আমাদের অতীত বর্তমান সবার চেয়ে ভাল জানেন। ভবিষ্যৎ কেবল তিনিই জানেন।

পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালনের বিষয়ে আমার মনের দুঃখটা একটু বেশি। কারণ, পরিবারের দায়-দায়িত্ব আমি আসলে মোটেই পালন করতে পারিনি। আমার জীবন সঙ্গীনি পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আমাকে এব্যাপারে যে সহযোগিতা করে ঋণে আবদ্ধ করেছে, সে ঋণ আমার কোন দিনই পরিশোধ করা সম্ভব হবে না। আজ কারাগারে বসে বসে আল্লাহর দরবারে একজন মজলুম বান্দা হিসাবে দেশ, জাতি, মুসলিম উম্মার জন্যে দোয়ার পাশাপাশি পরিবারের জন্যেও দোয়া করছি। বিশেষ করে দোয়া করছি আমার প্রিয়তম জীবন সঙ্গীর জন্যে। তাকে যেন আল্লাহতায়ালা সর্বোত্তম পুরস্কার দান করেন। আর

www.pathagar.com

আমার ছেলে মেয়েদের এযাবত সে যে যত্নসহকারে মানুষ করার চেষ্টা করেছে, তার চেষ্টা যেন অব্যাহত থাকে। আমার অবর্তমানে তার এই কাজে যেন আল্লাহ আরো অধিকতর বরকত দান করেন।

শুক্রবারে সকাল ১১-৩০টার দিকে আব্দুস সালাম পিন্টু সাহেব বললেন, সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিব জহুরুল ইসলামকে আবার গ্রেফতার করা হয়েছে, জেল গেট থেকেই। আগের সকালে তার জামিনের খবর জানা গেল, বুধবারে জজ কোর্ট থেকেই তার জামিন মঞ্জুর করা হয় এবং সন্ধ্যার দিকে জেলকর্তৃপক্ষ জামিনের কাগজপত্র পেয়ে যান। বৃহস্পতিবারে মাইকে ঘোষণাও দেয়া হয়। আমার সাপ্তাহিক সাক্ষাতে যাবার কিছু আগেই উনাকে মুক্তিদানের লক্ষ্যে জেলগেটে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐদিন আমি তাই বিদায় জানানোর পর আমার সাক্ষাতের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। সাক্ষাতে গিয়ে শুনলাম উনার জন্যে পরিবারের লোকেরা অপেক্ষায় আছে। আমি বললাম উনি আমার রওয়ানা করার বেশ আগেই বের হয়ে এসেছেন। এতক্ষণে তো বাসায় পৌঁছার কথা। যাইহোক উনাকে ঐদিনই ডিবি পুলিশ জেলগেট থেকে গ্রেফতার করে ক্যান্টনমেন্ট থানায় নিয়ে যায়। পরের দিন অর্থাৎ শুক্রবারে বাদ মাগরিব, আদালত হয়ে আবার উনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ফিরে এলেন, ভিন্ন কয়েকটা মামলায় (অতীতের হরতালের) তাকে গ্রেফতার দেখিয়ে পুনরায় কারাগারে আনা হল।

এরূপ ঘটনা নতুন নয়। ইতঃপূর্বে জামায়াতে ইসলামী অন্যতম সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল জনাব মুজিবুর রহমান সাহেবকে জামিনে মুক্তি দেয়া হয়। কারাকর্তৃপক্ষের ম্যাসেঞ্জার এসে ঠিক জোহরের নামাজের এবং দুপুরে খাবারের আগে এসে বলল, আমরা ক্লিয়ারেন্স পেয়েছি, এখনই যাওয়া ভাল। বলা যায় না আবার কখন কী হয়, আমরাও উনাকে নামাজ ও খাওয়া রেখেও চলে যাবার পরামর্শ দিলাম। কারণ জেলখানা থেকে উনার মগবাজারের বাসা তো বেশি দূরে নয়। গিয়েই নামাজ পড়তে পারবেন এবং বাসার রান্না খাবার খেতে পারবেন। উনি উনার ১৭/১৮ জন সাথীসহ জেল গেটে চলে গেলেন। আমারা একটু খোঁজখবর জানার চেষ্টা করে খারাপ বা নেতিবাচক কোন আলামতের কথা জানতে পারিনি। শুধু একজনের মুখে শুনলাম, গেটের বাইরে নাকি পুলিশের একটি ভ্যান দাঁড়ানো আছে। এখানে আমাদের অনেকেই বললেন, এ রকমভাবে জেল গেটের সামনে সব সময়ই কোন একটা পুলিশ ভ্যান থাকেই। তাই এটাকে আমরা নেতিবাচকভাবে নেইনি। উনারা চলে যাবার পরে পত্রিকাতেও উনাদের গ্রেফতারের কথা ছাপা হয়নি। ভেবেছি উনারা নিরাপদেই যার যার গন্তব্যে পৌঁছে গেছেন। তাদের জামিনে মুক্তির পরের দিন কি তার পরের দিন সন্ধ্যায় আমি বাথ রুম থেকেই শব্দ পেলাম আমাদের কারাগারের অন্যতম সাথী আযম রেজা সাহেব কাকে যেন সম্বোধন করে বললেন, আরে আপনি?

আযম রেজা সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে যে গলার আওয়াজটি আমার কানে ভেসে এলো, সেটা মুজিবুর রহমান সাহেবের গলার আওয়াজের মতই মনে হল। কিন্তু বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। দ্রুত বাথরুমের কাজ সেরে আমার রুমের বাইরে গিয়ে দেখি সত্যি সত্যি মুজিবুর রহমান সাহেব কারাগারে আবার ফিরে এসেছেন। তার কাছ থেকেই জানলাম, তাদেরকে নেবার জন্যে যে গাড়ী এসেছে তাতে উঠতে দেয়া হয়নি। পুলিশের ভ্যানে উঠিয়ে সোজা মীরপুর থানায় নিয়ে রাখা হয়। ঐদিন ও রাত মীরপুর থানা হাজতেই মুজিব সাহেবসহ ১৯ জনকে রাখা হয়। এবং একটা মিথ্যা কাহিনী রচনা করে উনাদেরকে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে নিয়ে আসা হয়। এবং আদালত হয়ে আবার কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে আসা হয়। কাহিনীটি বড় বিস্ময়কর। পুলিশকে দিয়ে যারা এত মিথ্যাচার করাচ্ছে, খোদ পুলিশ তাদেরকে কী ভাবছে তাও বোধহয় এই মুহূর্তে সরকারী কর্তা ব্যক্তিদের অনুভূতিতে নেই। তাদেরকে কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে পুলিশের গাড়িতে করে মীরপুর থানায় রাখা হল পুলিশের হেফাজতে। অথচ মামলা সাজানো হলো, তারা কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বাইরে গিয়ে কোন এক মাঠে নাকি একত্রিত হয়ে রাষ্ট্রবিরোধী কোন কর্মকাণ্ডের সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল। এমন হাস্যকর এবং ভিত্তিহীন গল্প যাদের দিয়ে বানানো হল এবং গ্রেফতার দেখানো জন্যে আদালতে মিথ্যা প্রতিবেদন দেয়া হল, তারা বলেছে

www.pathagar.com

আমাদেরকে "বদ দোয়া করবেন না, আমরা হুকুমের চাকর, আমাদের যা করতে বলা হয়, বলতে বলা হয়, চাকরির খাতিরে তাই করতে হয়, না করে উপায় নেই।" এভাবে যারা কোন সরকারের নির্দেশে, বিবেকের বিরুদ্ধে নিরীহ নিরপরাধ মানুষকে হয়রানি করার জন্যে মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে, এমনও দিন আসতে পারে সেদিন এই লোকেরাই বিবেকের তাড়নায় ঘুরে দাঁড়াতে বাধ্য হবে। এমন হওয়া হয়ত সময়ের ব্যাপার কিন্তু মোটেই অসম্ভব কিছু নয়। যারা সরকারের অন্যায় আদেশে নিরপরাধ মানুষের ভোগান্তির ইনস্ট্রুমেন্ট রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাদের বিবেক একদিন মজলুম জনতার পক্ষে জেগে উঠবেই।

জনাব জহুরুল ইসলাম সাহেব সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিব সদ্য বিএনপির রাজনীতির সাথে জড়িত হয়েই মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত হয়ে জেলে এসেছেন। জামিনে মুক্তি পেয়ে জেল গেট পার হতেই আবার ডিবি পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়ে, একদিন একরাত ক্যান্টনমেন্ট থানা হাজতে কাটিয়ে সিএমএম আদালত হয়ে আবার কারাগারে ফিরে আসার ঘটনায় ইতঃপূর্বে মুজিবুর রহমান সাহেবের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাটির কথা মনে পড়ে গেল। আমরা জেলখানায় যেমন শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় দিন রাত কাটাতে বাধ্য হচ্ছি, জেলের বাইরের অবস্থা এর চেয়ে খুব একটা ভাল মনে হচ্ছে না। গোটা দেশই যেন জেলখানায় পরিণত হয়েছে। দেশের মানুষ একটি দলের দাপটে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় অসহায় জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

গতকাল বিকেলের দিকে (১১/০৫/১১) সাঈদী সাহেব বারডেম হাসপাতাল ও ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতাল থেকে রিলিজ হয়ে কেন্দ্রীয় কারাগারে এসে পৌঁছুলেন। ইতঃপূর্বে উনার রুমে উঠেছিলেন প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র সচিব জনাব জহুরুল ইসলাম সাহেব। সাঈদী সাহেব জেল গেটে এসে পৌঁছতেই উনার জন্যে রুম প্রস্তুত করার জন্যে সিআইডি জমাদার এসে বলে গেল। রুম ব্যবস্থাপনা নিয়ে একটা সাময়িক সমস্যাই দেখা দিল। বিকেলে আমরা মাগরিবের আগে হালকা নাশতা খেয়ে অভ্যস্থ। আজকে সেবকরা রুম ব্যবস্থাপনা নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিল যে, নাশতার আয়োজন তাদের পক্ষে করা সম্ভব হয়নি।

২৬ সেলে আমরা যারা বন্দী হিসাবে আছি আমাদের সেবক হিসাবে এবং একজন ইমাম হিসাবে তিন জন ১১ নং রুমে থাকে। ঐ রুমটাই যদি একজন ভিআইপির জন্যে বরাদ্দ দেয়া হয় তাহলে সেবকদেরকে এখানে কিভাবে রাখা যাবে এনিয়ে একটু সমস্যা দেখা দিল। আমি প্রথমে পাহারা হিসাবে বিপ্লবকে, এরপর আমাদের খাদ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে আসছেন এখানকার সবচেয়ে বেশি দিন অবস্থানকারী, এক সময়ে আমার সহকর্মী জনাব আঃ সালাম পিন্টুকে বললাম, সেবকদেরকে কয়েকজনের রুমে লক আপের ব্যবস্থা করার জন্যে। এ ব্যাপারে এখানকার দায়িত্বে নিয়োজিত সুবেদারকে বলেই ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অবশেষে তাই হল। নতুবা লক আপের আগে সেবকরা সবাই চলে গেলে রাতের খাবারের ব্যাপারটা সবার জন্যে অসুবিধাজনক হত। এই অবস্থার মধ্যে সাবেক এমপি নাসিরুদ্দীন পিন্টু এসে যায়, বিডিআর মামলায় হাজিরা দেয়ার জন্যে। আমরা এখানে আসার পর থেকে আমি ৫ নং রুমে সাঈদী সাহেব ৭ নং রুমে এবং মুজাহিদ সাহেব ১০ নং রুমে থাকার সুযোগ পেয়ে আসছেন। মুজাহিদকে নারায়ণগঞ্জে স্থানান্তর করার পর ঐ রুমটা ট্রানজিট রুম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ সাময়িকভাবে কেউ কোন হাজিরা দিতে আসলে ঐ রুমটাতেই থাকার ব্যবস্থা হয়। বিডিআর মামলায় হাজিরা দেবার সুবাদে নাসিরুদ্দিন পিন্টু একটু ঘনঘন এখানে আসছে, ১০ নং রুমেই থাকছে। এর মধ্যে আমাদের কামারুজ্জামান সাহেব এবং আব্দুল কাদের মোল্লা সাহেব এসে উপস্থিত হলে, ১০ নং রুমে মোল্লা সাহেবের থাকার ব্যবস্থা হয়। ১ নং রুমটা আয়তনে একটু বড়, এখানে থাকতেন মতিঝিল থানার সাবেক ওসি রফিক সাহেব। উনি চলে যাবার পর থেকে রুমটা খালি ছিল। আমাকে অনেকেই ঐ রুমে যেতে বললেও আমি ৫ নং রুম থেকে অভ্যস্থ হবার পর অন্য রুমে যাওয়া পছন্দ করতে পারিনি। এভাবে রুমটাতে কামারুজ্জামান সাহেব উঠলেন। কামারুজ্জামান সাহেব যে ১ নং রুমে উঠেছেন, রুমটি বেশ বড়, দুটো চৌকিও আছে সেখানে, মনে করেছিলাম নাসিরুদ্দীন পিন্টুও ঐ রুমেই উঠতে পারে। তার

www.pathagar.com

এখানে আসাটা সাময়িক। মামলায় হাজিরার দিন হরতাল হওয়ায়, মামলার দিন পিছিয়ে গেছে, ১২/০৫/১১ এর স্থানে ২০/০৫/১১ তে দিন ধার্যের কথা ইতোমধ্যেই রেডিওতে প্রচারিত হচ্ছে। যাই হোক নাসিরুদ্দিন পিন্টুর তুলনায় আমাদের আব্দুল কাদের মোল্লা সাহেব সিনিয়র হওয়ায়, পিন্টু সাহেব তাকে রুম না ছাড়ার জন্যে নিজেই অনুরোধ করলে ভাল হত। একটা সৌজন্যমূলক আচরণ হতো। কিন্তু পিন্টু যেহেতু মুজাহিদ সাহেব স্থানান্তরিত হবার পর থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আসলেই এই রুমে উঠছে, তাই এটাকে তার অধিকার মনে করে ১০ নং রুমেই উঠলেন, সেবকদের জন্যে নির্দিষ্ট রুমে সাবেক সচিব জহুরুল ইসলাম সাহেব উঠলেন। এই রুমটাও একটু বড় ১ নং রুমের মতই। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে মোল্লা সাহেব এর বক্তৃতা শুনে আকৃষ্ট হতেন, আমাদের অন্যতম কারাগারের সাথী সাবেক বন কর্মকর্তা। সৌজন্য দেখিয়ে তার দীর্ঘ দিন থেকে অবস্থান করে আসা রুমটাই মোল্লা সাহেবের জন্য ছেড়ে দিয়ে, তিনি জহুরুল ইসলাম সাহেবের সাথে ১১ নং রুমে গেলেন। ওসমান গণি সাহেব যে সৌজন্য দেখালেন, সেটা দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, নাসিরুদ্দিন পিন্টু সাহেব দেখাতে পারলেন না। একাধিকবার এমপি থাকার কারণে জেলখানায় তার মোটামুটি একটা দাপট আছে। সে দাপটটা রক্ষা করার জন্যেই হয়ত তার এ আচরণটা করতে হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবারের সাক্ষাতের দিন আমার বেগম সাহেবা, ছেলে, মেয়ে ও বড় জামাইকে যা যা বলতে চেয়েছিলাম কিছু বলা হয়নি। ডেপুটি জেলারের সাথে কোর্ট অর্ডার ও বারডেম কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা বা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চিকিৎসা হতে না পারার বিষয়ে অহেতুক বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হওয়া এর একটা বড় কারণ। আমার ব্লাড সুগার টেস্ট করার শেষ স্ট্রিপটা ঐদিনই সকালে শেষ হয়ে যায়। আমার দাঁতের সমস্যার কারণে সুগার টেস্ট করা খুবই জরুরি মনে করলেও, পরিবারের লোকদেরকে কথাটা বলা হয়নি। জামাই প্রতি সপ্তাহে আসতে পারে না, ব্যস্ত মানুষ সে। তাকে এদিন কাছে পেয়েও যা বলার চিন্তা করেছিলাম, সাক্ষাতের সময় সবই বেমালুম ভুলে যাই। এরপর থেকে পরবর্তী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সাক্ষাতের জন্যে প্রতীক্ষার পালা। ১ দিন ২ দিন করে গুণতে গুণতে সাতটি দিন যেন শেষ হতেই চায় না। লেখাপড়ার নেশা যাদের সহজাত, তাদের এ সময় কাটানোটা যত সহজ, আমাদের মত মাঠকর্মী এবং এক সময়ের গণপ্রতিনিধি, যাদের মানুষের সাথে উঠাবসা দেখা সাক্ষাতে মনের অজান্তে সময় কেটে যায়, গোসল, খাবার, এমনকি ঘুমানোর সময় পর্যন্ত থাকে না, নিজেদের নিয়ন্ত্রণে তাদের পক্ষে জেলখানায় সময় কাটানোর বিষয়টি কত যে কঠিন তা আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি।

আমার একটা ওয়াদা ছিল "রাসূলুল্লাহর মদীনার জীবন" এর উপর লেখার। কিন্তু প্রায় বছর পেরিয়ে গেল, আমি এই লেখাটির জন্যে মানসিক প্রস্তুতিই নিতে পারলাম না। এজন্যে বেশ কটি বই আনিয়েছিলাম, আমার ছেলের মাধ্যমে, কিন্তু এগুলো মনোযোগ সহকারে পড়া এবং নোট নিয়ে নিজের লেখার জন্যে মাল মশলা যোগাড় করার সুযোগটা করতেই পারলাম না। এর অবশ্য একটা বাস্তব কারণও আছে।

এবারের জেল জীবনের ১ম দিকে একদফায় ১৭ দিন রিমান্ডে কেটে যায়। ঐ ১৭ দিন ডিবি অফিসে যে পরিবেশে ছিলাম তাতে লেখাপড়ার কোন সুযোগই ছিল না। ডিবি অফিসে অপরিষ্কার পুরনো কম্বলে শুতে হত। মাথার নিচে বালিশ হিসাবেই ঐ কম্বলই ছিল সম্বল। সাথে রাখা কোরআন শরীফ রাখার জন্যেও একটা কম্বলকেই কাজে লাগাতে হয়েছিল। কম্বলের উপরে চাদরটাই ছিল, কম্বল দর্শনে মনের অশান্তি দূর করার একমাত্র অবলম্বন।

১ম দফার ১৭ দিন রিমান্ড থেকে আসার পরপরই পিঠের ডানপাশে "হারপিচ" নামক রোগটা দেখা দেয়। যার কারণে পিঠে ও বুকের ডান পাশে ভীষণ ব্যথা দেখা দেয়। কারা হাসপাতালের ডাক্তার এটা দেখে বললেন, সারতে কম পক্ষে দুই সপ্তাহ লাগবে। তাছাড়া এটাও বললেন যে, এর ব্যথা হয় ভীষণ অমানবীয়। এ অবস্থায় রমজান এসে যায়। অতীতে রমজানে আমি প্রায় এক বছরের লেখাপড়ার কাজ

www.pathagar.com

করে ফেলতাম একমাসে। সেই রমজান এলো এবং চলে গেলো। আমার অসহ্য এই ব্যথা নিয়ে রমজান কাটালাম তার মধ্যে আমার তিন দিনের রিমান্ড ও রিমান্ড শেষে আদালত হয়ে জেলে আসতে আরো চার দিন গেলো। এই ক'দিনে আমার শরীরের অবস্থা কত খারাপ ছিল, তার সাক্ষী ডিবি অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ সহ, গ্রেফতার হয়ে আসা ঐ সব ব্যক্তিরাও যাদেরকে আমার সাথে আমার রুমেই রাখা হয়েছিল।

ঐ কদিন আমি নিজে হাঁটা চলাও করতে পারছিলাম না। ডিবি অফিসের তালাবদ্ধ রুমের সাথী সঙ্গীরাই আমাকে বাথরুমে যেতে আসতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করে। তাদের কার কী পরিচয় আমি জানি না, কিন্তু আমার ঐ দুঃসময়ে তাদের সেই আন্তরিকতাপূর্ণ সহযোগিতার কথা কোনদিনই ভুলতে পারব না। তাদের সে সহযোগিতা ও সহানুভূতির কোন প্রতিদান দেয়ার আমার সুযোগ হয়ত কোন দিনই হবে না। তবে প্রাণ খুলে তাদের দুনিয়া এবং আখেরাতের কল্যাণের জন্যে মহান আল্লাহর দরবারে আমার দোয়া অব্যাহত থাকবে।

এভাবে প্রথম দুমাস লেখাপড়ার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তার ধারে কাছেও যেতে পারিনি। ঈদুল ফিতর থেকে ঈদুল আজহা পর্যন্ত সায়েটিকার ব্যথা বাড়তে বাড়তে ডান হাঁটুতে এবং গোড়ালীতে অসহনীয় জ্বালা যন্ত্রণা শুরু হয়। আমার আইনজীবী ব্যারিস্টার আঃ রাজ্জাক সাহেব বলেছিলেন, আমার ফিজিওথেরাপিসহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেয়ার জন্যে কোর্ট থেকে অর্ডার দেয়া হয়েছে। সে অর্ডারের ব্যাপারে আজ পর্যন্ত জেলকর্তৃপক্ষ কোন কিছুই স্বীকার করেনি। ঈদুল আজহার পরের অবস্থাটা দেখে, কারা হাসপাতালের অন্যতম সহকারী সার্জন রথীন্দ্রনাথ কুন্ডু(যার বাড়ি আমার নির্বাচনী এলাকায়) দায়িত্ব নিয়ে লেখা লেখি করে, পিজি থেকে ফিজিক্যাল মেডিসিনের ডাক্তার আনার ব্যবস্থা করেন। এক পর্যায়ে কার্ডিওলজির প্রফেসর সজল ব্যানার্জিও এসে অনেকগুলো ওষুধ লিখে দিয়ে যান। তিনি মোটামুটি ভালভাবেই পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। আমার আগের ফাইলগুলো মনোযোগসহ দেখেন। এক কথায়, তিনি বললেন, এতে বেশ ভাল ভাল ওষুধের প্রেসক্রিপশন দেয়া ছিল। এগুলো খাওয়া বন্ধ করলেন কেন? আমি বললাম, ডাক্তারের পরামর্শ ক্রমেই ওষুধ একটা একটা বন্ধ করা হয়েছে, তবে ফিজিওথেরাপিস্ট বলেছিল ১ দিন পরপর। গ্রেফতারের পর থেকে এটা বন্ধ আছে। ২০০৯ এর জুলাইতে একটা মাইল্ড ব্রেইন স্ট্রোকের ফলে ডান হাত ডান পা বেশ কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ায় উক্ত থেরাপি দেয়া হচ্ছিল। এটা বন্ধ হওয়ায় আমার সমস্যা বাড়ছে। এজন্যে আমাকে কিছু ব্যায়াম শিখিয়ে দেয়া হল। হাতের জন্যে টেনিস বল ব্যবহারের পরামর্শও দেয়া হল। সজল ব্যানার্জি নামকরা কার্ডিওলজিস্ট। তিনি আমাকে দেখেছেন শুনে, অস্ট্রেলিয়া থেকে ছেলে ডাক্তার খালেদও সন্তোষ প্রকাশ করে। এতদিনের কারা জীবনে লেখাপড়ার সুযোগ নিতে না পারার কৈফিয়ত দিতে গিয়ে নিজের অসুস্থতার কথা একটু বেশিই বলতে হল।

ইতঃপূর্বে ১/১১ এর পরপরই মাত্র দুমাসের মধ্যে "রাসূলুল্লাহর মক্কার জীবন" বইটা লিখেছিলাম। তখনই ওয়াদা করেছিলাম আল্লাহ তৌফিক দিলে এরপর মদীনার জীবনটাও লেখার চেষ্টা করব। ২০০৮ এর মাঝামাঝি সময়ে ৫৬ দিন কেন্দ্রীয় কারাগারে কেটে গেলেও ঐ লেখায় হাত দিতে পারিনি। লেখার একটা outline অবশ্য তৈরি করেছিলাম। কিন্তু তার উপর আর কিছু করা সম্ভব হয়নি। এবারে তো বেশ লম্বা সময় জেলে কাটল, আরো কতদিন কাটবে, আসলে এ ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কী আসবে, কিছুই জানা বোঝার সুযোগ নেই। মানুষ হিসাবে এর একটা মানসিক চাপ যে নাই তা বলব না, কিন্তু এর সাথে বাড়তি অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে শারীরিক অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে। সপ্তাহখানেক হল, দাঁতের ব্যথায়ও বেশ কষ্ট পাচ্ছি। হাসপাতালে দাঁতের চিকিৎসা নিতে কেন যেন মোটেই মন সায় দেয় না। সায়েটিকার চিকিৎসা বারডেম কর্তৃপক্ষ দিতে চাইলেও জেলকর্তৃপক্ষ সে সুযোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত রাখল। এরও একটা মানসিক প্রতিক্রিয়া আমাকে পীড়া দিচ্ছে। তাই "রাসূলুল্লাহর মদীনার জীবন" লেখায় হাত দেবার জন্যে কোনভাবেই আর মনকে তৈরি করতে পারছি না। "রাসূলুল্লাহর মক্কার জীবন"

www.pathagar.com

যারা পড়েছেন তাদের সকলের দাবি, অনুরোধ, আমি যেন মদীনার জীবনটাও লিখি। কেউ কেউ তাকিদ দিয়ে বলেন, অবশ্যই যেন লিখি। আমার বেগম সাহেবাও প্রায় প্রতি সাক্ষাতে এজন্যে তাকিদ দেয়, ছেলে তো এজন্যে সহায়ক বইও জোগাড় করে দিয়েছে। আমার কারাগারের ঘনিষ্ঠতম সাথী, আন্দোলনের ঘনিষ্ঠতম সাথী, মুহতারাম মাওলানা সাঈদী সাহেব বার বার এদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু অবস্থা, পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে এদের কারও কথা রাখতে না পারা, নিজের ওয়াদা রক্ষা করতে না পারার জন্যে নিজেকে বড় অসহায় এবং দুর্ভাগা মনে হচ্ছে। একমাত্র আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানীতে এ অবস্থার পরিবর্তন হয়ে অনুকূল একটা পরিবেশ সৃষ্টি হলেই আমি আমার চেষ্টা করে দেখতে পারব। আমাকে আল্লাহতায়ালা আমার ওয়াদা রক্ষা করার তৌফিক দেন কিনা, তার প্রিয় রাসূলের জীবনের উপরে আমার অসমাপ্ত লেখাটা সমাপ্ত করার সুযোগ দেন কিনা এটা ভেবে আমার বর্তমান প্রতিকূলতার মধ্যে আল্লাহর দরবারে আমি দোয়াই করে যাচ্ছি, হে আল্লাহ তোমার এই নালায়েক দুর্বল গোনাহগার বান্দাহকে তোমার প্রিয় নবীর জীবনের বিশেষ অংশটি লিখে যাবার তৌফিক দাও।

ইতঃপূর্বে ৫ জুনের হরতালের অবস্থা আমরা অনুমান ও অনুধাবন করেছি, জেলাখানায় বসেই, কারাসংলগ্ন ঢাকার সবচেয়ে ব্যস্ততম ব্যবসা কেন্দ্র চকবাজারের নীরব নিঃশব্দ পরিবেশ থেকে। সারা দেশের ব্যবসায়ীগণ সাধারণত চকবাজারের হোল সেলারদের কাছ থেকে মাল নিয়ে যায়। আবার হোল সেলারদের নিজস্ব মালমালও আনা নেয়া হয় রাত দিন ২৪ ঘণ্টা প্রায় একই ভাবে। মালামাল ভর্তি ট্রাক আনলোডের শব্দ, আবার খালি ট্রাকের মাল উঠানোর শব্দ আমরা রাতে শুনতে পাই। কিন্তু ৫/৬/১১ তারিখের হরতালের দিন শেষে রাতেও এ শব্দ শোনা যায়নি। কারণ অনেকেই ধরে নিয়েছিল, সোমবার ৬/৬/১১ তে হরতাল হতে পারে। এবার ১২/৬/১১ থেকে ১৩/৬/১১ পর্যন্ত টানা ৩৬ ঘণ্টার হরতাল সারা দেশে বা সারা ঢাকায় কেমন হয়েছে, কারাগারে আবদ্ধ থেকে এটা পুরো আঁচ করা না গেলেও, সারাদেশের পাইকারী মাল আনা নেয়ার প্রাণ কেন্দ্র চকবাজারের পরিবেশ, খুব সহজেই অনুধাবন করা যায়। আমরা গতকাল ১১/৬/১১ এর দিবাগত রাত থেকে আজকের ১৩/৬/১১ এর সারা দিনে এলাকায় একটা রিকশার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি না। গতকাল একজন বড় মাপের কন্ট্রাক্টর এসেছিলেন তার সহকর্মীসহ। তারা দুজনও বলে গেলেন খুব কড়া হরতাল হচ্ছে। মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে সকাল সন্ধ্যা হরতাল ও ৩৬ ঘণ্টার হরতালের রাজনৈতিক প্রভাব কী হয় তা দেখার ও জানার অপেক্ষায় রইলাম। সরকার হরতালে বিরোধী দলের রাস্তায় নামা বন্ধ করার জন্যে মোবাইল কোর্ট বসিয়ে তাৎক্ষণিক বিচার করে, ধৃত বা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে তাৎক্ষণিক শাস্তি দিয়েও পরের দিনের হরতাল ঠেকাতে পারেনি। আওয়ামী লীগ রাজপথে আন্দোলনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একটি দল। তারা নিশ্চয়ই জানেন, দমন পীড়নের মাধ্যমে রাজপথের আন্দোলনকে কোন দিনই কেউ দমাতে পারেনি। বরং অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে তাদের নিজেদেরই ভাল জানার কথা; এতে রাজপথের আন্দোলন আরো জোরদারই হয়ে থাকে। জেলখানায় আবদ্ধ অবস্থায় আমাদের পক্ষে মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়, দেশের রাজনীতি কোন পথে যাচ্ছে। আমাদেরকে যে চারটি পত্রিকা দেয়া হয় তার প্রায় সবগুলোই সরকার ঘেঁষা। তার মধ্যেও মাঝে মধ্যে যেসব খবর, সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় ও বিশেষ প্রতিবেদন দেখার সুযোগ হয় তাতে মনে হয় না যে সরকার খুব একটা সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। সরকারের প্রধান অবলম্বন এখন প্রতিবেশী দেশের আশীর্বাদ এবং সে দেশের ভাস্কর রায়দের মত বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধিবৃত্তিক সাহায্য সহায়তা। কিন্তু জনমতের যে প্রকাশ ও প্রতিফলন ঘটল, দুই দুইটি হরতালের মাধ্যমে, তাকে উপেক্ষা করা সরকারের জন্যে কখনোই কল্যাণকর হতে পারে না। সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে তাদেরকে এটা ভেবে দেখতে হবে।

আজ ১৩/৫/১১, বিকেলে আছরের নামাজের কিছু পরে হাঁটতে হাঁটতে শুনলাম, আমাদের ২৬ সেলে আরো দুজন মেহমান আসছেন। দুজনই সাবেক চার দলীয় জোট সরকারের কেবিনেট মিনিস্টার ছিলেন।

www.pathagar.com

একজন মেজর হাফিজ সাহেব অপর জন এয়ার ভাইস মার্শাল আলতাফ হোসেন চৌধুরী। তারা গতকালের হরতাল চলাকালে গ্রেফতার হন। রাতে ক্যান্টনমেন্ট থানায় ছিলেন। আজ সিএমএম কোর্ট হয়ে জেল হাজতে আসলেন। এর মধ্যে মেজর হাফিজ সাহেবের জীবনের প্রথম জেল। আলতাফ হোসেন চৌধুরী সাহেব ১/১১ এর প্রেক্ষাপটে এর আগে একবার জেলে এসেছিলেন।

দুজনই সকালে নাস্তা করে কোর্টে গিয়েছেন। দুপুরে খাবার সুযোগ হবার কথা নয়। বাস্তবে হয়ও নাই। আমাদের বিকেলের হালকা চা নাস্তায় উনারা শরীক হলেন। এখানে ১১টি রুমের একটি, স্টোর রুম হিসাবে আমাদের খাবারের জন্যে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য আমরা খাওয়া দাওয়া করি বারান্দায়। আর একটি রুমে সেবকরা কয়েকজন মিলে থাকে। এবারে রুমের তুলনায় ভিআইপি মেহমান বেশি হয়ে যাওয়ায় ১নং রুমে নতুন দুই মেহমানকে রাখা হল। আর এক রুমে কামারুজ্জামান ও আঃ কাদের মোল্লাকে রাখা হল। সেবকদের জন্যে নির্ধারিত রুমে থাকছেন সাবেক স্বরাষ্ট্র সচিব জহুরুল ইসলাম সাহেব ও কারাগারের পুরাতন সাথী জনাব ওসমান গণি সাহেব। সেবকদের একটি স্টোর রুমে, বাকিদেরকে অন্যদের সাথে লক আপে থাকার ব্যবস্থা করা হয়।

আজ ১৪/০৬/১১ রোজ মঙ্গলবার আমাদের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল কামারুজ্জামানকে ধানমন্ডির তথাকথিত সেফ হোমে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে নেয়া হল। তাকে সকাল ৮.১৫ মিনিটে বিদায় দিলাম অশ্রুসজল নয়নে, ফি আমানিল্লাহ, হাফেজাকাল্লাহ বলে। সেফ হোমে, জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে যাদের বাছাই করা হয়েছে, তারা ঘাদানিকদের সার্থক প্রতিনিধি। তাদের সরবরাহ কৃত তথ্য উপাত্তই এদের সম্বল। আমাকে একজন ধমকের স্বরে জিজ্ঞেস করেছিল, এক কথায় জবাব দিন, হিটলার মুসোলিনী কি নিজের হাতে কোন মানুষ মেরেছিল? কোথায় হিটলার মুসোলিনী আর কোথায় আমার মত একজন অজপাড়া গাঁ থেকে উঠে আসা একজন সাধারণ মোল্লা মানুষ। তার এই প্রশ্ন থেকে আমি একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হই, আর এব্যাপারে আমি বরাবরই নিশ্চিত ছিলাম যে, আমার ব্যাপারে কোন অপরাধের সাথে জড়িত বা সংশ্লিষ্ট থাকার কোন প্রকারের তথ্য প্রমাণ এত কাল ধরে চেষ্টা করেও তারা এখন পর্যন্ত যোগাড় করতে পারে নাই। আর এটা বাস্তবে পারার কথাও নয়। কাজেই তার ধমকের কারণে, আমার মনোবল আরো বৃদ্ধিই পেল। সেই সাথে আমাকে নিয়ে তাদের চক্রান্ত ষড়যন্ত্রটার লক্ষ্যটা বুঝে উঠতে আমার তেমন কষ্ট হয়নি।

কামারুজ্জামানের জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করছি ইতঃপূর্বে যেভাবে মুজাহিদ সাহেব ও সাঈদী সাহেবের জন্যে দোয়া করেছি। আল্লাহ যেন তার মানসম্মান রক্ষা করেন, জালেমদের কূটকৌশল থেকে হেফাজত করেন। মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে হক কথা বলে সত্যিকারের ঈমানদারের পরিচয় দিয়ে আসতে সক্ষম হন। আল্লাহ জানেন আমাদের মূল ভূমিকা কী ছিল, আল্লাহ এও জানেন যে, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলতে যা বুঝায় তার সাথে আমাদের কারো দূরতম কোন সম্পর্কও ছিল না। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্কও ছিল না। অতীতে আল্লাহর অনেক প্রিয় বান্দাই তো মিথ্যা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। আল্লাহ তাদেরকে যেভাবে পরীক্ষা করেছেন, অতবড় পরীক্ষা আমাদের কম্য নয়, তা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। সেই সাথে পরীক্ষা যদি এসেই যায়, সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে যে ধরনের ছবর ও ইস্তেকামাত দরকার, ছাবেতেকদমীর দরকার সেই ছবর, ইস্তেকামাত ও ছাবেতেকদমীর তওফিক চাই। মহান আল্লাহর দরবারে কখনও হাত তুলে দোয়া করি এই গরিব, দুর্বল ও মজলুম বান্দার দোয়া কবুল করে আমার সাথী সঙ্গীদের সকলের মানইজ্জত রক্ষা করুন, ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার তৌফিক দিন। আমীন।

গতকাল ১৪ই জুন ধানমন্ডির সেফ হোমে আমাদের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল কামারুজ্জামান সাহেবের জিজ্ঞাসাবাদের নির্ধারিত তারিখ ছিল। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে বিকেলে কারাগারে বেশ একটু আগেই তিনি ফিরে আসলেন। জিজ্ঞাসাবাদের বিস্তারিত বিষয় নিয়ে আমরা সাধারণত আলোচনা করি না। তবে

www.pathagar.com

পরিবেশটা কেমন ছিল তা অবশ্যই জানার চেষ্টা করি। আমার ব্যাপারে তাদের সিনিয়র কর্মকর্তা হুমকির ভাষায় কথা বলেছিলেন। তাদের একজন আমাকে গালিও দিয়েছিলেন। তার গালির ভাষা ছিল, আপনার লজ্জা করে না? আপনার ছেলে মেয়েরা আপনাকে ঘৃণা করে না? নাকি তারাও আপনার মতই বেশরম? ঐ ভদ্র লোকের এই অভদ্র উচ্চারণের লক্ষ্য ছিল, আমাকে রাগিয়ে একটা অন্যরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। এটা আঁচ করে আমি তার উত্তরে শুধু এতটুকু বলেছিলাম, আমার ছেলে মেয়েরা আমাকে নিকট থেকে যেভাবে দেখে আসছে, তাতে ঐসব মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা তারা কখনই বিশ্বাস করতে পারে না। তাদের দুবার হুমকির ভাষায় কথা বলায় আমার মনে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। বিশেষ করে হিটলার মুসোলিনীর প্রসঙ্গ টেনে সানাউল্লাহ সাহেবের কথায় প্রমাণ হয় আমার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত কোন অপরাধ সংঘটিত হবার তথ্য তাদের কাছে নেই। কিন্তু বেশরম কথাটা আমার জন্যে, আমার ছেলে মেয়েদের জন্যে এই পর্যায়ের একজন শিক্ষিত এবং সরকারের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার মুখ থেকে উচ্চারিত হওয়াটা আমার কাছে ছিল চরম অসহনীয়। কিন্তু কোরআনের ভাষায় "ওয়ালকাজেমীনা গাইজা" এর প্রতি মনটা ঝুঁকে পড়ায় আমি সেটা নীরবে সহ্য করেছি।

এর ওপর আমল করার চেষ্টা করেছি। তবে লোকটা সম্পর্কে যে ধারণা নিয়ে ওখান থেকে বিদায় নিয়েছি, তাহল লোকটা যতবড় শিক্ষিতই হোক, কোন ভদ্র লোক নয়। বা ভদ্র পরিবেশে গড়ে উঠার সুযোগ তার হয়নি। টিমের অন্য সদস্যগণও এবারে কোন ভূমিকা না রাখায় আমি বিস্মিত হয়েছি, তবে এ বিস্ময় কেটে যায় দ্রুতই, এদেরকে "ঘাদানিক" কমিটির শিখণ্ডি হিসাবে মনে করে। আমার সাথে কথা বলতে, সময়ও তারা অতিরিক্ত নিয়েছিল কমপক্ষে ১০ মিনিট এটাকেও তেমন কিছু মনে করিনি। সেফ হোম থেকে বিদায়ের মুহূর্তে সমন্বয়ক আব্দুল হান্নান সাহেবের সামনে আমার আইনজীবী জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে জানতে চাইলে, হান্নান সাহেব বাধা দেন। তবে আমি এই গালির কথাটা খুব সংক্ষেপে হলেও হান্নান সাহেবের সামনেই বলে ফেলি। এটা নিয়ে আদালত অবমাননার মামলা করা হলে, খারিজ করা হলেও কামারুজ্জামান সাহেবের কথায় মনে হল, ঐ মামলার একটা নৈতিক চাপ তাদের উপর পড়েছে।

গতকাল সাঈদী সাহেবের সাপ্তাহিক সাক্ষাতের দিন ছিল। উনার পরিবারের সদস্যদের মাধ্যমে আমার ব্লাড সুগার মাপার স্ট্রিপ আসলো, সেই সাথে আমার দাঁতের ব্যাপারে কথা শুনে পরিবারের লোকেরা অন্যতম ডেন্টাল সার্জন জনাব শফিউল্লাহর প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী অনেকগুলো ওষধ পাঠায়। কিন্তু আমি আগে থেকে প্রায় ৩/৪ মাস যাবৎ পিজির ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী, সকাল বিকেল ও দুপুর অনেক ওষুধ খাচ্ছি। বারডেমের মেডিসিনের প্রফেসর ওষুধের তালিকা দেখে আমাকে ১০ দিনের জন্যে বারডেমে ভর্তি হতে বলেছিলেন, কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ কোন কারণ না জানিয়ে ওটা হতে দেয়নি। এমনিভাবে একটানা দশদিন ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থা দিয়েছিল। ঐদিন ফিজিওথেরাপি দেয়া হয়। কিন্তু এরপর বারডেমে গিয়ে ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থা কারাকর্তৃপক্ষ নাকচ করে দেয়।

বলছিলাম, আগে থেকে অনেকগুলো ওষুধ খাচ্ছি। বারডেমের মেডিসিনের প্রফেসর ওষুধ কোনটা কমানো উচিত, আর কোনটা চলা উচিত এটা দেখার জন্যে ক্লোজ মনিটরিংয়ের জন্যে ১০ দিনের জন্যে ভর্তি করতে চেয়েছিলেন, সেখানে এত ওষুধের মধ্যে দাঁতের ব্যথার জন্যে আবার এত ওষুধ খাওয়া ঠিক হবে কিনা সে ব্যাপারে পরামর্শের জন্যে কারা হাসপাতালের দাঁতের ডাক্তারকে কল দেয়া হল। কিন্তু তিনি ছুটিতে থাকায় ১৯ শে জুনের আগে আর তাকে পাওয়া সম্ভব হবে না। এখন এ ক'দিন (৪/৫ দিন) ধৈর্য ধরা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। আগামীকাল ১৬/৬/১১ বৃহস্পতিবারে পরিবারের লোকজনের সাথে পরামর্শ করেই করণীয় ঠিক করার সিদ্ধান্ত নিলাম। এখানে এর চেয়ে বেশি কিছু করার যে সুযোগ নেই এটাই বাস্তবতা। কালকের সাক্ষাতটা যেন ঠিকমত হয়ে যায়, কোন দিক থেকে কোন কৃত্রিম বাধার সৃষ্টি না হয়, এ জন্যে আল্লাহর দরবারে দোয়া করছি প্রাণ উজাড় করে।

www.pathagar.com

আজ ১৫/৬/১১ মোল্লা সাহেব সেফ হোমে গিয়েছেন জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে। তার ফিরে আসার অপেক্ষায় আছি অধীর আগ্রহে। আশা করছি বিকেল ৬ টা নাগাদ গতকাল কামারুজ্জামান যেভাবে ফিরে এসেছেন, মোল্লা সাহেবও সেভাবে আমাদের মাঝে ফিরে আসবেন ইনশাআল্লাহ। মাগরিবের কিছু আগেই মোল্লা সাহেব বেশ হাসিমুখেই ফিরে এলেন আমাদের মাঝে। বিকেলের নাস্তার টেবিল থেকে উঠে গিয়ে বারান্দায় সিঁড়ি সংলগ্ন গেটে আমি তাকে রিসিভ করলাম। তার মুখের বর্ণনাতেও মনে হল, "আদালত অবমাননা মামলার একটা নৈতিক প্রভাব সেফ হোমের জিজ্ঞাসাবাদকারীদের উপরে ভাল ভাবেই পড়েছে, ফলে আমার সাথে যে আচরণ করা হয় সেটা আর কারো সাথেই করা হয়নি। আমার বেশ ভাল লাগল জনাব মোল্লাহর একটি বক্তব্য থেকে। আমাকে জিজ্ঞাসাবাদকালে যে একজন আমাকে গালি দিয়েছিল, আমার ছেলে মেয়েদেরও গালি দিয়েছিল এবং কি ভাষায় গালি দিয়েছিল, সেই গালিটা আমি কিভাবে নিয়েছি, আমাদের পরিবারের সদস্যরা কিভাবে নিয়েছে, সংগঠনের যারাই এটা জেনেছে তারা কিভাবে নিয়েছে, এ কথাটা মোল্লা সাহেব তার মত করে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে এসেছেন। জিজ্ঞাসাবাদের ঐ টিমের সদস্যরা এটা স্বীকার করার মত সৎসাহসের পরিচয় না দিলেও এতটুকু বলতে বাধ্য হয়েছে, যদি কেউ এমন করে থাকে তাহলে সেটা ঠিক করে নাই। অথচ এখানে যদির কোন প্রশ্নের সুযোগই ছিল না। সিনিয়র একজন টিম সদস্য গালি দিয়েছিল, তারও সিনিয়র একজনের উপস্থিতিতে, তিনি চুপ ছিলেন, গোটা টিম চুপ ছিল, অতএব এ গালি দেয়ার বা দুর্ব্যবহার যাই বলিনা কেন এর দায়-দায়িত্ব গোটা টিমের। আমি তাদের মত ঘাদানিকের শিখণ্ডিদের সাথে বাজে তর্কে নিজেকে কখনও জড়াতে চাইনি। নিজেকে গালি দেয়ায় মনে যতটা কষ্ট পেয়েছি, তার চেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছি, ছেলেমেয়েকে জড়িয়ে গালি দেওয়ার মত এই ভদ্রবেশী লোকদের অভদ্র আচরণে। আল্লাহ সুবহানাহুতায়ালা, তার প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণাবলীর বর্ণনায় সূরা ফোরকানে বলেছেন, "যখন মূর্খরা তর্কে জড়িয়ে যায় তখন সালাম বলে তারা তাদেরকে পাশ কাটিয়ে যায়। এ সূরার অন্য স্থানে বলেছেন, "তারা যখন কোন বেহুদা কথা বা কাজের কাছ দিয়ে অতিক্রম করে তখন নিজেদের মান মর্যাদা রক্ষা করে সতর্কতার সাথে তা অতিক্রম করে যায়। আমি আল্লাহর সেই সব ভাগ্যবান ও প্রিয় বান্দাদের তালিকাভুক্ত আছি কিনা, জানি না, তবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান ও সাধ্যমত আল কুরআনে বর্ণিত তার প্রিয় বান্দাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জনের জন্যে এবং অনুসরণ ও অনুকরণের জন্যে চেষ্টা করে থাকি। জীবনে বেশ কয়েকবার, এ ধরনের দুটি চক্রের অভদ্র আচরণের মুখোমুখি হওয়ার মুহূর্তে, আল্লাহর নির্দেশনা ও তার প্রিয় বান্দাদের ব্যতিক্রম ধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধানে সক্ষম হয়েছি। আমি আল কোরআনে বর্ণিত, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের এই ব্যতিক্রম ধর্মী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জনের জন্যে নিজে যেমন অনুশীলনীর চেষ্টা করে থাকি, তার চেয়ে বেশি আল্লাহর কাছে তার পছন্দনীয় গুণাবলী অর্জনের জন্যে তৌফিকও কামনা করে থাকি। "ঘাদানিক"দের শিখণ্ডি ঐ টিমের টার্গেট ছিল আমাকে রাগিয়ে কিছু বেসামাল বা ভারসাম্যহীন কথাবার্তা বলতে বাধ্য করা। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী, সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫-১০ মিঃ পর্যন্ত তাদের সকলের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাদের সেই লক্ষ্য তারা অর্জন করতে পারেনি। মামলার ভবিষ্যৎ কি? আল্লাহতায়ালাই ভাল জানেন, তবে তাদের কাছে কিছু রাজনৈতিক বক্তব্যের পেপার কাটিং ছাড়া মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের কোন বাস্তব প্রমাণ নেই। এটা তাদের প্রশ্নের ধরন প্রকৃতি থেকেই পরিষ্কার বুঝা যায়।

মোল্লা সাহেব ফিরে আসতে আমার মতই একটু বেশি দেরী হয়, যেটা অন্য কারো সময়ই হয়নি। এতে একটু দুশ্চিন্তা হচ্ছিল কিন্তু তার হাসি মুখে ফিরে আসা দেখে সকল দুশ্চিন্তার অবসান হয়, স্বস্তি ফিরে পাই তার কাছে থেকে ওখানকার পরিস্থিতির বর্ণনা পেয়ে। আমাকে তারা মুখে কখনও বলেনি যে, "আপনাকে রাগাতে চেয়ে, রাগাতে পারলাম না" কিন্তু মোল্লা সাহেবকে নাকি বিদায়ের আগে অকপটে তারা বলেই ফেলেছে "আমাদের চেষ্টা ছিল আপনাকে রাগিয়ে তোলার কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হয়নি"।

www.pathagar.com

কিন্তু এ পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন স্থানে যে সব টিমের সাথে মুখোমুখি হয়েছি, তাদের সাথে কথাবার্তা যাই হোক না কেন, তারা নিজেরাও জনমত বিভ্রান্ত করার মত কিছু বিকৃত তথ্য প্রেসকে দিয়ে থাকেন, আবার প্রেস তাদের পক্ষ থেকে আরো রং চং লাগিয়ে তাদের মত করে আমাদের ব্যাপারে জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্যে সংবাদ পরিবেশন করে থাকে। এ ব্যাপারে প্রিন্টিং এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া কেউ কারো থেকে পিছিয়ে থাকতে রাজি নয়। এ পর্যন্ত আমাকেসহ পাঁচজনের জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে মিডিয়া বস্তুনিষ্ঠতা বা ইনসাফের পরিচয় দিতে পারে নি। মূলত সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে মিডিয়া ট্রায়ালের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বের চরিত্রহরণ করে মূলত দেশের প্রচলিত সুসংগঠিত ইসলামী শক্তিকে ঘায়েল করা। এবার নিয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তিনবার এসেছি বন্দি হিসাবে। অবশ্য আর কোন জেলখানায় যাওয়ার অভিজ্ঞতা এখনও হয়নি। এমন অভিজ্ঞতা আর না হোক, আল্লাহর কাছে এটাই কামনা করছি বার বার। কারাগারে একবার ৫৬ দিন ছিলাম। ২য় বার ছিলাম ১০ দিন। আর এবারে প্রায় বছর পেরিয়ে যাচ্ছে। কতদিন থাকতে হবে, শেষ পরিণতি কী হবে, সব আলেমুল গায়েব আল্লাহ জানেন। আর কারো এব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু জানার বা বলার কোন সুযোগ নেই।

কারাগারের স্টাফদের ব্যাপারে আমার ধারণা সব সময়ই ইতিবাচক। ২/১ জন ব্যতিক্রম ছাড়া সবাই মোটামুটি আমাদের সাথে, বিশেষ করে আমার সাথে ভাল ব্যবহারই করে আসছে। বলতে গেলে সবার ব্যবহারই ভাল, তবে কারো কারো ব্যবহার খুব বেশি ভাল যা মনে রাখার মত। হয়ত কখনই ভোলা যাবে না। এমন একজন কারারক্ষী অমৃতলাল, গায়ের রং ফর্সা না হলেও চেহারাটা বেশ মিষ্টি। ব্যবহারটা আরো মিষ্টি। আমার মনে তার ব্যবহারে যে মায়া মমতার সৃষ্টি হয়েছে, তা স্মৃতির পাতায় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। অমৃত একদিন ২৬ সেলের এক বকুল তলায় বকুলের ফুল কুড়াচ্ছিল। আমি তার পিঠে হাত দিয়ে বললাম, ফুল কি শুধু তোমরাই নিবে, না আমরাও পেতে পারি? গত বছর জুনের ৩০ তারিখে জেলে এসে সেবকদের মাধ্যমে বকুল ফুলের মালা আমার নাতি নাতনিদের জন্যে পাঠিয়েছিলাম। এবার বকুল তলা দিয়ে হাঁটতে অনেক ফুল পড়ে থাকতে দেখি। ফুল মাড়িয়ে যেতে মনে বেশ কষ্টও লাগে, আবার বকুল ফুলের মালা বানিয়ে পরিবারের সদস্যদের দিতে লোভও হয়। এ পর্যন্ত দুইজন নিকটতম সেবককে বললাম। তারা অপারগতা প্রকাশ করল। একজন বলল, কারারক্ষীরা এটা এবারে করতে দেবে না। আরেকজন বলল, একজনের দেখাদেখি আরো অনেকেই চাইবে সেটা সমস্যা হয়ে যাবে। তাই গতবারের মত এবার বকুল ফুলের মালা পাঠাবার আশা ত্যাগ করেই থাকতে হল। হঠাৎ অমৃতকে ফুল কুড়াতে দেখে কথাটা বলে ফেললাম, শুধু কি তোমরাই নেবে আমরা কি পেতে পারি না? অমৃত খুব মৃদু ও ভদ্রভাবে বলল, স্যার মালা কি নেবেন? আমি উত্তরে বললাম, পেলে কে ছাড়ে? হঠাৎ দেখি একদিন সে দুটো মালা এনে রুমে দিয়ে গেল। তাকে কয়েকদিন মালা গাঁথায় ব্যস্ত দেখে আর একদিন জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এত মালা দিয়ে কী করবে, তোমাকে তো এখন 'অমৃত মালাকার' নামে ডাকা যায়। অমৃত বলল স্যার এ মালাটা আপনার জন্যে গাঁথছি।

সত্যি সত্যি কদিন পরে আরো দুটো মালা এনে সে রুমে দিয়ে গেল। তার দেখাদেখি অবশেষে বিপ্লবও একটা মালা বানিয়ে আনল। এর আগে কিভাবে যেন ২ বারে তিনটা বকুলের মালা আমার স্ত্রী এবং দুই নাতনিকে দিয়েছিলাম। এবারের সাক্ষাতে পাঁচটি ছোট বড় মালা দিতে পেরে আমার খুবই ভাল লাগল। এব্যাপারে অমৃতের ভূমিকাই মুখ্য। তাই তার সাথে সম্পর্কটা বেশ মায়া মমতার সম্পর্কেই পরিণত হয়। এ পর্যন্ত বেশ কয়েকজনের জন্যে বকুলের মালা পাঠানোর সুযোগ হয়েছে। তবে ঢাকায় থাকে আমার এক ভাগ্নি, মনোয়ারা তার নাম তার মেয়েটা সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি হোম ইকোনোমিক্স কলেজে অনার্সে ভর্তি হবার কথা শুনেছিলাম, গ্রেফতারের আগে। মনে হল, তার জন্যে একটা কি পাঠাতে পারি? বিপ্লবকেও বললাম, ফুলতো শেষের দিকে, আর একটা মালা করা যায় কিনা? গতকাল হাঁটতে হাঁটতে অমৃত বেশ কিছুক্ষণ আমার সাথে চলতে থাকে। আমি হঠাৎ করে বলে ফেললাম, ফুল তো এখনও দেখা

www.pathagar.com

যাচ্ছে, আমার আর একটি নাতনির জন্যে একটা মালা পাঠাতে চাই। অমৃত বলল, কিছু ফুল গতকাল সে কুড়িয়ে দিয়েছে। গতরাতে তিনটায় উঠে দেখি আমার রুমের দরজার সামনে ভেতরে একটা কাগজ পড়ে আছে, আমি ভাবছি, টিস্যু পেপার বোধহয় ও ভাবে পড়ে আছে। আমি উঠে বাথরুম থেকে ইস্তেঞ্জা ও অজু সেরে রুমে ফিরতেই দেখি রুমের দরজার সামনে বারান্দায় অমৃত দাঁড়িয়ে, সে বলল স্যার ঐ কাগজে ফুল যোগাড় করে আপনার জন্যে এনেছি ওটা বিপ্লবকে দিলে সে মালা বানিয়ে দেবে। ফজর নামাজ শেষে বিপ্লবকে ডেকে তার হাতে অমৃতের যোগাড় করে দেয়া ফুলগুলো তুলে দিলাম। বিপ্লবের নিজের কুড়ানো এবং অমৃতের দেয়া ফুল দিয়ে ইতোমধ্যেই বিপ্লব একটা মালা বানিয়ে এনেছে। অমৃতের সর্বশেষ দেয়া ফুলগুলো দিয়ে অপর একটি মালা বানাতে পারলে আজকের দেখায় আমার বেগম সাহেবের মাধ্যমে আমার ভাগ্নি মনোয়ারার মেয়ে মারিয়ার জন্যে একটা বকুল ফুলের মালা পাঠাতে পারব ভেবে বেশ ভাল লাগছে। অপরটি বেগম সাহেব নিজে নেবে অথবা তার পছন্দের কোন নাতি নাতনিকে দিয়ে দেবে। আমার মায়ের বিকল্প বড় মেয়ে মুহসিনার লেখায় দেখলাম, এভাবে ফুল যোগাড় করার বিষয়টা তার কাছে খুবই আবেগের। এবারের দুটোর একটা না হয় তাকেই রাখতে বলব। অপরটি দেবে তাদের প্রিয় মনো আপার মেয়েকে।

অমৃত লালের ব্যবহার আসলেই অমৃতের মত। শেষ রাতে ডিউটি রত অবস্থায় আমার তাহাজ্জুদের জন্যে উঠার নির্দিষ্ট সময়ে এসে এভাবে ফুল যোগাড় করে দিয়ে যাওয়ার মত আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার আমার মত মায়া মমতায় ভরা অন্তরের মানুষের পক্ষে কি করে ভুলা সম্ভব?

শেষ রাতে অমৃতের ডিউটি শেষে দিয়ে যাওয়া ফুলগুলো দিয়ে আর মালা বানানো সম্ভব হয়নি। বিপ্লব ফজরের পর থেকে নানা ব্যস্ততায় আর মালা বানানোর সময় করতে পারেনি। অবশ্য আগের দিন বিকেল বেলায় একটা মালা সে বানিয়ে এনেছিল। ওটার জন্যে কিছু ফুল সেলিম যোগাড় করেছিল। আর বেশির ভাগটা জোগাড় করে দিয়েছিল অমৃত।

গত বৃহস্পতিবার (১৬/৬/১১ তারিখে) পরিবারের লোকজন সাক্ষাতের জন্যে এসে পৌঁছে বেশ আগেই, প্রায় সকাল ১০টায়। কিন্তু আমার কাছে স্লিপ আসে ১২-৩০ মিঃ এরও বেশ কিছু পরে। আমি রওয়ানা করতেই জোহরের আযান শোনা গেল আশপাশের মসজিদগুলো থেকে। এবারে দেখা শেষে এসে দেখি আমাদের সাথী সঙ্গীগণ জোহরের নামাজ শেষ করেছেন। এখানে আমরা নিয়মিত জোহর আদায় করি দুপুর ১.১৫ মিনিটে আমার সাক্ষাতে যেতে দেরি হবার কারণে ফিরতে ফিরতে দেড়টা পার হয়ে যায়। সাক্ষাতের জন্যে যাবার আগে অজু করেই যাই যাতে এসেই জামাতে শরীক হতে পারি। কিন্তু সব সময় ফিরে এসে জামাত পাওয়া যায় না। যেমন আজকে পারলাম না।

আমার চিকিৎসার বিষয়টা নিয়ে আমার স্ত্রী, বড় মেয়ে এবং ছেলে মোমেন খুবই ব্যস্ত। বারডেমে অবশেষে গেলেও এবং বারডেম কর্তৃপক্ষ একটানা ১০ দিন ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থা করলেও এবং মেডিসিনের ডাক্তার ১০ দিনের জন্যে ভর্তি করে রেখে নিবিড় পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত, জেলকর্তৃপক্ষ কোন অজানা কারণে বা অদৃশ্য শক্তির ইশারায়, বারডেম হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমার চিকিৎসার বিষয়টি এভাবে উপেক্ষা করে গেলেন, তা বুঝতে না পারলেও মনে সৃষ্টি হয় বা জমা হয় অনেক প্রশ্নের। তাই আমি বিগত সাক্ষাতে স্ত্রী ও মেয়ে এবং ছেলেকে বলে দিলাম, আর চিকিৎসার জন্যে চেষ্টা তদবিরের দরকার নেই। জেলে থাকা অবস্থায় চিকিৎসা নিতে কেন যেন আমার মনও সায় দেয় না। পরিবারের সদস্যরা যারা আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল, তারপর প্রায় বছর ঘুরে এল আমি তাদের সান্নিধ্য ও সাহচর্য থেকে বঞ্চিত, তারাও আমার সান্নিধ্য এবং সাহচর্য থেকে বঞ্চিত, এমতাবস্থায় তাদের মনের কষ্ট আমার চেয়েও অনেক বেশি, এটা আমি প্রতিবার সাক্ষাতের সময় হৃদয় দিয়ে অনুভব করি। কিন্তু জেলখানায় মানবিকতার কোন স্থান নেই। আইন কানুনও প্রয়োগ হয় দুর্বল বা ভদ্র লোকদের উপর, যারা স্বেচ্ছায় আইন মেনে অভ্যস্থ। বাকি, যাদের থেকে কোন ভয়ের কারণ আছে, অথবা যাদের কাছ

www.pathagar.com

থেকে কিছু অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা লাভের সম্ভাবনা বা আশা আছে, তাদের ব্যাপারে আইন কানুনের প্রয়োগের কোন প্রশ্নই উঠে না। গতকাল দুপুরে ও রাতের খাবারের সময় একজনের এলাকার নাম করা ছানার মিষ্টি খেতে অনুরোধ করলে, আমি সে অনুরোধটা রাখতে পারলাম না। ঐ মিষ্টির প্যাকেট দুপুরে ও রাতে দু'বার টেবিলে আসে আর সাথে সাথে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে আমার ছোট মেয়ে খাদিজার অশ্রুসজল চেহারা। সে তার স্বামীর সাথে লন্ডনে থাকে। কিছু দিনের জন্যে দেশে এসেছিল, প্রায় দুই তিন সপ্তাহ থেকে ফিরে চলে গেছে লন্ডনে। যাবার আগে সাপ্তাহিক সাক্ষাতের দিন অন্যদের সাথে সেও এসেছিল। সাথে এনেছিল তার শ্বশুর বাড়ির এলাকার একটা বিশেষ মিষ্টি 'মালপোয়া'। শুকনো খাবার যদি আনা বৈধ হয়, তাহলে এটাও শুকনো খাবারের মধ্যেই পড়ে, এটা ঘরে তৈরি কোন খাবার ছিল না, দোকান থেকে কেনা, দোকানের প্যাকেটে করেই আনা। কিন্তু আমার মেয়েটার চোখের পানি তাদের পাষাণ হৃদয়ে কোন দাগ কাটতে পারেনি। তারা ওটা ফিরিয়ে দেয়। এরপর থেকে আর কারো আনা এই ধরনের খাবার টেবিলে দেখলেই আমার চোখে পানি আসে। এবং আমার ছোট মেয়েটার অশ্রুসজল চেহারাটা সামনে ভেসে উঠে। গতকাল দুপুরে এবং রাতে মিষ্টির পাশাপাশি একজনের বাসার রান্নার ইলিশের একটা টুকরোও বিপ্লব জোর করে আমার প্লেটে দিয়ে দিল। আমি অবশ্য রাতে রুটি খাই। রুটির সাথে মাছের মিশ্রণটা তো এমনিতেও স্বাভাবিক নয়। তারপর বাসার রান্না খাবার, কারো আসে, কারো আসতে পারে না, এসব প্রশ্ন মনে নিয়ে এটা গ্রহণ করা আমার মন কিছুতেই সায় দেয় না।

১৭ই জুন বিকেলের দিকে শব্দ পেলাম বিপ্লবের কণ্ঠে, মুজাহিদ সাহেবের নারায়ণগঞ্জ থেকে কেন্দ্রীয় কারাগারে গেটে এসে গেছেন, তার থাকার ব্যবস্থা করার জন্যে সিআইডি জমাদার তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে গেছে। আওয়াজ শুনে আমি রুম থেকে বের হতেই দেখলাম, মুজাহিদ সাহেব আসছেন। ২৬ সেলের রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছেন, আমি বারান্দার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে তাকে রিসিভ করলাম। কোন মামলায় হাজিরার জন্যে না কি জন্যে আনল, জানতে চাইলে মুজাহিদ সাহেব জানালেন, বারডেমে চিকিৎসার জন্যে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ২০ শে এপ্রিল ট্রাইব্যুনাল যে অর্ডার জনাব মাওলানা সাঈদী সাহেবের জন্যে দিয়েছিলেন ঐ একই অর্ডার ২১ শে এপ্রিলে আমার, মুজাহিদ সাহেব, কামারুজ্জামান এবং মোল্লা সাহেবের জন্যে দিয়েছিল। কিন্তু ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কর্তৃপক্ষ নাকি সেভাবে কোন নির্দেশনা পায়নি। ঐ একই নির্দেশনার আলোকে নারায়ণগঞ্জ জেলকর্তৃপক্ষ মুজাহিদ সাহেবকে বারডেমে চিকিৎসার উদ্দেশে ঢাকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় কারাকর্তৃপক্ষ এমনটি আমার জন্যে করতে রাজি হয়নি। ডাক্তারদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় আমাকে একদিন বারডেমে পাঠালেও বারডেমের চিকিৎসকদের ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী আমার চিকিৎসা হতে দেয়নি। দশদিনের ফিজিওথেরাপির কোর্স, তার মধ্যে একদিন মাত্র থেরাপি নেয়ার পরে তা বন্ধ করে দেয়ায় ঐদিনের থেরাপিটা যেমন অর্থহীন হয়ে গেল, তেমনি ঐদিনের চিকিৎসা বাবদ অর্থব্যয়টা গচ্চা গেল। মুজাহিদ সাহেবকে নারায়ণগঞ্জ থেকে চিকিৎসার জন্যে ঢাকায় পাঠানোর পর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাকর্তৃপক্ষ সম্ভবত একটু বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছে। কারণ একই অর্ডারে আমার চিকিৎসাও হওয়ার কথা। কিন্তু তারা অজানা কোন কারণে, ইচ্ছায় হোক, আর অনিচ্ছায় হোক তারা আমার ব্যপারটা ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দিয়েছিল। দায়সারা ভাবে একদিন নিলেও যাদের কাছে নেয়া হল, তাদের কথামত চিকিৎসা নিতে দেয়া হল না। এখন তো ঐ একই অর্ডারের আওতায় মুজাহিদ সাহেবকে নারায়ণগঞ্জ জেল কর্তৃপক্ষ বারডেমে চিকিৎসা নিতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এটাতো আর তারা ঠেকানোর অবস্থানে নেই। এরপর কি আমার চিকিৎসার ব্যাপারে কোন প্রশ্নই উঠবে না? অবশ্যই উঠবে এবং কারা কর্তৃপক্ষের আন্তরিকতা সম্পর্কে অর্থাৎ তাদের কোন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কোন ভিন্ন নির্দেশনা আছে কিনা সে প্রশ্নও থেকে যাবে। উনারা মুখ রক্ষার জন্যে আমাকেও পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারে। অথবা চক্ষু লজ্জার ধার না ধেরে নীরবে আমার ব্যাপারটা পাশ কাটিয়ে যেতে পারে।

www.pathagar.com

গ্রেফতারের পর থেকেই আমার চিকিৎসা ফিজিওথেরাপির ব্যাপারে অনুরোধ করে আসছিলাম। ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক সাহেব নিজে এসে এ ব্যাপারে কোর্ট অর্ডারের কথা বলে গিয়েছিলেন, তার নিকট জেল কর্তৃপক্ষ উক্ত অর্ডার প্রাপ্তির কথা আদৌ স্বীকার করেনি, এবং আমার চিকিৎসার বিষয় মোটেই আমলে নিতে চায়নি। গত ঈদুল আজহার ১০ দিন আগে ডান পায়ের হাঁটুতে ও গোড়ালির জয়েন্টে ভীষণ জ্বালাযন্ত্রণা শুরু হওয়ার পর, আমাদের কারাগারের সাথী রফিক সাহেব নিজের চিকিৎসার জন্যে কারা হাসপাতালে গিয়ে, কারা হাসপাতালের সহকারী সার্জন জনাব শামসুদ্দীনকে আমার বিষয়টা খুলে বলেন। উনার বক্তব্য অনুযায়ী, শামসুদ্দীন সাহেব রথীন্দ্রনাথ কুন্ডু বাবুকে দিয়ে জেলকর্তৃপক্ষকে বলতে বলেন, উনারা বললে নাকি কর্তৃপক্ষ ভালভাবে নেয় না। রফিক সাহেব শামসুদ্দিন সাহেবকে বলেছিলেন উনি কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়ে নিজেকে অসুস্থ দেখাচ্ছেন না। তিনি আসলেই অসুস্থ এবং খুবই কষ্ট পাচ্ছেন। এই কথার প্রেক্ষিতেই ডা. শামসুদ্দিন সাহেব কুন্ডু বাবুকে দিয়ে বলানোর পরামর্শ দেন। এ পরামর্শের পেছনে কোন রহস্য যে নিশ্চয়ই আছে এটা রফিক সাহেব নিজেও তাৎক্ষণিকভাবে বুঝেছেন এবং আমাকেও বুঝাতে প্রয়াস পেয়েছেন। যাহোক কুন্ডু বাবুকে কল দিয়ে আমার পুরো অবস্থা বলার পর, ৩/৪ মাসের ব্যবধানে পিজি থেকে ফিজিক্যাল মেডিসিনের ডাক্তার এবং কার্ডিওলজির একজন স্বনামধন্য প্রফেসর সজল ব্যানার্জি আমাকে দেখে যান। এবং ব্লাড প্রেসারের ওষুধ পরিবর্তনসহ অনেকগুলো ওষুধের প্রেসক্রিপশন দিয়ে যান। এখনও সেই অনুযায়ী নিয়মিত ওষুধ খেয়ে যাচ্ছি। তবে বারডেমে মেডিসিনের প্রফেসর বলেছেন এতগুলো ওষুধ চলছে, এর কোনটা চলতে থাকবে, কোনটা বাদ দিতে হবে, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিতে হলে রোগীকে ১০ দিনের জন্যে বারডেমে ভর্তি হয়ে থাকতে হবে। এবং ক্লোজ মনিটরিংয়ের মাধ্যমেই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে কেন্দ্রীয় কারাকর্তৃপক্ষ বারডেমের চিকিৎসকদের কোন সিদ্ধান্তই বাস্তবায়নে সহযোগিতা করলেন না বা করতে পারলেন না। এখন নারায়ণগঞ্জ থেকে মুজাহিদ সাহেবকে সেখানকার জেল কর্তৃপক্ষ একই কোর্ট অর্ডারের ভিত্তিতে বারডেমে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে পাঠানোর পর, আমার ব্যাপারে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাকর্তৃপক্ষ কী সিদ্ধান্ত নেয়, তাই দেখার অপেক্ষায় আছি। আমার নিজের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে আর কাউকে অনুরোধ করার ইচ্ছা নেই, ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবেই আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়েছি।

"তিনিই আমার খানাপিনার ব্যবস্থা করেন এবং যখন অসুস্থ হয়ে পড়ি, তখনও তিনিই শেফা বা আরোগ্য দান করেন।" সুতরাং পরিবারের লোকদেরকেও বলে দিয়েছি, কারাগারে থাকা অবস্থায় আর চিকিৎসার জন্যে দেন দরবারের দরকার নেই। আল্লাহ যদি মুক্ত হয়ে বাইরে যাবার সুযোগ দেন, তাহলে নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছার ভিত্তিতে চিকিৎসা নেয়া যাবে।

সত্যি সত্যি মুজাহিদ সাহেবকে নারায়ণগঞ্জ জেল কর্তৃপক্ষ বারডেমে চিকিৎসার জন্যে পাঠানোর পর, আমাকে পুনরায় গতকাল ১৯ শে জুন বারডেমে পাঠানো হল। আমি ভেবেছিলাম, এখানে একটানা দশদিন ফিজিওথেরাপিতে দেয়ার জন্যে এবং ক্লোজ মনিটরিং-এর জন্যে সেদিন মেডিসিনের ডাক্তার ১০ দিনের জন্যে ভর্তির যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, সেমতে আজকে আমাকে ভর্তি করা হবে। এজন্যে যৎসামান্য প্রস্তুতিও নিয়ে গিয়েছিলাম। এখানে পৌঁছার পর প্রথমে থেরাপি নিলাম। আর ভর্তির কাগজপত্র নিয়ে অন্যরা আর,পি,সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে ব্যবস্থা করার জন্যে গেলেন। শুধু ফিজিওথেরাপির জন্যে ভর্তি করতে আর,পি,সাহেব নাকি রাজি হননি। আর সেদিনের কোন কাগজে নাকি ভর্তির কথা লেখা নেই। এজন্যেই ভর্তির প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়।

আমার ফিজিওথেরাপির কাজ শেষ হবার পর কাগজ দেখতে চাইলাম। সেদিনের বারডেমের ডাক্তার জহুর সাহেব স্বাক্ষরিত বারডেমের প্যাডে পরিষ্কার 'হসপিটালাইজড' করার কথা উল্লেখ আছে। উক্ত কাগজসহ পরে ওখানকার একজন ডাক্তার গেলেন আরপির সাথে দেখা করতে। ফিরে এসে বললেন, ভর্তি করা হবে, তবে আজ আর কোন সিট খালি নাই। ফিজিওথেরাপি নিতে এসে পরে দেখা যাবে। আমি পরে

www.pathagar.com

জেনে বেশি বিস্মিত হলাম, আরপি সাহেবের কাছে কাগজপত্র নিয়ে ডেপুটি জেলার আবু মুসা সাহেব নিজে না গিয়ে, একজন কারারক্ষীকে পাঠিয়েছিলেন। ফলে আরপি সাহেব তাকে গুরুত্ব দেয়া হয়ত সমীচীন মনে করেননি। কারাকর্তৃপক্ষ গুরুত্ব দিলে অবশ্যই এব্যাপারে দায়িত্বশীল ডেপুটি জেলার নিজেই যেতেন। তার পরও যদি না হত, তাহলে আমার মনে কোন প্রশ্ন সৃষ্টি হত না। যাহোক তকদিরের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে যে কোন অবস্থায় আল্লাহর কাছে সবর ও শোকরের তৌফিক চেয়ে বারডেম থেকে কেন্দ্রীয় কারাগারে ফিরে এলাম। জোহরের নামাজটা বারডেমেই আদায় করে এসেছিলাম। কারাগারে আমাদের সেলে পৌঁছতে পৌঁছতে বিকেল তিনটা পার হয়ে যায়। তাড়াহুড়া করে দুটো খেয়ে নিয়ে বিশ্রামের চেষ্টা করলাম। কিন্তু অনেকক্ষণ শুয়ে থাকা সত্ত্বেও ঘুমোতে পারলাম না।

ভেবেছিলাম আমাকে আবার নিতেও পারে। কিন্তু মুজাহিদ সাহেব যেহেতু কয়েকদিন যাবত নারায়ণগঞ্জ থেকে এসে অপেক্ষায় আছেন। অতএব আজ তাকে বারডেমে নেয়া হল। আমি নিশ্চিত হলাম, আজ অন্তত আর যাওয়া হচ্ছে না। আমার মন অনেক দিন থেকেই বলছে, আর চিকিৎসার তদবির নিয়ে পরিবারের বা সংগঠনের কেউ যেন ব্যস্ত না হয়। আল্লাহ হায়াতে বাঁচিয়ে রাখলে, আর মুক্ত মানুষ হিসাবে বাইরে যাওয়া তকদিরে থাকলে, পছন্দের যেকোন হাসপাতালে চিকিৎসা নেয়া যাবে। কারাগারে বন্দি অবস্থায় চিকিৎসা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি আমার নিজেরও খুব খারাপ লাগে। তাছাড়া বেশ কষ্টও হয়।

মুজাহিদ সাহেব বিকেল ৩টার দিকে ফিরে এলেন। আমি দুপুরের খাওয়ার পর অভ্যাস অনুযায়ী বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। তার আসার পর খবর নেয়ার জন্যে গিয়ে দেখি তিনি নামাজে দাঁড়িয়েছেন। এরপর আসরের আগ পর্যন্ত আর আলাপের সুযোগ আছে বলে মনে হল না। আসরের জন্যে উঠার একটু আগেই কারা হাসপাতালের ডা. রফিক সাহেব এলেন। উনার সাথে আমার পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে কিছুটা শলাপরামর্শ করলাম। আসলে এ ব্যাপারে, উনারা কেবল সুপারিশ করার মালিক, মূল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন কারা কর্তৃপক্ষ। আমি উনাকে এতটুকুই অনুরোধ করলাম, কারাকর্তৃপক্ষ যেন বারডেমের সাথে যোগাযোগ করে, ভর্তি হবার সম্ভাবনা নিশ্চিত জেনেই আমাকে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। তাছাড়া বিষয়টা যেহেতু নিজ খরচের ব্যাপার, তাই আমার পরিবারের সাথে একটু ভালভাবে পরামর্শও করে নিতে চাই। আমার সাক্ষাৎ আগামী বৃহস্পতিবারে। অতএব শনিবারের আগে যেন আমাকে পাঠানোর ব্যবস্থা না করে।

এদিকে আমার ঘনিষ্ঠতম সাথী মাওলানা মুহতারাম সাঈদী সাহেবের পরামর্শ হল, বারডেমে ভর্তি না হওয়া। উনি ইব্রাহিম কার্ডিয়াকে থেকে এসেছেন। নিরাপত্তার দৃষ্টিতে ইব্রাহিম কার্ডিয়াকের ব্যবস্থা নির্ভরযোগ্য। কিন্তু বারডেমে নিরাপত্তার ব্যাপারটা অতটা নির্ভরযোগ্য নয়। বরং সর্বসাধারণের যাতায়াতের সুযোগ থাকার কারণে কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। এ বিষয়ে পরিবারের সদস্যদের সাথে আলাপ না করে ওখানে ভর্তি হওয়া আপাতত আমারও ঠিক মনে হচ্ছে না। তাই বৃহস্পতিবারের সাক্ষাতের পরে যে কোন দিন পাঠানোর ব্যবস্থা করার জন্যে রফিক সাহেব যেন কারাকর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে নেন, এ দায়িত্বটুকু তাকে নিতে অনুরোধ করায় তিনি রাজি হলেন।

মুজাহিদের সাথে আসরের আগেই আলাপ হল। ইব্রাহিম কার্ডিয়াকের ফাউন্ডেশনে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী হিসাবে তার নাম এখনও আছে বিধায় সেখানে তার অবস্থানটা ভিন্ন। তাকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে তারা বেশ যত্ন সহকারে। তবে তার হার্টের কোন সমস্যা না থাকায় ওখানে ভর্তির প্রয়োজন হয়নি। এ চিকিৎসা নারায়ণগঞ্জেই ভাল হবে বিধায় চলে এসেছেন। আমার ব্যাপারে তারও পরামর্শ, শুধু ফিজিওথেরাপির জন্যে ওখানে ভর্তি না হওয়া। আমি আগামী বৃহস্পতিবারের সাক্ষাতের অপেক্ষায় রইলাম।

আমার প্রয়োজনীয় মূল চিকিৎসা ফিজিওথেরাপি, গ্রেফতারের পর থেকে জেল কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে কারা হাসপাতালের ডাক্তারদেরকেও এটাই জানিয়ে আসছি। ডিবিতে রিমান্ড চলাকালে পুলিশ হাসপাতাল থেকে আগত ডাক্তারদেরকেও এ সমস্যার কথা বুঝানোর চেষ্টা করেছি। অবশেষে আমাদের আইনজীবী

www.pathagar.com

ব্যারিস্টার আঃ রাজ্জাক সাহেব এ ব্যাপারে কোর্টের অর্ডারের কথাও নিজে কারাকর্তৃপক্ষকে জানিয়ে যান। কিন্তু ঐ কোর্ট অর্ডারের কোন অস্তিত্বের কথা আজ পর্যন্ত কারাকর্তৃপক্ষ স্বীকার করেনি। এরপর কারা হাসপাতালের ডাক্তারদের সুপারিশ, আমার কোমরের ব্যথা পায়ে রেডিয়েট করার পর ২ বার পিজি থেকে ফিজিক্যাল মেডিসিনের ডাক্তার আনা হয়। একবার কার্ডিওলজির প্রফেসর সজল ব্যানার্জি বাবুকেও আনা হয়। তারা আমাকে অনেকগুলো ওষুধের কথা লিখে দিয়ে গেছেন। প্রথম পর্যায়ে ফিজিক্যাল মেডিসিনের ডাক্তার তিন মাসের জন্যে ওষুধের ব্যবস্থাপত্র লিখে দিয়ে যায়। সেটা শেষ করেছি, তাতে হাঁটু ও গোড়ালীর জয়েন্টের জ্বালা যন্ত্রণাটা অবশ্য কমেছে, এ জন্যে আল্লাহর শুকরিয়া জানাই, ডাক্তারদেরকে এজন্যে ধন্যবাদ।

পরবর্তী পর্যায়ে ব্লাড প্রেসারের হঠাৎ উঠানামার জন্যে, কার্ডিওলজির স্বনামধন্য প্রফেসর সজল ব্যানার্জির প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধে এ পর্যন্ত মোটামুটি ব্লাড প্রেসারের অস্বাভাবিক উঠানামা প্রায় নিয়ন্ত্রণে এসেছে বলা চলে। তবে তার প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী অনেক বেশি ওষুধের ব্যাপারে বারডেমে ভর্তি হবার কথা বলেছিলেন। কারাকর্তৃপক্ষের ক্লিয়ারেন্স না হওয়ায় সেদিন ভর্তি হওয়া যায়নি। আজ পর্যন্তও হয়নি। গত ১৯ শে জুন বারডেমে ভর্তির প্রস্তুতি নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেন যে হয়নি এ প্রশ্নের উত্তর এখনও পাইনি। হয়ত কোন দিনই পাওয়া যাবে না।

এখানে কোন সমস্যা নিয়ে জেলার বা জেল সুপারের সাথে এখন আর কেন যেন আলাপের কোন সুযোগই পাওয়া যাচ্ছে না। প্রথম দিকে কিন্তু এমন ছিল না। উপর থেকে তারা কোন নেতিবাচক নির্দেশনা পেয়ে এমনটি করছেন, নাকি সরকারের সুনজরে থাকার জন্যে আমাদেরকে এড়িয়ে চলছেন, তা একমাত্র আল্লাহ আলেমুল গায়েব জানেন। আমাদের আর তেমন কিছু করার আছে বলে মনে হয় না। একটু কোন সমস্যা নিয়ে অভিযোগের সুরে কথা বললেই নাকি হিতে বিপরীত হতে পারে। এমনকি যখন একজন ডেপুটি জেলারের কণ্ঠে নিজে এটা শুনলাম তখন তো আর কোন সমস্যা নিয়ে আলোচনার চিন্তা করাই ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হল। তবে মানুষ তো কষ্টের কথা কোথাও বলার তো একটা জায়গা থাকতে হয়। কষ্টের কথা কাউকে মন খুলে বলতে পারলেও আর কিছু না হোক কষ্টের বোঝা একটু লাঘব হয়। কিন্তু সেই সুযোগ, এবারে জেলে এসে মোটেও পাচ্ছি না।

১/১১ এর প্রেক্ষাপটে দুবার জেলে এসেছিলাম। একবার ৫৬ দিন ছিলাম। আরেকবার ১০ দিন ছিলাম, তখন ডিআইজি, সুপার জেলার কাউকে না কাউকে পাওয়াই যেত। তখন ১৬ দিন পিজি হাসপাতালে ছিলাম। সেখানেও ২ জন ডিআইজি আলাদা আলাদা ভাবে দেখা করেছেন। এবারে দুই ঈদের দিনে উনাদের সাথে আনুষ্ঠানিকতামূলক সাক্ষাৎ ছাড়া আর কোন সাক্ষাতের সুযোগই হচ্ছে না। সুপারের সাথে একেবারে প্রথম দিকে চিকিৎসা নিয়ে কিছু কথা হলে, তিনি তাদের সীমাবদ্ধতার কথা জানালেন। ২/৩ মাস যাবত সুবেদারের মাধ্যমে জেল সুপারের সাথে কথা বলার জন্যে সময় চেয়ে কোন উত্তর পাচ্ছি না। উনারা নিজে এসে দেখা করুন তাও কোন দিন বলিনি। উনারা আসলে ভাল, তবে আমি নিজে অফিসে গিয়ে সাক্ষাৎ করে আমার সমস্যা বলতে চাই। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন উত্তর নেই। আমার বারডেমে চিকিৎসা নিয়ে যে খেলাটা দেখলাম তাতে আর কাউকে কিছু বলার আমার রুচি নেই। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের ভাষায়-

"আমার মনের দুঃখ ব্যথা ও চিন্তা দুশ্চিন্তার কথা কেবল মাত্র আল্লাহর দরবারেই পেশ করতে চাই।" আল্লাহর তো ঘোষণা আছে, 'কষ্টের পরেই সুখ, অবশ্যই দুঃসময়ের পরে আসবে সুসময়।' আল্লাহর এ ঘোষণার প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখি।

'এই সুদিন আর দুর্দিনের ব্যাপারটি আমিই আবর্তিত করে থাকি মানুষের মাঝে।' দেশের সার্বিক পরিস্থিতির আলোকে কারা কর্তৃপক্ষ হয়ত মনে করেছে, আজ আমাদের দুঃসময় যাচ্ছে, এর বোধহয় অবসান হবে না। তাই যারা এখন সুসময় ভোগ করছেন, তাদের মনোরঞ্জনের জন্যে, যা যা দরকার তাই

www.pathagar.com

তারা করে যাচ্ছেন। অবশ্য তারা নিজেরাই ইতিহাসের অনেক চড়াই-উৎরাই এর সাক্ষী। কিন্তু কেন যেন ইতিহাস থেকে শিক্ষা কেউই নিতে চায় না। আমরা আল্লাহর রহমতের প্রতি পূর্ণ প্রত্যয় নিয়ে বুকে পাথর চাপা দিয়ে ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করছি। আল্লাহর শিখানো ভাষায় বার বার দোয়া করছি-

"হে আমাদের রব আমাদেরকে ব্যাপকভাবে ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা দাও, আমাদেরকে দৃঢ়তার সাথে ছাবেতে কদমীর সাথে পরিস্থিতি মুকাবিলার তৌফিক দাও, আর বিজয় দান কর কুফরী শক্তির উপর।"

১৯ জুন ২০১১ তে বারডেমে গিয়েছিলাম। ঐদিন দাঁতের ডাক্তার (কারাহাসপাতালের) আমার জন্যেই এসে আমাকে না পেয়ে ফিরে গেছেন। মুজাহিদ সাহেবকে দেখার জন্যে আজকে তার আসার কথা। যদি আসেন, তখন আমার দাঁতের অবস্থা দেখানোর আশায় অপেক্ষা করছি। আমার ঘড়িতে এখন সকাল ১১টা অতিক্রম করছে। এখনও আসেননি। দুপুরের মধ্যে যে কোন সময় এসে যেতে পারেন। মুজাহিদ সাহেব, তাকে দাঁত দেখানোর সুযোগ না পেলে, নারায়ণগঞ্জে দাঁতের চিকিৎসা করাবেন। কারণ উনার আস্থা সৃষ্টি হয়েছে, নারায়ণগঞ্জের দাঁতের ডাক্তারসহ অন্যান্য ডাক্তারদের উপর নির্ভর করা যায়। আমাকে প্রথম বারে বারডেমে নেয়ার পরে, আর কেন নেয়া হল না, এর উত্তরে একজন ডাক্তার বললেন, ভর্তির অর্ডার না থাকার কারণেই পাঠানো হয়নি। আর এবার পাঠালেও ভর্তির জন্যে লেখা অর্ডারটি সাথে নিয়ে, বারডেমের আরপির সাথে জেলকর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি দেখা না করার কারণেই, আরপি ভর্তির ব্যাপারটি গুরুত্ব দিতে পারেননি। অথবা মনে করেছেন, জেল কর্তৃপক্ষই গুরুত্ব দেয়নি।

ভারতীয় সেনা প্রধান এবার আমাদের সেনাবাহিনীর একটি নতুন ব্যাচের পাস আউট অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদানের জন্যে পাঁচদিনের সফরে বাংলাদেশে এসেছেন। এ ধরনের প্রোগ্রামে দেশের প্রধানমন্ত্রীই সব সময় প্রধান অতিথি হয়ে থাকেন। ভারতীয় সেনা প্রধান নাকি মুক্তিযুদ্ধের সময় এ অঞ্চলের কমান্ডে ছিলেন, তাই তার আগমনে নাকি 'সেনাবাহিনীর নতুন অফিসারদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে' এই মর্মে একটি জাতীয় দৈনিকে মন্তব্য দেখলাম। আসলে আমরা দেশের শেষ পরিণতি কী দেখতে পাচ্ছি, জেলে থেকেও নিজের জন্যে নয়, দলের জন্যে নয়, দেশের এই অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়েই মাঝে মধ্যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। আল্লাহ দেশের মাটি ও মানুষকে নিকট প্রতিবেশী দেশটার আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী তথা আগ্রাসী ভূমিকা থেকে হেফাজত করুন। জেল জীবনে আল্লাহর দরবারে একান্তে যখন দেশের জন্যে হাত তুলি তখন এই বিষয়টিই প্রাধান্য পায় অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে। আমাদের আসল অপরাধতো এটাই।

আওয়ামী লীগ ২০০৮-এর ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনে মইন ইউ আহমেদ ও ফখরুদ্দীনের ডিজিটাল কারচুপির ভিত্তিতে ক্ষমতায় আসার অল্পদিনের মধ্যে সিলেটে টিপাইমুখ বাঁধ দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে। জামায়াত-এর পরিণতি সম্পর্কে দেশবাসীকে অবহিত ও সচেতন করার জন্যে ঢাকায় সফল জনসভার আয়োজন করে। সিলেটে নৌ মার্চের কর্মসূচি নিয়ে বৃহত্তর সিলেটবাসীকে ভারতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে বৃহত্তর সিলেটবাসীর কী সর্বনাশ হবে, গোটা বাংলাদেশের উপর এর কী প্রভাব প্রতিক্রিয়া হবে, এ ব্যাপারে গণসচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগকে ভারত ভাল চোখে দেখেনি। ভারতের আগ্রাসী, আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠের অস্তিত্ব তাদের কাছে অসহনীয়। এতএব ৪০ বছর আগের নিষ্পন্ন ইস্যুকে অজুহাত হিসাবে দাঁড় করিয়ে এই প্রতিবাদী কণ্ঠ স্তব্ধ করার জন্যে, তথাকথিত যুদ্ধাপরাধী ইস্যু থেকে শেষ পর্যন্ত মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের, বানোয়াট অভিযোগ সৃষ্টি করে দেশের সংগঠিত ইসলামী শক্তিকে নির্মূল করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের ইতিহাস ঐতিহ্যের ব্যাপারে সামান্যতম ধারণা যাদের আছে, তারা নিশ্চয়ই এটা উপলব্ধি করবেন, বাংলাদেশের মানুষেরা ভারতের বিএসএফের অত্যাচারে অতিষ্ঠ। ভারতীয় আগ্রাসনকে আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদকে কখনও বিনা প্রতিবাদে ছেড়ে দেবে না। জামায়াতের কয়েকজন নেতাকে দুনিয়া থেকে বিদায় করলেই, বাংলাদেশ থেকে ইসলামী শক্তি উৎখাত হয়ে যাবে না। বরং

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ ও ভারতের এই যৌথ উদ্যোগ, একদিন তাদের জন্যেই বুমেরাং হলে সেটা কোন বিস্ময়ের ব্যাপার হবে না।

১৯ শে জুন আমাকে বারডেমে নেয়ার কারণে কারা হাসপাতালের দাঁতের ডাক্তার এসে ফিরে গেছেন। আজকে মুজাহিদ সাহেবের জন্যে আসার কথা থাকায় আমি সুযোগটা নিব ভাবছিলাম। কিন্তু এখন প্রায় দুটো বাজে, তিনি আসেননি। আর সারা দিনে আসার সম্ভাবনা আছে কিনা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। কারাগার এমনই জায়গা যেখানে যখন যে প্রয়োজন অনেক ক্ষেত্রেই এখন তা পাওয়া যায় না। আজকে আমাদের আব্দুল কাদের মোল্লা সাহেবের ছোট ভাই মঈনুদ্দিন, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবার সংবাদ শুনে খুবই ভাল লাগল। বেচারা এর আগে কয়েকবার জিতেও জিততে পারেনি। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের তুলনায় বিএনপি বেশ ভাল করছে বলে, পত্রিকায় খবর দেখে দেশের জনমতের একটি প্রতিফলন বোঝা যাচ্ছে। জামায়াতের ব্যাপারে পত্রিকায় তেমন ভাল কিছুর আভাস না থাকলেও (যে পত্রিকাগুলো আমরা কারাগারে পাই) বিভিন্নভাবে যে খবর পাচ্ছি, তাতে অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় জামায়াত ভালই করছে, বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চেয়ারম্যান এবং মেম্বার নির্বাচিত হয়েছে। আসলে স্থানীয় নির্বাচনে আদর্শিক দলের জন্যে আঞ্চলিকতাসহ বিভিন্ন সুযোগগুলো কাজে লাগানো যায় না বিধায়, জামায়াত ইতঃপূর্বে এক্ষেত্রে ইচ্ছা থাকলেও তেমন গুরুত্বসহ অংশ নিতে পারেনি। এবারের ইতিবাচক সংবাদ বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। আশা করি এতে জামায়াতের ভাব-মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ আমাকে ছয়টি ছেলে মেয়ে দান করেছেন। দুটি মেয়ে চারটি ছেলে। ছেলে মেয়েদের সবাইকে সমান দৃষ্টিতে দেখি। সবার প্রতি মনের টানও এক ও অভিন্ন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও প্রথম সন্তান মেয়ে হবার কারণে এবং মেয়েটার মন তার আব্বুর প্রতি বেশী আবেগ প্রবণ হবার কারণে, সে নিজেই তার আব্বুর মনে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। তাই তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে আমি মাঝে মধ্যে বলে থাকি, তোমাদের পাঁচ ভাই বোন এক পাল্লায় আর মহসিনা একা এক পাল্লায় বসলে, মহসিনার পাল্লাটাই হবে ভারী। এটা অন্য কোন ছেলে মেয়ের প্রতি মায়া মমতার ক্ষেত্রে বিন্দু মাত্র তারতম্যের প্রতিফলন নয়, বড় সন্তান মেয়ে হবার কারণে, তাছাড়া তার মনটাও আমার মতই বেশি নরম হওয়া এর একটা অন্যতম কারণ। আমার মনে পড়ে তারেক যখন মালয়েশিয়ায় পড়ার জন্যে যাচ্ছিল, আমরা সবাই এয়ারপোর্টে তাকে বিদায় দিতে গিয়েছিলাম। বড় ছেলে আন্তর্জাতিক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছে এজন্যে তার মা এবং অন্যান্য ভাই বোন সবাই খুশি মনে তাকে বিদায় জানায়, কিন্তু সেই বিদায়ের মুহূর্তে চোখের কোণে পানি এসেছিল আমার এবং আমার বড় মেয়ে তারেকের বড় বোন মহসিনার। ভাইয়ের উচ্চ শিক্ষার্থে বিদায়ের মুহূর্তে যে মেয়ের চোখে পানি এসেছিল, সে তার আব্বার কারাবাসকে কিভাবে সহ্য করছে ভাবতেই আমি দুর্বল হয়ে যাই। যত চিন্তা দুশ্চিন্তা আমার তাকে নিয়েই। ইতোমধ্যেই সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় তার দুটো লেখায় তার মনে এই আবেগ ও অস্থিরতার প্রকাশ ঘটেছে। লেখা দুটো পড়তে গেলেই চোখ ভরে পানি আসে। মাওলানা মুহতারাম সাঈদী সাহেবকে ছোট ঐ লেখা দুটো পড়তে দিয়েছিলাম। উনি পড়ে মন্তব্য করলেন, মহসিনাতো আমাকেও কাঁদালো। আমি আল্লাহর কাছে হাত তুললেই বলে থাকি, আমার এবং আমার সাথী, সাথীদের পরিবার পরিজনের প্রতি, আমাদের স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার প্রতি হে আল্লাহ তুমি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাও, তাদের আবেগ অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য করে আমাদের সবাইকে সকল বিপদ আপদ বালা মুসিবত থেকে হেফাজত কর, সেই সাথে আমাদের অসংখ্য অগণিত কর্মী ভাই বোনদের আবেগ অনুভূতির দিকেও হে আল্লাহ তুমি তোমার রহমতের দৃষ্টিতে তাকাও এবং তাদের মনের সান্ত্বনার জন্যে আমাদেরকে ময়দানে তাদের সাথে মিলিত হওয়ার একাত্ম হয়ে কাজ করার সুযোগ করে দাও। কারাগারে পরিবারের সদস্য বা আত্মীয় পরিচয় ছাড়া আর কারো দেখা সাক্ষাতের সুযোগ নেই অথচ আমাদের জীবনের প্রতিদিনের খুব কম সময় থাকি পরিবার পরিজন বা

www.pathagar.com

আত্মীয়-স্বজনের সাথে। কর্মময় জীবনের প্রায় সবটা সময় যায় বা গিয়েছে যাদের সাথে, আইনী কারণে তাদের সাথে দেখা সাক্ষাতের সুযোগ নেই। তাই, আল্লাহর সমীপে প্রাণ উজাড় করে কাতর কণ্ঠে আরজ করি, আল্লাহ তোমার কুদরতি ব্যবস্থায় দ্রুত কারা প্রকোষ্ঠ থেকে আমাদের মুক্ত করে মাঠে ময়দানে কর্মী ভাইদের সাথে মিলে তোমার দ্বীনের পক্ষে শক্ত এবং সক্রিয় ভূমিকা পালনের তৌফিক দাও।

একটি ইংরেজী দৈনিকে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ' বিচারকে চ্যালেঞ্জের আওতামুক্ত রাখার জন্যে সংবিধানে সংশোধনী আনা হচ্ছে, মর্মে একটি বিশেষ প্রতিবেদন ছাপা হয়। গত সোমবারে কেবিনেট মিটিংয়ে সেটা অনুমোদিত হয়ে সংসদে উত্থাপিত হওয়ার কথাও উল্লেখ করা হয় উক্ত প্রতিবেদনে। কিন্তু কেবিনেটে যে সংশোধনী প্রস্তাব অনুমোদনের জন্যে পেশ করা হয়, বা যে প্রস্তাবটি পাস করা হয় তাতে উক্ত পত্রিকার চাহিদা মোতাবেক কিছু হয়েছে বলে মনে হল না। রহস্যজনকভাবে পত্রিকাটিতে কেবিনেট মিটিং-এ পরিকল্পনা মন্ত্রী ও সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের আহ্বায়ক জনাব এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) একে খোন্দকার সাহেবের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কিছু কথা কাটাকাটির রিপোর্টও ছাপা হয়। কেবিনেট মিটিংয়ের ভেতরের আলোচনা এভাবে বাইরে আসার কথা নয়। তবে ডেইলী স্টার পত্রিকাটির হাত অনেক লম্বা। তাদের পক্ষে সরকারের অভ্যন্তরের অজানা অনেক কিছু জানা এবং প্রচার করা সম্ভব। ডেইলী স্টার-এর রিপোর্টের সারমর্ম হল, 'তথাকথিত যুদ্ধাপরাধ' বিচার কার্যক্রমকে চ্যালেঞ্জমুক্ত করার জন্যে প্রয়োজনীয় সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় একে খোন্দকার সাহেব আপত্তি জানালেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খোন্দকার সাহেবের '৭৫ এর ১৫ই আগস্টের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেন। কথাটি যদি সত্যি হয়, তাহলে আগের দিনে বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়। আর তা হল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, জনগণ তো বিচার করে দিয়েছে। অর্থাৎ নির্বাচনে তার বিজয় এবং আমাদের পরাজয়কেই তিনি বিচার হিসাবে ধরে নিয়েছিলেন বা মেনে নিয়েছিলেন এবং অতিরিক্ত করার জন্যে তিনি ব্যক্তিগত আগ্রহী ছিলেন বলে মনে হয়নি। তার পিতার নিষ্পত্তি করে যাওয়া বিষয়টি এখন যেভাবে আবার ইস্যু হিসেবে উঠে এসেছে, এতে তার নিজের পিতার সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে উঠতে পারে।

তার পিতা মালেক মন্ত্রী সভার লোকদেরকে মুক্তি দিয়ে গেছেন। মরহুম নেতা শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব এর রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমদ সাহেব সংসদে রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও মরহুম শেখ মুজিবের উদারতার কথা বলতে গিয়ে বলেন, 'বঙ্গবন্ধু খান এ সবুর খান জেলখানা থেকে বের করার জন্যেই নিজে গাড়ী পাঠিয়েছিলেন। এভাবে '৭১ সালে পাকিস্তানের পক্ষ নেয়ার ক্ষেত্রে শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিরা যেখানে স্বয়ং মরহুম শেখ মুজিব এর নিজের উদারতায় মুক্তি পেয়ে গেছেন, সেখানে আমাদের মত ব্যক্তিদের বিচারের প্রশ্ন উঠে কী করে? আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছি, আমাদের প্রতিবেশী দেশটি সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম ও 'ঘাদানিক'দের মাধ্যমে এ বিষয়টি এ পর্যায়ে নিয়ে এসেছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে একটা বাধ্যবাধকতার মধ্যে ফেলে দেবার জন্যে। যেমন ১৯৯২ সালে এই 'ঘাদানিক'দের মাধ্যমে বিএনপিকে বাধ্য করা হয়েছিল, গোলাম আযম সাহেবকে গ্রেফতার করতে, যিনি '৯১ এর নির্বাচনের পর বিএনপিকে সরকার গঠনে বা ক্ষমতায় যেতে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। 'ঘাদানিক'দের পাতা ফাঁদে পা দিয়ে সে সময় বিএনপি রাজনৈতিকভাবে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছিল, আওয়ামী লীগের জন্যে ঘাদানিক এবং সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের পাতা ফাঁদে পা দেয়ার পরিণতি কী হতে পারে তা আল্লাহই ভাল জানেন। তবে কেবিনেটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একে খোন্দকার সাহেবের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে যে কথাগুলো বলেছেন তা যদি সত্য হয়, তাহলে ধরে নেয়া যায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এব্যাপারে কিছুটা হলেও সজাগ আছেন। আমরা আশা করব, তিনি এব্যাপারে দায়-দায়িত্বহীন মহলের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে নিজের পিতার উদারতাকে ম্লান হতে দেবেন না। দেশগড়ার স্বার্থে, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বার্থে সংঘাত ও সংঘর্ষ ও বিভাজনের রাজনীতি পরিহার করে ঐক্য ও সংহতির পথে দেশ ও জাতিকে নিয়ে

www.pathagar.com

যাওয়ার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন। দেশের গঠনমূলক গণতান্ত্রিক শক্তি হিসাবে জামায়াতের যথাযথ মূল্যায়ন করবেন। যদি সত্যি তিনি দেশকে জঙ্গিবাদমুক্ত দেখতে চান বা করতে চান তাহলে গণতান্ত্রিক রাজনীতির মূল ধারার সাথে সব সময় সম্পৃক্ত ছিল, যাদের সাথে তিনি নিজেও পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ উভয়ভাবে সংযোগ রক্ষা করে রাজনীতি করেছেন, এমন কি ক্ষমতায় আসতে সুযোগও পেয়েছেন এমন সব ইসলামী সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে যার তার কথায় কান দিয়ে কোন নেতিবাচক পদক্ষেপ নেয়া থেকে বিরত থাকবেন।

জামায়াতের শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনেকেরই অভিযোগ ২০০৮-এর ২৯ শে ডিসেম্বরের নির্বাচনই হতে পারত না যদি জামায়াত নিজে নির্বাচনের ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত না নিত এবং বিএনপিকে নির্বাচনে আসার ব্যাপারে ভূমিকা না রাখত। কেবল জামায়াতের কারণেই বিএনপি নির্বাচনে এসেছিল, কথাটা ষোল আনা সত্য নয়, তবে জামায়াতেরও ভূমিকা ছিল এটা বলা যেতে পারে। জামায়াতের এই ভূমিকা ছিল গণতন্ত্রের স্বার্থেই। নির্বাচন না হলে কী হত, কারো পক্ষে হলফ করে বলা সম্ভব ছিল না। অবশ্য ঐ নির্বাচনের সুবাদে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে জামায়াতকে জামায়াতের নেতৃত্বকে নির্মূল করার চক্রান্ত, ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়ায় এবং জামায়াতের উপর উপর্যুপরি আঘাত আসায় অনেকের মনেই এ প্রশ্নটা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক যে, জামায়াত কেন নির্বাচনে গেল? 'তথাকথিত যুদ্ধাপরাধের বিচার' 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বিচার' বিষয়ে প্রকাশিত সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে চিন্তা ভাবনাই প্রমাণ করে, আমাদেরকে সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে আটকে রাখা হয়েছে, এবং বিচারের নামে প্রহসন করা হচ্ছে। এযাবত, সরকারের পক্ষ থেকে যেসব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তার পেছনের কলকাঠি নাড়িয়েছে যেমন একটি নিকট প্রতিবেশী দেশ, তেমনি তাদের এদেশীয় অনুগত একদল বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকবৃন্দ, যার নেতৃত্বে আছে যুগপৎভাবে "ঘাদানিক" ও সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের নেতৃবৃন্দ। অতীতে কারাবন্দী হবার আগে অনেক অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে বলেছি, এখনও বলতে চাই, অবশ্য আমার এখনকার আওয়াজ তার কাছে পৌঁছানোর কোন সম্ভাবনা নেই, তবু ইতিহাসের রেকর্ডের জন্যে বলে যাই, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব আর ঘাদানিক বা সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের দায়িত্ব এক নয়। পত্রিকার রিপোর্টের বর্ণনা যদি সত্য হয়, সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের আহ্বায়ক ও পরিকল্পনা মন্ত্রীকে, মাননীয় প্রধান মন্ত্রী যা বলেছেন বলে উল্লেখিত হয়েছে তা যদি সত্য হয়, তাহলে বুঝতে বাকী থাকার কথা নয় যে, এব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি বেআইনী ইস্যুতে জড়িত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের স্থপতি মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা হিসাবে এব্যাপারে সতর্ক আছেন এবং থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক। যদি এর ব্যত্যয় ঘটে তা হলে সেটা শুধু দেশের একটি ইসলামী দলের জন্যেই নয় গোটা দেশ ও জাতির জন্যেই হবে দুর্ভাগ্যজনক। এমন হোক একজন নগণ্য দেশ প্রেমিক নাগরিক হিসাবে আমি কখনই এটা কামনা করি না।

সম্ভবত সরকারও উপলব্ধি করছে, যে অভিযোগের কথা বলে আমাদের বিচারের নামে প্রহসন করা হচ্ছে, এটা বাস্তবে খুব একটা সহজ হবে না, বা ধোপে টিকানো যাবে না। তাই আমাকে দশট্রাক অস্ত্র মামলায় এবং মুজাহিদ সাহেবকে ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার মামলায় জড়ানোর অপচেষ্টা ও অপকৌশল চলছে। তদন্তের দীর্ঘসূত্রতা, বার বার সময় বাড়ানো প্রমাণ করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে কিছু নিরপরাধ ব্যক্তিকে জড়ানোর জন্যেই এমনটি করা হচ্ছে। এভাবে নিরীহ নিরপরাধ ব্যক্তিদের ভোগান্তির শিকার হওয়াটা বেশ সীমালংঘনের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে না? আল্লাহর কোরআনে এ ব্যাপারে বার বার ঘোষণা করা আছে- "আল্লাহ কোন সীমালঘংনকারীকে পছন্দ করেন না।" বিশেষ করে মজলুম মানুষেরা যখন মানবিক ও জাগতিকভাবে কোন অবলম্বন খুঁজে পায় না তখনই তো আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে কুদরতি ফায়সালা। দেশটাকে সেদিকেই নেয়া হচ্ছে কিনা, মনে প্রশ্ন জাগতে শুরু করেছে। গতকাল বিকেলের হালকা নাশতা ও চায়ের সময়ে আমাদের কারাগারের অন্যতম সাথী বললেন, কামারুজ্জামান

www.pathagar.com

সাহেবকে আগামীকাল বারডেমে নেবে চিকিৎসার জন্যে। আমার ব্যাপারে নাকি তিনি জেলারের সাথে আলাপ করেছেন, জেলার সাহেব বলেছেন আমাকেও নাকি আগামী সপ্তাহে বারডেমে ভর্তির জন্যে পাঠাবে। তার কথা অনুযায়ী আজ সকালে কামারুজ্জামান সাহেবকে বারডেমে নিয়ে যাওয়া হল। আমার ব্যাপারে তার দেয়া তথ্যটা তাহলে সঠিকই হবে, আগামী সপ্তাহে আমাকে ভর্তির জন্যে নিয়ে যেতে পারে। তবে এব্যাপারে জনাব সাঈদী সাহেব এবং মুজাহিদ সাহেবের মত হল, শুধু ফিজিওথেরাপির জন্যে বারডেমে ভর্তি হওয়া ঠিক হবে না। নিরাপত্তার প্রশ্নটাকে বিবেচনায় রেখেই উনাদের এই অভিমত। আগামীকাল পরিবারের লোকদের সাথে সাক্ষাতের নির্ধারিত দিন। তাদের সাথে পরামর্শ করেই বিষয়টা চূড়ান্ত করতে চাই। তবে জেলকর্তৃপক্ষ এবং বারডেম কর্তৃপক্ষ একমত হয়ে যদি ভর্তি হতেই বলে, তাহলে এটা এড়ানো সম্ভব হবে কিনা, এব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে আরো একটু ভাবতে হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে চিকিৎসার ব্যাপারে আর কোন চেষ্টা তদবির করার পক্ষে নই। আল্লাহর কাছে কাতর কণ্ঠে আরজ করে বলেছি, আল্লাহ বন্দি অবস্থায় কোন হাসপতালে চিকিৎসা করতে যেন না হয়। ভাগ্যে কী রেখেছ, তাতো তুমিই জান, কিন্তু আমার মন চায় তোমার কুদরতি সাহায্যে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে যেন চিকিৎসা নিতে পারি।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অনুভূতি- ০৪

২৩ জুন ২০১১ আমার নির্ধারিত সাপ্তাহিক সাক্ষাতের দিন। প্রতিবারের ন্যায় এবার এই কাংখিত সাক্ষাতের জন্যে অপেক্ষা করতে হয় দীর্ঘক্ষণ। আমাদের ২৬ সেলের অন্যতম কারাগারের সাথী, জনাব ডাক্তার তোজাম্মেল হোসেন সাহেবের সাক্ষাতের স্লিপটা আসতে দেখে ভাবছিলাম বোধ হয় আমার সাক্ষাতের লোকেরাই এসে গেছে। কিন্তু না, একটু পরেই জানলাম, ওটা ডাক্তার তোজাম্মল সাহেবের। আমি বেলা ১১টা থেকে প্রস্তুতি নিয়ে বারান্দায় বসে অপেক্ষা করতে করতে বেশ চিন্তিত হয়ে যাই। ইতোমধ্যে ডাক্তার তোজাম্মল সাহেব ফিরে এলেন তার সাক্ষাৎ শেষে। তিনিই বললেন, আপনার সাক্ষাতের জন্যে পরিবারের লোক এসে গেছে, গেট সার্জেন্ট উনাকে বলেছেন কিন্তু স্লিপটা এখনও আমার পর্যন্ত পৌঁছায়নি। বিপ্লবকে বললাম সিআইডি জমাদারের মাধ্যমে খবর নেয়ার জন্যে। ডাক্তার সাহেব ফিরে আসার পরও বেশ দেরি হওয়ায় একটু বিরক্তি ভাব সৃষ্টি হয় মনে। ইতঃপূর্বে একবার আমার স্লিপটা ভুলক্রমে গিয়েছিল ১০ সেলে, তখনকার অন্যতম সেবক সেলিম গিয়ে ভাগ্যগুণে স্লিপটা পেয়ে যায়। স্লিপটা সেদিন কোন সিআইডির হাতে না দিয়ে একজন কয়েদিকে দেয়ায়, এই বিপদ ঘটেছিল। আজ আবার তেমন কিছু হল কিনা সন্দেহ দেখা দিল আমার মনে।

মনের সন্দেহ নিয়ে সাক্ষাৎ প্রার্থীদের বিড়ম্বনার কথা ভেবে, একটু বিব্রতবোধ করতে করতে আমি বাথরুমে যেতেই কে যেন আওয়াজ দিল 'স্যার আপনার স্লিপ আসছে'। আমি তো আগে থেকেই তৈরি ছিলাম। বিপ্লবকে ডেকে রওয়ানা দিলাম। সবাইকে পেয়ে গেলাম সাক্ষাতের নির্দিষ্ট স্থানে। ভাগ্য ভাল, স্লিপ পৌঁছাতে দেরি হলেও তাদেরকে ভেতরে ঢুকতে দিয়েছে আমার পৌঁছার আগে। আমি গেট সার্জেন্টকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি তো এদের আসার খবর পেয়েছি অনেক আগেই, আপনার বরাত দিয়েই ডাক্তার সাহেব সাক্ষাৎ শেষে ফিরে গিয়ে আমাকে জানালেন যে, 'আপনার লোক গেটে অপেক্ষা করছে', তারপরও আমার কাছে স্লিপ এত দেরিতে পৌঁছালো কেন? তাদের প্যাটেন্ট জবাব, স্লিপ নিয়ে যাওয়ার জন্যে সিআইডির লোকদের অনেক সময়ই খুঁজে পেতে দেরি হয়। তাছাড়া এক সাক্ষাৎ শেষ হবার আগে অন্য কোন সাক্ষাৎ প্রার্থীর খবর সাধারণত জানানো হয় না ইত্যাদি ইত্যাদি, তাদের গদ বাঁধা কিছু কথা। আসলে মানবিক দৃষ্টিকোণ ও বিবেচনা বোধের অভাবই মুখ্য কারণ, দায়িত্ববোধের অভাব তো

www.pathagar.com

আছেই। যাহোক দেরিতে হলেও সপ্তাহের একদিনের এই ৩০ মি. বন্দীদের জন্যে খুবই মূল্যবান মুহূর্ত, এতে সন্দেহ নেই।

গতকালের সাক্ষাতে আবারও শুনলাম, আমার তৃতীয় ছেলে ডাক্তার খালেদের মেয়ে নাঈমা তার দাদীর সাথে কোন কথা বলতেই দাদার সাথে কথা বলতে চায়। দাদীকে বার বার বলতে থাকে দাদাকে দাও। অবুঝ এই শিশুতো বোঝে না এখন তার দাদা কোথায় আছে, কী অবস্থায় আছে। আল্লাহ এই অবুঝ শিশুকে যেন নিরাশ না করেন, তার আশা পূরণের জন্যেই আমার ও আমার সাথীদের মুক্তির ব্যবস্থা করেন, আল্লাহর দরবারে হাত তুললেই এই ফরিয়াদটুকু জানাতে কখনও ভুল করি না। আরো শুনে খুশি লাগল, আমার বড় ছেলে নাজিবুর রহমানের বড় মেয়ে (যার বয়স মাত্র ৪ বছর) কোরআন শরীফের শেষ পারা মুখস্ত করেছে ক্যাসেট শুনে শুনে, এখনও কোরআন শরীফ দেখে দেখে পড়া শেখেনি। সূরায়ে আলে ইমরানও নাকি মুখস্ত প্রায়। ছোট মেয়েও নাকি বড় বোনের সাথে পাল্লা দিয়ে মুখস্তের চেষ্টা করে। শুনে মনে মনে আনন্দ অনুভব করলেও, কবে তাদের কণ্ঠের তেলাওয়াত শোনার সৌভাগ্য হবে, এ চিন্তায় মাঝে মাঝে মনে বেশ কষ্টও অনুভব করি। আল্লাহ আমার গোটা পরিবারকে তার দ্বীনের জন্যে কবুল করুন, সার্বক্ষণিকভাবে আমি তাঁর দরবারে এই কামনা পেশ করে থাকি।

আজ ২৪ শে জুন শুক্রবারের সকাল বেলায় নাস্তা সেরে একটু লিখতে বসেছি, এমন সময় মাওলানা মুহতারাম সাঈদী সাহেব রুমে এসে বললেন, কামারুজ্জামান সাহেব এবং আব্দুল কাদের মোল্লা সাহেবকে চালানে পাঠানোর খবর এসেছে। চালান জেলখানার একটি নিজস্ব পরিভাষা যার অর্থ এক জেল থেকে অন্য জেলে স্থানান্তর করা। শুনেই লেখা বন্ধ করে রুমের বাইরে বেরুবার চিন্তা করতেই, কামারুজ্জামান রুমের সামনে এসে নিজেই বললো, তাদের চালানের খবরটা। তাদেরকে প্রস্তুত হতে বলা হয়েছে, যে কোন সময় এসে নিয়ে যাবে। অন্য সময়ে দেখেছি, চালানে কাকে কোথায় পাঠানো হচ্ছে, তা জানা যেতো না। কিন্তু এবার একজন কারারক্ষী এসে সাঈদী সাহেবকে জানিয়ে গেল, তাদের দুজনকেই একত্রে কাশিমপুর জেলখানায় পাঠানো হচ্ছে। সম্ভবতঃ কাশিমপুর ২ নম্বর জেলের কথাই বলল বলে আমার মনে হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের প্রস্তুতি পর্ব শেষ হলে, দুপুরের খাবারের এবং জুমআর নামাজের আগেই তাদের দুজনকে ব্যথা ভরা হৃদয়ে বিদায় জানানো হল।

কামারুজ্জামান ও আব্দুল কাদের মোল্লা গতকাল চলে যাওয়ার পর থেকে আমাদের সেলটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। আব্দুল কাদের মোল্লা একটু বেশি কথা বলে অভ্যস্ত। কথা প্রসঙ্গে বেশ গল্পও বলে থাকেন। তার বেশি কথা বলা মাঝে মধ্যে আমার একটু খারাপ লাগলেও, রসালো গল্পে মজলিস গুলজার হয়ে উঠায় সবাই বেশ একটু আনন্দও উপভোগ করত। চলে যাবার পরে, তাদের দুজনেরই অভাব অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করছি। বিশেষ করে মোল্লার গল্পের মাধ্যমে জেল জীবনের ভারাক্রান্ত মনেও কিছু আনন্দ অনুভব করায় বুকটা হালকা হয়ে আসত, আর তার অনুপস্থিতিতে সেটা বেশ তীব্রভাবেই অনুভব করছি। তারা ঐদিন দুপুরের খাবার না খেয়ে এখান থেকে রওয়ানা দিয়ে বিকেল ক'টা নাগাদ কাশিমপুরের ২ নং কারাগারে পৌঁছেছে, গিয়েই তৈরি খাবার খাওয়ার সুযোগ পেয়েছে কিনা, ভাবতেই একটু চিন্তিত হই। বিশেষ করে মোল্লার ডায়াবেটিস হঠাৎ করে 'ফল' করে কিনা এতক্ষণ না খেয়ে থাকার ফলে, বিষয়টা ভাবতেই মনে কেমন যেন একটা অজানা আশংকা অনুভব করি। অবশ্য জেলখানা এমন এক জায়গা যেখানে বসে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় কোন কিছুই জানার সুযোগ নেই। তাদের সেদিন ফি আমানিল্লাহ বলে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করেছি। আল্লাহ তাদের আমাদের সবার সর্বোত্তম নেগাহবান।

১৯৭৪ সনের শেষ দিক থেকে আজকের দিন পর্যন্ত, ৩৬ বছরের দাম্পত্য জীবনে, আমার জীবন সঙ্গিনীকে নিয়ে আমাকে কোন দিনই তেমন কোন রূপ দুশ্চিন্তায় পড়তে হয়নি। বরং আমার গোটা সংসার জীবনের ঝামেলা সে একাই সামাল দিয়ে আমাকে আন্দোলন ও সংগঠনের কাজে যেভাবে সহায়তা দিয়েছে, এজন্যে আমি আল্লাহর দরবারে সব সময় শুকরিয়া আদায় করি, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে। সেই

www.pathagar.com

আমার জীবন সঙ্গিনী আমাকে যে ঋণে আবদ্ধ করেছে এর স্বীকৃতি দেই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে। আমার ছ'টি ছেলে মেয়ের লেখা পড়া থেকে তাদের জীবন গড়ার ক্ষেত্রেও আমার তেমন কোন ভূমিকা নেই, আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহায্যে এ ব্যাপারেও মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে আল্লাহর এই ভাগ্যবতী বান্দী। কিন্তু আজ আমার কারাজীবনে কেন যেন তার অসহায়ত্বের কথা বার বার মনে দাগ কাটছে। বেচারি বড্ড একাকীত্বের দুঃসহ যন্ত্রণা বুকে বহন করছে বলে আমি জেলে বসে কেন যেন হৃদয় দিয়ে এটা উপলব্ধি করছি। ছেলে চারজনের তিনজনই দেশের বাইরে। দুই মেয়ের ছোট জনও বাইরে। তিন ছেলেকে বিয়ে করানো হয়েছে তারাও কেউ কাছে নেই। একমাত্র একটা ছেলে মায়ের সাথে, আর বড় মেয়েটা একই বিল্ডিং-এ থাকায় কিছুটা সহায়তা দেবার চেষ্টা করে। সবাই আমাকে নিয়ে ব্যস্ত, তার উপর নিজেদের ব্যস্ততা, এ অবস্থায় বেচারি কিভাবে সব কিছু সামাল দিচ্ছে ভেবে কূল পাই না। শুধু আল্লাহকেই বলি, আল্লাহ তুমিই এদের অভিভাবক, তুমিই তো সর্বোত্তম অভিভাবক। তাদেরকে নিয়ে শুধু চিন্তাই করতে পারি, কিন্তু কিছু করার নেই তারাও আমাকে নিয়ে যতই পেরেশান হোক না কেন, যতই চেষ্টা তদবির করুক না কেন, আসলে কিছু করার নেই। আল্লাহ আমাদের সবার অভিভাবক, সর্বোত্তম অভিভাবক, এই ঈমানী চেতনায় পরিবারের সদস্যগণ এবং সংগঠনের কর্মী সমর্থক ও শুভাকাঙ্ক্ষীগণ সবাই যেন উজ্জীবিত থাকতে সক্ষম হয়, মহান আল্লাহর দরবারে সার্বক্ষণিকভাবে এই দোয়া করা ছাড়া আমার পক্ষ থেকে তো আর কিছুই করার নেই। আল্লাহর যে নেক বান্দীকে 'খায়রুল মাতা' হিসাবে আমাকে আল্লাহ সুবহানাহুতায়ালা দান করেছেন জীবন সঙ্গিনী হিসাবে, তাকে আল্লাহতায়ালা দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বোত্তম পুরস্কার দান করুন, অন্তর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত এই দোয়াই তার জন্যে আমার পক্ষ থেকে সর্বোত্তম উপহার। আল্লাহর দরবারে আমার দোয়া আমার দিল বলে, মেহেরবান আল্লাহ আমার এই দোয়াটি কবুল করেছেন।

আজ আমার জীবন সঙ্গিনীকে নিয়ে ভাবনার কারণের মধ্যে প্রধান কারণ হল তার একাকীত্ব। এ কারণে ছেলেরা চলে আসতে চায়। আমিই বলে দিয়েছি, আবেগ তাড়িত হয়ে, আমার জন্যে যেন কোন ছেলের ক্যারিয়ার নষ্ট না হয়। আবার সংগঠনের দায়িত্বও পালন করতে হয়। সেই সাথে আমার শুধু ব্যক্তিগত ব্যাপারে নয়, গোটা জামায়াতের সংগঠনের জন্যে চলছে একটা বড় রকমের পরীক্ষার মুহূর্ত, যাকে আমরা একটা সংকটকালও বলতে পারি। এমতাবস্থায় বেচারির মনের অবস্থা আমি উপলব্ধির চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু পুরো অবস্থা জানেন আলেমুল গায়েব আল্লাহ সুবহানাহুতায়ালা। আল্লাহর নেয়ামত ও রহমতের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি এবং উপলব্ধি করি। আল্লাহ তুমিই তো জামায়াতে ইসলামীর মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলামের অবস্থানকে মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছো, আজ জামায়াতে ইসলামীকে এ পর্যায়ে আসার তৌফিক দিয়েছ, একে টিকিয়ে রাখার এবং সামনে আরো বলিষ্ঠ এবং দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাবার সুযোগ কেবল মাত্র তোমারই হাতে। আমাদের উপর থেকে তোমার প্রদত্ত নিয়ামত ও রহমত তুলে নিও না। বরং আরো বাড়িয়ে দাও, এটাই তোমার দরবারে আমাদের আন্তরিক কামনা।

গতকাল ২৫ শে জুন শনিবারে আমাদের অন্যতম সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ও শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাহেবের পারিবারিক সাক্ষাতের নির্ধারিত দিন ছিল। তিনি যথাসময়ে সাক্ষাৎ শেষে এসে একটা দুঃখজনক খবর বা দুঃসংবাদ জানালেন, আমাদের দীর্ঘদিনের সাথী, আমার সাথে যিনি ছাত্র জীবনেও কাজ করেছেন, অধ্যাপক লোকমান সাহেব ইন্তেকাল করেছেন। তিনি দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। অবশেষে চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত হন। তার সর্বশেষ কর্মস্থল ছিল চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা ক্যাম্পাস। এখানে তিনি ভিসি হিসাবেই দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। হার্টের রোগী হিসাবে তাকে সৌদি আরবে রিয়াদস্থ কিং ফয়সাল স্পেশালাইজড হাসপাতালে চিকিৎসার জন্যে তদানীন্তন সৌদি রাষ্ট্রদূতকে বলে আমিই পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলাম, চিকিৎসা শেষে ফলো আপের

www.pathagar.com

জন্যেও সম্ভবত একবার গিয়েছিলেন। ওখান থেকে চিকিৎসা শেষে ফিরে এতদিন মোটামুটি শূরার সদস্য হিসাবে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতেন। তার মৃত্যুর খবরটা শুনে বেশ ব্যথিত হলাম। মৃত্যুতো অবধারিত, কিন্তু নিকটজনদের মৃত্যুর খবর কারাগারে বসে শোনাটা খুব কষ্টের। শেষ দেখা তথা জানাজায়ও শরীক হতে না পারা কতটা কষ্টের, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

ইতঃপূর্বে আমার এক পারিবারিক সাক্ষাতের সময় আমাদের আন্দোলনের সংগঠনের আর একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, ইসলামী শিক্ষা আন্দোলনে যার ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপক আব্দুর রব সাহেবের মৃত্যু সংবাদ শুনে যেমন ব্যথিত হয়েছিলাম, মাত্র অল্প ব্যবধানে লোকমানের বিদায় সেই ব্যথার মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিল। আল্লাহ কবে কারাগার থেকে কী অবস্থায় বের করবেন, এটা তো তিনি ছাড়া আর কারো জানা নেই। তবে সমসাময়িক আপনজন ও চলার পথের সাথীদের একেএকে বিদায়ের ঘটনা নিয়ে চিন্তা করলে মনে হয়, আল্লাহ যদি মেহেরবানী করে এই কারা অন্তরাল থেকে বাইরে যাবার সুযোগ দেনও তাহলেও বোধহয় এরূপ অনেক নিকটতম সাথীদের পাব কিনা তা আলেমুল গায়েব আল্লাহ ভাল জানেন। সম্ভবত ড. লোকমান সাহেবের ইন্তেকালের খবর পাওয়ার আগেই মুজাহিদ সাহেবকে আবার ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে নারায়ণগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয়। ক'দিন আগে তাকে ঢাকায় আনা হয়েছিল বারডেম হাসপাতালে এবং ইব্রাহিম কার্ডিয়াকে চেক আপের জন্যে। আল-হামদুলিল্লাহ, চেক আপে তার কোন সমস্যা ধরা পড়েনি। তার কাছ থেকেই শুনলাম, দাঁতের চিকিৎসার ব্যবস্থা নাকি নারায়ণগঞ্জেই ভাল আছে। যাই হোক একে একে ২৬ সেল আবার ফাঁকা হয়ে গেল, কামারুজ্জামান ও আব্দুল কাদের মোল্লার পর মুজাহিদ সাহেবও চলে গেলেন। এরপর এখানে সাঈদী সাহেব, মুজিব সাহেব ও আমি রয়ে গেছি। আমার বিশ্বাস, মুজিব সাহেব আল্লাহ চাহে তো হাইকোর্টের মাধ্যমে জামিনে মুক্তি পেয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই বেরিয়ে যাবেন। এ জন্যে আল্লাহর কাছে যেমন দোয়া করছি, তেমনি সুযোগ পেলেই আইনজীবীদের দ্রুত যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার জন্যে তাগিদ দিয়ে যাচ্ছি। সাঈদী সাহেব ও মুজাহিদ সাহেব কিছুদিন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের বাইরে থাকায়, কথা বলার লোক না থাকায় বেশ দম বন্ধ অবস্থায় ছিলাম বলে মনে হত। দোয়া করি সাঈদী সাহেব ও আমি দুজন যেন অন্তত এখানেই এক সাথে থাকতে পারি, একসাথে আল্লাহতায়ালা বের হবারও সুযোগ দেন।

ইতঃপূর্বে আমাদের জেলে বসেই শুনতে হয়, ইসলামী সঙ্গীত ও সংস্কৃতি চর্চার পথিকৃত, আমাদের ছোট ভাই তুল্য মোহাম্মাদ মতিউর রহমান মল্লিকের দুঃখজনক মৃত্যু সংবাদ। তিনি অবশ্য অনেক দিন থেকে কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন। তার শুভাকাঙ্ক্ষী এবং ভক্ত শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও তাকে সুস্থ করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে তাকেও পরপারের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যেতে হল এই দুনিয়া থেকে। এভাবে আন্দোলন ও সংগঠনের নিবেদিত প্রাণ তিনজনের মৃত্যুর খবর পেতে হল জেলে বসে। তাদের জন্যে নির্জনে নিভৃতে আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আল্লাহ যেন তাদের সকল নেক আমল ও দ্বীনি খেদমত কবুল করেন। তাদের মুত্যুতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হলো, আল্লাহ যেন তাঁর পক্ষ থেকে গায়েবী মদদ এবং কুদরতি ব্যবস্থায় সেই শূন্যতা পূরণের ব্যবস্থা করেন। (আমীন)

আজকে কারা হাসপাতালের সহকারী সার্জন ডা. শামসুদ্দিন সাহেব এসেছিলেন। ডায়াবেটিস রোগী হিসাবে পায়ের একটি আংগুলের সমস্যা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলাম। তিনি দেখে আশ্বস্ত করে গেলেন, এতে তেমন কোন সমস্যার আশংকা নেই। তাছাড়া ডায়াবেটিসও মাশাআল্লাহ নিয়ন্ত্রণেই তো আছে। এই সুযোগে উনাকে বারডেমের কাগজটা দেখালাম, উনি বললেন, এই কাগজটাতো প্রথমে আমার কাছে আসার কথা ছিল। আমাকে না পেলে পরবর্তী দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে দিতে পারত। আমাদেরকে এটা না দিয়ে আপনাকে কেন দিল, এটাতো বুঝে আসছে না। এর চেয়ে বেশি কথা তার পক্ষে বলা সম্ভব ছিল না। আমি তাকে জানালাম, ১৯ শে জুন আমাকে বারডেমে নিয়ে গেলেন ডেপুটি জেলার আবু মুসা সাহেব। কিন্তু আগের দিনের ভর্তি সংক্রান্ত এডভাইজসহ বারডেম প্রদত্ত কাগজটা আরপিকে দেখানোর

www.pathagar.com

দায়িত্বটা তিনি নিজে পালন না করে একজন কারারক্ষীকে দিয়ে পাঠানোর কারণে ঐ দিন বারডেম কর্তৃপক্ষও বিষয়টাকে গুরুত্ব দেননি। বরং জেলকর্তৃপক্ষও বিষয়টাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না, কারারক্ষীর মাধ্যমে কাগজ পাঠানোর ফলে তারাও এটাই বুঝতে বাধ্য হয়ে থাকবেন। এ ব্যাপারে আমি পরামর্শ চাইলে, এ বিষয়ে তিনি কোন মন্তব্য না করে সুপার, জেলার বা ডেপুটি জেলারের সাথে আলাপ করতে বললেন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, উনাদের সাথে কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশ করে বার বার সুবাদারের মাধ্যমে খবর দিয়েও এখন পর্যন্ত দেখা পাওয়া সম্ভব হয়নি। সামনেও হবে কিনা আল্লাহ আলেমুল গায়েবই ভাল জানেন। আমি এভাবে আর চিকিৎসার কথা বলতে চাই না কিন্তু অন্যদের পরামর্শ জেলে থাকা অবস্থায় অভিমান করে লাভ নেই।

আওয়ামী লীগ একতরফাভাবে সংবিধানে নিজেদের মর্জি মাফিক ব্যাপক সংশোধনী আনার উদ্যোগ নিয়েছে। দেশের সংবিধান বিশেষজ্ঞ আইনজীবী থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং চিন্তাশীল মহল এ নিয়ে বেশ উদ্বেগ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। দেশ সংঘাতের দিকে অথবা অনিশ্চয়তার দিকে যাচ্ছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। আওয়ামী লীগ সংসদে যে অবিশ্বাস্য সংখ্যায় আসন লাভ করেছে, এটা যে জনগণের ভোটের ফসল নয়, ফখরুদ্দীন মইন ইউ আহমদের মাধ্যমে ডিজিটাল কারচুপির ফসল, অনেকেই এটা উপলব্ধি করতে চান না। কিন্তু ভোটকেন্দ্রে যারা উপস্থিত হয়ে ভোট দিয়েছে তারা ঠিকই উপলব্ধি করে। তাছাড়া যেসব বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তাদের ব্যবহার করে এত সংখ্যক আসনে আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করা হয়েছে, তা কতটা সঠিক আর কতটা কৃত্রিমতা ঐ সব কর্মকর্তারাও জানেন। তারা বুকে হাত রেখে, আল্লাহকে হাজির নাজির জেনে যদি আত্মবিশ্লেষণ করেন তাহলে অবশ্যই তাদের মধ্যে বিবেকের দংশন শুরু হবে, হতে বাধ্য। আড়াই বছরে আওয়ামী লীগ দেশকে সুশাসন উপহার দিয়েছে না দুঃশাসন উপহার দিয়েছে, ঐসব কর্মকর্তাদের বুকে হাত রেখে অবশ্যই ভেবে দেখতে হবে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি সহ ক্ষমতার দাপট দেখাতে গিয়ে তারা যে নিজেরা নিজেদের মধ্যে দাঙ্গা ফাসাদে লিপ্ত হয়ে দেশটাকে নৈরাজ্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, এর দায়ভার ঐ সব বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তাদেরও বহন করতে হবে। আগামী প্রজন্মের কাছে এর জন্যে, ইতিহাসে আসামীর কাঠগড়ায় অবশ্যই দাঁড়াতে হবে। এতে কোন সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই। তবে হ্যাঁ, তারা যদি নিজেদের ভুলের ও কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে এর প্রতিকার প্রতিবিধানে নিজেরাই উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসেন, তাহলে সর্বনাশের কিঞ্চিত রক্ষার একটা ব্যবস্থা হলেও হতে পারে। কিন্তু আসলে তারা এটা আদৌ উপলব্ধি করছেন, বা করতে পারবেন তাতো তারাই জানেন। আরো ভাল জানেন আলেমুল গায়েব আল্লাহ সুবহানাহুতায়ালা। মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অদূর ভবিষ্যতে দেশের জন্যে ভাল কিছু হওয়ার লক্ষণ আদৌ দৃশ্যমান নয়।

আমরা মাত্র চারটি পত্রিকা পড়ার সুযোগ পাই, যেগুলো সরকারের পক্ষের পত্রিকা হিসাবেই বিবেচিত। এবং আমাদের পয়সায় ঐ পত্রিকা দেয়া হয় সরকারের নির্দেশক্রমে। এ থেকে দেশের ভেতরের বাইরের সঠিক চিত্র সঠিক অবস্থা জানার তেমন কোন সুযোগই নেই। তারপরও যে চিত্রগুলো চোখে ধরা পড়ে মনের উপর দাগ কাটে তা মোটেই সুখকর নয়।

বর্তমান বিশ্বকে বলা হয় গ্লোবাল ভিলেজ। তাই এখন আর কোন দেশ এককভাবে কোন বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হিসাবে চলতে পারে না। তবে প্রত্যেক দেশের স্বাধীন অস্তিত্বের ও স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে সজাগ সচেতন থাকার প্রয়োজন আছে। ইসলাম ব্যক্তি প্রতিবেশীর সাথে যেমন সদ্ভাব বজায় রাখার উপর গুরুত্ব দেয়, তেননি রাষ্ট্রীয় প্রতিবেশীর সাথেও সদ্ভাব রাখার উপর গুরুত্ব দিয়েছে। আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ভারত। বিশ্বের অন্যতম একটি বিশাল রাষ্ট্র। এবং আমাদের প্রায় চার দিক ভারত দিয়েই বেষ্টিত। দক্ষিণ-পূর্ব কোণের সীমান্ত এলাকার সামান্য জায়গা বার্মা ঘেঁষে, বাকী তিনদিক এবং সমুদ্র সীমান্ত, ভারতের আগ্রাসী থাবার মুখে অসহায়। তালপট্টিতে তারা একতরফা পতাকা উড়িয়েছে,

www.pathagar.com

আমাদের করার বা বলার কিছু নেই, আমরা বেরুবাড়ি দিয়ে দিলেও ছিটমহলগুলোর সাথে যোগাযোগের জন্যে চুক্তি মোতাবেক করিডোর এ পর্যন্ত পাইনি। ফারাক্কার অভিশাপ ভুক্ত-ভোগী দেশের উত্তরাঞ্চলের ষোলটি জেলার ও দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের লোকেরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। তিস্তার পানির প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে নাকি মীমাংসা হবে বলে আশার বাণী শোননো হচ্ছে। কিন্তু যা এতদিন হয়নি তাকি কোন জাদুর স্পর্শে হঠাৎই হয়ে যাবে, না মিথ্যা আশার ছলনায় আমাদেরকে ছেলে ভুলানো ছড়া শুনানো হচ্ছে? দশ ট্রাক অস্ত্রচোরাকারবারীদের সাথে আমাদের কোন দূরতম সম্পর্কও নেই, এটা সকলের জানা। এই মামলায় আমাকে জড়ানো হবে, এটা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আমাকে বলা হচ্ছে' আমি কোন তদন্ত কমিটি করে দিলাম না কেন? অথচ দশ ট্রাক অস্ত্র যারা আটক করেছে, তারাই তো যোগ্যতার সাথে এ বিষয়ে তদন্ত করে প্রকৃত হোতাদের বের করতে সক্ষম হবে, এই আস্থা এবং বিশ্বাস রাখাই কি অপরাধ হতে পারে? আমরা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কোন তদন্ত কমিটি করলেও তো প্রশ্ন উঠতে পারতো বিষয়টি স্বরাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে জড়িত, এ বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের করার কী আছে? আমরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের তদন্ত কর্মকাণ্ডে কোনরূপ হস্তক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকাই উচিৎ মনে করেছি। চট্টগ্রাম ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কারখানার কেউ যদি জড়িত থেকেই থাকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তদন্তেই তা বেরিয়ে আসবে, আমরা কাউকে বাঁচাতেও চাইনি, কাউকে ফাঁসাতেও চাইনি। ড. শোয়েব এবং ইমামুজ্জামান সাহেব মিথ্যা ও অসত্য বিবৃতি দিয়ে আমাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে নিজেরা বাঁচার চেষ্টা করেছেন। নুরুল আমীন সাহেবকে ঢাকার বাইরে যাওয়ার অনুমতি ড. শোয়েবই দিয়েছেন। অথচ তিনি মিথ্যা বিবৃতি দিয়ে বেঁচে গেলেন আর ফাঁসিয়ে দেয়া হল আমাকে, আল্লাহ একদিন এর বিচার অবশ্যই করবেন।

১/১১ এর পর থেকে দশ ট্রাক অস্ত্র মামলার পূর্ণ তদন্ত শুরু হয়। কিন্তু এ ব্যাপারে কোন তদন্ত কর্মকর্তা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরও দেড় বছর মুক্ত ছিলাম। এ সময়ও কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করতে আসেনি। আওয়ামী শাসনের দেড় বছরের মাথায় 'ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার' অযৌক্তিক এক মামলায় গ্রেফতারের পর, অসংখ্য মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে, প্রথমে ১৭ দিন ও পরে তিন দিনের রিমান্ডে নেয়। উক্ত রিমান্ডের সাথে দশ ট্রাক অস্ত্র মামলার কোন উল্লেখ না থাকলেও ১৭ দিনের রিমান্ডের সময় ২টি টিম আমাকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের মূল টার্গেট, আমরা মন্ত্রণালয় থেকে কোন তদন্ত করলাম না কেন? আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত; যদি আমরা তদন্ত করতাম, তা হলেও প্রশ্ন করা হত, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তদন্ত কমিটি করার পরে, আবার আপনারা তদন্ত করতে গেলেন কার স্বার্থে? এ বিষয়ে বার বার তদন্তকারী কর্মকর্তা পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু আমি গ্রেফতার হওয়ার আগে কোন তদন্ত কর্মকর্তাই আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের চিন্তা করেনি। এখন আমি জেলে নিজের আত্মপক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য দেয়ার বা আইনজীবীদের সাথে পরামর্শ করার অবস্থায় নেই এমন সময় আমাকে চার্জশিট ভুক্ত আসামী করা হল। পত্রিকায় যখন খবরটা দেখছি, তখন না পরিবারের কেউ পাশে আছে, না সংগঠনের সহকর্মীদের কেউ পাশে আছে। একমাত্র ছেলে দেশে আছে, সেও গতকাল বিদেশ গিয়েছে। অবশ্য চলে আসবে শীঘ্রই। তবে আগামী বৃহস্পতিবারের সাক্ষাতে আসতে পারবে কিনা, জানি না। সে আসলে, এব্যাপারে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ করতে পারতাম। আর কারো সাথে ২/১ দিনের মধ্যে কথা বলার সুযোগও নেই। জেলের মধ্যে এভাবেই সরকার তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে মানসিকভাবে ঘায়েল করে থাকে। পত্র-পত্রিকা এখানে যেগুলো পাই তাতো আমাদের বিরুদ্ধে জনমত বিভ্রান্ত করার হাতিয়ার ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের চরিত্র হননে নিয়োজিত, এই পত্রিকাগুলোর প্রতিবেদনের, জবাব দেয়ার মত অনেক কথাই তো মনে জাগে। কিন্তু তার কি আর কোন সুযোগ আছে? একতরফা প্রচারণার মাধ্যমে তারা জঘন্য মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠা করে চলছে। আর আমরা কারা প্রকোষ্ঠে অন্তর্জ্বালায় নিদারুণ কষ্টের মধ্যে এগুলো হজম

www.pathagar.com

করতে বাধ্য হচ্ছি। আল্লাহতায়ালার একটি ঘোষণার প্রতি নজর পড়ায় বেশ একটু স্বস্তি ফিরে পেলাম। সূরায়ে নিসার ৪৬ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের সম্পর্কে অনেক বেশি অবগত আছেন, আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক হিসাবে যথেষ্ট, আল্লাহই তোমাদের সাহায্যকারী হিসাবে যথেষ্ট"। আল্লাহর কাছে কামনা করি, তিনি যেন তার এই ঘোষণার প্রতি আমাদের একীন ও প্রত্যয় বাড়িয়ে দেন, এর ভিত্তিতে হৃদয়ের প্রশান্তি নিয়ে সকল পরিস্থিতি মুকাবিলার তৌফিক দেন।

আমাকে দশ ট্রাক অস্ত্র মামলায় জড়ানো এবং মুজাহিদ সাহেবকে ২১ শে আগস্টের গ্রেনেড হামলার মামলায় জড়ানোর অপপ্রয়াস থেকে একটা ম্যাসেজ পরিষ্কারভাবেই পাওয়া যাচ্ছে, তাহলো তথাকথিত যুদ্ধাপরাধের মামলায় বা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের মামলায় সরকারের অবস্থান খুব একটা সুবিধাজনক নয়, অতএব আমাদেরকে আরো কিছু মামলায় জড়িয়ে হয়রানির শিকারে পরিণত করে সরকার, রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চায়, আমাদের পক্ষের আইনজীবী এবং অন্যান্য সহায়তাকারীদের বহুমুখী ব্যস্ততায় ফেলে দিয়ে নিজেরা সুবিধা আদায় করতে চায়, অবশ্য এক্ষেত্রে আমরা স্মরণ করি মহান আল্লাহর কথা।

আমাকে জড়ানোর জন্যেই মেজর জেনারেল (অবঃ) ইমামুজ্জামান সাহেব ও ড. শোয়েব আহমদ থেকে মিথ্যা বিবৃতি আদায় করা হয়েছে। তবে তারা এটা স্বেচ্ছায় দিয়েছেন, না নিজেদেরকে বিপদ মুক্ত করার জন্যে দিয়েছেন, এটা কেবল তারাই জানেন, আর সবচেয়ে ভাল জানেন আলেমুল গায়েব আল্লাহ সুবহানাহুতায়ালা। অথচ বাস্তব কথা হল, নিজ নিজ জায়গায় তারা দায়িত্ব পালন করেননি। বিসিআইসি একটা করপোরেশন। এ ব্যাপারে করপোরেশনের চেয়ারম্যান সরাসরি প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত এবং এ করপোরেশনের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব তারই। বিবৃতিতে এসেছে তিনি একটি রিপোর্ট চেয়েছিলেন, কিন্তু রিপোর্টটা সঠিক তথ্য সমৃদ্ধ ছিল না, ড. শোয়েবও উক্ত রিপোর্ট ইমামুজ্জামান সাহেব থেকে পেয়েছেন বলে তার বিবৃতিতে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেই তদন্ত প্রতিবেদনটি তিনি যথা নিয়মে নথিভুক্ত করে মন্ত্রী পর্যন্তও পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেননি। নিজেও করপোরেশনকে অন্য কোন নির্দেশনা দেননি। এটা তাদের দুজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার রহস্য কী তা সহজেই অনুমেয়। একটা মিথ্যাকে ঢাকার জন্যে আরেকটা মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। বিসিআইসির চেয়ারম্যান এ বিষয়ে যথানিয়মে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা; প্রতিবেদনটি পেশ করতে পারতেন, কোন এ্যাকশন নিয়ে তাও জানাতে পারতেন।

আমি আল্লাহর কাছে এ ব্যাপারে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন আছি বলে পূর্ণ আস্থা রাখি। সেই সাথে নিজের বিবেকের কাছেও পরিষ্কার আছি। তাই এই মামলা নিয়ে আমি মোটেই চিন্তিত নই। চিন্তার কারণ আমার স্বাস্থ্যগত অবস্থা। এই স্বাস্থ্যগত নানা অসুবিধাসহ চট্টগ্রামে যদি যাওয়া আসা করতে হয় সেটা হবে আমার জন্যে খুবই কষ্টকর। তাছাড়া চট্টগ্রাম জেলখানার অবস্থা সম্পর্কে যতটুকু শুনেছি, তাও আমার জন্যে বেশ কষ্টকর হবার কথা। হয়তবা এভাবে কষ্ট দেবার জন্যে, হয়রানিমূলক মামলাটা সাজানো হয়েছে আমার বিরুদ্ধে। এই মুহূর্তে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কথা স্মরণ করছি, সূরায়ে ইউসুফ তেলাওয়াতের মাধ্যমে। সেই সাথে দোয়া করছি আল্লাহর দরবারে ছবর ও ইস্তেকামাতের জন্যে। তাঁর পক্ষ থেকে গায়েবী মদদ ও কুদরতি কোন ফায়সালাই পারে আমাদের বিরুদ্ধে গৃহীত চতুর্মুখী চক্রান্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে। কুন ফাইয়াকুনের মালিক আল্লাহ, আরশে আজিমের মালিক আল্লাহ নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করবেন, এই আশা বুক বেঁধে সময় কাটাচ্ছি। সকল বিপদ আপদ বালা মুসিবত থেকে হেফাজত করার জন্যে। আল্লাহর রহমত থেকে কখনও নিজেকে যেন হতাশ মনে না করি, এব্যাপারেও তাঁরই কাছে সাহায্য চাই।

গত ২৯ শে জুন ২০১০ এ গ্রেফতার হয়ে ৩০ শে জুন রাতে আদালত হয়ে কেন্দ্রীয় কারাগারের ২৬ সেলে এসে পৌঁছি। ১লা জুলাই দুপুরের খাবারের পর বিশ্রাম নিতেই দেখি একজন যুবক ছেলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে

www.pathagar.com

এসে আমার মাথায় হাত বুলাচ্ছে। ছেলেটাকে দেখে বেশ মায়াও হল। পরে সে পিজি হাসপাতালে যায় তার নাকের চিকিৎসার জন্যে। ছেলেটির ডাক নাম বিপ্লব, এই নামেই জেলখানায় প্রায় সর্বত্রই সে পরিচিত। তার অবর্তমানে আরেকটি ছেলে আমাকে দেখাশোনার জন্যে নিজেই এগিয়ে আসে, ওর নাম সেলিম। বিপ্লব চিকিৎসা শেষে হাসপাতাল থেকে কারাগারে ফিরে এসেই আবার আমাকে দেখা শোনার দায়িত্ব নেয় নিজে থেকেই। এতদিন ছেলেটার সাথে বেশ মায়া মমতার একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তার সাথে আসলে ২৬ সেলের সকল ভিআইপি বন্দিরই বেশ সুসম্পর্ক। ক'দিন আগে তার জামিন হয়েছে। আগামীকাল তার চলে যাবার কথা। তার বিদায় উপলক্ষে আজ দুপুরে একটু ভাল খাবারের যোগাড় করতে রাজি হয়েছে ২৬ সেলের সকল ভিআইপি বন্দি। এতদিন পর জামিনে মুক্তির কারণে আমরা সবাই আনন্দিত। আল্লাহ তাকে যেন মুক্ত জীবনে তার মা, ভাই-বোনের সাথে নিরাপদে থাকার সুযোগ দেন, এ জন্যে প্রাণ খুলে দোয়া করছি।

মানুষের প্রতি মানুষের মনে মায়া মমতা সৃষ্টি হওয়াটা একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। এখানে যারা ২৬ সেলের সেবক হিসাবে আছে, তাদের সবার সাথে আমাদের সম্পর্ক ভাল। তবে বিপ্লব যেহেতু আমাকে বিশেষভাবে দেখা শোনা করত, সাপ্তাহিক সাক্ষাতের দিন আমাকে সাথে নিয়ে যেতো, আমাকে নিয়ে আসত, আমার রুমটা সেই সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতো, আমার বাসা থেকে পাঠানো বিভিন্ন খাবার সামগ্রী কোনটা কোথায়, এ খবর সেই রাখত, এক কথায় এই ১১ মাসে বা এক বছরে আমি তার উপর বেশ কিছুটা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলাম। জেল থেকে মুক্তি পাওয়াটা সবার জন্যেই আনন্দের। আমাদের স্নেহাস্পদ বিপ্লবের জামিনে মুক্তিতে সকলের মত আমিও আনন্দিত। বরং তার কেইস সংক্রান্ত বিষয়ে আমিই খোঁজখবর নিয়ে থাকি বেশি। তার বিদায়ে আমাদের পাশাপাশি তার অভাবটা কি ভুলতে পারব, তার অভাবটা কি আর কেউ পূরণ করতে পারবে? মাঝে মধ্যে এ চিন্তাটাও কেন যেন আমাকে পেয়ে বসে। আজকেই কোন এক সময়ে বিপ্লব চলে যাবে। যাবার দিনও সে সকাল থেকে তার ডিউটি করে যাচ্ছে। আমাদের নাশতা শেষে সে আমার কার্ড নিয়ে গেল মেডিকেলে, কারাগারের হাসপাতাল থেকে আগামী দশ দিন চলার মত ওষুধ সে নিজেই এনে দিয়ে যাবে। আর সামনে কিভাবে ওষুধ আনতে হবে, তা ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছে সেলিমকে যে আমার দেখা-শোনা করবে ওর পরে।

আজ বিপ্লবকে বিদায় দিতে গিয়ে আমার দীর্ঘদিনের কর্মক্ষেত্র জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় অফিসের কথা মনে পড়ছে। আমি সাধারণত যেখানেই যাই, কিছু লোকের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তাদের সাথে মায়া মমতায় জড়িয়ে যাই। জামায়াত অফিসের সাথে সম্পর্ক ১৯৭৯ এর মে মাসে জামায়াত পুনর্গঠিত হবার পর থেকে। এখানে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে ওঠা বসা ও মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে চিন্তার একাত্মতাসহ একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। ইতিহাসের নানা চড়াই উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে তা হয়েছে সীসাঢালা প্রাচীরের মতই এ আদর্শিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সম্পর্ক।

নেতৃবৃন্দ ছাড়াও অফিসের স্টাফ হিসাবে যারা ছোট বড় বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে সাথে, সকলের সফরে সাথে যায়, অফিসের দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা ছাড়া ব্যক্তির ব্যাপারেও খোঁজ খবর নেয়, এমন প্রতিটি ছেলেকেই আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে স্নেহ করি। ওদের চেহারার দিকে তাকালে নিজের ছেলেদের মতই মায়া লাগে। নিজেদের ছেলেমেয়েদের সময়তো আমরা দিতেই পারি না, সারাক্ষণই কাটে ওদের সাথে। আজ কারা প্রকোষ্ঠে বসে ওদের মায়া মমতায় ভরা চেহারাও ভেসে ওঠে আমার চোখের সামনে। এখানে দেখা করতে আসতে পারে শুধু পরিবারের সদস্য এবং আত্মীয় স্বজন। আমার দিনের বেশির ভাগ সময় কাটতো যাদের নিয়ে, তাদের দেখি না প্রায় বছর ঘুরে গেল। বিপ্লবকে আমার কাছে তাদেরই একজন মনে হত। আজ ওকে বিদায় দেবার মুহূর্তে জামায়াত অফিসে কর্মরত সব ছেলেগুলোর মায়া ভরা চেহারাই আমার হৃদয়ে পটে ভেসে উঠছে। ওদের কথা ভাবতেই চোখ দুটো ভরে উঠে অশ্রুতে। আমি আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় সংগঠনের নেতাকর্মীদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকেই ভালবাসি,

www.pathagar.com

এই ভালবাসায় কোন কৃত্রিমতা নেই। অফিসের সাথে সম্পৃক্ত ছোট বড় দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত ব্যক্তিদের যেমন ভালবাসি, তেমনি ভালবাসি আমার প্রিয় সংগঠনের অফিসকে; অফিসের প্রতিটি আসবাবপত্র, ইটসহ ধূলাবালি সবাই আমার কাছে একান্ত প্রিয়, যার সাথে আমার অন্তরাত্মা গভীর ও নিবিড় ভাবে জড়িয়ে আছে অকৃত্রিম মায়া মমতায়।

আমি কখনও নিরাশার শিকার হই না। আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী আল্লাহ হায়াত রাখলে, তাঁরই ইচ্ছায় একদিন এবং সহসাই ফিরে যাব, আমার আত্মার আত্মীয়দের কাছে এবং প্রিয় সংগঠনের প্রিয় অফিসে। ভবিষ্যৎ তো কেবল আলেমুল গায়েব আল্লাহই জানেন। তিনি হতাশ হতে নিষেধ করেছেন। দুশ্চিন্তা ও ভগ্নোৎসাহ হতে বারণ করেছেন, তাই আমরা কেন আশাবাদী হব না, আল্লাহর অমোঘবাণী অবশ্যই সত্য প্রমাণিত হবে, যেমনি অতীতে হয়েছে বার বার। কারাগারে আসার পরে, সংগঠনের কোন দায়-দায়িত্ব পালনের সুযোগ নেই, তেমনি দেশ ও জাতির ভাল মন্দ নিয়ে যত চিন্তা ভাবনাই করি, তা প্রকাশেরও কোন সুযোগ নেই। বলতে গেলে এখন নিজের জন্যেও নিজে কিছু করার নেই। তাই সব কিছু আল্লাহর উপর সঁপে দিয়ে বাস্তবতা মেনে নিয়ে সবর করা ছাড়া কোন বিকল্প নেই। আল্লাহতায়ালা নামাজ ও সবরের সাথে বা মাধ্যমে তাঁর সাহায্য কামনা করতে বলেছেন।

'তোমরা আল্লাহর সাহায্য কামনা কর সবর এবং সালাতের মাধ্যমে। আল্লাহ অবশ্যই সবরকারীদের সাথে আছেন। আল্লাহ এই সবরের তৌফিক কামনা করে দোয়া করার ভাষাও শিখিয়ে দিয়েছেন।

'হে আমাদের রব, আমাদেরকে ব্যাপকভাবে সবর করার তৌফিক দিন, আমাদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করে দিন এবং কুফরী শক্তির উপর বিজয় দান করুন।'

সবরকারীদের জন্যে আল্লাহতায়ালা তাঁর পক্ষ থেকে তিনটি উত্তম পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন।

'সবরকারীদেরকে শুভসংবাদ জানিয়ে দাও যারা মুসিবতে আক্রান্ত হলে বলে থাকে, আমরাতো অবশ্য অবশ্যই আল্লাহর জন্যে এবং অবশ্য অবশ্যই একমাত্র তাঁরই কাছে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

যারা বিপদের মুখোমুখি হয়ে এই ভাবে আল্লাহর কথা স্মরণ করে, সবরের পক্ষ অবলম্বন করে, আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন, ওরা তো তারাই যাদের উপর বর্ষিত হয় আল্লাহর করুণারাশি ও রহমত, আর ওরাই তো সত্যিকার অর্থে হেদায়াত প্রাপ্ত বা হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এখানে প্রথম কথাটি তাদের উপর তাদের রবের পক্ষ থেকে সালাত বর্ষিত হয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাত বর্ষণের অর্থ তার পক্ষ থেকে মেহেরবানী ও করুণারাশি বর্ষিত হয়। দ্বিতীয়টি রহমত, এটা যদিও সালাতের অন্যতম অর্থ, তারপরও সালাতের পর রহমত বর্ষণের ঘোষণাটি সবরের পুরস্কারের গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়। সর্বোপরি কথা, তারাই হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত।

"আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া কোন বিপদ আসে না, আসতে পারে না। যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে, এ ব্যাপারে তারা সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে যায়, বা আল্লাহ তাদের দিলকে সঠিক পথের সন্ধান দেন।" কাজেই বিপদ আপদকে আল্লাহর পক্ষ থেকে মনে করে, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে আল্লাহরই শেখানো পথে সবর ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে হবে। আল্লাহ ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদেরকেই ইমামতি বা নেতৃত্বের জন্যে বাছাই করে থাকেন। ঈমানের দাবিদারদের জন্যে পরীক্ষা আসবেই, এটা অনিবার্য অবধারিত। তবে আল্লাহর রাসূল আমাদেরকে পরীক্ষা চাইতে নিষেধ করেছেন কিন্তু এরপরও যদি এসে যায় তাহলে সবর করতে বলেছেন। আল্লাহ স্বয়ং এ ব্যাপারে যে দোয়া শিখিয়েছেন 'সূরায়ে বাকারার শেষ আয়াতটি, যা মেরাজের উপহারের অন্যতম; তাও প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহর শিখানো ভাষায় দোয়াটি নিম্নরূপঃ

'হে আমাদের রব, আমরা যদি ভুলত্রুটি করেই থাকি তুমি তার জন্যে আমাদেরকে পাকড়াও করো না। অতীতের লোকদের উপর পরীক্ষার যতবড় বোঝা চাপিয়েছো, আমাদের উপর তেমনটি চাপিও না। যে বোঝা (পরীক্ষার বোঝা) বহন করার সাধ্য আমাদের নেই, এমন বোঝাও আমাদের উপর চাপিও না।

www.pathagar.com

আমাদেরকে মার্জনা কর, গোনাহখাতা ক্ষমা কর, আমাদের উপর রহম কর, তুমিই আমাদের প্রভু আমাদের অভিভাবক, অতএব কুফরী শক্তির উপর আমাদেরকে বিজয় দান কর।'

আল্লাহর শিখানো এই দোয়ার ভাষাও অর্থবহ এবং তাৎপর্যপূর্ণ। এতেও মূলত পরীক্ষা চাইতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। অতীতের নবী রাসূলের অনুসারীদেরকেও ঈমানের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। সবচেয়ে বেশি পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছেন আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম।

মানুষের মধ্য থেকে সবচেয়ে বেশি বিপদের বা মুছিবতের সম্মুখীন হতে হয়েছে নবী রসূলদেরকে (আঃ), অতঃপর সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে যারা নবী রাসূলের আদর্শের যত বেশি অনুগামী তাদের উপর তত বেশি বিপদ মুছিবত আসার কথা। বিপদ মুছিবত কখনও কাম্য নয় কিন্তু এসে গেলে সবর করতে হবে। সেই সাথে এই হাদিসের মধ্যে একটা স্পষ্ট ইংগিতও আছে। এই বিপদ মুছিবত যাদের উপর আসে, তাদের মধ্যে এ প্রত্যয় সুদৃঢ় হওয়ার কথা, যে তারা নবী রাসূলদের অনুসরণে অগ্রগামী ভূমিকায় আছে।

দশ ট্রাক অস্ত্র মামলায় আমাকে জড়ানোর জন্যেই সাবেক বিসিআইসি চেয়ারম্যান অবসর প্রাপ্ত মেজর জেনারেল ইমামুজ্জামান ও সাবেক শিল্প সচিব ড. শোয়েবকে দিয়ে অসত্য বিবৃতি বা ১৬৪ এ তাদের স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্যে আমাকে দায়ী করানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আমি এখনও বিশ্বাস করি না যে তারা স্বেচ্ছায় এতবড় অসত্য বক্তব্য দিতে পারেন। ড. শোয়েবের কাছ থেকেই অনুমতি নিয়ে অতিরিক্ত সচিব নূরুল আমীন ঢাকার বাইরে যান। শুনেছি জনাব নূরুল আমীনের কাছে এর রেকর্ড আছে। অর্থাৎ তার যে দরখাস্তে ড. শোয়েব অনুমতি দিয়ে স্বাক্ষর করেছেন সে কাগজটা তার কাছে আছে। অথচ তিনি তার বক্তব্যে এ ব্যাপারে নাকি উল্টো চার্জ করেছেন, পত্রিকার রিপোর্ট থেকে তাই মনে হয়েছে। অথচ আমার পাঁচ বছরের মন্ত্রীত্বের কালে বেশ কয়েকজন সচিবের সাথেই তো কাজ করার সুযোগ হয়েছে, খোদ ড. শোয়েবসহ কোন সচিবই আমার সাথে এভাবে কোন দিনই কথা বলেননি। এ থেকেই বোঝা যায় কৃত্রিম বানোয়াট কথার আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

ইমামুজ্জামান সাহেবের কথায় এসেছে আমি নাকি তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেছি, এসব আমি জানি। আসল কথা তারা দুজনের কেউ এ বিষয়ে আমার সাথে কখনও কোনদিনই কথা বলেননি। আর কারো কথা বলার সময় থামিয়ে দিয়ে কথা বলার অভ্যাস আমার সহজাত স্বভাব বিরোধী। ইমামুজ্জামান সাহেব মুক্তিযোদ্ধা দাবি করে আমাকে হেয় করতে চেয়েছেন। যা তার আচরণে অতীতে কোন দিনই পরিলক্ষিত হয়নি। তাছাড়া ডিবি অফিসে দুটি টিমের জিজ্ঞাসাবাদে আমি যে বক্তব্য দিয়েছিলাম, তাকেই পুঁজি করে, তাদের সাথে আমার ডায়ালগ বসানোটা তদন্ত কর্মকর্তাদের নিজস্ব কারসাজি, এটা বুঝতে আমার মোটেই সময় লাগেনি। যাই হোক এই মামলা নিয়ে আমি মোটেই চিন্তিত নই। এ মামলার সাথে আমার প্রত্যক্ষ তো দূরের কথা পরোক্ষ কোন সম্পর্কও নেই। যে ব্যাপারে মূল সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব ছিল যাদের, তারা দায়িত্ব পালন না করে আমার উপর দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে বাঁচতে চেয়েছেন। তাদেরকে এজন্যে এ দুনিয়াতে না হলেও আদালতে আখেরাতে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। এ বিশ্বাস নিয়ে আমি মিথ্যার মুকাবিলার জন্যে প্রস্তুত। তবে চট্টগ্রামে এই অসুস্থ শরীর নিয়ে যাওয়া আসার কষ্টের অনুভূতিটা মাঝে মধ্যে দুশ্চিন্তায় ফেলে দেয়। শুনেছি চট্টগ্রাম কারাগারে নাকি ডিভিশনও নেই। আমাকে যদি এই মামলার কারণে সেখানে যেতে হয়, তাহলে স্বাস্থ্যগত কারণে সেটা হবে আমার জন্যে বড় কষ্টের। আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই, সেই কষ্ট থেকে বাঁচার জন্যে অথবা কষ্ট সহ্য করার মত শক্তি সাহস আল্লাহতায়ালা তার পক্ষ থেকে কুদরতি ভাবে আমাকে যেন দান করেন। চট্টগ্রামে দশ ট্রাক অস্ত্র মামলায় আমাকে অন্যায়ভাবে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে চার্জশীটভুক্ত আসামী করার পর, এই প্রথম আজ দেখা হবার কথা আমার পরিবারের সদস্যদের সাথে। মোমেন নাকি ইতোমধ্যে মালয়েশিয়ায় গিয়েছিল। গতকালের মধ্যে যদি সে ফিরে এসে থাকে তাহলে তার সাথে এ সংক্রান্ত কথা বলা যেতে পারে। আর সে না আসলে তেমন কিছু জানা বা বুঝা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। আইনজীবীদের কারো সাথে সাক্ষাতের প্রয়োজনীয়তা

www.pathagar.com

অনুভব করছি। কিন্তু তারাও নাকি সাক্ষাত চাইলেই আসতে পারে না। আমি আশা করছি, এবারে হয়ত কালকের দিন পরে, শনিবারে আইনজীবীদের কেউ আসতে পারেন। যদি আসেন, তাহলে এ ব্যাপারে আইনগত পদক্ষেপ কী কী নেয়া যায় সে সম্পর্কে, মতের আদান প্রদান হবে। শুনলাম উক্ত মামলায় যাদেরকে আসামী করা হয়েছে, তাদেরকে নাকি ১লা আগস্ট চট্টগ্রামের বিচারিক আদালতে হাজির হতে বলা হয়েছে।

এতে প্রস্তুতির জন্যে এক মাসের মত সময় পাওয়া গেল বলে একটু স্বস্তিবোধ করছি। কিন্তু তারপরও চট্টগ্রামে যাওয়া, সেখানকার জেলখানায় অবস্থান করাটা আমার স্বাস্থ্যগত কারণেই হবে দুঃসহ কষ্টের ব্যাপারে। আল্লাহ যদি তার কুদরতি ব্যবস্থায় সাহায্য করেন, কেবল তাহলে এ অসহনীয় কষ্ট উৎরানো সম্ভব হবে। তাই তাঁর দরবারে কাতর কণ্ঠে দোয়া করছি।

গতকাল ছিল কেন্দ্রীয় কারাগারে এবারের বর্ষপূর্তি দিবস। আমাকে গত বছর ২০১০ এর ২৯ শে জুন বিকেলে জাতীয় প্রেস ক্লাব থেকে ডিবি পুলিশ গ্রেফতার করে ডিবি অফিসে নিয়ে যায়। ঐদিনই দুপুরে ঢাকার সিএমএম আদালতের পক্ষ থেকে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার অভিযোগে মাইজভান্ডারী বেদআতী গ্রুপের দায়ের কৃত মামলার প্রেক্ষিতে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। উক্ত গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির সাথে সাথেই ডিবি পুলিশের লোকেরা আমাকে, সাঈদী সাহেবকে এবং মুজাহিদ সাহেবকে গ্রেফতার করে ডিবি অফিসে নিয়ে আসে। আসরের নামাজ ডিবি অফিসে গিয়েই পড়েছিলাম। রাতটা ওখানেই কাটাতে হল। দিনের মাঝখানে আমাদেরকে কোর্টে নেয়া হল। কোর্টে মূল মামলা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের বিষয়টি অনেকটা চাপা পড়ে যায়। অনেকগুলো বানোয়াট মামলায় গ্রেফতার ও রিমান্ডের আবেদন মঞ্জুর শেষে মূল মামলায় আদালতে জামিন মঞ্জুর করা হয়। অবশেষে গারদে কিছুক্ষণ অবস্থান করে মাগরিব শেষে ৩০ শে জুনের দিবাগত রাতে আমাদের কেন্দ্রীয় কারাগারে আনা হয়। বছর ঘুরে সেই দিনটাই ছিল সাপ্তাহিক সাক্ষাতের দিন। কিন্তু পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনায় সে প্রসঙ্গ তোলার সুযোগ হয়নি। আমার বারডেমে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনায়ই সময় শেষ হয়ে যায়। ঘটনাক্রমে এদিনে মোমেনের অনুপস্থিতি সেই সাথে মিঠুর অনুপস্থিতিতে সাক্ষাৎটা আগের মত না হয়ে আমার কিছু চিন্তা বাড়িয়ে দেয়।

গত বৃহস্পতিবারের সাক্ষাতে মোমেনের অনুপস্থিতি এবং সেই সাথে মিঠুর গেট পর্যন্ত এসেও সাক্ষাতস্থলে না আসায় মনটা বেশ খারাপ হলেও তা প্রকাশ করিনি। আমার বড় জামাই তার ভাগ্নির বিয়ে উপলক্ষে ইংল্যান্ডে গিয়েছিল। সেখান থেকে আমেরিকায় গিয়েছে, এখন সে আমার বড় ছেলে নাজিবুর রহমান তারেকের বাসায় আছে, তারেকের দুই মেয়ে তাদের বড় ফুফাকে পেয়ে নাকি খুব খুশি। অন লাইনে তাদের সাথে বাসার সবার মাঝে মাঝেই কথা হয়, দেখাও হয়। তারেকের মেয়ে খুবই কোরআন ভক্ত হয়েছে। বড় মেয়ের বয়স চার বছরের কিছু বেশি, সে ক্যাসেট শুনে কোরআনের শেষ পারা সহ বেশ কিছু অংশ নাকি মুখস্থ করেছে, অথচ দেখে পড়তে শিখেনি। এখন ছোট মেয়েও নাকি বড় বোনের সাথে পাল্লা দিয়ে কোরআন মুখস্থ করতে চায়, তাদের কাছে কোরআনের ক্যাসেটই নাকি সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয়। শুনে মনটা আনন্দে যেমন উৎফুল্ল হয়, তেমনি আমার মনের মধ্যে ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়, আল্লাহ কি আমাকে তাদের কণ্ঠের তেলাওয়াত শোনার সুযোগ দেবেন না? আমার দোয়ার মধ্যে সবচেয়ে প্রাধান্য পায় আল্লাহ ও রাসূলের শিখানো সবগুলো দোয়াই। তবে বিশেষ করে আল্লাহর শিখানো দোয়ার মধ্যে মা বাপের জন্যে এবং নিজের স্ত্রী সন্তান সন্ততির জন্যে শিখানো দোয়াগুলোই বেশি পছন্দের দোয়া।

'হে রব, আমাকে প্রকৃত নামাজ কায়েমকারী বানাও, অনুরূপভাবে আমার বংশধরদেরকেও বানাও। হে আমাদের রব আমার এই দোয়া কবুল কর।'

সেই সাথে মা বাপের জন্যে শিখানো দোয়াটি - 'হে রব, আমার মা ও বাপের প্রতি তেমনি সদয় হও যেমন সদয় চিত্তে তারা আমাকে লালন করেছেন।'

www.pathagar.com

'হে আমাদের রব, আমাদের জীবন সঙ্গিনীকে (স্বামীর জন্যে স্ত্রী, আর স্ত্রীর জন্যে স্বামীকে), আমাদের সন্তানদেরকে চক্ষু শীতলকারী বানাও। আর আমাদের পরিবারের সবাইকে মুক্তাদিদের জন্যে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় বানাও।'

আমার স্ত্রীর এ পর্যন্তকার ভূমিকা নিয়ে আমি আত্মবিশ্বাসী, তার জন্যে অন্তত আমার দোয়াটি আল্লাহতায়ালা কবুল করেছেন। ছেলে মেয়েদের ভূমিকাতেও এখন পর্যন্ত আমার মন বলে আল্লাহ তাদের ব্যাপারেও আমার দোয়া কবুল করেছেন। নাতি নাতনীদের চলছে শিশু অবস্থা অবশ্য বড় মেয়ের ছেলে কৈশোরে পা রেখেছে। তাদের অবস্থা দেখে মনে হয়, আল্লাহ তার এই গোনাহগার মজলুম বান্দার দোয়া তাদের ব্যাপারেও কবুল করেছেন বা করবেন।

আমার এই অনুভূতি আল্লাহ সুবহানাহুতায়ালা আমার পরিবারের এবং সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট সবার মনে পৌঁছায়ে দিন, এ দোয়াও করি মাঝে মধ্যে। মানুষের জীবনের কোন নিশ্চয়তা নেই। আল্লাহ কাকে কত দিন হায়াত দেবেন, কখন কোথায় তার জীবনের যাত্রা শেষ হয়ে যাবে তাতো তিনি জানেন। জেলে আসার প্রথম কি দ্বিতীয় সাক্ষাতে আমার স্ত্রীকে বলেছিলাম, আমার সোনার টুকরো ছয়টি ছেলে মেয়েকে তুমি দেখে রেখ। এটা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ তাড়িত অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত উচ্চারণ। আমি এই সন্তানদের কার্যক্রম ও ভূমিকা দেখার সুযোগ পাওয়ার আশা মনে মনে অবশ্যই লালন করি। তবে সুযোগ হবে কি হবে না, তা কেবল আলেমুল গায়েব আল্লাহই জানেন।

আমার সাপ্তাহিক সাক্ষাতে নিয়মিত এসে থাকে আমার বেগম সাহেবা, বড় মেয়ে, মেঝ ছেলে এবং মিঠু। ছেলে মোমেন এবং ভাতিজা মিঠুকে যা বলার থাকে তা আর কাউকে বললে হয় না। গত সাক্ষাতে এই দুজনের একজনও না আসায় আমার অনেক কথাই যেন বলা হয়নি। অবশ্য পরিবারের প্রধান এখন আমার বেগম সাহেবা। তিনি যথেষ্ট দায়িত্বশীলা এবং নির্ভরযোগ্য। আমার সংসার ও সন্তান লালন পালনে, তাদের শিক্ষাদীক্ষায় তার ভূমিকাই মুখ্য। বড় মেয়ে তো আমার মায়ের বিকল্প। আমার বেগম সাহেবা সংসার ও সন্তানদের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান। আমাদের সংগঠনের মহিলা বিভাগের দায়িত্বও খুব নিষ্ঠার সাথে এবং সক্রিয়ভাবে পালন করে অভ্যস্ত। বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমি তাকে একটু সতর্কতার সাথে কাজকে সীমিত পর্যায়ে রাখার উপদেশ দিয়ে থাকি। তার শরীরের দিকে যেন লক্ষ্য রাখে, তাছাড়া আমাদের পরিবারের প্রতি অনেকেরই সুনজর নেই, এই বাস্তবতাটা বুঝে যেন চলাফেরা করে এবং তার সার্বিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত ও পরিমিতভাবে আঞ্জাম দেয়। আমার বেগম সাহেবাকে যখনই আমি এরূপ উপদেশ দেই, তখনই পাশে থেকে আমার বড় মেয়ে মুহসিনা বলে উঠে, 'আব্বু আপনি চিন্তা করবেন না, আম্মুকে দেখে রাখার দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দেন, আমি তার একথায় আশ্বস্ত হই, সত্যি সে আমার মা।

গত বৃহস্পতিবারের সাক্ষাতে আমি আমার বেগম সাহেবাকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম, যেন জেল গেট থেকে বের হয়েই ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক সাহেবকে বলেন, তিনি যেন ঐ দিনই জেল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে শনিবারে আমার সাথে দেখা করতে আসে। জানি না ঐদিন পর্যন্ত ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক সাহেব মালয়েশিয়া থেকে দেশে ফিরেছেন কিনা। গতকাল শনিবার ছিল আমার আর একটা পরীক্ষার দিন। বিকেল ৩ থেকে ৪টার মধ্যেই সাধারণত আইনজীবীদের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে থাকে। কিন্তু দিন শেষে হতাশ হলাম। জানি না তিনি না আসার কারণে না কি অন্য কোন কারণে সাক্ষাৎটা হল না।

মাত্র ক'দিন আগে তিনি মাওলানা সাঈদী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে যান। সাঈদী সাহেব তাকে বলেছিলেন আমার সাথে সাক্ষাৎ হওয়া দরকার। এ পর্যন্ত অনেকদিনের ব্যবধানে কোন সাক্ষাৎ না হওয়াটা কেমন যেন দেখায়। জবাবে ব্যারিস্টার সাহেব বলেছিলেন, উনার পক্ষ থেকে উনার ছেলে যোগাযোগ করলেই আমি দৌড়ে আসব। এ যাত্রায় ছেলে সাক্ষাতে না আসতে পারায় আমার বেগম সাহেবকেই দায়িত্ব দিলাম। কিন্তু কোন কারণে হয়তোবা, এ যাত্রায়ও আমার আশা পূরণ হল না।

www.pathagar.com

সামনের সাক্ষাতে ছেলে মোমেন আসবে, আশা করছি, তার মাধ্যমে খবর দিয়ে দেখি ফলাফল কী দাঁড়ায়। সাক্ষাতে আসলেই আমার বেগম সাহেবা লেখার কথা জিজ্ঞাসা করে। ১/১১ এর পরই আমি মাত্র ২ মাসের মধ্যে 'রাসূলুল্লাহর মক্কার জীবন' শিরোনামে সংক্ষিপ্ত একটা বই লিখতে সক্ষম হই আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানীতে। বইয়ের শেষের দিকে আমি নিজেও ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলাম, মদিনার জীবনের উপর কিছু একটা লেখার। বলতে গেলে ওয়াদাই করেছিলাম। ১/১১ এর সরকারের সময়ে দুবার জেলে আসতে হয়, একবার ৫৬ দিন, আরেকবার ১০ দিনের জন্যে। তখন চেষ্টা করেও কিছু লেখা হয়নি। এবার তো একবছর পেরিয়ে গেল। ছেলে এ প্রসঙ্গে সহায়ক বেশ ক'টি বই যোগাড় করে দিয়েছে, কিন্তু কেন যেন, লেখার জন্যে প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহের জন্যে এগুলোকে তেমন কাজে লাগাতে পারছি না। সময় কাটাবার জন্যে জেলখানায় যে অনুভূতি ও উপলব্ধি মনের কোণে উঁকি ঝুঁকি মারে, মাঝে মাঝে ঝড়ও তুলে, তারই আংশিক প্রকাশ ঘটছে আমার বর্তমান লেখা 'জেলখানার অনুভূতি' এর মাধ্যমে।

গত পরশু আমাদের প্রতিবেশী দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংয়ের বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে মন্তব্য শুনে মনের উপর দিয়ে ঝড় নয়, রীতিমত টর্নেডো বা সাইক্লোন বয়ে গেল। তার মত ব্যক্তি প্রতিবেশী দেশ সম্পর্কে এবং উক্ত প্রতিবেশী দেশের একটি ইসলামী দল সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, তা কূটনৈতিক শিষ্টাচার বহির্ভূতই বলতে হবে। তার এ বক্তব্যই প্রমাণ করে, বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার জামায়াতে ইসলামীর উপর যে নির্যাতন নিপীড়ন চালাচ্ছে, তার পেছনে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী এবং তার সরকারের ডিকটেশন কাজ করছে। ভারত যদি বাংলাদেশের সাথে সৎ প্রতিবেশীসুলভ আচরণ করতে চায়, তাহলে বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দলের সাথেই সুসম্পর্ক রাখার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু তার পরিবর্তে দল বিশেষের প্রতি বৈরিতা দল বিশেষের প্রতি সখ্যতা প্রমাণ করে, তারা আমাদের ঐক্য সংহতি নষ্ট করে, তাদের মর্জিমত আমাদের দেশকে চালাতে চায় বা চলতে বাধ্য করতে চায়। আমরা সংসদের ভেতরে বাইরে, এমনকি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তাদের বুঝাতে চেষ্টা করেছি, আমরা নিকট প্রতিবেশী হিসাবে তাদের সাথে সুসম্পর্ক কামনা করি, বৈরিতা নয়।

এখানে উল্লেখ করতে দ্বিধা নেই, বাংলাদেশে অবস্থিত সব কূটনৈতিক অফিস থেকে আমরা দাওয়াত পাই কিন্তু ভারত থেকে পাই না। গত বছর আমার গ্রেফতার হবার আগেই ঢাকাস্থ সব দূতাবাসে বাংলাদেশের মৌসুমী ফল আম পাঠিয়েছিলাম। সবাই ধন্যবাদের সাথে গ্রহণ করেছে, আর নিতান্ত অবজ্ঞা করে ভারতীয় দূতাবাস ওটা গ্রহণ না করলেও এথেকে তাদের মন মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তারা বাংলাদেশের সংগঠিত ইসলামী সংগঠনকে তাদের সেই ডিজাইন বা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে বাধা বা অন্তরায় মনে করে। ভারতের প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মনে একটি সুসংগঠিত ইসলামী দল সম্পর্কে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত ধারণারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তার উক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যা থেকে গ্রাম্য প্রবাদটিই প্রতিধ্বনি অনুরিত হয়েছে, 'ঠাকুর ঘরে কে? আমি কলা খাই নাই।' পররাষ্ট্র দফতরের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এটা নাকি তার পূর্ব প্রতিষ্ঠিত কোন ধারণা থেকে বলা হয়নি। ভারতীয় পররাষ্ট্র দফতরের বক্তব্য স্বীকার করে নিল যে, ড. মনমোহন সিং ভারতের নামিদামী প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রের তার একান্ত বিশ্বস্ত কয়েকজন সিনিয়র সাংবাদিকের মাধ্যমে জেনে বাংলাদেশ সম্পর্কে তার এই বক্তব্যটি দিয়েছেন। আমাদের জেলখানার এক সাথী সাংঘাতিক ভারতপন্থী ও মনমোহন সিংয়ের ভক্ত অনুরক্ত। তিনি বলছিলেন, সংবাদপত্রে তার বক্তব্য সঠিকভাবে নাও আসতে পারে। পরের দিন কোন রিজয়েন্ডার আসে কিনা সে পর্যন্ত অপেক্ষা না করে কোন মন্তব্য করা ঠিক নয়। পররাষ্ট্র দফতরের পক্ষ থেকে কোন রিজয়েন্ডার দেয়া হয়নি বরং ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। ব্যাখ্যার মূল কথা, এটা তার কোন ধারণা প্রসূত বক্তব্য নয়। তার অর্থ তিনি নিশ্চয়ই জেনে শুনে, তাদের নিজস্ব সোর্স থেকে

www.pathagar.com

তথ্য উপাত্ত নিয়ে তার ভিত্তিতে বক্তব্য দিয়েছেন। তাহলে এখন আর এটা ভেবে অপেক্ষা করার আর কোন সুযোগ থাকে না যে, পত্রিকায় ভারতীয় মন্ত্রীর বক্তব্যের সঠিক প্রতিফলন ঘটেনি।

ভারতের মত একটা বড় দেশের, বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ এই প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে মোটেই হালকাভাবে নেয়া উচিত হবে না। যারা বাংলাদেশকে যুদ্ধ করে স্বাধীন করেছেন, যুদ্ধে অংশ নিতে না পারলেও যারা বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসাবে দেখতে চান, তাদের সবার বিবেকের কাছে আমার আবেদন জানাতে ইচ্ছা করে, আকুল আবেদন জানাতে ইচ্ছা করে, তারা কেউ যেন ড. মনমোহন সিংয়ের এই বক্তব্যকে হালকাভাবে না দেখেন, বক্তব্যের গভীরে যেয়ে দেখেন মি. সিংয়ের পক্ষ থেকে ভারতবাসীকে এবং দুনিয়াবাসীকে বিশেষ করে বাংলাদেশের মানুষকে তিনি কী বার্তা দিতে চেয়েছেন। জামায়াত সম্পর্কে তার বক্তব্যের প্রধান কারণ কি তাই, টিপাইমুখ বাঁধের ব্যাপারে জামায়াতের প্রতিবাদী ভূমিকায় তারা হোঁচট খেয়েছেন? তাদের আগ্রাসী, আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদী কণ্ঠ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ময়দানে সক্রিয় ভূমিকায় থাকুক, এটা তাদের কাছে অসহনীয়, একমাত্র এ কারণেই জামায়াতকে নিয়ে তাদের এত মাথা ব্যথা। আমরা পরিষ্কার বলতে চাই, ভারতের স্বার্থ দেখার দায়িত্ব যেমন প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের, তেমনি বাংলাদেশের স্বার্থ দেখার দায়িত্বও প্রতিটি বাংলাদেশী নাগরিকের। আমরা গায়ে পড়ে ভারতের সাথে বিরোধে জড়াতে চাই না। কিন্তু আমাদের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের পায়ে কুর্নিশ করা আমাদের কাছে কেন, গোটা জাতির কাছেই গ্রহণযোগ্য নয়।

আজ কারা প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ অবস্থায়, বিবেকের ডাকে সাড়া দিয়ে হক কথা বলার সুযোগ থেকে আমি বঞ্চিত। সম্ভবত তাদের সৎভাইসুলভ আচরণের প্রতিবাদ যাতে বাংলাদেশের মাটিতে আর হতে না পারে, এজন্যেই তাদের পছন্দের দলকে ক্ষমতায় এনে, দেশের ইসলামী শক্তিকে নির্মূল করার মোক্ষম সুযোগটি তারা বেছে নিয়েছে। তবে আমি হতাশ নই। মনমোহন সিংয়ের বক্তব্যের কারণে আমার মত অনেকেই আহত হয়েছেন। বিবিসির বাংলা অনুষ্ঠানে, এর কিঞ্চিৎ আভাস যা পাওয়া গেল, তাতেও বুঝা যায়, তার এই বক্তব্য শুধু অপ্রাসঙ্গিকই নয়, অযৌক্তিক ও সৌজন্যের পরিপন্থী। মনমোহন সিংয়ের বক্তব্য, শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির বক্তব্য নয়, শুধুমাত্র একজন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য নয়, এটা ভারতের নীতিনির্ধারকদের এবং সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে অখণ্ড ভারতের প্রবক্তাদের ও তাদের সার্থক উত্তরসূরীদের মনের গভীরে লালিত ধ্যান-ধারণারই বহিঃপ্রকাশ। অতএব ভালভাবে, বিশ্লেষণী মনোভাব নিয়ে, এ বক্তব্যের নিগূঢ় রহস্য উৎঘাটন করে, গোটা জাতিকে এর প্রতিকার প্রতিবিধানে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের দেশ ছোট হতে পারে, কিন্তু জাতি হিসাবে, গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ঐতিহ্যের ধারক বাহক হিসাবে, আমরা এতটা তুচ্ছতাচ্ছিল্যের পাত্র নই, আমাদের নিকট প্রতিবেশী দেশটির শাসক গোষ্ঠী যেমন মনে করে থাকেন।

আমি কারা প্রকোষ্ঠে শুয়ে বসে যতই ভাবি ততই মনটাকে অস্থিরতায় পেয়ে বসে। এ বিশ্বাস সুদৃঢ় ভিত্তি পেয়ে যায়, ভারতীয় ডিজাইন বাস্তবায়নে জামায়াতকে একটা বাধা মনে করেই দাদাদের অনুগত সরকার জামায়াতের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক নিপীড়ন নির্যাতনের স্টিম রোলার চালাচ্ছে। এখানে বসে অসহায়ের মত এটা ভাবছি, আর আল্লাহর কাছে কাতর কণ্ঠে বলছি, আল্লাহ আমার এই অনুভূতিটুকু জাতির বিবেকের কাছে পৌঁছিয়ে দাও।

গত সপ্তাহের সাক্ষাতে মোমেন আসতে পারেনি দেশের বাইরে থাকার কারণে। গত শুক্রবারে ভোরের দিকে দেশে ফিরে আসার কথা। আজ সোমবার এখনও কোন খবর পাইনি তার ফিরে আসার। তার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। কারণ তার কাছ থেকে আমার ছোট ছেলে তালহার সর্বশেষ খবর জানতে পারব। ২ বছর পরে সে দেশে এসেছিল। প্রায় দু'সপ্তাহের বেশি সময় থেকে গেছে। এর মধ্যে একদিন ট্রাইব্যুনালে দেখা আর ২ দিন জেল গেটে এসেছিল, তার যাওয়ার আগের দিন সাপ্তাহিক সাক্ষাতের আর একটা সুযোগ ছিল। কিন্তু সেই দিন আমাকে সেফ হোমে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে যেতে হয়

www.pathagar.com

বিধায় পরিবারের লোকেরা বুধবারে এসেছিল জেল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করেই। কিন্তু পরে জানলাম জেল কর্তৃপক্ষ আসতে বললেও তাদের ২ ঘণ্টা বসিয়ে রেখেও, দেখা করতে দেয়নি। তাদেরকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। এরূপ ঘটনা তো মাঝে মধ্যেই এখানে অনেকের ব্যাপারে ঘটে থাকে। কিন্তু আমার জন্য কষ্টের ব্যাপার ছিল সবচেয়ে ছোট ছেলে ২ বছর পরে এসেছিল, তার সাথে আরেকবার দেখা হলো না। আবার কবে আসতে পারবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। আমার এই ছেলেটি কথা কম বলে, কিন্তু অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে মা বাপ ও ভাই বোনের কথা। এ সময় তাকে দেশে আসতে অনেকেই মানা করেছিল, কিন্তু সে চলে এসেছিল মনের টানে। ও দিকে তার অনার্সের পরীক্ষা চলছে, এখনও শেষ হয়নি। পরীক্ষা বাকী রেখে এভাবে চলে আসা প্রমাণ করে, আমার গ্রেফতারের কারণে তার মনের অবস্থাটা কেমন। আল্লাহ মেহেরবান, সে সর্বশেষ এসে দেখা না করতে পারলেও, দেশে অবস্থান কালে বিভিন্নভাবে তিনবার দেখা হয়েছে। আশংকা ছিল ফিরে যেতে না দিলে তার ক্যারিয়ারটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এজন্যেই তাকে আসতে মানা করা হয়েছিল। যাক আল্লাহ বড়ই মেহেরবান, সে বেশ সহিসালাহমতে তার বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে গেছে এবং বাকী পরীক্ষাগুলোর জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। তার বাকী পরীক্ষাগুলোর প্রস্তুতি কেমন, আর কত দিন লাগবে শেষ হতে, এটা জানার জন্যেই মোমেনের সাক্ষাতের অপেক্ষা করছি, মনের দারুণ ব্যাকুলতা নিয়ে। আগামী সাক্ষাতের নির্ধারিত দিন বৃহস্পতিবার। এদিকে চারদলীয় জোটের পক্ষ থেকে জুনের ৬-৭ অর্থাৎ বুধ বৃহস্পতিবার ৪৮ ঘণ্টা হরতাল ডাকা হয়েছে। তাই বৃহস্পতিবারে হরতালের দিন তো আর সাক্ষাতের জন্যে কেউ আসতে পারবে না। তাই মোমেনের সাথে দেখা হওয়ার বিষয়টি আরো একদিন বিলম্বিত হবে। বিলম্বে হলেও যেন দেখাটা হয় এজন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, প্রাণ খুলে।

আমার ডান হাতের অবস্থার এখনও কোন উন্নতির লক্ষণ নেই। ২০০৮ এ ঘরের দরজায় চাপা লেগে ডান হাতের একটি আঙ্গুল (শাহাদাত আঙ্গুল) বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় প্রায় তিন বছর কোন লেখালেখি করতে পারিনি। তদুপরি ২০০৯ এর শেষে ২০১০-১২ সেশনের ইমারতের নির্বাচনের আগে, মজলিসে শূরার প্যানেল নির্বাচনের আগের রাতে আমার একটা 'মাইল্ড ব্রেইন স্ট্রোক' হয় ফলে বড় রকমের কোন ক্ষতি না হলেও ডান হাত ও ডান পা অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় কিছুদিন ইবনে সিনা হাসপাতালে ভর্তিও ছিলাম। তারপর ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতালে নিয়মিত ফিজিওথেরাপি নিচ্ছিলাম। ২০১০ এর ২৯ শে জুনে গ্রেফতার হবার পর থেকে আর ফিজিওথেরাপি নেয়ার সুযোগ হয়নি। বারডেমে ৫ই জুন ও ১৯ শে জুন দুই দিন ফিজিওথ্যারাপি নিলেও ওটা কোন কাজে আসেনি। বরং এভাবে অনিয়মিত থেরাপি ক্ষতিকরই হয়ে থাকে। আমার জন্যে বারডেমের ফিজিক্যাল মেডিসিনের পক্ষ থেকে একটানা দশ দিনের ফিজিওথেরাপি (নিজ খরচে) নেয়ার ব্যবস্থা করলেও, জেল কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোন সহযোগিতা করতে অপারগতা প্রদর্শন করেন। এইভাবে আমাকে বিনা চিকিৎসায়ই থাকতে হচ্ছে। অবশ্য ইতঃপূর্বে, পিজির কার্ডিওলজির অধ্যাপক সজল ব্যানার্জি আমাকে দেখে গেছেন, বারডেমের মেডিসিনের প্রফেসর এগুলো দেখে দশ দিনের জন্যে ভর্তির পরামর্শ দেন এবং বারডেমের আরপিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে অনুরোধ জানান। কিন্তু তখন কারা কর্তৃপক্ষের বরাত দিয়ে ডেপুটি জেলার আবু মুসা সাহেব আপত্তি করায় ঐদিন আর ভর্তি হওয়া সম্ভব হয়নি। পরে ১৯ শে জুনে প্রস্তুতি নিয়ে গিয়েছিলাম বারডেমে ১০ দিনের জন্যে ভর্তি হবার। কিন্তু সেদিন প্রথমে একজন কারারক্ষীর মাধ্যমে আরপি এর কাছে কাগজ পাঠানোতে, ভর্তির ব্যাপারে বারডেমের আরপি নেতিবাচক মনোভাব দেখেন। পরে একজন ডাক্তারের মাধ্যমে কাগজপত্র নিয়ে যাওয়ার পর জানা গেল, ভর্তি করা হবে, তবে এখন সিট বা কেবিন খালি নাই।

আমার ভর্তির ব্যাপারে মেডিসিনের ডাক্তারের পরামর্শের কারণ হল ঊাধষঁধঃরড়হ ধহফ ৎবঢ়ড়ৎঃ রহাবংঃরমধঃরড়হ. ফিজিক্যাল মেডিসিনের পক্ষ থেকে একটানা ১০ দিন থেরাপি নেয়ার ব্যাপারে আমার

www.pathagar.com

ভর্তি না হলেও চলে। কিন্তু জেলকর্তৃপক্ষ একটানা ১০ দিন বারডেমে নেয়া আনা করতে কিছুতেই রাজি নয়। আমার স্বাস্থ্যগত অন্যান্য সমস্যার মধ্যে এখন দাঁতের সমস্যা এবং ডান হাতের সমস্যা দুটোই প্রকট। তাছাড়া অনেকগুলো ওষুধ কার্ডিওলজিস্ট প্রফেসর সজল ব্যানার্জির প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী খেতে হচ্ছে। এগুলো আর কত দিন খেতে হবে, কোনটা বাদ দেয়া যায় কোনটা আরও কিছু দিন খেতে হবে, এই ব্যাপারে বারডেমের মেডিসিনের ডাক্তারের (প্রফেসর) অভিমত ছিলই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বাস্তব সম্মত। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, এব্যাপারে এখন পর্যন্ত কোন ব্যবস্থাই করা সম্ভব হল না।

বারডেমের ফিজিওথেরাপিস্ট আমার হাতের ব্যাপারে বলেছিলেন, ফিজিক্যাল মেডিসিনের ডাক্তারের (প্রফেসর) নির্দেশানুযায়ী হাতের জন্যে আলট্রা সাউন্ডের ব্যবস্থায় এ সমস্যাটা খুব দ্রুতই ভাল হয়ে যাবে। কিন্তু ঐ দিনের পর আরতো যাওয়ার কোন সুযোগই হল না। কারাকর্তৃপক্ষের যিনি এবিষয়ে দেখে থাকেন, তিনি পরামর্শ দিয়েছেন, বারডেমে ভর্তির ব্যাপারে নিজের পরিবারের পক্ষ থেকে যোগাযোগের মাধ্যমে ব্যবস্থা করলেই ভাল হবে। মোমেন আসলেই এ ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে বলার আশা করছি, অন্তত ফিজিওথেরাপিটা একটানা ১০ দিন হলে, এবং হাতে আলট্রা সাউন্ডের মাধ্যমে চিকিৎসা পেলে একটু দুশ্চিন্তা মুক্ত হতে পারতাম।

গতকাল আমাদের এখানে তিনজন নতুন মেহমান এসেছেন। তিনজনই সাবেক আই,জি,পি। তাদেরকে ২১ শে আগস্টের গ্রেনেড হামলার মামলায় চার্জশীটভুক্ত আসামী হিসাবে গ্রেফতার করে আনা হয়েছে। তারা নিজেরাই কোর্টে গিয়ে আত্মসমর্পণ করার পর জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানো হয়।

আমরা দুপুরের খাবার শেষে বিশ্রামে যাব, ঠিক এমন সময় উনারা তিনজন এসে পৌঁছলেন। উনাদের জন্যে তড়িঘড়ি করে ডিম ভাজি আর ডাল ভাতের ব্যবস্থা করা হল। উনাদের কাছ থেকে জানা গেলো পারস্পরিক কোন যোগযোগ ছাড়া যার যার মত উনারা কোর্টে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু কাকতালীয়ভাবে এক সাথে হয়ে যান এবং একই চিন্তা করে তারা স্বেচ্ছায়, আদালতে আত্মসমর্পণ করতে যান। তাদের পেশাগত দায়িত্বের অনুভূতি তাদেরকে এভাবে স্বেচ্ছায় আদালতে আত্মসমর্পণে উদ্বুদ্ধ করে।

কারা জীবনে এ পর্যন্ত যাদের সাহচর্যে এসেছি, সবার কাছেই কিছু না কিছু শিক্ষণীয় বিষয় আছে বলে আমার মনে হয়েছে। বিশেষ করে যারা বিভিন্ন সরকারের অধীনে পেশাগত দায়িত্বপালন করতে গিয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পেয়েছেন, এদের কথাগুলো আমি বেশ মনোযোগ সহকারে শোনার চেষ্টা করছি, তাদের কথাগুলো হৃদয়ে গেঁথে নিচ্ছি। কিন্তু এক্ষণই এই মুহূর্তে কলমে প্রকাশ করছি না। আল্লাহ সুযোগ দিলে ভবিষ্যতে মাঠে ময়দানে কাজ করার সুযোগ পেলে ওগুলোকে কাজে লাগানোর একটা সুপ্ত আশা আকাঙ্ক্ষা রয়ে গেল আমার মনের কোণে। আল্লাহই ভাল জানেন, সে সুযোগ কবে আসবে, বা আদৌ আসবে কিনা, কিন্তু মনটা আমার আশাবাদী। আল্লাহর রহমত থেকে ঈমানদার কখনও হতাশ হতে পারে না, নিরাশ হতে পারে না। অতএব আল্লাহর ঐ নূরের আলোকে আলোকিত হতে চাই, যার ফলে নিকষ কালো অন্ধকার দূরীভূত হয়ে যায়। যার উপরে ভিত্তি করে দুনিয়ার সকল বিপর্যয় উৎরে সংস্কার সংশোধন ও উন্নয়নের দ্বার উন্মোচিত হয়।

আল্লাহর ঘোষণাটি সব সময়ই মনকে আশাবাদী করে রাখে, 'নিশ্চয়ই কঠিন সময়ের পরেই রয়েছে সুসময়, অবশ্যই দুঃসময়ের পরেই আসবে সুসময়।' বেশি আশা করলে, আশাপূরণে বিলম্ব হলে, হতাশায় পেয়ে বসতে পারে, তাই অনেক বিজ্ঞজনের পরামর্শ মোটেই কিছু আশা না করা। কিন্তু আমি এই কথার সাথে কেন যেন একমত হতে পারি না। আশাইতো মানুষকে চরম প্রতিকূলতার মাঝেও সাফল্যের স্বপ্ন দেখায়। একজন আরবী কবি বলেছেন, 'আল্লাহর ব্যাপারে হতাশ হওয়া কুফরীর পর্যায়ে পড়ে।' অতএব আশাবাদী হতেই হবে। আল্লাহ চরম প্রতিকূল অবস্থায় ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর সবরের তৌফিক চেয়ে দোয়া করার যে ভাষা শিখিয়েছেন, তার প্রায় সবটার শেষ কথা 'অতঃপর আমাদেরকে কাফেরদের উপর,

www.pathagar.com

কুফরী শক্তির উপর বিজয় দান কর।' অতএব আশা ত্যাগ করা নয়, বরং সাফল্য বিলম্বিত হওয়ায়, অথবা বিপদ কেটে যেতে বেশি সময় লাগায় অস্থিরতা প্রকাশ থেকে বিরত থাকতে হবে। এই অস্থিরতা থেকে বাঁচার জন্যে আল্লাহর রহমতের প্রতি পূর্ণ আস্থাসহ আশাবাদী হয়েই এ পরিস্থিতির মুকাবিলা করা সম্ভব। এক্ষেত্রে ইংরেজী প্রবাদ বাক্যটিও বেশ প্রণিধানযোগ্য, যার বাংলা অর্থ 'উত্তম কিছুর জন্যেই আশা কর, তবে অনেক বড় রকমের বিপর্যয়ের জন্যেও তৈরি থাক।' বন্দী জীবনের একবছর পার হয়ে গেল। ২৯ শে জুনের বিকেলে গ্রেফতার হই। আজ ৬ ই জুলাই ২০১১ অর্থাৎ বন্দী জীবনের এক বছর ৭ দিনে পা রাখি। আমার মেয়ে মহসিনা তার মনের কষ্ট প্রকাশ করেছে, সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় ছোট একটা লেখার মাধ্যমে; আর কত দিন এভাবে কাটবে তার আব্বুর কারাপ্রকোষ্ঠে? মা মনি মহসিনার লেখার মাধ্যমে আমরা যারা আজ কারাবন্দী, সকলের পরিবারের মনের অবস্থা, বুকে চেপে থাকা জগদ্দল পাথর তুল্য ব্যথা-বেদনার প্রতিফলন ঘটেছে। আমরা কারাগারে প্রায় সমমনাদের নিয়ে একটি অভিন্ন পারিবারিক পরিবেশেই সময় কাটাচ্ছি। আমার অন্তরের অনুভূতি ও উপলব্ধি, আমরা নই আমাদের পরিবারের সদস্যরাই অধিকতর মনঃকষ্টে জীবন যাপন করছে। ভিআইপিদের সাথে আছি তাই খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে অন্তত আমি বিনা দ্বিধায় বলতে পারি, আমার বাসায় এত ভাল খাবারের আয়োজন কেবল কোন মেহমান আসলেই হয়ে থাকে। তাই খাবারের ব্যাপারে কোন অভিযোগ অন্তত আমার নেই। কিন্তু তারপরও খাবার টেবিলে বসলে মনের মধ্যে অব্যক্ত একটা ব্যথা অনুভব করি। মাঝে মাঝে এমন হয় যে, খাবার গলা দিয়ে ঢুকতে চায় না। মনে হয়, আমার স্ত্রী, ও ছেলে মেয়েরা খাবার সময় কী ভাবছে?

এখানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ২৬ সেলের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে, লালবাগ থানার লাল দালানটি বারান্দায় বের হলেই যেমন নজরে পড়ে, তেমনি পশ্চিম প্রান্তের বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবনগুলোতে, মুক্ত মানুষের বিচরণ ও কথাবার্তার আওয়াজও মাঝে মাঝে মনের কোণে নানা অনুভূতির জন্ম দেয়। তাদের মাঝে আর আমাদের মাঝে একটি উঁচু প্রাচীরের ব্যবধানটাই, জীবনের একটা বড় পার্থক্যের জন্ম দিয়েছে। এই প্রাচীরের বাইরে ওরা স্বাধীন, আর আমরা এখানে অসহায় বন্দী জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছি। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার পুরনো ঢাকায় নাজিমুদ্দিন রোডে অবস্থিত। ঐতিহাসিক চকবাজার শাহী মসজিদ সংলগ্ন আমাদের ২৬ সেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে পশ্চিম দক্ষিণে তাকালেও ঐতিহ্যবাহী চকবাজার শাহী মসজিদের সুউচ্চ মিনার চোখে পড়ে। যা মনের মধ্যে এক অন্যরকম অনুভূতির জন্ম দেয়। দক্ষিণ পূর্ব কোণে তাকালে মসজিদের সুউচ্চ মিনার। এ মসজিদে খোৎবা দিতেন তাফসির করতেন মরহুম মাওলানা দ্বীন মুহাম্মাদ খান। আমাদের সেলের পশ্চিম উত্তর কোণে নজরে আসে উর্দু রোডের আরেক ঐতিহ্যবাহী মসজিদের মিনার। দিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আযানের সুমধুর সুর মনের কোণে সৃষ্ট করে অন্য একটি এক অনুভূতির ঝড়। এত কাছে থেকে শোনা এই আযানের ডাকে সাড়া দিয়ে এই তিনটি ঐতিহ্যবাহী মসজিদের কোন একটিতেও জামাতে নামাজে শরীক হবার সুযোগ নেই আমাদের। এভাবে আর কত দিন শুধু কান পেতে শুনতে থাকব এই সুন্দর সুমধুর আযানের ধ্বনি? মাঝে মাঝে এই সুমধুর আযানের ধ্বনি কেমন যেন সকরুণ ও ব্যথাভরা মনের আকুতি মনে হয় আমার কাছে। দেশের মজলুম মানুষের মুক্তির জন্যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ফিরে আসার কোন বিকল্প নেই। আযানের ধ্বনিকে ইসলামের পরিপূর্ণ দাওয়াতই মনে করতে হবে। অন্তত আযান শেষের দোয়ায় আমরা তাই উল্লেখ করে থাকি। মানুষের উপরে মানুষের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়ে আল্লাহর প্রভূত্ব গ্রহণের মাধ্যমে সকল প্রকার জুলুম, শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতনের অবসান ঘটাবার জন্যে বিশ্ব বিবেককে জাগ্রত রাখার লক্ষ্যেই মুসলিম জাহানের সর্বত্র দিনে পাঁচবার আযানের এই আয়োজন। জেলের প্রকোষ্ঠ থেকে আযানের এই অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এখন যেভাবে উপলব্ধি করছি, মুক্ত জীবনে মনে হয় কখনও এভাবে ভাবতে পারিনি। আল্লাহ যেন আমার এই অনুভূতি আমৃত্য জাগরুক রাখেন।

www.pathagar.com

আমার নির্ধারিত পরিবারিক সাক্ষাতের দিন আজ। কিন্তু হরতালের কারণে সাক্ষাৎ প্রার্থীরা আজ আসতে পারবে না। আল্লাহ চাহে তো আগামী কাল সাক্ষাতের ব্যবস্থা হতে পারে। গত সপ্তাহে মোমেনের সাথে দেখা হয়নি, বাইরে থাকার কারণে। সে ফিরেছে গত সপ্তাহের সাক্ষাতের নির্ধারিত দিনের পরের দিন সকালে। তার কাছ থেকে তালহার পড়াশোনার এবং ওখানে তার অবস্থানটা কেমন, তা জানার আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি গত সপ্তাহ থেকেই। আমার ধারণা ছিল সে ফিরবে বৃহস্পতিবারের আগেই। গত বৃহস্পতিবারের সাক্ষাতের মুহূর্তে, তার মায়ের কাছে জানলাম, সে আসবে শুক্রবারে ভোরে। এ সপ্তাহের সাক্ষাতটা একদিন পিছালো। আগামীকাল শুক্রবারের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

শুক্রবারে আরো অনেকের সাক্ষাৎ থাকে। তাছাড়া জুমআর নামাজের ব্যাপার আছে, আমাদের বন্দীদের জন্যে জুমআ ফরজ না হলেও যারা সাক্ষাতের জন্যে আসে, তাদেরকে তো ফিরে গিয়ে জুমআ আদায় করতে হবে। তাই এদিন ছুটির দিন হলেও, সাক্ষাতের জন্যে খুব একটা সুবিধাজনক নয়। একবার নির্ধারিত দিনের বাইরে সাক্ষাৎ হবার পর আবার অনেক ক্ষেত্রে সাপ্তাহিক সাক্ষাৎকারের রুটিনে পরিবর্তন এসে যায়, যা সবার জন্য সুবিধাজনক নাও হতে পারে। আমার ব্যাপারে ২/১ সাক্ষাতে ব্যতিক্রম হলেও এতদিন নির্দিষ্ট রুটিন বাদ যায়নি। দেখা যাক এবারে কী হয়। আগামীকালের সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছি ব্যাকুল চিত্তে। এক বছরের কারাবাসে, অনেক তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগও হয়েছে। অনেক নামী দামী ব্যক্তিদের সাহচর্যে আসার সুবাদে অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জনের পাশাপাশি শিক্ষণীয় অনেক কিছুই জানার বুঝার সুযোগ হয়েছে। বয়সের শেষ প্রান্তে এসে এর কতটা কাজে লাগাতে পারব, কতটা কাজে লাগানোর সুযোগ মহান আল্লাহ সুবহানাহুতায়ালা দেবেন, তাতো কেবল আল্লাহ আলেমুল গায়েবই জানেন। যদি আল্লাহ দয়া করে মেহেরবানী করে কিছু দিন ময়দানে কাজ করার সুযোগ দান করেন, তবে ইনশাআল্লাহ আমি অবশ্যই এগুলোর আলোকে, অন্তত দেশ ও জাতির স্বার্থে নতুন প্রজন্মকে এর কিছু না কিছু জানিয়ে যাবার আশা রাখি। এর সুযোগ দেবার মালিক মোখতার একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহুতায়ালা। তিনি ছাড়া আর কারও হাতেই নেই এ সুযোগ দেবার এখতিয়ার। আমি তার কাছেই এ ব্যাপারে তৌফিক কামনা করি।

চারদলীয় জোট সরকারের ২০০১ সালের অক্টোবরের ১১ তারিখে থেকে যাত্রা শুরু হয়। যাত্রা লগ্নে সর্বহারা ও নকশালপন্থী, যাদেরকে চরমপন্থী বলা হয়, এদের উৎপাত বৃদ্ধি পায় উদ্বেগজনক হারে। এদের দমনের জন্যে অপারেশন ক্লীন হার্ট নামে একটি অভিযান নিয়ে সেনাবাহিনী নামানো হয়। কিন্তু স্থায়ীভাবে সেনাবাহিনীকে এভাবে মাঠে রাখা সমীচীন মনে না হওয়ায় একটি এলিট ফোর্স গঠন করা হয় 'র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন' র‍্যাব নামে। প্রকাশ থাকে যে পুলিশ বাহিনীর পক্ষে চরম পন্থীদের দমন করা মোটেই সম্ভব হচ্ছিল না। উপরন্তু দেশের কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলে বাম চরমপন্থীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে, পুলিশের সহযোগিতা না পেয়ে, ইসলামের নামে কিছু চরমপন্থী এই সুযোগে মাঠে নামে। মিডিয়ার ভাষায় নকশাল বা সর্বহারা হল চরম পন্থী। আর ইসলামের নাম ব্যবহার করে যারা চরমপন্থা গ্রহণ করে, তাদেরকে মোকাবিলা করতে গিয়ে সরকারের জন্যে বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তাদেরকে মিডিয়ায় চিত্রিত করা হয় মৌলবাদী এবং জঙ্গিবাদী হিসাবে।

র‍্যাব, নকশালপন্থী ও সর্বহারা মুকাবিলায় পুলিশের তুলনায় সাফল্য অর্জনে কিছুটা সফল হলেও এদেরকে পুরোপুরি কাবু করতে সক্ষম হয়নি। তবে ইসলামের নামে যারা সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয়, তাদের পুরো নেটওয়ার্ক তছনছ করতে ও বিচারের আওতায় আনতে সক্ষম হয়। আমি জনপ্রতিনিধি হিসাবে এলাকায় গেলে, পুলিশ কর্মকর্তাদের সাথে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে মত বিনিময়ের মুহূর্তে দেখেছি, এলাকাবাসী আফসোস করে বলেছে, যারা জেএমবিকে নিঃশেষ করতে পারল, তাদের সর্বহারাদের কিছু করতে পারছে না কেন? পুলিশ কর্মকর্তারা জনগণের এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেনি।

www.pathagar.com

র‍্যাব, সর্বহারা বা বাম চরমপন্থীদের নেটওয়ার্ক ধ্বংস করতে না পারলেও ইসলামের নাম ব্যবহার করে যারা সন্ত্রাসে লিপ্ত হয়ে, ইসলামের ভাব মর্যাদা ক্ষুণ্ন করে চলছিল, দেশের প্রতিষ্ঠিত পরিচিত ইসলামী রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানের জন্যে বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে চলছিল, র‍্যাব তাদের নেটওয়ার্ক সর্বাংশে না হলেও প্রায় ভেঙ্গে দিতে এবং তাদেরকে অকার্যকর করতে সক্ষম হয়।
এই র‍্যাব গঠনের বিষয়টি কেবিনেটে আলোচনার সময় এ প্রশ্নটি এসেছিল, আমার নিজের মনেও প্রশ্নটি দেখা দিয়েছিল, এমন একটি বাহিনী গঠনের ফলে পুলিশ বাহিনীর মধ্যে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে কিনা, ২৮ অক্টোবর ২০০৬ সালে আওয়ামী লীগের লগি বৈঠার তাণ্ডবের মুকাবিলায় পুলিশের কোন সহযোগিতা না পাওয়া, সেই প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ ছিল কিনা আজ আমার নিজের মনেও সে প্রশ্নটি বার বারই জাগে এবং পীড়া দেয়। কিছু দিন হল, আমাদের এখানে তিন সাবেক আইজিপি এসেছেন, এর একজন, নাসিরুদ্দীন পিন্টুর একটি কথা প্রসঙ্গে র‍্যাব সম্পর্কে অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে যে নেতিবাচক মন্তব্য করলেন, তাতে আমার মনে এ প্রত্যয় সুদৃঢ় হল, র‍্যাব গঠনের মাধ্যমে চরম পন্থী বিশেষ করে তথাকথিত ইসলামী জঙ্গি দমনে সফলতা যাই হোক না কেন, ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের কাছে এটা গ্রহণযোগ্য ছিল না। এদের একজন আফসোস করে বললেন, যে পুলিশ বাহিনীকে সন্তানের মত সযত্নে লালন করেছি, তারাই আজ আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রতিবেদন দিয়ে ভোগান্তির শিকারে পরিণত করল। আবার পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ শেষে তিন জনের এক কথা, তাদের বাসায় পরিবারের সদস্যদেরকে সমবেদনা জানিয়ে এ পর্যন্ত দেশের ভেতর ও বাইরে থেকে যত টেলিফোন আসছে, তার মধ্যে আত্মীয় স্বজনের তুলনায় পুলিশের লোকদের পক্ষ থেকেই এসেছে বেশি টেলিফোন। এতে বোঝা যায়, তিনজন সাবেক পুলিশ প্রধানের এভাবে গ্রেফতার হওয়াটা পুলিশের লোকদের কাছে ভাল তো লাগেইনি, বরং নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াই হয়েছে। যা কোন এক পর্যায়ে সরকারের জন্যে নেতিবাচক কোন পরিস্থিতির জন্ম দিলে তাতে বিস্মিত হবার কিছু থাকবে না।

দুদিনের হরতালের আজ চলছে দ্বিতীয় দিন। কারা প্রাচীরের বাইরে কী হচ্ছে, তা বোঝার কোন উপায় এখানে নেই। চকবাজার, ঢাকার এবং সারা দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের একটা বড় এবং ব্যস্ততম কেন্দ্র। এই ব্যস্ততম কেন্দ্রটি একেবারে কারাপ্রাচীর সংলগ্ন হওয়ায়, এখান থেকে আঁচ করা সম্ভব হরতালের ধরণ প্রকৃতি কেমন হচ্ছে। এখানে হোল সেলারদের দোকানে দিনরাত ২৪ ঘণ্টা মালামাল আসা যাওয়া করে। মালামাল ট্রাকে উঠানো ও নামানোর শব্দে যেমন মাঝে মাঝে আমাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, তেমনি কোন কোন সময় বড় জাতীয় মাল সামান ট্রাক থেকে ফেলার শব্দে অজানা আতংকেরও সৃষ্টি হয়। গত পরশু রাত থেকে আজকের আমার এই লেখা পর্যন্ত (দুপুর ১২টা) চকবাজারকে নীরব নিথর মনে হচ্ছে।
মাঝে মধ্যে পুলিশের টহলগাড়ীর আওয়াজ অভিজ্ঞ মাত্রই বুঝতে পারেন। এখানে কোন রিকশার বেল বাজার শব্দও শোনা যাচ্ছে না, তাতে বোঝা যায় পুলিশি এ্যাকশন ও ভ্রাম্যমাণ আদালতে শাস্তির পরোয়া না করে জনগণ হরতালে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সাড়া দিচ্ছে। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত, তখনকার আওয়ামী সরকারের আমলে এভাবে সফল হরতাল হতে দেখিনি। আমাদের এখানে আমাদের পয়সায় সরকারের পছন্দের চারটি পত্রিকা আসে। তাতেও হরতালের যে চিত্র দেখা গেল, তা এই সরকারের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য গণজাগরণ ও গণঅভ্যুত্থানের আগমনের বার্তা মনে হওয়ার মত। সরকারের জন সমর্থন এভাবেই একদিন প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে। শুধু বিরোধী রাজনৈতিক দলই নয়, সাধারণ মানুষও সরকারের দুঃশাসনে এবং সরকারী দলের লোকদের চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজিতে অতিষ্ঠ। শুধু দমন আর নিপীড়ন নির্যাতনের আশ্রয় নিয়ে এই ক্ষোভ নিরসন করা তো সম্ভব নয়ই, বরং এই ক্ষোভকে সরকারী দমননীতি একদিন জনরোষে পরিণত করবে। এটা শুধু সময়ের ব্যাপার। বিরোধী দলকে ধৈর্যের

www.pathagar.com

সাথে এবং মাথা ঠান্ডা রেখে অকুতোভয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। প্রোগ্রামের পর প্রোগ্রাম করতে থাকতে হবে। তবে একঘেয়েমি কাটিয়ে উঠতে প্রোগ্রামে মাঝে মধ্যে বৈচিত্র্য আনতে হবে।

চারদলীয় জোটের শরীক প্রধান দলের, বিশেষ করে ৮০ এর দশকের এবং ১৯৯৬ থেকে ২০১১ এর রাজপথের আন্দোলনের যে অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাকে ভালভাবে কাজে লাগাতে পারলে, আন্দোলনের সাফল্য অনিবার্যভাবে আসবে। আমরা বন্দী অবস্থায় কোন রাজনৈতিক মেসেজ দিতে পারছি না, তবে কথায় বলে রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তিদের মধ্যে মনের অজান্তেই অভিন্ন চিন্তা চেতনার জন্ম হয়ে থাকে। তাই আমার বিশ্বাস আমরা জেলে বসে যা ভাবছি, যারা বাইরে আছেন ময়দানে আছেন তারাও তাই ভাবছেন, বরং আমাদের চেয়ে আরো বেশি ভাবছেন। আমরা এখন আমজনতা থেকে বিচ্ছিন্ন আর তারা আছেন জনতার মাঝে। অতএব তাদের প্রতি এ আস্থা নিয়েই ভাবছি, ইনশাআল্লাহ, তারা ঠিক সময়ে ঠিক কাজটি করতে সক্ষম হবেন। আমরা নির্জনে নিভৃতে বসে বসে আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দোয়া করছি, জাতির এই দুর্দিনে দুঃসময়ে চরম ক্রান্তিকালে, আল্লাহ, বিরোধী দলীয় রাজনীতিবিদসহ সবাইকে দেশের স্বার্থে, দেশের গণতন্ত্রের স্বার্থে, যার যার জায়গায় সঠিক ভূমিকা পালনের তৌফিক দিন। ৪৮ ঘণ্টার হরতালের সাফল্যের প্রতিক্রিয়া অবশ্যই আওয়ামী দুঃশাসনে অতিষ্ঠ সকল মহলকেই উজ্জীবিত করবে এতে কোন সন্দেহ নেই। এই হরতালের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় আগামী ১০-১১ তারিখের ৩৬ ঘণ্টার হরতাল সফল হবে বলে সরকার সমর্থক পত্র পত্রিকায় প্রতিবেদন থেকেও বোঝা যাচ্ছে। পুলিশের বাড়াবাড়ি বিরোধী দলের জন্যে শাপেবর এবং সরকারের জন্যে বুমেরাং হতে পারে। এদেশের অতীতের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসের শিক্ষা এটাই। সরকার যদি সময় মত এটা অনুধাবনে ব্যর্থ হয়, তা হলে এর চড়া মাশুল তাদেরকেই দিতে হবে।

আমরা যারা আজ কারারুদ্ধ, তারা ময়দানের সাথীদেরকে কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্যে প্রস্তাব বা পরামর্শ দেওয়া নীতিগতভাবে ঠিক মনে করি না। কারণ যারা ময়দানে আছেন, জনতার মাঝে আছেন, ময়দানের অবস্থা এবং জনমতের অবস্থা সম্পর্কে তারা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ওয়াকেফহাল আছেন। অতঃপর বস্তুনিষ্ঠ কর্মসূচি এই মুহূর্তে কী হতে পারে তা বোঝার ব্যাপারে তারাই আমাদের চেয়ে ভাল অবস্থানে আছেন। তবে আদর্শিক রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতাকর্মীদের যে যেখানেই থাকুক না কেন, তাদের মধ্যে অতীতে সব সময়েই চিন্তার একটা অদ্ভুত মিল দেখেছি। পরস্পরের সাথে যোগাযোগ মতবিনিময়ের সুযোগ ছাড়া অভিন্ন চিন্তা করতে দেখেছি বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলদেরকে বিভিন্ন সময়ে। অতএব আমি তাদের উপরে পূর্ণ আস্থা রেখে প্রশান্ত চিত্তে আশাবাদী হয়ে থাকতে চাই। ইনশাআল্লাহ ময়দানে যারা আছেন, তারা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব, আল্লাহর সাহায্যে সঠিক সময়ে সঠিকভাবেই আঞ্জাম দিয়ে যাবেন, দিতে সক্ষম হবেন। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গতকাল থেকে বাংলাদেশে আছেন। তাদের প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন বাংলাদেশ সফরের প্রস্তুতির জন্যে, এ সফর এতে কোন সন্দেহ নেই। এই সফরে আসার আগে ভারতীয় প্রধান মন্ত্রীর বাংলাদেশ সম্পর্কে মন্তব্য, বাংলাদেশের মানুষ সম্পর্কে মন্তব্য, বাংলাদেশের একটি সুসংগঠিত ইসলামী সংগঠন সম্পর্কে মন্তব্য, এদেশের বিবেকবান মানুষ ভাল ভাবে নেয়নি। এটা আঁচ করে ভারতের পররাষ্ট্র দফতর দায়সারা একটা ব্যাখ্যা দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। ড. মনমোহন সিং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে টেলিফোনে কথা বলে পরিবেশ হালকা করার চেষ্টা করেছেন। এতে আরো কিছু মলম লাগাবার জন্যে, সে দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এখন বাংলাদেশ সফর করছেন। তাদের সফরে বাংলাদেশের মর্যাদা রক্ষা করে যদি দ্বিপাক্ষিক কোন চুক্তি হয়, তবে আমরাও স্বাগত জানাই। কিন্তু এ ব্যাপারে সৎসাহস নিয়ে বাংলাদেশের স্বার্থের পক্ষে কথা বলার মত কোন প্রস্তুতি এবং হোমওয়ার্ক কি আদৌ আমাদের সরকারের আছে? তা না থাকলে তাদের আবদার মেনে অসমচুক্তিতে স্বাক্ষর করা হবে, এটাই স্বাভাবিক। আর তা কখনও দেশ ও জাতির জন্যে শুভ হবে না, হতে পারে না।

www.pathagar.com

গতকালের নির্ধারিত সাক্ষাৎ হরতালের কারণে হতে পারেনি। আজ শুক্রবারে আরো অনেকের পূর্ব নির্ধারিত সাক্ষাতের দিন। এজন্যে সাক্ষাৎ যথেষ্ট বিলম্বিত হওয়ার আশংকা আছে। আবার জুমআর দিন হবার কারণে উভয় দিকের তাড়া আছে। আমরা যারা কারাগারে বন্দী জীবন যাপন করছি, তাদের জুমআ ফরজ না হলেও এখন এখানে জুমআ আদায় করা হচ্ছে। ১/১১ এর সময় যখন আসছিলাম, তখন কারান্তরালের মসজিদে নাকি জুমআ হত, তবে ভিআইপিদের সেখানে যাওয়ার সুযোগ ছিল না। ঐ সময় ২৬ সেলে আমরা জোহর পড়েছি। এবার আসার পর এখানকার ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন যিনি (ডাক নাম জুয়েল) তিনি আমাকে বললেন ইতঃপূর্বে বেশ কয়েকজন মুফতী নাকি জুমআ চালু করে গেছেন। অতএব জুমআ হবে, আপনাকে খোৎবা দিতে হবে এবং ইমামতি করতে হবে। আমি বললাম, আমি যেহেতু কারাবন্দীদের জন্যে জুমআ ওয়াজেব মনে করি না, অতএব ইমামতি করতে পারব না; তবে মুফতী সাহেবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে আমি জুমআ আদায় করব। এখানে এ পর্যন্ত যেভাবে যার নেতৃত্বে জুমআ চলে আসছে, তিনিই ইমামতি করবেন, আমি তার পেছনেই নামাজ আদায় করব। এরপর থেকে এ পর্যন্ত এভাবেই চলে আসছে। জুমআর দিন সাক্ষাৎ বিলম্ব হলে আমাদের জুমআর জামায়াতে শরীক হওয়া প্রায়ই অসম্ভব হয়ে যায়। যেহেতু এটা আমাদের জন্যে ফরজ নয়, কাজেই এতে হয়ত এমন কিছু আসে যায় না। কিন্তু সাক্ষাতে যারা আসেন, তাদের জন্যে তো জুমআ ফরজ। সাক্ষাৎ শেষে বাসায় ফিরে গিয়ে জুমআর জামায়াতে অংশগ্রহণ তাদের জন্যে অসম্ভব হতে পারে যদি সাক্ষাতে বিলম্ব হয়।

সাধারণত সকাল ১১টা থেকে ১১-৩০ টার মধ্যে সাক্ষাৎ প্রার্থীদের এসে যাওয়ার কথা, তবে একদিনে একাধিক ব্যক্তির সাক্ষাৎ থাকলে, একটা সাক্ষাৎ শেষ হবার পরে, অপর সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়, এতে স্বাভাবিকভাবেই কিছু বিলম্ব হয়। আবার দুপুর ১২টা গুণতির সময় হবার কারণেও কিছুটা বিলম্ব হয়। ফলে প্রতীক্ষার মুহূর্তটা বেশ দীর্ঘ মনে হয়। বিলম্বে হলেও যদি সাক্ষাতটা হয়ে যায় তাহলে সব পেরেশানীর অবসান হয়। কিন্তু কোন কোনদিন সাক্ষাৎ প্রার্থীদের ফিরে যাবার ঘটনাও ঘটে থাকে। আমার সাক্ষাৎ প্রার্থীদের এরূপ ঘটনা ২/১ বার ঘটেছে। তাই শেষ পর্যন্ত পেরেশানীর মধ্যে থাকতেই হয়। সাক্ষাতের স্লিপটা হাতে না আসা পর্যন্ত প্রতীক্ষার প্রহর যেন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘই হতে থাকে। আজকের সাক্ষাতটা কতক্ষণে হবে সেই প্রতীক্ষায় চেয়ে আছি।

গতকালের সাক্ষাতের জন্য খুব বেশিক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হয়নি। শুক্রবারে যানজট না থাকার কারণেই হয়ত সময় মত আসতে পেরেছে। আমি অবশ্য একটু আগেই কাপড় চোপড় পরে তৈরি থাকি, যাতে স্লিপ আসলেই রওয়ানা দিতে পারি। তারপরও কোন কোন সময় কে সাথে যাবে তার খোঁজ নিতে, তার প্রস্তুতি নিতে একটু সময় লেগেই যায়। তারপরও গিয়ে দেখি আমার সাক্ষাৎ প্রার্থীরা তখনও গেটের বাইরেই অপেক্ষা করছে। আমি সাক্ষাতের নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছার ৫-৬ মিঃ পরে তারা ভেতরে আসার সুযোগ পায়। এখন আমাদের বন্দীদের জন্যে সাক্ষাৎপ্রার্থীদের সাথে আসা ফলফলাদিসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সাথে নিয়ে ঢুকতে দিচ্ছে না। সাক্ষাৎপ্রার্থীরা ভেতরে আসার পরে, মাল সামানা তল্লাশি করে ভেতরে পাঠায়। আমি এব্যাপারে আপত্তি জানাই। কেউ যদি আমাদের সাক্ষাৎপ্রার্থীদের অনুপস্থিতিতে অবাঞ্ছিত কিছু ওতে রেখে দোষ চাপাতে চায়, তার তো সুযোগ থেকে যাচ্ছে এতে। গেট সার্জেন্টকে আমি একথা বলতেই বেশ তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে মালামাল আনার ব্যবস্থা করা হল। এবারের সাক্ষাতের মাঝে নবাগত জেলসুপারের সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করায়, সাক্ষাত চলাকালেই তিনি সময় দিলেন। বেশ ভদ্র ব্যবহার করলেন। আমার সাথে আমার ব্যারিস্টার ছেলেকে সাথে নিয়ে তার রুমে ঢুকলেন। তিনি আমাদেরকে চা পানে আপ্যায়িত করলেন। তার ব্যবহারটা সত্যি আমার কাছে বেশ ভাল লাগল। আসলে তিনি একটি সভ্রান্ত পরিবারের সন্তান, তার অমায়িক ও ভদ্র ব্যবহার থেকেই এটা বুঝা গেল। জেল সুপারের সাথে মূলত আমার চিকিৎসা নিয়েই আলাপ হল। আলাপে আমার ছেলে ব্যারিস্টার নাজিবই বারডেম হাসপাতালে ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ের বর্ণনা দিল। আমার ফিজিওথেরাপি যদি নিয়মিত একটানা

www.pathagar.com

দশ দিন হয়, তাহলে আপাতত আমার আর কোন চাহিদা নেই। সুপারের সাথে আলাপ শেষে আবার কিছুক্ষণ পরিবারের সদস্যদের সাথে আলাপ করার সুযোগ হল। আজ জেল কর্তৃপক্ষকে বেশ উদার মনে হল। আমার ছেলে নাজিব ছোট ছেলে নাদিম তালহাকে দেখতে গিয়েছিল। তার কাছে থেকে তালহার সব শেষ খবর জানলাম। তার বাকী পরীক্ষাগুলো শেষ হতে আর ৩/৪ মাস সময় লাগবে। দোয়া করি সে যেন সবকটি পরীক্ষায় ভাল করতে পারে।

বড় ছেলের পিএইচডি ডিগ্রী প্রাপ্তিতেও আর কিছু দিন সময় লাগবে। তবে আর কোন সমস্যা নেই, ইনশাআল্লাহ সে ডিগ্রী পেয়ে যাবে। এর পর তাকে দেশে আসতে বলব, না আপাতত কিছু দিন ওখানেই থেকে যেতে বলব, এব্যাপারে আমি এখনও মনস্থির করতে পারিনি। পরিবারের অন্যদের সাথেও পরামর্শ করা হয়ে উঠে না। আমার কারাগারের সাথীদের অনেকেই আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন এখনও দিচ্ছেন, যেখানে আছে সেখানেই অথবা অন্য কোথাও ভাল জব পেলে সেখানে থেকে যাওয়াই ভাল। এ ব্যাপারে সামনের সাক্ষাতে পরামর্শ করা যাবে ইনশাআল্লাহ।

গতকালের সাক্ষাতের সময় মোমেন বলেছিল আজ শনিবারের কোন এক সময়ে ব্যারিস্টার আঃ রাজ্জাক সাহেব আসতে পারেন। আমিও গতকাল জেল সুপারের সাথে আলাপের সময় বলেছিলাম আইনজীবীদের পক্ষ থেকে সাক্ষাতের জন্যে আসতে চাইলে যেন আসতে দেয়া হয়। ঠিক ঠিকই আজ সকাল ১১টার দিকে আমাকে খবর দেয়া হল। তৈরি থাকার জন্যে দুপুরের মধ্যেই আইনজীবীরা আসতে পারেন। আমি ১১-৩০টা থেকে তৈরি হয়ে অপেক্ষা থাকলাম। ১২-৪৫ মিঃ জমাদার এসে হাজির। আমি তো তৈরিই ছিলাম। অতপর বিপ্লবকে ডেকে নিয়ে রওয়ানা দিলাম। আইনজীবীদের সাথে আমার এ সাক্ষাৎ হল বেশ অনেক দিন পরে। তারা আমার স্বাস্থ্যের ব্যাপারে খোঁজখবর নিলেন। বারডেমের চিকিৎসার ব্যাপারে কি হল তাও জানতে চাইলেন। জেলকর্তৃপক্ষ আমার ফিজিওথেরাপির জন্যে প্রতিদিন একটানা দশ দিন বারডেমে পাঠানোর চিন্তা ভাবনা করছেন বলে জানালাম। আমাদের মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে জানতে চাইলে ব্যারিস্টার আঃ রাজ্জাক সাহেব খুব সংক্ষেপে বললেন, দোয়া করেন, দুশ্চিন্তা করবেন না। সংক্ষিপ্ত কথার মধ্যে আশার আলো খুঁজে পেলাম। তাছাড়া সবকিছু আল্লাহর হাতে, একমাত্র তার সাহায্যের উপর ভরসা করেই এত পথ পাড়ি দিয়ে এসেছি। অতএব দোয়া তো তার দরবারে করতে থাকতেই হবে। গত ৬ ও ৭ জুলাই শুক্রবার ও শনিবারের সাপ্তাহিক ছুটির দিন শেষে, আবার আজ ও কাল অর্থাৎ ১০ ও ১১ জুলাইয়ের দ্বিপ্রহর পর্যন্ত সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের আহ্বানে ১২ টি ছোট বড় ইসলামী রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে হরতাল ডাকা হয়েছে। চারদলীয় জোটের বড় শরীক দল বিএনপিও এ হরতালের প্রতি সমর্থনের ঘোষণা দিয়েছে, সেই সাথে জামায়াতে ইসলামীও আলেম ওলামার প্রতি পূর্ণ সমর্থন পূর্বক তাদের ডাকা হরতালের প্রতি পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় কারাগার সংলগ্ন ঢাকা নগরীর ব্যস্ততম বাজার চকবাজার কারা প্রাচীরের দক্ষিণে অবস্থিত। গতরাত থেকেই এ অঞ্চল নীরব মনে হচ্ছে, অন্যত্র কী হচ্ছে আমাদের জানার কোন উপায় নেই। তবে চকবাজার ঢাকার ব্যবসা বাণিজ্যের প্রাণ কেন্দ্র হওয়ার কারণে এখানকার নীরবতাকে ব্যারোমিটার হিসাবে ধরে নিলে, হরতাল ভালই হবার কথা।

ওলামায়ে কেরামের হরতালের কারণ, সংবিধান থেকে সর্ব শক্তিমান 'আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে সকল কাজের যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি' এই বাক্যটি মূলনীতি থেকে বাদ দেয়ার প্রতিবাদ জানানো। শুনলাম আইন প্রতিমন্ত্রী একজন মরহুম মাওলানার ভাই। প্রতিমন্ত্রী আলেমদের উদ্দেশ্যে বলেছেন সোলেহ হুদাইবিয়ার চুক্তি পত্র থেকে রাসূল (সা) স্বয়ং তার নামের অংশের, রাসূলুল্লাহ, শব্দ নিজ হাতে কেটে দিয়েছেন, তাই আলেমদের এই সংশোধনী মেনে নিতে আপত্তি করা উচিত নয়। প্রতিমন্ত্রী আলেমদের প্রতি ধৃষ্টতা দেখিয়েছেন। কিন্তু ভুলে গেছেন যে সুলেহ হুদাইবিয়া ছিল মক্কার কোরাইশদের সাথে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ও তার সাথে যারা ঈমান এনেছেন, সেই আনসার মুহাজিরদের সাথে চুক্তি বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করা হচ্ছে একতরফাভাবে মুসলমান নাম ধারীদের দ্বারা, দেশের

www.pathagar.com

ইসলামী জনতা ও সর্বস্তরের আলেম ওলামার অভিমতকে উপেক্ষা করে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এই প্রসঙ্গ টেনে নিজেদেরকে কোন পক্ষে নিলেন, আর দেশের জনগণ ও আলেম উলামাকে কোন পক্ষে দাঁড় করালেন যদি গভীরভাবে তলিয়ে দেখতেন, তাহলে পাণ্ডিত্য জাহিরের নামে এই রকম অজ্ঞতার পরিচয় দিতেন না। তাদের এই সব কর্মকাণ্ডের এবং কথাবার্তার মোক্ষম জবাব যারা দিতে পারে, মূলত তাদেরকে জেলে আটকিয়ে রাখার মূল কারণ যে এটাই, তা আর কারোই বুঝতে বাকী থাকার কথা নয়।
এভাবেই একের পর এক তারা, প্রতিবেশী দেশের স্বার্থে জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ইসলাম, ঈমান ও মুসলমানদের ঈমান আকিদা বিরোধী কর্মকাণ্ড সামনে আরো করতে থাকবে, কিন্তু জনতার ময়দান থেকে কোন অর্থবহ প্রতিরোধ হতে দেবে না বা হতে পারবে না। এমন লক্ষ্য নিয়েই তথাকথিত যুদ্ধাপরাধ বা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের সাজানো অভিযোগে আমাদেরকে আটকে রাখা হয়েছে। এছাড়া আর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণই তাদের কাছে নেই।
বাংলাদেশে গণআন্দোলনের একটা ঐতিহ্য আছে। দেশের জনগণ ঐতিহ্যগতভাবেই প্রতিবাদী। নেতৃত্ব ছাড়াও তারা অতীতে গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং এ ইতিহাস সকল রাজনৈতিক মহলেরই জানা থাকার কথা। '৭২ থেকে '৭৫ সাল পর্যন্ত এদেশে কোন ইসলামী দলই ময়দানে ছিল না, কিন্তু দাউদ হায়দারের কবিতায় রাসূল এর অবমাননার বিরুদ্ধে জনগণই ফুঁসে উঠেছিল। জনরোষের কারণে তাকে প্রথমে জেলে, এরপর দেশান্তরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আজ পর্যন্ত তার দেশে আসা হয়নি।
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী একটা সংগঠিত ইসলামী দল হলেও, একমাত্র ইসলামী দল বা শক্তি নয়। জামায়াতকে আটকে রাখলে ইসলাম ও দেশ বিরোধী কাজের কোন প্রতিবাদ হবে না, প্রতিরোধ গড়ে উঠবে না, এমন ভাবলে সরকারের পক্ষ থেকে চরম বোকামি করা হবে। ১০ ই জুলাই এর হরতালই তার জীবন্ত উদাহরণ। সামনে সরকারের কোন দমন পীড়ন নির্যাতনই এটা ঠেকাতে পারবে না। আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের কেউ কেউ বলেন, আমরা নাকি জেলে আছি ভালই আছি। ফ্যাসিবাদী সরকারের মোকাবিলার জন্যে জনতাই যথেষ্ট প্রমাণিত হবে, ইনশাআল্লাহ।
ওলামা পরিষদ ও ১২টি ইসলামী দলের ৩০ ঘণ্টার হরতালে গতকাল ১০/৭/১১ সকাল থেকে শুরু হয়ে আজ ১১/৭/১১ এর দুপুর ১২টা পর্যন্ত চলার কথা। এখন সকাল ১০টা। চকবাজারের নিকট প্রতিবেশী আমরা। ব্যস্ততম এই বাণিজ্য কেন্দ্রকে গতকালের মতই নীরব নিথর মনে হচ্ছে। সরকার সমর্থক পত্রিকায় হরতালকে যতই ঢিলে ঢালা বলা হোক, হরতালকারীরা মাঠে ছিল না, মাঠ ছিল পুলিশের দখলে, বা সরকারী দলের দখলে, এভাবে হরতাল সম্পর্কে যতই নেতিবাচক প্রোপাগাণ্ডা করা হোক না কেন, সরকারের উপর হরতালের প্রভাব প্রতিক্রিয়া যতটা তৈরি হয়, আর কোন কর্মসূচির মাধ্যমেই তা হয় না। অতীতে অন্যান্য দলের সাথে মিলে, আমরাও সরকার বিরোধী আন্দোলন করেছি আমরা সহজে হরতালে রাজি হতে চাইতাম না। কিন্তু যে সব দল কোন না কোন সময় ক্ষমতায় ছিল, তাদের কথা ছিল পূর্ণভাবে সফল হোক আর আংশিকই হোক সরকারকে সবচেয়ে বেশি কাবু করে থাকে এই হরতালই।
ইতোমধ্যে চার দলের ডাকা ৪৮ ঘণ্টার হরতাল সফল হবার পর উলামা পরিষদের ৬০ ঘণ্টার হরতালও সফল হল। সামনে বিএনপির গণঅনশন কর্মসূচিও হরতালেরই অনুরূপ হতে পারে বলে মনে হচ্ছে। কারা প্রাচীরের বাইরে কী হয়, তা দেখতে না পেলেও, তার ধাক্কা কারা প্রাচীর ভেদ করে ভেতরেও যে আসে না এমন নয়। মাওলানা সাঈদী সাহেবকে আজ ১১/৭/১১তে ট্রাইব্যুনালে হাজির করার কথা ছিল। কাল ১০/৭/১১ এর পূর্ণ দিবস হরতালের পর আজ ১১/৭/১১ এর অর্ধদিবস হরতালের কারণে ট্রাইব্যুনালও বসতে পারছে না। ১৩/৭/১১ তে সাঈদী সাহেবকে বারডেমে নেয়ার কথা। কিন্তু ১৩/৭/১১ তে বিএনপির গণঅনশন কর্মসূচির কারণে জেলকর্তৃপক্ষ ডিএমপির কাছ থেকে পুলিশ স্কোয়াড পাবে না

www.pathagar.com

বিধায় ঐদিন ওনাকে বারডেমে নেয়া হচ্ছে না। এগুলোতো আন্দোলন কর্মসূচির প্রভাব প্রতিক্রিয়ারই প্রতিফলন।

দেশের সর্বস্তরের আলেম ওলামা কেরামের প্রতি জানাই আন্তরিক সশ্রদ্ধ ও সকৃতজ্ঞ সালাম ও মুবারকবাদ। সংবিধান থেকে আল্লাহর প্রতি আস্থা ও ঈমানের জায়গায় ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিস্থাপনের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদী ভূমিকা ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্ব পাবে। প্রেরণা যোগাবে আগামী প্রজন্মের ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ জনগোষ্ঠীকে। কারা প্রকোষ্ঠ থেকে তাদের জন্যে প্রাণ খুলে দোয়া করছি। তাদের ভূমিকার ধারাবাহিকতা যেন বজায় থাকে এবং এভাবেই একটি অর্থবহ বৃহত্তর ইসলামী ঐক্যের পরিবেশ গড়ে উঠে। এই বাঞ্ছিত ঐক্যই হবে সাফল্যের চাবি কাঠি।

আজ ১১/৭/১১ এর দুপুর ১২টা পর্যন্ত ওলামা পরিষদ ও ১২ দলের ৩০ ঘণ্টার হরতাল কর্মসূচি ছিল। আমার ঘড়িতে এখন বাজে ১২-৪৫ মিঃ। কারা প্রচীরের বাইরে চকবাজার এলাকায় এখনও গাড়ী চলাচলের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। সরকার সমর্থক পত্রিকায় কাল হয়ত দেখব, আলেমদের এবং ইসলামী দলগুলোর আহ্বানে ৩০ ঘণ্টার হরতাল সফল হয়নি অথবা ঢিলা ঢালাভাবে পালিত হয়েছে, অথবা বলবে রাজপথ ছিল পুলিশের দখলে। একদিকে ৬/৭/১১ ও ৭/৭/১১ তে পুলিশকে দিবারাত্র রাজপথে থাকতে হয়েছে। আবার যদি ১০/৭/১১ ও ১১/৭/১১তে চলা ৩০ ঘণ্টা পুলিশকে রাজপথ দখলে রাখতে ব্যস্ত থাকতে হয়, তাহলে তো ধরে নিতে হবে এটাই হরতালের সফলতা। ব্যবসায়ী মহল থেকে হরতালের ব্যাপারে অনেক নীতিকথা বলা হচ্ছে। মাঠে নামার হুমকিও দেয়া হচ্ছে। এই ব্যবসায়ীরা অতীতে আওয়ামী লীগের ডাকা হরতাল, অবরোধসহ লৈগি বৈঠার তাণ্ডবের বিরুদ্ধে, আওয়ামী লীগের সৃষ্টির নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে কি টু শব্দটুকু করার সৎ সাহস দেখিয়েছেন? রাজনৈতিক সংস্কার তথা গঠনমূলক ও দায়িত্বশীল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড একদিনে শুরু হতে পারে না। আর দায়িত্বহীন বা হরতালের রাজনীতিও হঠাৎ শুরু হয়নি। এটা বর্তমান সরকারের কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা।

আমার জন্যে বাসা থেকে ফলফলাদিসহ বৈধভাবে জেল কর্তৃপক্ষ শুকনো খাবার জাতীয় যা কিছু আনার অনুমতি দেয়, তার এক কিস্তি সাক্ষাতের দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার অথবা শুক্রবারে আসে। আর এক কিস্তি আসে রবিবারে অথবা সোমবারে, গতকাল রবিবার পূর্ণ দিবস হরতাল থাকায় কিছু পাঠাতে পারেনি। মনে করেছিলাম আজকেও তো দুপুর পর্যন্ত হরতাল; তাই আজ হয়তো কিছু আসবে না। আগামীকাল ট্রাইব্যুনালে যেতে হবে। সেখানে ছেলে মোমেনকেও যেতে হয়। অতএব এবারে বোধহয় মধ্যবর্তী কিস্তি আসতে পারবে না। না, আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হল। আজতো হরতাল ছিল দুপুর ১২টা পর্যন্ত। অতএব হরতাল শেষে মধ্যবর্তী কিস্তির মাল বিকেল ৪-৩০টার মধ্যেই হাজির। পরিবারের সদস্যরা আমাকে নিয়ে কতটা ব্যতিব্যস্ত এ থেকেই তার একটা ধারণা নেয়া যায়।

কারাগারে আসার আগে এত ফলফলাদি এক সাথে বাসায় মনে হয় কখনও দেখিনি; এখন যেমনটি জমা হয় সপ্তাহে দুদিন আমার রুমে। অন্যদেরও এভাবেই এসে থাকে। আমরা সবাই মিলে মিশে খাই। কিন্তু ফল খাবার সময় মনটা কেমন যেন করে উঠে। স্নেহাস্পদ ছেলে মেয়ে নাতি নাতনী ও প্রিয়তমা স্ত্রীকে রেখে আমি একা একা এতসব খাচ্ছি। জানি না ওরা কী খাচ্ছে।

গতকাল ১২ই জুলাই ২০১১ ট্রাইব্যুনালে হাজিরার দিন ছিল। মনে করেছিলাম ওখানে আমার ছেলে মোমেনের সাথে দেখা হবে। কিন্তু ট্রাইব্যুনালে পৌঁছে তাকে না দেখে কাকে যেন জিজ্ঞেস করলাম। মোমেন আসেনি? আমাদের আইনজীবী তাজুল ইসলামের ছোট ভাই, সেও একজন আইনজীবী, জানালো কোন একটা কনফারেন্স নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে মোমেন আসতে পারেনি; তাকে কিছু বলার থাকলে বা বাসায় কোন খবর দেবার থাকলে তাকে বলা যায়। আমার এ পর্যন্ত নিয়মিত সাপ্তাহিক সাক্ষাতের নির্ধারিত দিন বৃহস্পতিবারই বহাল আছে। মাঝে মধ্যে কোন কারণে ঐদিন না হলে তার পরের দিন হয়েছে। এবারে গত বৃহস্পতিবার হরতালের কারণে সাক্ষাৎ হতে না পারায় শুক্রবারে হয়েছে। কারা

www.pathagar.com

কর্তৃপক্ষ চাইলে এই ব্যতিক্রমটা বাদ দিয়ে বৃহস্পতিবারেই বহাল রাখতে পারে। কিন্তু কোন কোন সময় এবং কারো কারো ক্ষেত্রে আবার বিবেচনা করাও হয় না। এজন্যে অনেকে এসে ফিরে যায়। তাই আমার বাসা থেকে যেন এ ব্যাপারে কারাকর্তৃপক্ষের সাথে পূর্বাহ্নেই যোগাযোগ করে আসতে ভুল না করে, এ বিষয়টি যেন স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। এতটুকু কথা বলার পরপরই, ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়।

সরকারী প্রসিকিউশনের পক্ষে তাদের তদন্তের অগ্রগতির প্রতিবেদন দিয়ে আরো সময় প্রার্থনা করা হয়। ট্রাইব্যুনাল আগামী ১লা আগস্ট পর্যন্ত তাদের সময় দেয়। ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত রেজিস্ট্রারের বক্তব্য নিয়ে, চেয়ারম্যানের সাথে কিছুক্ষণ তাজুল সাহেবের বাক্য বিনিময় হয়। আমাদের আয়কর রিটার্নের ফাইলে জেল গেটে স্বাক্ষর দেবার সুযোগ প্রদানের জন্যে, আমাদের আইনজীবীর আবেদনের প্রেক্ষিতে, ট্রাইব্যুনালের পক্ষ থেকে জেলকর্তৃপক্ষকে নির্দেশনা দেয়া হয়। এভাবে গতকালের দিনের অর্ধেকটা কেটে গেল। বেশ সকাল সকাল অর্থাৎ ১২-৩০ টার মধ্যে কেন্দ্রীয় কারাগারে ফিরে এসে বেশ স্বাচ্ছন্দের সাথে এস্তেঞ্জা ও অজু শেষে জোহরের নামাজ সাথীদের সাথে জামাতেই আদায় করলাম। অন্য সময়ে এত সকালে কোন দিনই ফেরা সম্ভব হয়নি। মোমেন কাল ট্রাইব্যুনালে না আসায়, পরিবারের অন্যদের ব্যাপারে, বিশেষ করে দেশের বাইরে অবস্থানরত তিন ছেলে ও এক মেয়ের কোন খবর, জানা সম্ভব হল না। আগামীকাল বৃহস্পতিবারে যদি সাক্ষাতটা বাধাগ্রস্ত না হয় তাহলে ভাল, না হয় আরো অতিরিক্ত একদিন অপেক্ষা করতে হবে।

শুক্র, শনি ও রবিবারের মধ্যে শাবানের রোজা রাখার ইচ্ছা। যদি শুক্রবারে সাক্ষাৎ হয়, তাহলে একটু অসুবিধা হবে। আমার স্ত্রী এবং বড় মেয়ে চাইবে তাদের সাথে আনা খাবার এবং স্যুপ তাদের হাতে খেতে, না খেলে মনে কষ্ট পাবে। বলেও ফেলবে বন্দী অবস্থায় আবার নফল রোজার দরকার কী? কিন্তু আমি তো এ রোজা রাখি রমজানের রোজার প্রস্তুতি হিসাবে।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অনুভূতি- ০৫

২০১০ সালের ২৯ জুনে ডিবি পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করে জাতীয় প্রেস ক্লাব থেকে। ঐদিন আমাকে রাখা হয় ডিবি অফিসের বিভিন্ন ধরনের আসামীদের সাথে একই রুমে। আমাকে নেয়ার পর সাঈদী সাহেবকেও ওখানে নেয়া হয়। একটু পরেই শুনলাম মুজাহিদ সাহেবকেও নাকি ওখানেই আনা হয়েছে। ডিবি কর্তৃপক্ষ আমাদের তিনজনকে তিন রুমে আলাদা আলাদা রাখার কথা বলেন। মুজাহিদ সাহেবকে আগেই অন্য রুমে রেখেছে। আমি আর সাঈদী সাহেবকে এক রুমেই উঠানো হয়েছে। পরে সাঈদী সাহেবকে অন্য রুমে নিতে চাইলে উনি বলেন, আসর ও মাগরিবের নামাজ আদায়ের পরে অন্য রুমে নেয়ার ব্যবস্থা করুন। অবশ্য এর পরে কেউ খোঁজ নিতে আসেনি। আমরা দুজন এক সাথে রাতের খানা (বাসা থেকে পাঠানো) ও এশার নামাজ সেরে এক রুমেই রাত কাটালাম। পরের দিন নাশতাও হলো একই রুমে। দুপুরের দিকে আমাদের বলা হল সব কিছু সাথে নিয়ে কোর্টের উদ্দেশ্যে তৈরি হতে। ঐদিন সম্ভবত দুপুরের খাবারের আগেই কোর্টে নেয়ার কারণে আমাদের কারোই দুপুরে কিছু খাওয়া হয়নি। ডিবি কর্তৃপক্ষ একটু তাড়াহুড়ো করে আমাদের কোর্টে পাঠানোর ব্যবস্থা করার কারণ হিসাবে বললেন, আজ বিডিআরের কোর্ট থাকায় অনেক ভিড় হবে। আমাদের সোজা কোর্টে পৌঁছানোর জন্যে বলে দেয়া হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গারদেই অপেক্ষা করতে হল অনেকক্ষণ। এবং তিনজনকে রাখা হল তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রুমে। কোর্টে রওয়ানার আগে এডিসি ডিবি মুনিরুজ্জামান সাহেব নিজে আমার ব্লাড প্রেসার চেক করে দিলেন। অন্যদিনের চেয়ে প্রেসার অনেক বেশিই মনে হল অর্থাৎ ১৮০/১০০, সাধারণত আমার কখনও এমন হয় না। আচমকা গ্রেফতার হয়ে অনেক বিচিত্র মামলার ১৫/২০ জন আসামীর সাথে উচ্চক্ষমতা

www.pathagar.com

সম্পন্ন লাইটের নীচে রাত কাটানো আমার জন্যে ছিল খুবই কষ্টকর। ঘুম হয়নি মোটেই। রাত ১-৩০টার দিকে আমার ওষুধের ব্যাগটা চেয়ে নিয়ে একটি 'রিভেট্রিন' খাওয়ার পরে বেশ কিছুক্ষণ একটু ঘুম হলেও ওটা শরীরের চাহিদা অনুযায়ী যথেষ্ট ছিল না।

যাহোক কোর্টের গারদে বসার কোন ব্যবস্থা নেই। চেয়ার বা টুল চেয়ে কোন লাভ হল না। আমি কোন মতে ঐ ফ্লোরেই নামাজ পড়েছিলাম (জোহরের)। কিছুক্ষণ পরে আসরের নামাজ শেষে দাঁড়িয়ে দরজা পর্যন্ত হেঁটে যেতে কয়েকবার পড়ে যাবার উপক্রম হই। দ্রুত দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দরজার (লৌহ কপাট) শিক ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কিছুটা সামলিয়ে উঠার চেষ্টা করি। মনে একটা আতংক ছিল। ডিবি থেকে কোর্টে রওয়ানার সময় ব্লাড প্রেসারের মাত্রা ছিল অনেক বেশি। এর জন্যে তখনও কোন মেডিসিনের ব্যবস্থা করা যায়নি। কোর্ট এলাকায় আওয়ামী ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠীর চলছিল অনেকটা বিজয় উৎসব। র‍্যাবসহ আইনশৃংখলা বাহিনীর উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মত। কোর্টের ভেতরের অবস্থা ছিল আরো নৈরাজ্যকর। ওটা কোন আদালত অঞ্চল বলে মনে করা সম্ভব ছিল না।

আদালত মূল মামলায় (সেটাও অযৌক্তিক একটি হয়রানিমূলক মামলা বৈ আর কিছুই নয়) জামিন দিলেও অনেকগুলো মামলায় গ্রেফতার ও রিমান্ডের আবেদন মঞ্জুর করে আমাদেরকে আবার গারদে পাঠিয়ে দেয়। গারদ থেকে সরাসরি রিমান্ডে পাঠাবে না কারাগারে পাঠাবে এ ব্যাপারে পুলিশের কর্তা ব্যক্তিরা কিছু বলতে পারছিলেন না। অবশেষে আমাদের আইনজীবীরা এসে বললেন, কোর্ট অর্ডার এলেই আমাদেরকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেবে। আমরা ঢাকা সিএমএম কোর্টের গারদে অপেক্ষা করছি আর আওয়ামী লীগের কর্মী সমর্থকদের বিরূপ শ্লোগান শুনছি। আমাদের কর্মীদের নিরাপত্তার বিষয়ে বেশ দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। অবশেষে কেন্দ্রীয় কারাগারে এসে গেলাম। জেলকর্তৃপক্ষ আমাদের তিন জনকেই ২৬ সেলে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। ২৬ সেলে আগে থেকেই আমাদের বিএনপির বন্ধুরা অবস্থান করছিলেন। যাদের মধ্যে আব্দুস সালাম পিন্টু ও শমসের মোবিন চৌধুরী সাহেব এবং এমপি এহসানুল হক মিলন ও এ্যানির কথা উল্লেখযোগ্য। উনারা জেলগেট থেকে আমাদের আগমন বার্তা পেয়ে রাতের খাবারের ব্যবস্থা করেন। এভাবে সারা দিনের ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তার সাময়িক অবসান ঘটিয়ে এশার নামাজ ও রাতের খাবার শেষে রুমে শয্যা গ্রহণ করি। পরের দিন দুপুরের খাবারের পর রুমে শুয়ে বিশ্রাম নিতেই দেখি একটা ছেলে আমার মাথার কাছে বসে মাথায় হাত বুলাচ্ছে। সে নিজের পক্ষ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে দেখে, একটু অবাক হলাম। সাথে সাথে মনে একটু হলেও তৃপ্তি পেলাম। যেন নিজের কোন ছেলেই আমার শিয়রে বসে আমার সেবা যত্নের চেষ্টা করছে একান্ত আন্তরিকভাবে। ক'দিন পরে ছেলেটা তার নাকের চিকিৎসার জন্যে পিজিতে যায়। তখন তার দারুণ অভাব অনুভব করতে লাগলাম। এরপর কিছুদিন অপর একটি ছেলে আমার সেবা যত্নে এগিয়ে আসে, ওর নাম সেলিম। আর এতক্ষণ যার কথা বলছিলাম, ওর নাম বিপ্লব। চিকিৎসা শেষে এসে আবার আমার সেবা যত্নের দায়িত্ব নেয় সে। কেন্দ্রীয় কারাগারের এক বছর সময়ের মধ্যে সে একান্ত আপন জন হিসাবে আমাকে দেখা শোনা করেছে। কারা হাসপাতালের ডাক্তার ডাকা ও ওষুধপত্র আনা থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজ সে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে আঞ্জাম দিয়েছে।

আমরা এখানে আসার পর থেকেই ওর জামিনের প্রচেষ্টার কথা শুনে আসছিলাম। কোন এক উকিল সাহেব তার কেস করার দায়িত্ব নিয়েও শেষ পর্যন্ত কিছু করে নাই বলে অভিযোগ শুনছিলাম। অবশেষে ব্যারিস্টার আনিসুল হক সাহেবের হস্তক্ষেপে ঐ উকিল সাহেব কাগজপত্র আনিসুল হক সাহেবকে দেয়ার পর তার জামিন মঞ্জুর হয়। জামিন মঞ্জুর হবারও প্রায় ২০ দিন পর গতকাল সে জামিনে মুক্তি পেয়ে কারাগার থেকে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়। টানা এক বছর সময় দেখতে দেখতে অতিবাহিত হয়ে গেল। এ সময়ের প্রতিদিনের আমার খোঁজখবর স্বতঃস্ফূর্তভাবেই নিয়েছে বিপ্লব। সকালের নাশতা শেষে একটা আপেল কেটে দেয়া ফজরের পরেই ডালিমের জুস করে টেবিলে রেখে দেয়ার কাজটি সে নিয়মিতভাবে

www.pathagar.com

নিজেই করে যেতো, কোন দিন তাকে একাজের কথা মনে করিয়েও দিতে হয়নি। আমার বড় মেয়ের ফরমায়েশ ছিল, আমি যেন প্রতিদিন ডালিমের জুস খাই। আর আমার বেগম সাহেবার ফরমায়েশ ছিল আমি যেন প্রতিদিন একটা করে আপেল খাই। বিপ্লব আমার সাথে জেল গেটে যেতো। আমি তার কাঁধে ভর করেই জেল গেট পর্যন্ত যাওয়া আসা করতাম। অতএব পরিবারের সবার সাথে সেও বেশ পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে। আমার বড় মেয়ে মহসিনা একদিন তাকে বলেছিল, আমার আব্বাকে একটু দেখাশোনা করো। ডালিমের রস ও আপেল খাবার ব্যাপারেও পরিবারের চাহিদাকে সামনে রেখেই সে নিয়মিত এর ব্যবস্থা করতো।

তার জামিনে মুক্তির জন্যে আমিও আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি, অতি সীমিত পর্যায়ে সহযোগিতারও চেষ্টা করেছি। ছেলেটা ছোট বেলায় বাপ হারায়। মা, ভাই বোনরাই এখন তার দেখভাল করছে। মায়ের ছেলে মায়ের বুকে ফিরে গেছে, ভাই বোনদের কাছে যেতে পেরেছে, এতে অবশ্যই অন্তরে বেশ আনন্দ অনুভব করছি। কিন্তু এতদিন তার সাথে যে এক মায়া মমতার, স্নেহের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, সেটা ভুলতে পারছি না। অন্তর থেকে দোয়া করছি ও যেন ভাল থাকে। মা, ভাইবোনদের সাথে তার জীবনটা নিরাপদে এবং সুখেই কাটে।

আমার একটা স্বভাবগত দুর্বলতা যারা ছোট বেলায় মা বা বাপ হারায় তাদের প্রতি আমার মনের অজান্তে একটা মায়া-মহব্বতের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এর সবটা হয়ত প্রকাশও করি না। কিন্তু মনে মনে এদের জন্যে যেন কেমন দারুণ একটা মমত্ববোধ আমার মনকে বেশ আবেগ তাড়িত করে তোলে। আমার মনের কোণে লালিত এই আবেগের সামান্যতমই প্রকাশ করে থাকি। বিপ্লবের সেবা যত্নের জন্যেই শুধু নয়, তার ছোট বেলায় বাপ হারানোর জনেই হয়ত তার প্রতি আমার মনে এতটা মায়া-মহব্বত ও আবেগের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আমার মনের এতটা আবেগ তাকে কখনও টের পেতে দেইনি। কিন্তু গতকাল তাকে বিদায় দেয়ার পর থেকে, ছহিসালামাতে সে যেতে পারল কিনা সাধ্যমত বিভিন্ন সোর্স থেকে খোঁজ নিয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেছি। কিন্তু তার অভাব যেন ভুলতে পারছি না। সে যাবার আগে ২৬ সেলে সেবক হিসাবে কর্মরত সেলিম এবং লেবু মোল্লাকে বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে, আমার কখন কী দরকার হয়।

গতকাল মুজিবুর রহমান সাহেবের রাষ্ট্রবিরোধী মামলার তারিখ ছিল। উক্ত মামলায় সরকার পক্ষের আইনজীবী রিমান্ডের দাবি করলে আদালত তা নামঞ্জুর করে দেয় এবং মুজিবুর রহমান সাহেব এবং তার সাথে আরো ১৭ জনের জামিন মঞ্জুর করে। বেচারা খুশি মনে জেল গেটে ফিরে আসে। আদালতে অবস্থানকালেই জামিন মঞ্জুর হওয়ায় আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানিয়ে দোয়া মুনাজাতও করা হয়। অনেকের বাসা বাড়িতেও এ শুভ সংবাদটি জানানোর ব্যবস্থাও করা হয় আইনজীবীদের মাধ্যমে। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে এসে তারা জানতে পেল, তাদেরকে আবার কোন নতুন মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। সেই মামলাটা যে কী, কোন অভিযোগে সাজানো হয়েছে, তার কিছুই এরা এখন পর্যন্ত জানে না। এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বৃদ্ধ মানুষও রয়েছেন, যাদের দুর্বিসহ কষ্ট হচ্ছে। অথচ ২ বার জামিন পাওয়া সত্ত্বেও তাদের পক্ষে কারাগার থেকে মুক্তি হচ্ছে না। এই জুলুম-নির্যাতনের কি কোন শেষ নেই? আল্লাহর দরবারে এদের ব্যাপারে বিচার চাওয়া ছাড়া মজলুমদের আর করার কিইবা আছে? আল্লাহ জুলুম পছন্দ করেন না, সীমালংঘন পছন্দ করেন না, তার প্রতি এই আস্থা ও বিশ্বাসই এদের সম্বল, আল্লাহর দরবারে সুবিচার বা ন্যায়বিচারের আশাই মজলুমের বেঁচে থাকার অবলম্বন। আল্লাহ তো সব কিছু দেখছেন এবং শুনছেন। তিনি কখনও জালেমদের পছন্দ করেন না, সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। একদিন এই সীমালংঘনকারীদের তিনি অবশ্য অবশ্যই পাকড়াও করবেন। এই আশায় বুক বেঁধে ধৈর্যধারণ করা ছাড়া মজলুমের আর কিছু করার নেই। এই বেচারাদের

www.pathagar.com

দু'দুবার জামিন হওয়া সত্ত্বেও কারাগারের প্রকোষ্ট থেকে বের হয়ে মুক্ত আলো বাতাসে যেতে না পারার দুঃখ বেদনা যে কতটা অসহনীয় তা কল্পনা করতেও গা শিহরে উঠে। আল্লাহ এদের সহায় হও।

আজ মাওলানা সাঈদী সাহেবের ট্রাইব্যুনালে হাজির হওয়ার তারিখ ছিল। সরকার পক্ষের আইনজীবীরা ইতঃপূর্বে তদন্ত প্রতিবেদন ট্রাইব্যুনালে জমা দিয়েছে প্রায় চার হাজার পৃষ্ঠার। তাদের কাছে আরো এক বাক্স কি কি যেন তথ্য ভাণ্ডার আছে যা আজ কোন এক সময় ট্রাইব্যুনালে জমা দিতে পারে। এ জন্যে আবার একটা তারিখও নাকি দিয়েছে। আসলে বানোয়াট তথ্য কয়েক হাজার কেন কয়েক লাখও হতে পারে। এটা সর্বজন বিদিত সত্য। ঐ সময়ে অর্থাৎ স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে বেচারা কোন রাজনীতির সাথেই জড়িত ছিলেন না। জামায়াতে উনি শরীক হয়েছেন ১৯৭৯ সালে জামায়াত পুনর্গঠিত হবার পরে। তার একমাত্র অপরাধ তার জনপ্রিয়তা এবং সেই সাথে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করা। উক্ত জামায়াতের নায়েবে আমীরের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়া। আল্লাহতায়ালা তার কোরআনের এই একনিষ্ঠ খাদেমের মান-মর্যাদা রক্ষা করুন, এজন্যে আমি আল্লাহর দরবারে কাতর কণ্ঠে অব্যাহতভাবে দোয়া করছি। আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী এমন একজন একনিষ্ঠ কোরআনের খাদেমের প্রতি যারা বৈরী আচরণ করছে, ইতিহাসের জঘন্যতম মিথ্যাচারের মাধ্যমে অনবরত চরিত্র হনন করে চলেছে, আল্লাহ তাদের একদিন অবশ্যই পাকড়াও করবেন, এটাই আল্লাহর সুন্নাত। আল্লাহর ঘোষণা রয়েছে, তার এই সুন্নাতের ব্যতিক্রম হয় না।

গতকালের পারিবারিক সাক্ষাতে আমার বড় জামাই সাইফুল্লাহ মানসুর এসেছিল। সে সদ্য বৃটেন আমেরিকা ও মালয়েশিয়া হয়ে ১৩/০৭/২০১১ ঢাকায় পৌঁছেছে। তার কাছ থেকে আমার বড় ছেলে নাকিবুর রহমান তারেকের এবং তার স্ত্রী ও দুই মেয়ের ভাল থাকার খবর পেয়ে বেশ ভালই লাগল। তারেক ওখানে ভাল অবস্থানেই আছে। নিউ অরলিন্সের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে পার্টটাইম শিক্ষকতা করছে, ফুল টাইমের চেষ্টা করছে। একটা ফুল টাইম চাকরি হলেই তার ওখানে থাকাটা নিশ্চিত হয়ে যায়। না হলে পিএইচডি ডিগ্রী পাওয়ার পর আর ওখানে থাকার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। মানসুরের ভাষায়, তারেক সেখানে একটু ভাল পরিবেশে আছে। আর এমন পরিবেশটা গড়ে উঠেছে তারই উদ্যোগে। শুনে বেশ ভাল লাগল। তারেককে, তার মেয়েদেরকে এবং তার স্ত্রীকে দেখি না কত দিন। গ্রেফতারের আগে অনলাইনে মাঝে মধ্যে দেখা হত কথাও হত। এক বছর ১৫ দিন পার হয়ে গেল। ওদের সাথে আর দেখাও নাই, কথাও নাই। তাই ওরা আল্লাহর ফজলে ভাল আছে জেনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায়ের পাশাপাশি মনের মধ্যে কেমন যেন একটা ব্যথা অনুভব করলাম, ওদের থেকে এতদিন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকার জন্যে। তবুও দোয়া করি ওরা বিদেশে বিভূঁইয়ে যেন ভাল থাকে। আল্লাহ যেন ওদের জানমাল দ্বীন-ঈমান হেফাজত করেন। আমেরিকায় তারেক ও তার মেয়েদের সাথে বেশ ক'দিন খুব ভাল ভাবেই কাটিয়ে এসেছে সাইফুল্লাহ আল মানসুর। সেই সাথে ফেরার পথে আমার ছোট ছেলে তালহাকেও দেখে এসেছে মালয়েশিয়াতে। আমার যত চিন্তা দুশ্চিন্তা এই ছোট এবং সবচেয়ে নিরীহ ছেলেটাকে নিয়ে। তার অনার্স শেষ করতে কেন যেন একটু বেশি সময় লেগে গেল। অবশ্য সময় একটু বেশি লাগলেও রেজাল্ট ভাল করছে। সাধারণত অনার্সের পর বিদেশী ছেলেরা ওখানে মাস্টার্স পড়ার সুযোগ পায় না বা পড়ে না। কিন্তু তালহা আশাবাদী সে ওখানেই মাস্টার্স করতে পারবে এবং স্কলারশিপ অথবা এসিস্টেন্টশিপ দুটোর কোন একটা সুযোগ ইনশাআল্লাহ সে পেয়ে যাবে। আমার চার ছেলের বাকী তিনজনের লেখাপড়া শেষ প্রায়। এখন তাদের ক্যারিয়ার গড়ার পালা। বড় ছেলে পিএইচডি হয়ে গেলে সে শিক্ষকতা করবে, না কোন প্রতিষ্ঠানে বিজনেস এক্সিকিউটিভ হবে, এটা তার স্বাধীন ইচ্ছার উপরই নির্ভর করছে। তার ছোটটা বার এ্যাট ল' করে ঢাকায় আইন ব্যবসায় যোগদানের প্রক্রিয়ায় আছে। আগে ব্যারিস্টাররা সরাসরি সুপ্রীম কোর্টে প্রাকটিস করতে পারত। এখন দেশের এডভোকেটদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এত বছর পরিশ্রম করে আইনশাস্ত্রে অনার্স ডিগ্রী নিয়ে আরো একবছর পরে জয়েন করে পরীক্ষা

www.pathagar.com

দিয়ে পাস করে আসার পরও এখন তাদেরকে আদালতে প্রাক্টিসের জন্য লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় পাস করতে হয়। তারপরও এক বছর নিম্ন আদালতে কোন সিনিয়রের অধীনে এক বছর কাটিয়ে সুপ্রিম কোর্টের জন্যে পরীক্ষা দিতে হয়। সে দেশে এসেই নিম্ন আদালতের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এখন সুপ্রিম কোর্টে পরীক্ষার জন্যে অপেক্ষা করছে। এভাবে চলে যাবে আরো একবছর। তৃতীয় ছেলে ডাক্তার এমবিবিএস পাস করা। সে এফআরসিএস এর দুই পর্বের পরীক্ষায় পাস করেছে। এখন তৃতীয় পর্ব অর্থাৎ ভাইভা বাকী। সে তার স্ত্রীর সাথে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে সিডনীর নিকটবর্তী কোন এক শহরের একটি ভাল হাসপাতালে চাকরি পেয়েছে অল্প কিছু দিন হল। মূলত সে ওখানে গিয়েছে তার স্ত্রীর উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে ওখানে একটি ভাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ হওয়ায় তার ডিপেন্ডেন্ট ভিসায়। ওখানে গিয়ে তাকে দুটো পরীক্ষা দিতে হয়েছে এবং পরীক্ষায় ভাল করার ফলেই চাকরিটা হয়েছে। এখন তার এফআরসিএস এর তৃতীয় পর্বটা হয়ে গেলেই তার ক্যারিয়ারটা পূর্ণতা পেতে পারে। মোটামুটি এই তিনজনের ব্যাপারে আমি এখনও দুশ্চিন্তামুক্ত হতে পারছি না। তবে এবার তার সাথে আলাপ করে আমি নিজেও কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছি। তাছাড়া মোমেন এবং মানসুর তাকে যে অবস্থায় দেখে এসেছে, তাতেও আমি অনেকটা এখন দুশ্চিন্তামুক্ত। মেয়ে দুটোকে আল্লাহর রহমতে সৎপাত্রে পাত্রস্থ করার সুযোগ পাওয়ায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। বড় মেয়েকে ও লেভেল পাস করার আগেই বিয়ে দিয়েছিলাম। আল্লাহর শুকরিয়া সে বৈবাহিক জীবনে তিন সন্তানের মা হয়েও বিবিএ ও এমবিএ পাস করে, এখন একটা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছে। ছোট মেয়েটাকে গ্রাজুয়েশনের আগেই বিয়ে দিয়েছিলাম। সে ইংলিশে অনার্স ডিগ্রিটা হাতে পেয়েছে। এখন স্বামীর সাথে বৃটেনে আছে। সেখানে শিশুশিক্ষার উপর লেভেল থ্রি নামের একটা ডিগ্রি নিয়েছে। যা দেশের শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজে আসবে আশা করা যায়।

সর্বোপরি কথা আমার দু'ইটি মেয়ে এবং ৪টি ছেলেই দ্বীন ও ঈমানের উপরে টিকে আছে, টিকে থাকার চেষ্টা করছে। তাদেরকে এভাবে গড়ার ক্ষেত্রে তাদের মায়ের ভূমিকাই মুখ্য। আমি মূলত সংসারের দিকে তথা সন্তানদের দিকে তেমন একটা নজর দেবার সুযোগই পাইনি। জেলের প্রথম সাক্ষাতে আমার স্ত্রীকে একটু আবেগ নিয়ে বলেছিলাম এখন সংগঠন দেখার, সংগঠনের কাজ করার (মহিলাদের মাঝে) মত অনেক লোক তৈরি হয়েছে। বর্তমান সময়ে সংগঠনের কাজ করার সুযোগ বিশেষ করে মহিলাদের অংগনে বেশ সীমিত হয়ে এসেছে। সরকারের পক্ষ থেকে ছুতো নাতায় হয়রানির মাত্রা সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অবস্থায় তুমি বেশি সক্রিয় ভূমিকায় না গিয়ে সবরের সাথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হও যাতে সংগঠনের পক্ষ থেকে কোন অভিযোগের সুযোগ কেউ না পায়। কাজের মাত্রা একটু কমিয়ে দিয়ে আমার সোনার টুকরো ছয়টি ছেলে মেয়েদের তুমি দেখে রাখ। এটাই এই মুহূর্তে তোমার কাছে আমার বড় দাবি। আমি নিজেও আল্লাহর দরবারে কামনা করি, আল্লাহ আমার স্ত্রীকে এ মুহূর্তে এমন দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের তৌফিক দাও, যাতে আমার ছেলে মেয়েরা তাদের মায়ের মাঝেই তাদের আব্বুকে খুঁজে পায়। ছোট ছেলেটা তার মনের কথা, মনের ব্যথা সহজে প্রকাশ করতে পারে না। কিন্তু অন্তর দিয়ে সবই সে অনুভব করে। তার এই তীব্র অনুভূতিই অনার্স ফাইনালের মত পরীক্ষা অসমাপ্ত রেখে তাকে দেশে আসতে বাধ্য করে। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী, সে আমাকে দেখে নিরাপদে তার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে গিয়ে বাকী পরীক্ষাগুলো দেয়ার সুযোগ পেয়েছে। তার অন্য তিন ভাইদের মতই তাকেও আল্লাহ দ্রুত তার নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দিন অন্তর থেকে এই দোয়াই করি বার বার। আরো দোয়া করি ওদের দুই বোন চার ভাইয়ের কর্মজীবনের সাফল্য যেন সচক্ষে দেখে যাবার তৌফিক আল্লাহ আমাকে দান করেন।

সংগঠনের কারণে চেনা অচেনা মানুষের সাথে আদর্শিক সম্পর্ক কিভাবে আত্মিকসম্পর্কে পরিণত হয় ছাত্র জীবন থেকে তা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে আসছি। আধুনিক জাহেলিয়াতের আগ্রাসনের কারণে আজকের মানব সমাজ যেখানে জর্জরিত, সেখানে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে পরিচালিত একটি খাঁটি নির্ভেজাল

www.pathagar.com

ইসলামী সংগঠন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্যে কত বড় নিয়ামত তা আগেও বুঝতাম। কিন্তু জেলখানায় এসে এটা যেভাবে উপলব্ধি করছি, অতীতে কোন দিন এমনভাবে উপলব্ধি করেছি বলে মনে হয়নি।

তেমনি সংগঠনের কারণে ছাত্রজীবনে পারিবারিক জীবন থেকে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই বিচ্ছিন্ন ছিলাম। সংগঠনের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে একাডেমিক ক্যারিয়ারের যেমন চিন্তা করিনি, তেমনি মা-বাপের প্রতি হৃদয়ভরা গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও তাদের সাথে বছরের পর বছর কোন ঈদই করা হয়নি। আজ সেই পরিবারের বন্ধনটাও যে আল্লাহর কত বড় নিয়ামত তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। পরিবারের সদস্যদেরতো সপ্তাহে একদিন ৩০ মিঃ এর জন্যে হলেও কাছে পাচ্ছি। যদিও এতে মনের ব্যথা আরো বৃদ্ধিই পায়। কিন্তু আমার প্রিয় সংগঠনের সাথীদের সাথে তো এভাবেও একটু কথা বলার সুযোগ হচ্ছে না। দুটো নিয়ামতই আমার কাছে অনেক বেশি মূল্যবান। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা "হে আল্লাহ তোমার নেয়ামতের পতন থেকে, তোমার নিরাপত্তা উঠিয়ে নেয়া থেকে এবং তোমার যাবতীয় ক্রোধ অসন্তুষ্টি থেকে পানাহ চাই"। আজ শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত মধ্য শাবান বা নেসফ শাবানের রোজা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা ২৬ সেলের বর্তমান বন্দীদের দুজন ছাড়া সবাই। আমার শরীরের অবস্থার কারণে গত রমজানের রোজা না রাখার জন্যে অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী পরামর্শ দিয়েছিলেন। কারণ ব্লাড সুগার খুবই নীচে নেমে যাচ্ছিল। কিন্তু আমার জীবনে এ পর্যন্ত পূর্ণ রোজা রাখা শুরু করার পর থেকে একটি রোজাও কাজা করতে হয়নি। আল্লাহর শুকরিয়া একটু কষ্ট হলেও (অসুস্থতা ও রিমান্ডের কারণে) পূর্ণ রোজা গত রমজানে রাখতে সক্ষম হই। শাবানের রোজাতো মূলত রমজানের রোজার প্রস্তুতিতে সাহায্য করে থাকে। তাই স্বাস্থ্যগত কিছু অসুবিধা সত্ত্বেও আমিও রোজা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আল্লাহ যেন এই তিনটি রোজার অছিলায় রমজানের মাসব্যাপী রোজা সহজ করে দেন।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অনুভূতি- ০৬

কোর্ট অর্ডারের অস্পষ্টতার অজুহাতে আমার বারডেমে চিকিৎসার কোন উদ্যোগ জেল কর্তৃপক্ষ নিতে পারছিলেন না। ইতোমধ্যে আমি কয়েকবার কারা হাসপাতালের সহকারী সার্জন শামসুদ্দীন সাহেবের সাথে কথা বলে হতাশ হয়ে এক পর্যায়ে বলে ফেলি, চিকিৎসার ব্যাপারে আর আপনাদেরকে বিরক্ত করতে চাই না। জেলে থাকা অবস্থায় আর কোন চিকিৎসা নিতেও চাই না। আপনারা আর আমার জন্যে কষ্ট করবেন না। আমি যেভাবে আছি এভাবেই থাকতে দিন। ইতঃপূর্বে ব্যারিস্টার আঃ রাজ্জাক সাহেব নিজে এসে জানিয়ে গিয়েছিলেন হাইকোর্ট থেকে আমার ফিজিওথেরাপিসহ সকল চিকিৎসা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে জেল কর্তৃপক্ষকে। জেল কর্তৃপক্ষ সেই কোর্ট অর্ডার প্রাপ্তির কথা আজ পর্যন্ত স্বীকারই করেনি। ব্যবস্থা নেয়ার তাই কোন প্রশ্নই উঠে না। ট্রাইব্যুনাল থেকে দেয়া যে অর্ডারটি কারা হাসপাতালে ডাক্তার আমাকে দেখিয়ে বললেন এখানে স্পষ্ট কোন নির্দেশ নেই, উক্ত অর্ডারের মধ্যে এটাও লেখা ছিল, ইতঃপূর্বে বার বার তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। হাইকোর্টের অর্ডারের মতই হয়তবা গায়েব হয়েছে। কোন দুষ্টচক্র ভেতরে থেকে এমনটি করেও থাকতে পারে। যা জেল কর্তৃপক্ষ অনুধাবন করতে পারেননি। আমার ব্যাপারে মহল বিশেষের কোন চক্রান্ত গোপনে কাজ করছে বলে ধারণাটা আমার অনেকটা দৃঢ় বিশ্বাসেই পরিণত হতে থাকে। ডা. শামসুদ্দীন সাহেব সিরাজগঞ্জের মানুষ। আমার মান অভিমান মিশ্রিত হতাশাজনিত বক্তব্যে তিনি কিছুটা সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেন। আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, হতাশ হবেন না, দেখি আমরা নিজেরা কিছু করতে পারি কিনা। ইতঃপূর্বে ট্রাইব্যুনালে সরকার পক্ষের উকিলদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, কোর্ট অর্ডার ছাড়াও তো কারা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে কোন বন্দীর চিকিৎসার ব্যবস্থা নিতে পারে। আমি শামসুদ্দীন সাহেবকে একথাটাও শুনিয়ে

www.pathagar.com

দিলাম। পরে তারা যথোপযুক্ত কাগজপত্র তৈরি করে বারডেমে আমাকে নেয়ার ব্যবস্থা করলেন ৫ই জুন ২০১১ তারিখে। সেদিন ফিজিক্যাল মেডিসিনের প্রফেসর আমাকে দেখে এবং আমার পূর্বের কাগজপত্র দেখে একটানা দশদিন ফিজিওথেরাপি দেয়ার সিদ্ধান্ত দিলেন এবং অন্যান্য ব্যাপারে দেখার জন্যে ফোনে কথা বলে মেডিসিনের প্রফেসরের কাছে রেফার করলেন। মেডিসিনের প্রফেসর পিজির ব্যবস্থাপত্রে অনেক ওষুধের উল্লেখ দেখে বললেন, উনি এত ওষুধ খাচ্ছেন, এর কোনটা চলবে আর কোনটা বাদ দিতে হবে এজন্যে ১০ দিন হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হবে। সবদিন সিট খালি থাকে না। আজ সিট খালি আছে, তাই আজকেই ভর্তি করে নেয়া হোক। উনার প্রস্তাবের সাথে সাথেই কারা কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি আপত্তি করলেন, একজন বন্দী যেহেতু বাইরের হাসপাতালে ভর্তি আছে, অতএব ভর্তি করা যাবে না। একটানা দশ দিন আমাকে হাসপাতালে ফিজিওথেরাপির জন্যে নেয়া আনা করা যাবে না। একথা তখন না বললেও পরে ৫ই জুন থেকে ১৯ শে জুন পর্যন্ত আর কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।

১৯ তারিখে আবার আমাকে পাঠানো হল বারডেমে। আমি ভর্তির প্রস্তুতি নিয়েই গিয়েছিলাম। কারণ ঐদিন পর্যন্ত আমাদের সাথীদের কেউ বাইরের হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন না। ৫ ই জুন একদিন থেরাপি নেয়ার দুই সপ্তাহ পরে আবার একদিন থেরাপি নিলাম। কিন্তু ভর্তি হওয়া হল না। এখানে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের না কারাকর্তৃপক্ষের আন্তরিকতার অভাব ছিল আমি বুঝে উঠতে পারিনি। তবে পরে জানলাম আমার কাগজপত্র আরপি সাহেবের কাছে নিয়ে গিয়েছিল একজন কারারক্ষী। ডেপুটি জেলার নিজে যাননি। ভর্তির কথা ব্যবস্থা পত্রে লেখা নাই বলেই নাকি ভর্তি করা হয়নি। ডেপুটি জেলার গেলে দেখতে পারত ভর্তি হবার কথা লেখা আছে কি নেই। এরপর চিকিৎসা আবার ছেড়ে দেই। ইতোমধ্যে ডান হাতের মধ্য আংগুলের গোড়ায় দারুণ ব্যথা হয়। মাঝে মাঝে ডান হাতে কোন কাজই করতে পারছি না। ইতঃপূর্বে পিজির ফিজিক্যাল মেডিসিনের ডাক্তারদের পরামর্শে একটানা টেনিস বল হাতে নিয়ে উক্ত ব্যথা উপশমের চেষ্টা করছি। এর মধ্যে সাঈদী সাহেব একদিন বললেন, পরিবারের পক্ষ থেকে একটু চেষ্টা করতে বলেন, এভাবে বিনা চিকিৎসায় হাতটা তো অকেজো হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমি কোন উপায় না দেখে আর কোন পদক্ষেপ নেয়ার চিন্তা প্রায় ছেড়ে দিয়েছিলাম।

ইতোমধ্যে ৪ঠা জুলাই আমাদের ২৬ সেলে তিনজন সাবেক আইজি এলেন ২১ শে আগস্ট গ্রেনেড হামলার আসামী হিসাবে। উনাদের জন্যেই হয়ত আইজি প্রিজন সাহেব ৫ কি ৬ জুলাই ২৬ সেলে আসলেন আমাদের খোঁজ খবর নেয়ার জন্যে। তিনিই জানালেন, আমাকে প্রতিদিন বারডেমে নিয়ে ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থা করা হবে। উনার কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। আমার ফিজিওথেরাপি আবার শুরু হল জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহের শেষের দিকে। জুলাই মাসের ৩০ তারিখে ১০ দিনের কোর্স শেষ হবার কথা। অষ্টম দিনে প্রফেসর সাহেব আরও ৭ দিন বাড়িয়ে দিলেন। একদিকে দশ ট্রাক অস্ত্র মামলায় ১লা আগস্ট আদালতে হাজির হওয়ার তারিখ ঘোষণা করা হয়। ৩১ শে জুলাই ঢাকা থেকে রওয়ানা হয়ে ১লা আগস্টে কোর্টে হাজির হওয়া যেতো। কিন্তু এ ব্যাপারে কারা হাসপাতালের ডাক্তারদের কোন সহযোগিতা পাওয়া গেল না। বারডেমের ফিজিক্যাল মেডিসিনের প্রফেসরের এডভাইস ছিল লং জার্নি এভয়েড করতে হবে। এটার উপর ভিত্তি করে কারা হাসপাতালের ডাক্তারের পক্ষ থেকে সহযোগিতা পেলে কোমরের এই দুরবস্থা নিয়ে এই লম্বা সফর এড়াতে পারলে আমার জন্যে বড় এহসান হত। কিন্তু জেলে মানবিকতা বলে কোন বিষয়ের অস্তিত্বই নেই। সেখানে এহসানের আশা করা অবান্তর।

১লা আগস্ট চট্টগ্রাম বিচারিক আদালতে হাজিরা দিয়ে ২রা আগস্ট পহেলা রমজান বিকেল ৫-৩০ টায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে এসে পৌঁছলাম। চট্টগ্রাম থেকে রওয়ানার আগের দিনই আদালতে আমার ছেলের সাথে এবং ভাতিজা মিঠুর সাথে দেখা। ওদের জানিয়েছি, ১লা আগস্ট বিকেলেই আমাকে ঢাকায় নিয়ে যেতে পারে। ওখানে পৌঁছলেই যেন ফিজিওথেরাপি শুরু করা যায়, এজন্যে তারা যেন গিয়েই বারডেমে এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাকর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে সব ব্যবস্থা করে রাখে। চট্টগ্রাম কারাকর্তৃপক্ষ

www.pathagar.com

আমাকে ১লা আগস্ট বিকেলেই পাঠানোর জন্যে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে। ওখানকার ডাক্তারও আমার বারডেমের চিকিৎসা যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় এজন্যে কারা কর্তৃপক্ষ ও বিচারিক আদালতের ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে আলোচনা করে। কিন্তু পুলিশ স্কোয়াড পাওয়া না যাওয়ায় ১ম রোজা শুরু হল সফর দিয়ে।

চট্টগ্রাম থেকে ঢাকার পথে রওয়ানা করেই দেখা গেল ড্রাইভারের ঘুম পাচ্ছে। জানা গেল, সে কাল বিকেল চারটায় সিলেট থেকে গাড়ী ড্রাইভ করে গভীর রাতে চট্টগ্রামে পৌঁছেছে। সেহরী খেয়েও ঘুমাতে পারেনি। সে বিকল্প ড্রাইভারের ব্যবস্থা করার জন্যে পুলিশ কর্মকর্তাকে অনুরোধ করল। গাড়িটা আপাতত মিরসরাই থানায় থামল। ওখানে আমি এই সুযোগে এস্তেঞ্জা ও অজু সেরে নিলাম। পুলিশ স্কোয়াডের সাথে এসবি-এর একজন লোক থাকায় কিছুটা সহযোগিতা পাওয়া গেল। ডিসি ফোন করে পুলিশের একজন ড্রাইভারকে বের করলেন। সে বেচারা ছুটিতে কুমিল্লা গিয়েছিল। কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম ফেরার পথে তাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে ড্রাইভিংয়ের দায়িত্ব দেয়া হল। গাড়ির আসল ড্রাইভারকে গাড়িতেই পেছনের সিটে শুয়ে বিশ্রাম করতে বলা হল। কুমিল্লা পর্যন্ত এসে বিকল্প ড্রাইভার আবার নেমে গেল। এবং মূল ড্রাইভার শেষ পর্যন্ত গাড়ি চালিয়ে ঢাকায় কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছায় ৫-৩০ টায়। জোহর ও আসরের নামাজ আমি পথে গাড়িতে বসেই আদায় করে নেই। কেন্দ্রীয় কারাগারের গেটের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে রুমে পৌঁছি ৬ টার দিকে। তাড়াহুড়ো করে গোসলটা সেরে সাথীদের সঙ্গে ইফতারের টেবিলে শরীক হই।

ঢাকায় ফিরে এলাম মঙ্গল বারে। আশা ছিল বুধ, বৃহস্পতি এবং শনিবারে ফিজিওথেরাপি নিয়ে রবিবারে আবার চট্টগ্রামে যাওয়া যাবে ৮ই আগস্টে হাজিরা দেবার জন্যে। চট্টগ্রাম-এর জেলার রাজি হলেন ৮ই আগস্টের হাজিরার জন্যে ৭ই আগস্টই আমাকে চট্টগ্রামে আনা হবে। কিন্তু এখানকার কারা হাসপাতালের ডাক্তারদের অসহযোগিতার জন্যে আমার ঐ দিনের থেরাপি পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী নেয়া হল না। আবার ৭ই আগস্ট যেতে হল চট্টগ্রামে। ৮ই আগস্টের কোর্ট হাজিরা শেষে দুপুর ২-৩০ টায় আমাকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করানো হল। ঐদিনই যে পাঠাবে এটা আগে জানি নাই। কোর্ট থেকে এসে জানলাম। তাই আমার ভাতিজা মিঠুকে জানাতে পারি নাই। জানানো গেলে তাদের গাড়ীটা আমাদেরকে অনুসরণ করতে পারতো। এবারে পুলিশ স্কোয়াডের দায়িত্বশীলকে খুবই কাটখোট্টা মনে হল। নামাজ ও ইফতারের জন্যে কোথাও সে গাড়ী থামাতে মোটেই রাজি ছিল না। আমি কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের হাইওয়ে ইনে ইফতার এবং নামাজ আদায় করার কথা বললাম। সে হাইওয়ে ইনে কিছুতেই যেতে রাজি হল না। এদিকে গাড়িতে গ্যাস নেয়ার জন্যে একটা ফিলিং স্টেশনে থামলে, আমি এই ফাঁকে এস্তেঞ্জা ও অজু সেরে নিলাম। ফিলিং স্টেশনের লোকেরা আমাকে চিনে বেশ খাতির যত্নের চেষ্টা করল। হাইওয়ে ইন না গিয়ে, বেশ সময় হাতে থাকতে ইফতারের জন্যে রয়াল নামের একটা হোটেলে গাড়ী থামানো হল। সেখানেই পুলিশের লোকদের (ড্রাইভারসহ) নিয়ে ইফতার করলাম। কিন্তু বিল কত হয়েছে জিজ্ঞেস করায় তারা বিল নিতে অস্বীকার করল। চৌদ্দগ্রাম উপজেলা জামায়াতের আমীর শাহাবুদ্দিন সাহেব বললেন, কুমিল্লা জেলা আমীর তাদেরকে এই ইফতারের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব দিয়েছে। ইফতারের মধ্যেই তারা খিচুরি খাওয়ানোর প্রস্তাব করল। আমাদের সাথে পুলিশ কর্মকর্তা একটু কর্কশভাবেই প্রস্তাব নাকচ করে দেয়। পরে অবশ্য প্যাকেট নিতে রাজি হয়। তারা 'অরবিট' নামক হোটেলের পাশে আমাদের গাড়ি থামাতে বলে এবং ওখান থেকে বার প্যাকেট সুস্বাদু ভুনা খিচুরি গাড়িতে তুলে দেয়। আমরা লোক আমাকেসহ আটজন। অতিরিক্তি চার প্যাকেট কর্মকর্তা নিজের আয়ত্তে নিয়ে নিলেন। গাড়ী চলার পথেই সবাই খিচুরি খেয়ে খুবই খুশী হল। আমি প্যাকেটের চার ভাগের একভাগ খেয়ে একজন যুবক সিপাইকে বাকীটা খেতে দিলাম।

এভাবে আসতে আসতে পথের লোকজন ড্রাইভারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানালো, পেছনের চাকা পাংচার হওয়ার কথা। কোনমতে একটা গ্যাস স্টেশনে গাড়ি থামিয়ে চাকা বদলাতে লেগে গেল প্রায় ৪০/৪৫

www.pathagar.com

মিনিট সময়। এরপর রওয়ানা দিয়ে ঠিক ক'টা নাগাদ ঢাকা পৌছা সম্ভব হতে পারে, তা আর অনুমান করা যাচ্ছিল না। রাস্তা এত খারাপ যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এই রাস্তায় ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-নোয়াখালী, ঢাকা-ফেনী, ঢাকা-কুমিল্লা জীবনে অনেক বার যাওয়া-আসা করেছি। কিন্তু রাস্তার এই বেহাল অবস্থা আর কখনও দেখিনি। এরপর বৃষ্টির কারণে বাড়তি বিড়ম্বনা। ঢাকার উপকণ্ঠে এসে মনে হল সেহরীর সময়ও বোধহয় কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছা সম্ভব হবে না। প্রথমে চৌদ্দগ্রাম হতে দেয়া খিচুরি মোটেই খেতে চাচ্ছিলাম না। কারণ, মনে করেছিলাম, কুমিল্লা থেকে ঢাকা পৌঁছতে বড় জোর দু থেকে আড়াই ঘণ্টা সময় লাগবে। কিন্তু কাঁচপুরে ব্রিজ পার হতেই অনেক সময় লাগল। ব্রিজের পর যাত্রাবাড়ী মোড় পেতেই যে কত সময় লেগেছে তার আর হিসাব রাখিনি। যাক অবশেষে রাত সোয়া বারটায় ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের গেটে পৌঁছলাম।

চট্টগ্রাম কারা কর্তৃপক্ষকে বলে এসেছিলাম, ঢাকায় যেন আমার রওয়ানার খবরটা জানানো হয়। জেলার সাহেব বলেছিলেন, এনিয়ে আপনাকে কোন চিন্তা করতে হবে না। এটা আমাদের দায়িত্ব। আমরা এখনই জানিয়ে দিচ্ছি। গেট খোলা পেয়ে মনে হল চট্টগ্রাম থেকে খবর জানানো হয়েছে। কিন্তু গেটে কর্তব্যরত ব্যক্তিরা বলল তারা কিছু জানে না। গেটের আনুষ্ঠানিকতা সারার মত কোন লোকই গেটে উপস্থিত ছিল না। আমি পৌঁছার পর কাকে যেন খবর দেয়ার জন্যে লোক পাঠানো হল। আমি বেশ ক্লান্তি অনুভব করছিলাম। সারা দিন রোজা শেষে প্রয়োজনীয় খাবারও খাওয়া হয়নি। চৌদ্দগ্রাম হতে দেয়া খিচুরিটা ঐ সময় পুরো না খাওয়া ভুল হয়েছে মনে হল। জেল গেটের হাবভাব দেখে মনে হল, বাকী রাতটা বোধহয় গেটেই কাটাতে হবে। চট্টগ্রাম থেকে যারা আমাকে নিয়ে এল, তাদের কাছ থেকে আমাকে বুঝে নেয়া, পিসির টাকা জমা নেয়া, ঐ টাকা থেকে চট্টগ্রাম থেকে আগত পুলিশ স্কোয়াডকে চট্টগ্রাম ফেরার পথে খাবার জন্যে আমি পিসি একাউন্ট থেকে টাকা দিতে চাইলাম। তাতেও তাদের আপত্তি করতে শুনলাম; এতে নাকি তাদের চাকরির অসুবিধা হতে পারে। আমি তাদেরকে অভয় দিলাম। বিষয়টা আমি নিজে দেখবো। কিন্তু এই লোকেরা পথে সেহরী খেতে পারবে না, এমনটি হতে দেয়া যায় না। আমার পক্ষে এতটা অমানবিক আচরণ বরদাশত করা সম্ভব নয়, আর টাকাতো দিচ্ছি আমি, আমার একাউন্ট থেকে। অবশেষে বেচারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হল। আমি তাদের সেহরীর টাকা দিতে পেরে স্বস্তির সাথে বিদায় দিলাম। প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে আমার জন্যে গেট খোলার এবং ২৬ সেল পর্যন্ত পৌঁছানোর ব্যবস্থা হল। আমি রাত ১-৩০ টায় রুমে এসে শুয়ে পড়লাম। ঘড়ির এলার্ম শুনে আবার ১ঘণ্টা পরেই উঠে পড়লাম। ডিউটিরত কারারক্ষীকে বলেছিলাম। আমার আসার খবরটা যেন ২৬ সেলের ম্যাট আলমগীর সাহেবকে জানায়, সে থাকে ১১ নং রুমে। ২৬ সেলের সাথীদের সাথে আমার দেখা হল সেহরীর টেবিলে। অনেকটা সারপ্রাইজ দেয়ার মত ঘটনাই বলা চলে।

আগের বার চট্টগ্রাম থেকে ফিরে এসে বারডেমে চিকিৎসার ধারাবাহিকতায় ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থা না হওয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে, মঙ্গলবারেই ডাক্তার ডেকে পাঠাই। কুন্ডু বাবু এলেন। সব কিছুর ব্যবস্থা করার অঙ্গীকার করে গেলেন। এরপর শামসুদ্দীন সাহেবকেও জানালাম যে কুন্ডু বাবুর সাথে আমার কথা হয়েছে, এটা মনে করিয়ে দেবেন। কুন্ডু বাবু আগেও বলেছিলেন চট্টগ্রাম থেকে ঘুরে আসুন, একটানা ফিজিওথেরাপির কোর্স পূরণ করা যাবে। এবারেও তার কথা থেকে মনে হল আগামী শনিবার থেকে থেরাপি শুরু হবে। আমি বৃহস্পতিবারে সাপ্তাহিক সাক্ষাতের ফাঁকে ডক্টর'স রুমে ঢুকে কুন্ডু বাবু, শামসুদ্দীন সাহেব এবং রফিক সাহেবের সাথে কথা বলে আসলাম। তারা ওয়াদা করলেন, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবেন। তাদের কথা মত আমি শনিবারে যথা সময়ে প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষার ফাঁকে, আমাদের সেলের ম্যাট আলমগীরকে পাঠালাম খোঁজ নেয়ার জন্যে। আলমগীর এসে জানাল সহকারী জেলার আবু মুসা সাহেব বলেছেন, আজ উনাকে নেয়া যাচ্ছে না, ডাক্তাররা ফরওয়ার্ড না করার জন্যে। গত বৃহস্পতিবারে একসাথে তিনজনকে বললাম। তারা ইতিবাচক সাড়া দিলেন, তার আগে কুন্ডু বাবু ও

www.pathagar.com

শামসুদ্দীন সাহেবকে বললাম; তারপরও এমন হওয়ার কারণ জানার জন্যে কুন্ডু বাবুকে ডেকে আনলাম। তিনি কিন্তু ঔদ্ধত আচরণই করে বসলেন। আবু মুসা সাহেব নাকি তাদেরকে কোন কাগজ পত্রই দেননি। তিনি বললেন, 'আমি কি কাগজপত্রের জন্যে তাদের টেবিলে টেবিলে ঘুরব? ফরওয়ার্ডিংয়ের জন্যে তাদের কাগজ লাগবে, একথাটি আগে কখনও বলেননি। যাক অবশেষে ঐদিনই বিকেলে, সহকারী জেলার আবু মুসা সাহেব এসে বলে গেল, আগামী কাল রবিবারে পুলিশ স্কোয়াড পাওয়া যাচ্ছে না, তাই সোমবার থেকে শুরু করা হবে। অথচ সোমবার ছিল জাতীয় শোক দিবস হিসাবে ছুটির দিন। এটা হয়ত তাদের খেয়ালই ছিল না। আমি রবিবারে সকালে গোসলের অপেক্ষায় আছি এমন সময় শুনলাম, আজকেই আমাকে বারডেমে ফিজিওথেরাপির জন্যে নেয়া হবে। কিছুক্ষণ পরেই নিতে আসবে, আমি যেন তৈরি হয়ে থাকি। গতকাল বিকেলে, খবরের কারণে আজকে যেতে হবে, এ ধারণা ছিল না বিধায় ফজরের পরে ঘুম থেকে একটু দেরীতেই উঠেছিলাম। যাহোক অবশেষে আমার চিকিৎসা হতে যাচ্ছে এটা জেনে তড়িঘড়ি করে গোসল সেরে তৈরি হয়ে গেলাম। অন্য সময় তৈরি হয়ে বসে থাকার অনেক পরে নিতে আসে। এবার তারা নিতে এসে অপেক্ষা করতে থাকে। এই ফাঁকে আমি প্রস্তুতি সেরে তাদের সাথে জেলগেটে রওয়ানা করি বারডেম হাসপাতালের উদ্দেশ্যে। রবিবারের পর সোমবার জাতীয় শোক দিবসের ছুটি উপলক্ষে বিরতি দিয়ে আবার মঙ্গলবার থেকে থেরাপি দেবার জন্যে অর্থপেডিক্সের ডাক্তারকে রেফার করা হল। তিনি বুধবার সকাল ১০টায় সময় দিলেন। বুধবার সকাল ১০টার আগেই আমাদের বারডেম হাসপাতালে পৌঁছার কথা। কারণ সংশ্লিষ্ট ডাক্তার ১০ টার পরে থাকে না। আমি বুধবার সকাল সকাল গোসল সেরে প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষায় আছি। আগের দিন পুলিশের লোকদেরকে আমি ব্যক্তিগতভাবেও অনুরোধ করেছিলাম, তারা যেন একটু সকাল করেই চলে আসে যাতে ডাক্তার থাকতে থাকতেই আমরা পৌঁছতে পারি। কিন্তু ৯টা পেরিয়ে যাচ্ছে তবুও জেলগেট থেকে কোন খবরই আসছে না। অপেক্ষার এক পর্যায়ে ৯-৩০ টায় জেলগেটে পৌঁছলাম। কিন্তু আনুষ্ঠানিকতা শেষ করতে করতে প্রায় পৌনে ১০টাই বেজে গেল। মনে হচ্ছিল ১০টার মধ্যে পৌঁছা সম্ভব হবে না, তাই ডাক্তারও পাওয়া যাবে না। তবে আল্লাহ বড় মেহেরবান, রাস্তা অন্য দিনের তুলনায় বেশ ফাঁকা থাকায় ১০টা বাজার কয়েকমিনিট আগে বারডেম হাসপাতালে পৌঁছতে সক্ষম হই। তবে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের চেম্বারে যেতে বেশ কিছুটা হাঁটতে হবে। মোমেন, মিঠু ও আমার বেগম সাহেবা অবশ্য আগেই পৌঁছে, উক্ত ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করে, আমার জন্যে একটু অপেক্ষা করতে অনুরোধ জানালে তিনি রাজি হন। অবশ্য আমরা কাটায় কাটায় ১০টায় উক্ত চেম্বারে পৌঁছতে সক্ষম হই। ডাক্তার সাহেব খুব আন্তরিকভাবেই আমার ডান হাতের মধ্যম আংগুলের সমস্যাটা বোঝার চেষ্টা করলেন, অনেকেই ইনজেকশনের পরামর্শ দিলেও উনি বেশ আন্তরিকতার সাথে ইনজেকশন ছাড়াই ভাল করা যায় কিনা শেষ পর্যন্ত দেখতে বললেন। একটা জেল দিয়ে আলট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে ফিজিওথ্যারাপি শেষ করতে বললেন। ফিজিওথেরাপি শেষ হলেই দেখা করতে বললেন। ডায়াবেটিসের কারণে ইনজেকশন না দিতে হলে ভাল। আমার হাত ধরে এবং দেখে তিনি কিছুটা সাহসও দিলেন। তিনি বললেন, আপনার হাতে তো বেশ শক্তি আছে, এতে মনেই হয় না যে আপনার 'ট্রিগার ফিংগার' এর সমস্যা আছে। ডাক্তারদের এরূপ আন্তরিক আচরণে অনেক সময় রোগী বিনা ওষুধেও ভাল হয়ে থাকে, স্বস্তিবোধ করে। আমার খুব ভাল লাগল তার আচরণ, যাতে পেশাদারিত্বের সততাসহ রোগীর প্রতি মমত্ববোধের পরিচয় পাওয়া যায়। আমার বেগম সাহেবারও অভিমত হল ইনজেকশন যাতে দিতে না হয়। ডাক্তারের কথায় তার অভিমতটা আরো মজবুত হল। আমরা উনার চেম্বার থেকে বিদায় নিয়ে ফিজিওথেরাপির কাজ সেরে কারাগারে ফিরে এলাম। আজ বৃহস্পতিবার ১৮ই আগস্ট ফিজিওথেরাপি দেয়ার জন্যে মোটামুটি সকাল সকালই রওয়ানা হই। রাস্তা মোটামুটি ফাঁকা থাকায় আরো একটু সকালেই পৌঁছে যাই বারডেমে। প্রতিদিন বারডেমের গেটে পৌঁছেই মিঠুর দেখা পাই। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে মোমেন তার মাসহ পৌঁছে যায়। কিন্তু আজ গেটে মিঠুকে

www.pathagar.com

দেখলাম না, ফিজিওথেরাপির রুমের কাছে নূরুন্নবীকে পেলাম। ফিজিওথেরাপি নেয়ার আগে টাকা জমা দিতে হয়। নিজ খরচে চিকিৎসা, তাই টাকাটা পরিবারের পক্ষ থেকেই দিতে হয়। পরিবারের পক্ষ থেকে বেগম সাহেবা এবং ছেলে কেউ উপস্থিত না থাকায় সমস্যা মনে হচ্ছিল। সাথের ডেপুটি জেলার সাহেব বললেন, সমস্যা নেই আমি দিয়ে দিব। ইতোমধ্যে নূরুন্নবী বলল, 'কত লাগবে, টাকা আছে আমার কাছে'। অতঃপর সেই টাকা জমা দিল। নূরুন্নবী জানালো আমার বেগম সাহেবা এবং ছেলে রওয়ানা করেছে, পথে জ্যামে পড়েছে। বাসায় গাড়ী যেতে দেরী হওয়ায় টাকা দিয়ে নূরুন্নবীকে পাঠানো হয়েছে, সে বাসে করে সময় মত পৌঁছেছে। ফিজিওথেরাপি প্রায় শেষের দিকে হলেও তাদের আসতে না পারায় মনে হচ্ছিল আজকে আর বোধহয় ওদের সাথে দেখা হবে না, বেচারারা কষ্ট করে আসবে অথচ দেখা হবে না ভাবতেই একটু মনটা খারাপ হয়ে আসল। ইতোমধ্যে আমার সাথে থাকা কারারক্ষী বলল, আপনার ছেলে এসে গেছে, একটু পরেই ছেলে, ছেলের মা দুজনই পৌঁছে গেল। আমার দুশ্চিন্তার অবসান হল। ফিজিওথেরাপির কাজ শেষ হওয়ার অল্প একটু আগে হলেও তারা আসায় মনের স্বস্তি ফিরে পেলাম। ক্ষণিকের সাক্ষাৎ এবং কুশল বিনিময়ের পরেই বিদায় নিয়ে রওয়ানা হলাম কেন্দ্রীয় কারাগারের উদ্দেশে।

গতকালই ছিল সাপ্তাহিক সাক্ষাতের নির্ধারিত দিন। ফিজিওথেরাপির জন্যে বৃহস্পতিবারের পরিবর্তে আজ শুক্রবারে সাপ্তাহিক সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হয়। আজকের সাক্ষাতে আমার বেগম সাহেবার সাথে ছেলেমেয়ে এবং মিঠু আসে। বড় মেয়ের ঘরের ছোট নাতনি মানাল এসে বুকের সাথে মাথা লাগিয়ে নানা ভাইয়ের আদর নেয়ার চেষ্টা করে। আমার গ্রেফতারের ফলে এবং কারাগারের কারণে, ছোট এই শিশুটির অনুভূতি থেকেই বুঝতে পারি, পরিবারের লোকদের কত কষ্ট হচ্ছে তাদের মনে, আমার জন্যে। আজ ২০ শে আগস্ট শনিবার সকাল ১০ টার কিছু পরে বারডেম হাসপাতালে রওয়ানা হলাম ফিজিওথেরাপির জন্যে। বারডেমের গেটে পৌঁছেই দেখা হল সদ্য জামিনে মুক্তি পাওয়া ২৬ সেলের অন্যতম সেবক এবং পাহারা বিপ্লবের সাথে। সে আমার পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে জেনেছে আমি কখন বারডেমে যাই, ওখানে দেখা হতে কোন অসুবিধা নেই। এখানে থাকতে সে আন্তরিকভাবে আমার সেবা যত্ন করে গেছে, যা কোন দিনই ভুলতে পারব না। তাকে দেখেই আমার মনে তার প্রতি যে মায়ামমতা লালন করেছি তার প্রকাশ ঘটে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। সত্যি ছেলেটার মায়া ভরা চেহারা আমার মনে অকৃত্রিম মায়ামমতার সৃষ্টি করে, আমি যার সামান্যই প্রকাশ করি। আল্লাহর দরবারে তার সার্বিক মঙ্গল কামনা করে দোয়া করি। আমার পরিবারের লোকদের সাথেও গড়ে উঠেছে তার একটা হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক।

আজ ফিজিওথেরাপিতে বেশি সময় লাগেনি। হাসপাতালে পৌঁছার সাথে সাথেই কাজ সেরে নেয়ার সুযোগ পেয়েছি। দুটি কামরায় আমাকে থেরাপি নিতে হয়। কোথাও আজ অপেক্ষা করতে হয়নি। কোন কোন দিন মিঠু বা নূরুন্নবী আগে আসে অন্যরা পরে। আজ সবাই আগে থেকেই হাসপাতালে হাজির। সকাল ১১টায় পৌঁছে ১২টার আগেই সব সেরে কারাগারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। আজ রবিবার সকাল থেকে রুটিন মাফিক বারডেম হাসপাতালে যাওয়ার অপেক্ষায় কাটল বেশ লম্বা সময়। অবশেষে সকাল ১০-৫০ মিঃ হাসপাতালের উদ্দেশে রওয়ানা করে প্রায় ১১-৩০ টার দিকে সেখানে পৌঁছি। আজও গতকালের মত আমার হাসপাতালে পৌঁছার বেশ আগেই আমার স্ত্রী, ছেলে এবং মিঠু ও নূরুন্নবী হাজির হয়ে যায় হাসপাতালে। পৌঁছা মাত্রই আমার থেরাপির কাজ শুরু হয়ে যায়। প্রায় সাড়ে বারটায় ফিরে আসি আমার বর্তমান ঠিকানায় অর্থাৎ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে।

চিকিৎসা চলার ফাঁকে বেগম সাহেবার সাথে ছেলে মেয়েদের অবস্থা নিয়ে কথাবার্তা চলতে থাকে। আমার বেগম সাহেবা জানে, আমি মনের দিক দিয়ে কতটা নরম মানুষ। তাই প্রতি সাক্ষাতে একান্ত দরদভরা মন নিয়ে সে আমাকে সান্ত্বনা দেয় এবং মনটাকে শক্ত রাখতে তাগিদ দেয়। আজকে তার কথার আন্তরিক দরদের ভাষাটা বেশি ফুটে উঠে। তার প্রকাশ ঘটে অশ্রু ভেজা চোখের মাধ্যমে। তার এই দরদভরা মনের

www.pathagar.com

কথাগুলো অন্তরঙ্গ পরিবেশে আমাকে সব সময়ই অনুপ্রাণিত করে আসছে। আজকেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আল্লাহ ধৈর্যের পরীক্ষায় সফলকাম হবার তৌফিক দিন। এটা যেমন আমার নিজের জন্যে কামনা করি, তেমনি আমার জীবন সঙ্গিনীসহ পরিবারের এবং সংগঠনের সবাইকে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্যে গায়েব থেকে মদদ করুন আমীন।

আমার এবারের জেল জীবনের বড় কষ্টের কারণ শারীরিক অসুস্থতা। পুরাতন লো ব্যাক পেইনের সাথে এবার যুক্ত হয়েছে ডান হাতের মধ্যম আংগুলের গোড়ায় ব্যথা। যে ব্যথার কারণে মাঝে মধ্যেই লেখাপড়া থেকে শুরু করে কোন কাজেই মন বসাতে পারছি না। আজ থেরাপি শেষে ফিজিক্যাল মেডিসিনের ডাক্তারের সাথে দেখা করলাম। তিনি আরো তিনদিন থেরাপি নিতে বললেন, এতেও ব্যথা দূর না হলে ইনজেকশন নিতে পরামর্শ দিলেন। আগামীকাল ২ আগস্ট জন্মাষ্টমীর ছুটি। তাই ২৩, ২৪ ও ২৫ আগস্ট অর্থাৎ মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার পর্যন্ত থেরাপি নেয়ার শেষে আবার দেখা করতে বললেন সর্বশেষ সিদ্ধান্ত জানার জন্যে। কারা হাসপাতালের ডাক্তারের ফরওয়ার্ডিং পেলেই, এটা কার্যকর হবে এ আশা নিয়ে রুমে ফিরে এলাম।

আজ একুশে রমজান। আল্লাহর রাসূল (স.) মসজিদে নববীতে রমজানের শেষ দশ অথবা নয় দিন এতেকাফ করতেন। কদরের রাত তালাশ করার জন্যে এভাবে একুশে রমজানের রাত থেকে শুরু করে ঈদের চাঁদ দেখার ঘোষণা পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করা, সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী, জিকর আজকার ও কোরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকার সর্বোত্তম পন্থা, যা স্বয়ং আল্লাহর রাসূল (স.) নিজে করে আমাদের জন্যে দৃষ্টান্ত হিসাবে রেখে গেছেন।

আমার ছাত্রজীবন থেকেই কদরের রাত পাওয়ার জন্যে, ইতেকাফ অথবা বেজোড় রাতগুলো জাগার অভ্যাস গড়ে উঠে। বড় চাচার সাথে উনার ঈদের জামাতে শরীক হবার জন্যে আমাকে যেতে হত। উনি উক্ত ঈদের জামাতে ইমামতি করতেন, তবে ঈদের বেশ ক'দিন আগেই ঐ গ্রামে যেতেন, ইতেকাফের জন্যে। অবশ্য গ্রাম এলাকায় তখন দেখেছি, ইতেকাফ তিনদিন এমন কি একদিনও করা হত। যারা তিন দিন ইতেকাফ করতেন, তারা ২৬ শে রমজানের বিকেল থেকে (আসর থেকে) শেষ দিন বা ২৯ শে রমজান পর্যন্ত মসজিদে অবস্থান করতেন, কেউ আবার শুধু ২৬ শের দিন শেষে শুরু করে ২৭ শের দিন শেষে বের হতেন। পরবর্তীতে আমার বাস্তব জীবনের এক পর্যায়ে রমজানের শেষ দশকে ইতেকাফের অভ্যাস গড়ে উঠে। ১৯৮০ সন থেকে শুরু করে গত বছর গ্রেফতার হবার আগ পর্যন্ত, প্রায় প্রতি বছরেই ইতেকাফ করে আসছিলাম। সরকারে থাকাকালে দশদিন সম্ভব না হলেও অন্তত ৫ দিন বা ৬ দিন (মাস ৩০ বা ২৯ শে হওয়া সাপেক্ষে) ইতেকাফ করেছি। ঐ পাঁচ বছরের কোন কোন বছর দশ বা নয় দিনের ইতেকাফও করেছি, গত রমজানেও ইতেকাফের এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হই। এবারও একইভাবে ইতেকাফের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবার ব্যথা যে কত বেদনার কত হৃদয়বিদারক তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মনে মনে এটা ভেবেই কিছুটা ব্যথা বেদনার অবসানের চেষ্টা করি যে বন্দী জীবনটাই তো একধরনের ইতেকাফের মতই কাটাচ্ছি। আল্লাহতায়ালা চাইলে আমাদের এই অবস্থানকে ইতেকাফ হিসাবে কবুল করতে পারেন। তবুও আল্লাহর ঘর মসজিদে অবস্থান এবং আল্লাহর ইবাদতে মশগুল বান্দাদের সাহচর্যের তো কোন বিকল্প নেই। আজ হিন্দুদের জন্মাষ্টমীর জন্যে সরকারী ছুটির দিন। তাই ফিজিওথেরাপির জন্যে আজ হাসপাতালেও যাওয়া হচ্ছে না। কারাকর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিলে, আবার আগামীকাল থেকে তিনদিনের জন্যে ফিজিওথেরাপি নেয়ার জন্যে বারডেম হাসপাতালে যাওয়া লাগবে। কারাকর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত এখনও জানা যায়নি। তবে আশা করি তাদের সিদ্ধান্ত ইতিবাচক হবে।

ইতেকাফে আমি যে রুটিন অনুযায়ী মসজিদে কাটাতাম এখানে সেই রুটিন অনুসরণের চেষ্টা করে গতবার সফল হতে পারিনি শরীর অসুস্থ থাকার কারণে। এবছরেও হাতের ব্যথাটার কারণে হাসপাতালে যেতে

www.pathagar.com

হবে চিকিৎসা নিতে; এতে করে ঐ রুটিন অনুসরণে ব্যত্যয় ঘটবে। অতএব মনকে যতই প্রবোধ দেই না কেন, ইতেকাফের সুযোগ হারানোর ব্যথার উপশম সম্ভব নয়। ব্যথাভরা মন নিয়েই কাটাতে হবে রমজানের শেষ দশ অথবা নয়টি দিন। নাজাতের এই অধ্যায় কদরের রাতের এরকম লাভের অধ্যায়ে, আমার মনের কোণে এই ব্যথা লালন করেই কাটাতে হবে। আল্লাহর কাছে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দেয়া ছাড়া বান্দার আর কী করার আছে। আল্লাহর মর্জির প্রতি দ্বিধাহীন সন্তুষ্টি নিয়ে যেন ছবর ও ইস্তেকামাতের সাথে বাকী জীবনটা কাটাতে পারি, আল্লাহর কাছে কাতর কণ্ঠে দিনরাত এই কামনা বাসনা পেশ করে চলেছি। আমার মত দুর্বল মনের বান্দাকে যেন আল্লাহ বড় রকমের কোন পরীক্ষায় না ফেলেন, এজন্যে তারই শিখানো ভাষায় প্রাণ উজাড় করে দোয়াও করছি, প্রায় সারাক্ষণ। আল্লাহ 'কুন ফাইয়াকুনের' মালিক, আরশে আজীমের মালিক, সর্বশক্তিমান, তিনি চাইলে কিনা হতে পারে? তবে তার চাওয়া না চাওয়া, তারই একক এখতিয়ার। তিনি যা চান তাই হবে, তবে তার কাছে প্রাণ উজাড় করে বান্দা তার কামনা বাসনা পেশ করুক এটাও তিনি পছন্দ করেন। আল্লাহর পছন্দের এই কাজটি করার মধ্যেই একটা তৃপ্তি আছে, দোয়া তো স্বয়ং ইবাদত। এটা দুনিয়ায় কবুল হওয়া আমাদের দেখার সুযোগ হতেও পারে নাও হতে পারে। তবে চূড়ান্ত পর্যায়ে আখেরাতে আল্লাহ এর বিনিময় অবশ্যই দিবেন, এই একিন এবং বিশ্বাস আমাদের অবশ্যই থাকতে হবে।

আজ ২২ শে রমজান, ২৩ শে আগস্ট। রুটিন মাফিক সকাল ১০-৩০ টায় আমাকে বারডেমে নেয়ার জন্যে একজন কারারক্ষী এসে তৈরি হতে বলল। আমার ফিজিওথেরাপি আজ ছাড়াও আরো দুদিন লাগবে। এজন্যে কারাহাসপাতালের ডাক্তারের ফরওয়ার্ডিং দরকার হয়। ডেপুটি জেলার যিনি আমাকে বারডেমে নিয়ে যান, তিনি বললেন, আমি যেন নিজেই ডাক্তারদেরকে বলি। বারডেম থেকে ফেরার পথে জেল গেটে ডাক্তারদের কক্ষে একযোগে তিনজন ডাক্তারকে পেয়ে গেলাম। তাদের মধ্যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তারকে বাকী দু'জন ডাক্তার ফরওয়ার্ডিং দেবার জন্যে সম্মতিসূচক অনুরোধ জানালেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত ডাক্তার অবশ্য এব্যাপারে আইজি সাহেবের অনুমতির কথা বললেন। আইজির সাথে কথা বলেই তারা ব্যবস্থা করবেন। আমি তাদেরকে অনুরোধ জানিয়ে আসলাম, আর দুদিন হলে চিকিৎসাটা সম্পূর্ণ হয়, এই দুদিনের জন্যে আমার চিকিৎসাটা অসম্পূর্ণ যেন না থেকে যায়, এজন্যে আপনার ইতিবাচক ভূমিকা রাখবেন, আমি এটাই আশা করব। কাল সকালেই জানা যাবে, দেখি কী হয়।

আজ সাঈদী সাহেবের ট্রাইব্যুনালে চার্জ গঠনের দিন ছিল। আমি বারডেম থেকে ফেরার কিছুপরেই সম্ভবত উনি ফিরে এসেছেন। দেখা হল জোহরের নামাজের সময়। বেচারার বিরুদ্ধে সাড়ে চার হাজার পৃষ্ঠার বানোয়াট রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে, সরকারী আইনজীবীদের পক্ষ থেকে। এর ভিত্তিতে চার্জ গঠন হবে। উনার আইনজীবীদের কাছে ঐ রিপোর্ট দেয়া হয়েছে মাত্র ক'দিন আগে। আইনজীবীদের মাধ্যমে পেয়েছেন মাত্র একদিন আগে, তিনি জানেন না তার বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। এজন্যে সময় চান তার দুই আইনজীবী। প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত সময় না দিয়ে আগামীকালই আবার তারিখ দিয়েছে। তিনি আফসোস করে বললেন, রমজানের শেষ দশকে ইতেকাফে থাকার কথা সেখানে কোর্টে যাওয়া আসায় সময় যাচ্ছে। আর শুনতে হচ্ছে অসংখ্য কল্পকাহিনী, ইতিহাসের জঘন্য মিথ্যাচার। ট্রাইব্যুনাল তো সরকার পক্ষের কথা শুনেন উদারভাবে। তাদের ভুল হলে সাহায্য করেন, অথচ অভিযুক্ত ব্যক্তির উকিলকে কথাই বলতে দেয়া হয় না। ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়া হয়। এখানে কিসের বিচার হবে? বিচারের নামে অবিচার ছাড়া এই ট্রাইব্যুনালের কাছে আর কিছুই আশা করা যায় না। অবশ্য সকল বিচারের উপর বিচারক হিসাবে আছেন আল্লাহ আলেমুল গায়েব, তিনি আহকামুল হাকেমীন। আমরা বিষয়টি তাঁর কাছেই সোপর্দ করেছি। আল্লাহর মেহেরবানী ও ন্যায়বিচার থেকে কোন ঈমানদার মানুষই নিরাশ হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা তাঁর অনুগত মজলুম বান্দাদের জন্যে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছেন- 'জালেম যা কিছু করেছে এ ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে গাফেল মনে করো না।' আল্লাহ তার কুরআনের

www.pathagar.com

একজন একনিষ্ঠ খাদেমের বিরুদ্ধে আনীত এত মিথ্যাচার বরদাশত করবেন, এটা অন্তত আমার মনে হয় না, তবে আল্লাহ অতীতে তার প্রিয় বান্দাদের বিশেষ করে নবী রাসূলদেরও বিপদ আপদ দিয়ে ধৈর্যের পরীক্ষা না নিয়ে ছাড়েননি। হাদিসে রাসূল থেকে জানা যায় 'মানুষের মধ্য থেকে সবচেয়ে বেশি বিপদ আপদ বালা মুছিবতের মুখোমুখি হয়েছেন নবী রাসূলগণ।'

নবী রাসূলের পরে সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে নবী রাসূলদের অনুসরণের দিক দিয়ে যারা যত বেশি অগ্রসর তাদেরকে তত বেশি বিপদ আপদ বালা মুছিবতের মুখোমুখি হবার কথা হাদিসে রাসূলের এই বক্তব্যটি আমাদের মত দুর্বল ঈমানদার লোকদের জন্যে সান্ত্বনা ও শুভসংবাদের বিষয় হিসাবেই গণ্য হতে পারে। আল্লাহর রাসূলের ঘোষণা অনুযায়ী, আল্লাহ যদি তার ঐসব বান্দাদের মধ্যে আমাদেরকে গণ্য করে থাকেন, যারা নবী রাসূলগণের আদর্শ অনুসরণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী, তাহলে সেটা বড়ই সৌভাগ্যের কথা। একজন ঈমানদার মানুষের জন্যে এর চেয়ে বড় চাওয়া পাওয়া আর কী হতে পারে? এমন চিন্তা চেতনা যাদের মনে সদা জাগ্রত তাদের জন্যে দুশ্চিন্তা আর পেরেশানীর তো কোন কারণ থাকার কথা নয়। আল্লাহতায়ালা তার নেয়ামত প্রাপ্ত বান্দা অর্থাৎ নবীয়ীন সিদ্দিকীন এবং শুহাদার তালিকায় আমাদের শামিল করুন, আমাদের নিত্যদিনের প্রার্থনায় বার বার আমরা কামনা করে থাকি। আল্লাহ যেন সেভাবেই আমাদের কবুল করেন। মনের সবটুকু আবেগ দিয়ে আল্লাহর কাছে সেই দোয়াই করি প্রতিনিয়ত, সর্বক্ষণ।

গতকাল ছিল ২২ শে রমজান। ফিজিওথেরাপি দিতে গিয়ে বারডেম হাসপাতালে পৌঁছে, থেরাপি চলা অবস্থায় শুনলাম, আমার ছোট ছেলে তালহা (মালয়েশিয়ায় অধ্যয়নরত) তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে ইতেকাফ করছে। আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়ায় ইসলামী ঐতিহ্যের নিদর্শন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ। আমি ইতেকাফ করতে পারায় ব্যথায় কাতর ছিলাম। আমার বেগম সাহেবার মুখে ছোট ছেলে তালহা ইতেকাফ করছে শুনে সে ব্যথার বেশ কিছুটা উপশম হল। প্রাণখুলে দোয়া করছি, আল্লাহ তার ইতেকাফ কবুল করুন। তাকে দ্বীন ঈমানের উপর মজবুতভাবে কায়েম রাখুন। 'আমাদের পরিবারটাকে আল্লাহ যেন দ্বীনদার মুত্তাকীদের জন্যে অনুসরণীয় অনুকরণীয় হবার তৌফিক দেন।' আল্লাহর পছন্দনীয় এই দোয়াটা আমার হৃদয়ের গভীরে যে আবেগ সৃষ্টি করে তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

আজ বারডেমে গিয়ে শুনলাম, বড় ছেলে তারেক মর্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার স্ত্রী ও দুই মেয়েকে নিয়ে তারাবিহ পড়তে যায়। মেয়ে দুটির বড়টার বয়স ৪ বছর আর ছোটটার ২ বছর। ওরা চেয়ারে বসেই ২০ রাকাত তারাবিহ নামাজ আদায় করে আব্বা আম্মার সাথে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মত পাশ্চাত্য সভ্যতার লীলাভূমিতে পিএইচডি করতে গিয়ে ছেলে দ্বীনের পথ থেকে সরে যায়নি। বরং দেশে যতটা ছিল তার চেয়ে আরও মজবুতভাবে দ্বীনের উপর থাকার চেষ্টা করছে। গোটা পরিবারকে দ্বীনি পরিবার হিসাবে গড়ে তোলায় প্রয়াস পাচ্ছে, এটা শুনে মনে বেশ তৃপ্তি পেলাম। আল্লাহ ওদেরকে আরো বেশি করে দ্বীনের অনুসরণের তৌফিক দিন, আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে সবসময়ই এই দোয়া করি। যেমন দোয়া করি আমার পিতা মাতার জন্যে। দুটো দোয়া আমার কাছে বেশি প্রিয় এবং দুটো দোয়াই আল্লাহর শিখানো দোয়া।

আল্লাহ আমার পিতা মাতার উপর সেই রূপ রহম কর সদয় হও যেভাবে তারা দুজনে আমাকে (তাদের হৃদয়ের সবটুকু ভালবাসা মায়া মমতা দিয়ে) প্রতিপালন করেছেন। অপর দোয়াটি হল -

আল্লাহ আমাদের স্ত্রীদেরকে স্বামীর জন্যে স্বামীকে স্ত্রীর জন্যে এবং তাদের সন্তানদেরকে উভয়ের জন্যে চক্ষু শীতলকারী বানাও। আর মুত্তাকীদের জন্যে আমাদের সবাইকে (স্বামী, স্ত্রী ও সন্তানদেরকে) অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় বানাও।'

জেলে বসেও অনেক দোয়ার মাঝে এ দুটো দোয়া বেশি বেশি করে থাকি। আমার মনে হয় আল্লাহ আমার এই দ্বিতীয় দোয়াটি কবুল করেছেন। পিতা মাতার জন্যে সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত। এই

www.pathagar.com

আমানতের হিফাজত ও সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারাটা খুব সহজ ব্যাপার নয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ মেহেরবানী ছাড়া এটা সম্ভব নয়। তাই আল্লাহর শিখানো ভাষায় দোয়া করলে আল্লাহই তার পক্ষ থেকে প্রদত্ত আমানতের হিফাজত ও সঠিক ব্যবহারের তৌফিক দেবেন, অত্যন্ত দৃঢ় আস্থার সাথেই এটা আশা করা যায়। আমি আমার স্ত্রী এবং ছ'টি ছেলে মেয়ের জন্যে সব সময় এই তৌফিকই কামনা করি।
আমার সন্তানদের শিক্ষা দীক্ষার ব্যাপারে আমার তেমন কোন ভূমিকা রাখার সুযোগ হয়নি। বলতে গেলে আমার সন্তানদের মানুষ করার ক্ষেত্রে এককভাবে ভূমিকা পালন করেছে আমার বেগম সাহেবাই। আমি তার প্রতি এ ব্যাপারে বেশি ঋণী এবং আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। দোয়া করি, তার এই সহযোগিতার জন্যে আল্লাহ যেন তাকে সর্বোত্তম পুরস্কার দান করেন, দুনিয়া ও আখেরাতে উভয় জগতে।
আজ ২৫ শে রমজান শুক্রবার। গত রাতটা গিয়েছে একদিকে শুক্রবারের রাত হিসাবে, সেই সাথে ২৫ শে রমজানের রাত হবার কারণে সম্ভাব্য কদরের রাতও বটে। গতকাল বৃহস্পতিবার ছিল পরিবারের জন্যে নির্ধারিত সাপ্তাহিক সাক্ষাতের দিন। কিন্তু হাসপাতালে যাওয়ার কারণে তার পরিবর্তে আজ পরিবারের লোকদের সঙ্গে দেখা হবার কথা। ঈদুল ফিতরের আগে এটাই শেষ দেখা, এই দিন ২৬ সেলের আরো বেশ কয়েকজনের সাক্ষাতের দিন হওয়ার কারণে অনেকক্ষণ প্রতীক্ষায় থাকতে হয় আমাকে ও পরিবারের লোকদেরকেও। সকাল ১১টা থেকে ১১-৩০ টার মধ্যেই দেখা হবার কথা। কিন্তু কোন কোন দিন বেশ বিলম্ব হয়ে যায়। এই প্রতীক্ষায় মুহূর্তটি কাটে অসহনীয় দুশ্চিন্তা বা অস্থিরতার মধ্যদিয়ে। এটা মানুষের প্রকৃতি এবং সহজাত প্রবৃত্তির অনিবার্য প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সাপ্তাহিক সাক্ষাতের নির্ধারিত সময় আধাঘণ্টা। সপ্তাহ কাটে এই একটি মুহূর্তের প্রতীক্ষায়। কিন্তু সাক্ষাতের আধাঘণ্টা সময় মনে হয় যেন খুব তাড়াতড়িই শেষ হয়ে যায়। মনে মনে চিন্তা করে যাওয়া অনেক কথা বলা হয় না তাদের সাথে। জুমআর দিন হবার কারণে উভয়পক্ষের জন্যেই সাক্ষাতের সময়টি বিলম্বিত হলে অসুবিধা হয়। সাক্ষাৎপ্রার্থীদেরকে ফিরে গিয়ে নামাজ আদায় করতে হবে। এটা কখনও কখনও সম্ভব নাও হতে পারে। বন্দীদের জন্যে জুমআ ওয়াজিব না হলেও আমরা যেহেতু জুমআ আদায় করে আসছি, তাই আমাদেরও বেশ অসুবিধায় পড়তে হয় সাক্ষাত বিলম্বিত হলে। আজকের সাক্ষাতের স্লিপটা কখন হাতে আসবে সেই আশায় অপেক্ষা করছি সকাল ৯টা ৯-৩০ টা থেকেই। কারাগারে বন্দী না থাকলে আজকের এই মুহূর্তটি কাটত মসজিদে ইতেকাফে। সেখানে কারও সাক্ষাতের জন্যে প্রত্যাশা বা প্রতীক্ষা না করে, আল্লাহর ইবাদতে বন্দেগী ও তেলাওয়াতে কোরআনের মাধ্যমেই সময়টা কেটে যেতো। পরিবারের কারো সাথে দেখা হলে তা হত কেবলমাত্র ইফতারের মুহূর্তেই। ইতেকাফ করতে না পারার ব্যথা এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাতের প্রতীক্ষার এই মুহূর্তটি আমার জন্যে খুবই আবেগের মুহূর্ত। যাদের সাথে জীবনের এবং দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডের সিংহভাগ সময় কাটত যাদের সাথে, তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ মত বিনিময়ের কোন সুযোগই হয়নি গত চৌদ্দ মাসে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এই সুযোগ আবার কবে আসবে, এই চিন্তাও মাঝে মধ্যে মনকে বেশ উতলা করে তুলে। গত বছরের দুটো ঈদই কেটেছে জেলখানায়, এবারেও ঈদুল ফিতরের দিন এসে গেছে দ্বারপ্রান্তে। জানি না ঈদুল আজহা কি এখানেই কাটবে? এক্ষেত্রে আল্লাহর মর্জি মেনে নেয়ার মধ্যে মুমিনের কল্যাণ নিহিত।
ঠিক ১১-৩০ টার দিকে সাক্ষাতের স্লিপ আসল। আমিতো আগে থেকে তৈরি হয়ে বসেছিলাম। তাই স্লিপ আসার সাথে সাথেই বহু প্রতীক্ষিত সাক্ষাতের জন্যে জেলগেটের দিকে রওনা হই। সাক্ষাতের নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে অবশ্য বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। কারণ গেটে বেশ ভীড়। ঈদের আগে জামিনে অনেক বন্দী মুক্তি পাচ্ছে। এ কারণে আমার সাক্ষাৎ প্রার্থীদের গেটে পার হয়ে আসতে একটু সময় লেগে গেল। তার উপরে মালপত্রের চেকিং এর ঝামেলাটাও নেহায়েৎ কম নয়। যাক অবশেষে আমার বেগম সাহেবার সাথে বড় মেয়ে ও বড় জামাই, মেঝ ছেলে ও ভাতিজা মিঠু এসে হাজির হল। বড় জামাই এল বেশ কিছুদিন পরে। তার কাছেই শুনলাম, আমাদের সহকর্মী স্বনামধন্য সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মাওলানা

www.pathagar.com

আব্দুল মান্নান তালিব সাহেব অসুস্থ। তার চিকিৎসার ব্যাপারটি নিয়ে তারা দুশ্চিন্তায় আছে। আমাকে তার জন্যে দোয়া করতে বলল। ইতঃপূর্বে কবি মতিউর রহমান অল্প বয়সে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। আব্দুল মান্নান তালিব সাহেবের অসুস্থতার কথা শুনে মনটা যেন কেমন করে উঠল; দ্বীনের একজন একনিষ্ঠ খাদেমের এই দুঃসময়ে তাকে একনজর দেখার সুযোগ নেই আমার।

আজ ২৬ শে রমজান। আর ক'দিন পরেই আসছে ঈদুল ফিতর। গত বছর, দুটো ঈদই গেছে এই কারান্তরালে। এ বছরের দুটো ঈদের একটা এসেই গেছে। জানি না ঈদুল আজহার সময় আল্লাহতায়ালা কোথায় রাখবেন। গতকাল সাক্ষাতের সময় আমার বেগম সাহেবা বার বার জানতে চাইল, ঈদের দিন কী পাঠাবে। আসলে তাদের মনের অবস্থা তো আমার চেয়েও বেশি ব্যথা বেদনা এবং অস্থিরতায় ভরা, তারই কিঞ্চিৎ আভাস ইঙ্গিত বোঝা যায় কী আনবে, কী খাওয়াবে, এমন কথা বার্তা থেকে। আমার বড় মেয়ে একটা পাঞ্জাবী নিয়ে এসেছিল, ঈদকে সামনে রেখে। আমি বললাম, আমি তো কোন ঈদেই নতুন জামা কাপড় ব্যবহারে অভ্যস্থ নই। মেয়ে জামাই এবং তার সাথে আমার বেগম সাহেবা এবং ছেলে তাদের সাথে মিলিয়ে বলল, না, এটা আমাদের মনের চাহিদা আপনি ঈদের দিন এটা পরবেন। তাদের আবেগের দিকে লক্ষ্য করে সম্মতি দিতে বাধ্য হলাম। ঈদের দিন ওরা দেখা করতে আসলে, তখন মোহসিনার দেয়া পাঞ্জাবীটা পরে দেখা করতে যাব বলে মনে মনে সিদ্ধান্ত নেই। পরিবারের সাথে এবারের দেখাটা যেন অন্যসব দিনের সাক্ষাতের তুলনায় অনেকটাই ব্যতিক্রম। কাল দুপুর ১২-৩০ টায় সাক্ষাৎ শেষে রুমে ফিরে এসেছি। কিন্তু সাক্ষাতের প্রভাব প্রতিক্রিয়া মনের উপর ঠিক সাক্ষাতের মুহূর্তে যেমন ছিল তেমনটিই আছে। মোহসিনার ছোট মেয়ে মানাল অন্যদিনের মতই নিজেই কাছে এসে বসে এবং এক পর্যায়ে মাথাটা আমার বুকের উপর দিয়ে, আমার অন্তরকে জানান দেবার চেষ্টা করে, সে তার নানা ভাইকে কতটা ভালবাসে। বাসায় থাকতেও সে মাঝে মধ্যে এসে বুকের উপর মাথা রেখে শুয়ে থাকত। আর ফিরে গিয়ে তার মাকে বলতো নানা ভাইয়ের আদর খেয়ে আসছি। এই অবুঝ শিশুর মনেও আমার জেলে অবস্থান এবং তাদের থেকে অনুপস্থিতির অনুভূতি কত যে তীব্র তার চোখ মুখের দিকে তাকালেই তা বুঝা যায়। আল্লাহ এদের সহায়, এদের উত্তম অভিভাবক। তিনি যেদিন চাইবেন সেই দিনই তাদের কাছে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে। আল্লাহর দরবারে এতটুকু ফরিয়াদই জানাই, আল্লাহ, তুমি এই অবুঝ শিশুদের আবেগ অনুভূতির দিকে তাকিয়ে আমাদের অনুকূলে ফায়সালা কর।

আজকের দিন শেষে আসছে মহামহিমান্বিত কদরের রাত। রাতটা ভাল ভাবে জেগে কাটানোর আশায় দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু না একটুও ঘুম হল না। দুপুর ১২টা থেকে নিয়ে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ঘুমানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে অবশেষে কলম হাতে নিলাম। আজ মনটা কেন যেন খুব বেশি ছটফট করছে। জেলখানায় এক বছর দুই মাস অতীতের পথে। আজকের মত মনের অস্থিরতা কোন দিনই অনুভব করিনি। ঈদুল ফিতরের দিন যত এগিয়ে আসছে মনটা ততই যেন অস্থির হয়ে উঠছে। এমন অস্থিরতার কারণে আমার নিজেরও বুঝে আসছে না। আল্লাহর দরবারে দোয়ার মুহূর্তে সব সময়ই তার করুণা প্রার্থনার সাথে সাথে ছবর ও ইস্তেকামাতের জন্যেও দোয়া করে থাকি। আল্লাহ যখন যে অবস্থায় রাখেন, সেই অবস্থায় মনটাকে সন্তুষ্ট রাখতে আন্তরিকভাবেই আমি চেষ্টা করে অভ্যস্ত। কিন্তু তারপরও আমি একজন দুর্বল মনের মানুষ হিসাবে অনেক সময়ই যেভাবে চাই সেভাবে ধৈর্য ধারণে সক্ষম হতে পারি না। আজকের দিনটাতে আমি যেন ধৈর্য ধারণে সেভাবে সক্ষম হতে পারছি না।

সারা দিনে একটুও ঘুম না হওয়ায়, কদরের রাতটা যেভাবে কাটাতে চেয়েছিলাম, সেভাবে পারব কিনা এখন মাথায় চেপে বসেছে সেই দুশ্চিন্তা। আল্লাহ যেন কদরের রাতের খায়ের ও বরকত থেকে আমাকে বঞ্চিত না করেন, এজন্যে তো দোয়া শুরু করেছি ২১ শে রমজান থেকেই। আল্লাহ কবুল করা না করার মালিক, ছোট্ট একটি মুহূর্তের ইবাদতও আল্লাহ কবুল করলে অনেক হতভাগা দুর্ভাগা মানুষের ভাগ্য খুলে যেতে পারে।

www.pathagar.com

মাহে রমজান আল কুরআন নাজিলের উৎসবের মাস। এই উৎসবের প্রকাশ ঘটে সামষ্টিক ইফতারের মুহূর্তে। জেল জীবনে দুটি রমজান কেটে গেল, সেই উৎসব থেকে আমি বঞ্চিত। এই উৎসবের আরো প্রকাশ ঘটে মসজিদে তারাবিহ ও কিয়ামুল্লাইলের মাধ্যমে। সেই উৎসব থেকে আমরা বঞ্চিত রয়ে গেলাম জেল জীবনের দুটি রমজান মাসে। একইভাবে বঞ্চিত থাকতে হবে ঈদ উৎসব থেকে। হয়তবা এই চিন্তারই প্রতিফলন ঘটছে আমার মনের অস্থিরতার মধ্য দিয়ে। উৎসব থেকে বঞ্চিত থাকলেও, আল্লাহ রমজানের মাসে তার পক্ষ থেকে রহমত মাগফিরাত এবং নাজাতের নিয়ামত থেকে যেন বঞ্চিত না করেন, প্রাণ উজাড় করে এই দোয়াই করছি বার বার। ২৭ শের রাতটা মোটামুটি ভালই কাটল। আল্লাহর কাছে যেন এর চেয়েও ভালভাবে গৃহীত হয়, মনে প্রাণে সেই দোয়াই করছি। ২৬ শে রমজানে দিনের বেলায় মনের অস্থিরতার সাথে যোগ হয়েছিল শারীরিক অসুবিধার দিকটাও। রাত্রি জাগরণের প্রস্তুতি স্বরূপ দিনের বেলায় একটু ঘুমিয়ে নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তিনবার ঘুমাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হই। জনাব সাঈদী সাহেব সবাইকে অনুরোধ করেছিলেন এই রাতে যেন কেউ বিছানায় পিঠ না লাগাই। রাতের খাবারের সময় আমি উনাকে বললাম, আমার দিনের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও ঘুম হল না। একটানা রাত জাগা সম্ভব হবে কিনা আল্লাহই ভাল জানেন। আমাকে মাঝখানে দেড় দু'ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে হবে। তারাবিহ ও খাওয়া শেষে যার যার রুমে ব্যক্তিগত ভাবে ইবাদত ও তেলাওয়াত করার কথা। আর পৌণে একটায় বারান্দায় নামাজের জায়গায় একত্রিত হয়ে সামষ্টিকভাবে কিয়ামুল্লাইলের নামাজ আদায় করার কথা। আমি রাতের খাবার শেষে রুমে ঢুকেই কিছুক্ষণ তেলাওয়াত করে ১০-৩০ টার দিকে শুয়ে যাই। ঘড়িতে পৌণে একটায় এলার্ম দিয়ে থাকি যাতে রুটিন মাফিক সামষ্টিক ইবাদতে শরীক হতে পারি।

অল্প সময়ের তুলনায় আজ রাত ১০-৩০ থেকে ১২-৪০ টা পর্যন্ত এই সংক্ষিপ্ত সময়ে ঘুমটা খুব ভাল হয়। ১২-৪০ মিনিটের সময় সাঈদী সাহেব এসে উনার বিশেষ কায়দায় আমাকে ডেকে বললেন এখন ১২-৪০ মিঃ বাজে। আমি সাথে সাথে বিছানা থেকে উঠে ইস্তেঞ্জা ও অজু সেরে নির্দিষ্ট নামাজের স্থানে গিয়ে হাজির হই। কিয়ামুল্লাইল ও বেতের নামাজ শেষে মাওলানা সাঈদী সাহেব তার স্বভাবসুলভ আবেগজড়িত কণ্ঠে আমাদের সবাইকে নিয়ে দোয়া করলেন। সবাই প্রাণ উজাড় করে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে তার সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আমিন আমিন বলে লাইলাতুল কদরের খায়ের ও বরকত হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে। এভাবেই কাটে আমাদের কারাবদ্ধ জীবনের দ্বিতীয় ২৭ শে রমজানের রাতটি। বাইরে মসজিদে ইতেকাফ অবস্থার রম রমা পরিবেশ এখানে অনুপস্থিত থাকলেও মনের আবেগ অনুভূতি সবারই ছিল বেশ তুঙ্গে। আল্লাহ সকলের হৃদয়ের কান্না অন্তরের ফরিয়াদ অবশ্যই শুনেছেন। আশা করি তিনি এমন আবেগময় পরিবেশের দোয়া মুনাজাতও অবশ্যই কবুল করবেন, ফিরিয়ে দেবেন না।

আজ ২৮ শে আগস্ট ১৭ শে রমজান। গত রাত্রি জাগরণের পর আজ দিনে একটি বেশি সময় নিয়ে ঘুমানোর চিন্তা করেছিলাম। কিন্তু কালকের মত আজকেও মনের কোণে কেমন যেন একটা অস্থির অস্থির ভাবের ছাপ লক্ষ্য করছি। কিন্তু ঘুমোতে পারছি না। কালকের অস্থিরতার কোন বাহ্যিক কারণই ছিল না। কিন্তু আজ পত্রিকায় দেখলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বিমান বন্দর বন্ধ ঘোষণা হয়েছে, প্রবল ঘূর্ণিঝড় হ্যারিকেনের কারণে। নিউজার্সির নিউইয়র্ক বিমান বন্দরও বন্ধ হয়েছে একই কারণে। আমার বড় ছেলে নকীবুর রহমান তারেক আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিউঅরলিন্সে। এ জায়গাটাও ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকা কোস্টাল বেল্টের ৭টি অংগ রাজ্যের উপর দিয়েই এ ঘূর্ণিঝড় বয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে পত্রপত্রিকায়। নিউঅরলিন্সের কথা অবশ্য কোথাও উল্লেখ দেখিনি। তার পরও দুশ্চিন্তা মুক্ত হতে পারছি না। আমার ছেলে, ছেলের বউ ও দুটি মেয়ে এবং বৌমার ভাইটাও ওখানে আছে ওদের সাথে। ওরা কি নিরাপদে আছে, না কোন বিপদে পড়েছে, জানার জন্যে মনটা বেশ উতলা হয়ে উঠে।

ঈদের দিন ছাড়া আর তাদের সম্পর্কে কিছু জানার কোনই সুযোগ নেই। ঈদ বুধবারে হলে বুধবারে, নতুবা বৃহস্পতিবারে পরিবারের সদস্যরা আসবে। তখনই জানা যাবে ওরা কেমন ছিল ঘূর্ণিঝড়ের মুহূর্তে,

www.pathagar.com

আর এখন কেমন আছে। জেল জীবনের অন্যতম বড় সমস্যা হল, কোন সাংঘাতিক জরুরি বিষয়ও যখন তখন ইচ্ছা করলেই জানার উপায় নেই। আমার বড় ছেলে ও তার স্ত্রী কন্যাদের অবস্থা এখন কেমন কোন পর্যায়ে, এটা জানার জন্যে আমাকে আসছে ঈদের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এছাড়া আর কোন উপায়ই খোলা নেই।

আমার কালকের অস্থিরতার কারণ ছিল সম্পূর্ণ অজানা। কিন্তু আজ ছেলের এবং ছেলে বউ বাচ্চাদের নিয়ে সৃষ্ট দুশ্চিন্তার কখন যে অবসান হবে, আল্লাহই ভাল জানেন। ছেলেরা কেউ বাইরে থাকুক আমার এটা কেন যেন পছন্দ হয় না। মাঝে মধ্যে কোন দুঃসংবাদ শুনলে তাই আমার একটু বেশিই খারাপ লাগে। চার ছেলের তিনজনই এখন দেশের বাইরে। দুই মেয়ের ছোটটাও বাইরে। এই কিছুদিন আগে লন্ডনে দাঙ্গার ফলেও দুশ্চিন্তায় পড়েছিলাম ওখানে ছোট মেয়ে থাকার কারণে। পরে অবশ্য আল্লাহর ফজলে দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়েছি, তাদের কোন অসুবিধা হয়নি, এটা জেনে। এ ব্যাপারেও আশা করি, ঈদের দিন ভাল সংবাদই পাব। তার পরও ঐদিন পর্যন্ত নিজেকে দুশ্চিন্তামুক্ত রাখা সম্ভব হচ্ছে না আমার পক্ষে।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে প্রতীক্ষার মুহূর্তটি খুবই বড় মনে হয়ে থাকে। আজ ২৭ শে রমজান। রোজা ৩০টি হলে, আজ ছাড়া আরো ৩ দিন অপেক্ষা করতে হবে, তারেকের খবর পাওয়ার জন্যে। তারেক আমার সন্তানদের মধ্যে দ্বিতীয়, আর ছেলেদের মধ্যে বড়। বড় ছেলে হবার কারণে তার প্রতি আশাও অনেক। তাকে কেন্দ্র করে তাই মনের আবেগও একটু বেশি থাকাই স্বাভাবিক। আমি আন্তরিকভাবেই চাচ্ছি, পিএইচডি হয়ে গেলেই সে দেশে আসুক। আমার কারাবাসের সময়, বাসায় শুধু আমার স্ত্রী এবং মেঝ ছেলে পরিস্থিতি সামাল দিতে বেশ হিমশিম খাচ্ছে। ছেলের এই মুহূর্তে ওদের পাশে দাঁড়ানোর জন্যে আসতে চাইলেও আমিই বারণ করেছি; বলেছি, আমার কারণে যেন কোন ছেলে বা মেয়ের ক্যারিয়ার নষ্ট না হয়। এ ব্যাপারে আমার বেগম সাহেবাকে শক্তভাবে ছেলে মেয়েদের গাইড করতে বলে দিয়েছি।

আজ আটাশে রমজান। রোজা ২৯ টা হলে কালকের দিনের পরেই আসছে বহু আকাঙ্ক্ষিত ঈদুল ফিতর। মনের একান্তে কামনা বাসনা ছিল ঈদটা যেন মুক্ত পরিবেশে করার সুযোগ হয়। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে, এবারের ঈদটা হতে যাচ্ছে আমাদের কারাবদ্ধ ভাবেই। মাসব্যাপী রোজা পালনের ক্ষেত্রে, আল্লাহর হুকুম পালন করতে পারাটা একটা বড় রকমের সাফল্য, এই হুকুম পালন যেখানে থেকেই করি না কেন। এটা খুশির বিষয়, অবশ্যই যে মাহে রমজানে পবিত্র কোরআন নাজিলের মাসে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নেয়ামত কোরআনের শুকরিয়া আদায়ের জন্যে রোজা আল্লাহ ফরজ করেছেন। আল কোরআনের হেদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠা লাভের প্রধান অবলম্বন যে তাকওয়া, সেই তাকওয়া অর্জনের অনুশীলনীতে শরিক হবার আল্লাহ সুযোগ দিয়েছেন, এটা নিঃসন্দেহে খুশির বিষয় এবং আনন্দের বিষয়। এতে তো কোন সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই। এই খুশির মুহূর্তে দেশের জনগণ, সংগঠনের সাথী সঙ্গীগণ এবং আত্মীয় পরিজন কাছে নেই এটা ভিন্ন কথা। তাদের পাশে না পাওয়ার ব্যথা বেদনার অনুভূতি মনকে ব্যাকুল করবে এটাও স্বাভাবিক। তারপরও রমজানের রোজা পালনের সক্ষম হবার পর, আল্লাহর নির্ধারিত পদ্ধতি অনুযায়ী তারই শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দেয়া, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উদ্দেশে দু'রাকাত নামাজ আদায় করার মধ্যে যে আনন্দ আছে, আত্মীয়-স্বজনদের অনুপস্থিতির ব্যথা বেদনা সত্ত্বেও এর জন্যে আল্লাহর শুকরিয়া তো জানাতেই হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোস্টাল বেল্টের কয়েকটি অঞ্চলে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের খবরে আমি গত পরশু থেকে বেশ উদ্বেগের মধ্যে কাটাচ্ছি। আমার ছেলে, ছেলের বউ ও তাদের দুটি মেয়ে এই সময় কোথায় কেমন ছিল, জানার জন্যে মনটা খুবই অস্থির হয়ে উঠছিল। গতকাল সোমবার ২৯ শে আগস্ট ছিল মাওলানা মুহতারাম সাঈদী সাহেবের পারিবারিক সাক্ষাতের দিন। উনার এক ছেলের নামে নাম একজন ডেপুটি জেলারের। তার সাথে উনার ছেলের বেশ খাতিরও আছে। আমি আশা করেছিলাম, সে বাসার সাথে

www.pathagar.com

যোগাযোগ করে খবরটা জেনে তার বন্ধুর মাধ্যমে আমাদেরকে জানানোর ব্যবস্থা করবে। কিন্তু কালকের দিন ও রাত পার হয়ে গেল, আজ ৩০ শে আগস্ট মঙ্গলবার, এখন পর্যন্ত জানার সুযোগ হল না তারেক কেমন আছে, কেমন আছে তার স্ত্রী ও কচি কচি দুটো মেয়ে। একটা রেওয়াজ সাধারণত খারাপ খবর হলে সহজে খবরটা দেয়া হয় না। সাঈদী সাহেবের ছেলেকে বাসার থেকে খবর নিয়ে জানানোর দায়িত্ব দেয়ার পরও কোন খবর না আসায় আমার দুশ্চিন্তা আরো কয়েক মাত্রা বৃদ্ধি পেল। আগামীকাল যদি ঈদ হয়, তাহলে কালকের সাক্ষাতের মুহূর্তে, আর কাল না হয়ে যদি পরের দিন ঈদ হয়, তাহলে আজ সহ আরো দুদিন দুশ্চিন্তার বোঝা মাথায় নিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। আমি আশা করেছিলাম, সাঈদী সাহেবের ছেলের মাধ্যমে সে তাদের বিশেষ চ্যানেলে খবরটা কাল বিকেলের মধ্যে (২৯/০৮/১১) পেয়ে যাব। কিন্তু তা আর হল না। ফলে মনের অস্থিরতা আরো বৃদ্ধি পেল। দু'একজন যাদেরকে বিষয়টা বলে মনকে একটু হালকা করার চেষ্টা করেছি, তাদের সবাই সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আল্লাহর মর্জি সবাই ভালই আছে, বিবিসির বাংলা অনুষ্ঠানে বলা হয়েছে, ওখানে কোন বাংলাদেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবার খবর পাওয়া যায়নি। আমিও আল্লাহর উপর ভরসা করে ভালই আশা করছি। তারপরও নিশ্চিত খবরটা না পাওয়া পর্যন্ত মনকে প্রবোধ দিতে পারছি না। আল্লাহ আমাকে ছয়টি ছেলে মেয়ে দিয়েছেন। প্রত্যেকেরই আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। তারেক বড় ছেলে হিসাবে মোটামুটি একটা ভাল একাডেমিক ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। পিএইচডিটা হয়ে গেলে তার ক্যারিয়ার গঠনের একটা পর্যায় শেষ হয়। স্টাডি লিভ নিয়ে পিএইচডির জন্যে আমেরিকায় যাওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে ফুল টাইম এবং ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে পার্ট টাইম শিক্ষকতা করছিল। পিএইচডি হয়ে গেলে নর্থ সাউথেই ভাল বেতনে চাকরি করতে পারবে। তাই সে তাড়াতাড়ি চলে আসুক এটাই আমি চাচ্ছিলাম। তার থিসিসের বোর্ডের আলোচনা শেষে ডিগ্রী প্রদান পর্ব একটু বিলম্ব হচ্ছে গ্রীষ্মকালীন ছুটির কারণে। সেপ্টেম্বরে এটা শেষ হবে আশা করা যায়। এখানকার রাজনৈতিক প্রতিকূলতার কারণে অনেকেই পরামর্শ দেন, এখন ও দেশে না আসুক বরং কিছু দিন ওখানে থেকে আসুক। আমিও কিছুটা নিম রাজি ছিলাম। কিন্তু এই ঘূর্ণিঝড়ের ঘটনার পর, আর মন চাচ্ছে না, ও ওখানে থাকুক। আমি দোয়া করছি, সহিসালামতে পিএইচডি ডিগ্রীটা নিয়ে ও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশে চলে আসুক। আমার কারাজীবন কতটা দীর্ঘ হবে, তা আল্লাহ ছাড়া কারো জানা নেই। এই মুহূর্তে আমার বেগম সাহেবার পাশে শুধু মোমেন একা। সেও ৮ বছর ছিল দেশের বাইরে। এখন আমাদের এই প্রতিকূলতার মধ্যেই তাকে ব্যারিস্টার হয়ে সুপ্রিম কোর্টে প্রাকটিসের জন্যে প্রস্তুতি হিসাবে নানা আনুষ্ঠানিকতা সারতে হচ্ছে। সেই সাথে আমার জন্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম দৌড়াদৌড়ি তার জন্যে একটা বাড়তি চাপ। বাকি তিন ভাইয়ের অন্তত কেউ একজন তার সাথে শেয়ার করলে তার জন্যেও একটু এহসান হত। খালেদ তো তার স্ত্রীর উচ্চ শিক্ষার জন্যে স্ত্রীর ডিপেন্ডেন্ট ভিসায় গিয়েছিল, বৌমার পড়া শেষ হওয়ার আগেতো আসতে পারছে না। তারেক যেহেতু থিসিস জমা দিয়েছে, এখন বোর্ডের অনুমোদন হলেই ও আসতে পারে। সেই আশায় দিন গুণছি। ইতোমধ্যে ডূর্ণিঝড়ের ফলে ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো বুঝতে না পারার কারণেই পেরেশানীটা বেশি হচ্ছে। এখন আমার জানার একমাত্র বিষয় সে এবং তার স্ত্রী ও সন্তানেরা মিলে সবাই সহিসালামতে আছে, না কি ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে বিপদগ্রস্ত হয়েছে? এব্যাপারে প্রকৃত সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত মনটাকে প্রবোধ দিতে পারছি না, শান্ত করতে পারছি না। সবাই জানে, ছেলে মেয়ের শিক্ষা দীক্ষায় আমার তেমন কোন ভূমিকা নেই, ওরা ওদের মায়ের আন্তরিক যত্নে এবং নিজেদের মেধা বলে সর্বোপরি আল্লাহর বিশেষ রহমতে যতদূর এগুনোর এগিয়েছে। তারপর তাদের নিরাপত্তা এবং সুবিধা-অসুবিধার ব্যাপারে আমি প্রায়ই বেশ অস্থিরতার শিকার হয়ে থাকি। এটা আমার দুর্বলতা অথবা আল্লাহ প্রদত্ত হৃদয়ের কোমলতা এবং সংবেদনশীলতারই স্বাভাবিক প্রকাশ। এর উপর আমার কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা নেই। সাধারণভাবে মানুষের প্রতি বিশেষভাবে নিকটজন তথা পরিবার-পরিজনের সদস্যদের প্রতি, স্ত্রী পুত্র কন্যাসহ সন্তানদের

www.pathagar.com

প্রতি এবং অন্যান্য নিকটতম আপনজনদের প্রতি মায়া মমতার বহিঃপ্রকাশ তো আল্লাহরই দান, তাঁরই রহমতের কিঞ্চিত প্রকাশ পাত্র। এটাকে আমি ঈমানী দুর্বলতার লক্ষণ মনে করি না। অবশেষে আমার মনের অবস্থা অনুধাবন করে আমার একসময়ের শিল্প মন্ত্রণালয়ের সহকর্মী আব্দুস সালাম পিন্টু তার নিজস্ব চ্যানেলে, একজনের মাধ্যমে আমার বাসায় যোগাযোগ করে জানিয়ে যায়, যে আমার ছেলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যেখানে আছে ওখানে কোন অসুবিধা হয় নাই। ওরা সবাই ভাল আছে, আলহামদুল্লিাহ। আমার প্রেসার দেখার জন্যে যে ফার্মাসিস্ট এসেছিল তাকেও আমার দুশ্চিন্তার কথাটা জানিয়েছিলাম। সে বিকেলে এসে জানিয়ে গেল তার পক্ষে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় নাই। সে আপনা থেকেই আবার দায়িত্ব নিয়ে গেল বাসার টিএন্ডটি ফোনে যোগাযোগ করবে। খবর খারাপ হলে সে আসবে, ভাল হলে আসবে না অর্থাৎ রাতে যদি সে দেখা করতে না আসে তাহলে মনে করতে হবে ওরা ভালই আছে। তার কথা অনুযায়ী সে আর সন্ধ্যা বেলায় বা রাতে দেখা করতে আসেনি। ইতোমধ্যেই পিন্টু সাহেবের মাধ্যমে জেনেছি ওরা ভাল আছে। অতএব ঈদের পূর্ব রাতটা মোটামুটি দুশ্চিন্তা মুক্ত মনে সাধ্যমত আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী ও তেলাওয়াতে কোরআনের পর অল্প সময়ের জন্যে হলেও ভাল ভাবেই ঘুমিয়েছিলাম। ঈদের পরপরই পরিবারের লোকেরা আসতে প্রস্তুত, খবর পাওয়ার আশায় অপেক্ষমাণ থাকলাম। এবারে ঈদের সাক্ষাতে আমার পরিবারের লোকদের আসার একই সময়ে ২৬ সেলের আর একজনের সাক্ষাতের স্লিপ আসে। আমাদের সাক্ষাতের স্থলে একটা মাত্র স্ট্যান্ড ফ্যানের ব্যবস্থা আছে। ভাদ্র মাসের প্রচণ্ড গরমের দিনে আমাকে যেখানে বসতে হল ওখানে রৌদ্রের তাপ সরাসরি অনুভব করছিলাম। ভুল করে আমার পাতলা সুতি পাঞ্জাবী না পরে, আমার বড় মেয়ের দেয়া পাঞ্জাবীটাই পরে গিয়েছিলাম। ওটাও সুতি কিন্তু একটু মোটা এবং আনকোড়া নতুন হওয়ার কারণে পুরাতন জামার তুলনায় একটু গরমও বেশি। যাইহোক ঈদের দিন কারাবন্দী অবস্থায় মনের কোণে জমে থাকা অব্যক্ত ব্যথা বেদনার মাঝে পরিবারের সদস্যদের সাথে মিলিত হওয়া, মরুভূমিতে মরুদ্যানের দেখা পাওয়ার শামিল। তাই গরমের কষ্টের কথা তেমন মনেই হয়নি।

আজকের সাক্ষাতের প্রথম জানার বিষয় ছিল তারেক কেমন আছে, ওরা কবে কিভাবে ঈদ করছে। ওদের সাধারণত সৌদি আরবের সাথে ঈদ হবার কথা। কিন্তু এবার নাকি আমাদেরও একদিন পরে হচ্ছে। তারেকের মেয়েদের কোরআনের প্রতি আকর্ষণও আগ্রহের কথা শুনে সত্যি আল্লাহর শুকরিয়ায় মাথানত হয়ে আসে।

সাক্ষাৎ চলাকালে হঠাৎ গেট সার্জেন্ট এসে বলল, আপনাদের সময় শেষ এখন উঠতে হবে। অথচ আমাদের পাশে যিনি সাক্ষাৎ দিচ্ছেন তিনি আমার চেয়ে ১০ মিনিট আগে সাক্ষাত দেয়া শুরু করেছেন। আমি একটু বিব্রতকর অবস্থা সত্ত্বেও বলতে বাধ্য হলাম, আমি তো উনার দশ মিনিট পরে এসেছি আমাকে আগে উঠতে বলছেন কেন? বেচারা আমার এ ধরনের কথায় একটু অপ্রস্তুত হল এবং আমার পাশের সাক্ষাৎ প্রার্থীদেরকে সময় শেষের সংকেত দেয়ায় তারা উঠে বিদায় নিলেন। অল্প সময়ের জন্যে হলেও আমরা ঐ পাখার জায়গায় গিয়ে বসলাম। আমাদের পাশের উনারা বিদায় নেয়ার পরে আমি গেট সার্জেন্টকে ডেকে বললাম, আমি এলাম পরে, আমাকে আগে উঠতে বলা হল কেন? বেচারা হাত জোর করে মাফ চাইল। তারপর থেকে আর সময় শেষের সংকেত দেয়নি, আমরা স্বেচ্ছায় সাক্ষাৎ শেষ করে বিদায় নিয়ে ২৬ সেলে ফিরে আসি। এখানে এই প্রবাদ বাক্যটি যথার্থ প্রমাণ হল, 'দুনিয়া শক্তের ভক্ত নরমের যম'।

ঈদের দিনের বিশেষ সাক্ষাৎ ছাড়াও এবার মাত্র মাঝখানে একদিনের ব্যবধানে শুক্রবারে আবার পরিবারের লোকদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হয়। এদিন একই সময়ে একই স্থানে তিনটি পরিবারের সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়। পাখার জায়গাটিতে প্রথমে অন্য একজনের পরিবারের লোকেরা বসার সুযোগ পেলো। আমি পৌঁছার সাথে সাথে তারা আমার জন্যে জায়গাটি ছেড়ে দেয়ায়, পাখার বাতাসের বাড়তি

www.pathagar.com

সুযোগটা আমি পেয়ে যাই। আজকের এই দিনে সাক্ষাতের স্থলে তিনদিকে তিনটি ফ্যামিলির লোকেরা বসে কুশল

বিনিময় ও আলাপচারিতার নির্দিষ্ট সময় পার করতে থাকে। পরস্পরের পরিবারের সাথে পরিচয় এবং শুভেচ্ছা বিনিময়ের সুযোগ হয়। সকলের মনের অবস্থা যে এক ও অভিন্ন তা তাদের চেহারা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। আল্লাহ তায়ালা, এই সব ব্যথাহত পরিবারের সদস্যদের অন্তরের কান্না হৃদয়ের ফরিয়াদ কবুল করে, সবাইকে স্বজনদের মাঝে ফিরে যাবার তৌফিক দিন, মন থেকে এই দৃশ্য দেখে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এই দোয়া বেরিয়ে আসে।

গত শুক্রবারের সাক্ষাতের পর শনি ও রবি দুটো দিন পার হবার পথে। আগামীকাল আমাকে নাকি যেতে হবে চট্টগ্রামে ৭ ই সেপ্টেম্বর আদালতে হাজিরা দেয়ার জন্যে। আইনত ঐ দিনে আমাদের হাজিরা যদিও জরুরি নয়, তবু যেতে হবে। কারণ মামলা দেয়াই হয়েছে হয়রানি করার জন্যে, কষ্ট দেয়ার জন্যে। আমি সায়েটিকার রোগী। কোমর ও দু'পায়ের হাঁটুর জয়েন্টে ব্যথা নিয়ে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম সফর করা তাও আবার ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ রাস্তায় খানা খন্দকে জরাজীর্ণ রাস্তায়। এভাবে সফর আমার মত এই ধরনের রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্যে কত কষ্টকর তা কেবল ভুক্তভোগীরাই উপলব্ধি করতে পারে। সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ, তাই কোন ডাক্তারের পক্ষে এমন সুপারিশ করার সাহস নেই, যে তাদের রোগী দূরপাল্লার সফরের যোগ্য নয়।

আমার বেগম সাহেবা ছেলের সাথে চট্টগ্রাম যাবার ইচ্ছা ব্যক্ত করায় আমি তাকে না যাবার জন্যে অনুরোধ করলাম। কতবার ওখানে যাওয়া আসা করতে হবে কে জানে? প্রতিবারেই যদি পরিবারের লোকেরা যাওয়া আসা করতে থাকে, তাহলে সেটা হবে তার উপর বাড়তি চাপ। সেই সাথে একটা বাড়তি খরচও বটে। ছেলে যাক এটাও আমি চাই। ওখানে তাদের তো কিছু করার নেই, শুধু মনের আবেগ প্রশমিত করা ছাড়া। তারপরও ছেলে একজন আইনজীবী হিসাবে আইনজীবীর সাথে শলাপরামর্শ করার জন্যে যাওয়া আসা করছেই।

আজ ৪ঠা সেপ্টেম্বর মাওলানা সাঈদী সাহেব সকালে ট্রাইব্যুনালে গেছেন। এখনও এসে পৌঁছেননি। অবশ্য দুপুর ২টা পর্যন্ত ট্রাইব্যুনাল চলে। কোন দিন বেশ সকাল সকালই চলে আসেন। আজ চার্জ ফ্রেম করার দিন তাই হয়ত সময় লাগছে। তবে এখন সময় ১২-১৫ টা। শুনেছি তার বিরুদ্ধে সাড়ে চার হাজার পৃষ্ঠার প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে, যা মূলত কল্পকাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। ঐ সময় উনার কোন রাজনীতির সাথেই সম্পর্ক ছিল না। জামায়াতে ইসলামীতে যোগাযোগ করা এবং তার বক্তব্য সর্বস্তরের জনমানুষের কাছে গ্রহণ যোগ্য হওয়ায় অন্য কথায় তার জনপ্রিয়তা এবং জামায়াতে যোগদান করাই একমাত্র অপরাধ। যাকে দেশের দলমতের উর্ধ্বে, লাখ লাখ মানুষ অন্তর থেকে ভক্তি করে শ্রদ্ধা করে, অগণিত মানুষের মনের মণিকোঠায় যার স্থান সীমাহীন ভালবাসার এবং সম্মানের, আল্লাহ তার সম্মান রক্ষা করুন। সকল চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে আল্লাহ তাকে সহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন। সকল বানোয়াট অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করে আল্লাহ আমাদের সবাইকে সম্মানজনকভাবে জনতার ময়দানে ফিরে যাবার জন্যে তার পক্ষ থেকে কুদরতি ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। মনে প্রাণে এই দোয়াই করছি অবিরাম অবিরত। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত মানুষের দোয়া কবুল করুন।

ট্রাইব্যুনাল সাধারণত দুপুর ২টা পর্যন্ত কার্যক্রম চালায়, এর পরেই মুলতবি হয়ে যায়। কিন্তু আজ কেন যেন দেরী হচ্ছে। আমিও তাদের অপেক্ষায় বসে বসে আলাপ করছিলাম। আমি একটু উদ্বিগ্নই হয়ে পড়ি। বারান্দা থেকে রুমে আসি আসরের নামাজের প্রস্তুতির জন্যে। এর মধ্যেই তাহের এসে খবর দিল, রেডিওতে নাকি বলেছে ১টা পর্যন্ত শুনানির পর বিরতি দেয়া হয়েছে বিরতির পর আবার শুনানি চলবে। তাহেরের কথা শেষ হতেই আমি কলম হাতে কয়েক লাইন লিখতে লিখতেই সাঈদী সাহেব এসে আমার রুমের সামনে দাঁড়ালেন। বললেন ওরা একতরফা কথা বলেছে। আমাদের আইনজীবীদের কোন কথাই

www.pathagar.com

বলতে দেয়নি। কথা বলতে গেলেই বসিয়ে দিয়েছে। আর সরকার পক্ষের আইনজীবীদেরকে ট্রাইব্যুনাল থেকে সহযোগিতা করা হয়েছে। তাদের ভুল হলে সংশোধন করে দিয়ে বলা হয়েছে এভাবে না বলে এভাবে বলুন। এভাবে না লিখে এভাবে লিখুন। আবার ১৩/৯/১১ তে তারিখ দেয়া হয়েছে। সেদিন নাকি সাঈদী সাহেবের পক্ষের আইনজীবীদের বক্তব্য শোনার সুযোগ দেয়া হবে। আল্লাহতায়ালা এই সব মিথ্যা বানোয়াট কল্পকাহিনী তৈরিকারীদের সকল কারসাজি তার কুদরতি ফায়সালায় নস্যাৎ করে দিন, একান্ত কাতর কণ্ঠে তার দরবারে প্রতি নিয়ত এই দোয়াই করে চলেছি অব্যাহতভাবে।

আগামীকাল সকালে আমাকে যেতে হবে চট্টগ্রাম। একটি নির্জলা মিথ্যা মামলার জন্যে মনে তেমন কোন পেরেশানী না থাকলেও, আমার শরীরটা যেমন খারাপ, তেমনি চট্টগ্রাম পর্যন্ত রাস্তার অবস্থাতার চেয়েও বেশি খারাপ। আল্লাহ যেন সহায় থাকেন, সফরের ধকল সহ্য করার তৌফিক দেন অথবা তাঁরপক্ষ থেকে কোন কুদরতি ব্যবস্থার মাধ্যমে আমাকে এই কষ্টকর সফর থেকে অব্যাহতি দেন, এ জন্যেই আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করছি। আল্লাহ যেন সফরকে আসান করে দেন অথবা সফর থেকে অব্যাহতি দেন। আমার জন্যে তিনি যেটা ভাল মনে করেন, সেটাই যেন করেন। এবং আমাকে তার ফায়সালার প্রতি রাজি থাকার তৌফিক দেন।

চট্টগ্রাম কাল গেলে হয়ত ৯/৯/১১ তে ফিরে আসতে পারব। আমার হাতের ব্যথার চিকিৎসার বিষয়টা বেশ বাধাগ্রস্ত হয়ে গেল। জেলজীবন এমনি কষ্টের এবং অস্বস্তিকর। তার উপরে অসুস্থতা একটা বাড়তি কষ্টের বোঝা ছাড়া আর কিছুই নয়। দুনিয়ার এই কষ্টের বিনিময়ে আল্লাহ আমার আখেরাতের জীবনটা নিষ্কন্টক করুন (আমীন)।

আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর ১১ তে চট্টগ্রাম আদালতে হাজিরা দেবার জন্যে আজ সকালেই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে চালানে চট্টগ্রাম পাঠানোর কথা। কাল রাত থেকেই মোটামুটি প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষায় ছিলাম। সকাল সাড়ে দশটার দিকে আমাদের অপর দুই সাথীর কাছে শুনলাম, উনাদেরকে স্লিপ পাঠানো হয়েছে এবং উনারা প্রস্তুত, আমার ব্যাপারে নাকি কিছু বলা হয়নি। ইতিমধ্যে উনাদের নেয়ার জন্যে নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকেরা এসে গেল। অভিজ্ঞ লোকেরা মন্তব্য করলেন, আমাকে আগামীকালও নিতে পারে, আজকেও যেকোন সময় নিতে পারে। জোহরের সময় হয়ে আসায় মনে হল অন্তত আজ আর নিচ্ছে না। ইতোমধ্যে মাওলানা সাঈদী সাহেব কোর্টের হাজিরা শেষে জেল গেট থেকে জেনে এসেছেন, আমাকে নাকি আগামীকাল নেবে। আজ না নিয়ে কাল নেয়ার কারণ সম্পর্কে অনেকেই মন্তব্য করলেন, এক সাথে নেয়া কর্তৃপক্ষ ঠিক মনে করছে না। দীর্ঘ পথ, খুব খারাপ পথ একা একা চলা বেশ অস্বস্তিকর। এই অস্বস্তিকর অবস্থায় দীর্ঘ ৮/৯ ঘণ্টা রাখাটা তাদের পরিকল্পনার একটা অংশও হতে পারে। আজকে চট্টগ্রাম যাবার জন্যে আমার ছেলে মোমেন এবং ভাতিজা মিঠুও হয়ত তৈরি ছিল। কিন্তু আগামীকাল যে যেতে হবে এটাতো তাদের জানার বা জানানোর উপায় নেই। এবারের সফর হবে নির্জনে নিরালায়। আজকে আমাকে না নেয়ায় প্রথমে ভেবেছিলাম, এ যাত্রায় হয়তো কোর্টে হাজির হওয়া থেকে আমাকে অব্যাহতিই দেয়া হল। মনে কিছুটা স্বস্তিও বোধ করছিলাম। কিন্তু যেতেই হবে, এবং কালকেই যেতে হবে, একদম একাকী, নির্জনে নিরালায় এটা ভেবে মনের অস্বস্তি আবার একটু বৃদ্ধি পেল। অবশ্য এর আগে একদিন একা একাই গিয়েছি। আর ২ দিন ফিরে এসেছি একা একাই। তাই অস্বস্তিবোধ করলেও তেমন সমস্যা মনে করছি না। চট্টগ্রামে যাওয়া আসার কষ্টের অনুভূতি প্রথমে যেমন ছিল, ইতঃপূর্বে দু'বার আসা যাওয়ায় তা অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে আসছে, সামনে হয়ত আরো স্বাভাবিক হয়ে আসবে।

আগামীকাল কখন রওয়ানা করতে হবে কিছুই জানি না। তবে সব কিছু গোছগাছ করাই আছে। যখন নিতে আসে তখনই যেতে পারব, ইনশাআল্লাহ। তবে আল্লাহর কাছে কাতর কণ্ঠে ফরিয়াদ অব্যাহত থাকবে, আল্লাহ যেন এই কষ্টের সফরকে আসান করে দেন অথবা এই সফরের কষ্ট থেকে আমাকে স্থায়ীভাবে অব্যাহতি দানের ব্যবস্থা করেন।

www.pathagar.com

অবশেষে ৭ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম আদালতে হাজিরা দেয়ার জন্যে আমাকে ৬ই সেপ্টেম্বর নেয়ার স্লিপ পাঠানো হয় সকালের দিকে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে রওয়ানা দেয়া হল সকাল ১১টায়। মাঝখানে কুমিল্লা চিওড়া উপজেলার Vita world হোটেলে জোহরের নামাজ ও দুপুরের খাবার খেলাম। আতিথেয়তা করলেন কুমিল্লা সংগঠনের ভাইয়েরাই। চট্টগ্রাম পৌঁছতে পৌঁছতে বেশ কিছুটা রাত হয়ে গেল। চট্টগ্রাম কারাগারে পৌঁছে এস্তেঞ্জা অজু শেষে নামাজ ও রাতের খাবার সেরে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। জেলগেটে ডাক্তার প্রেসার মেপে দেখলেন প্রেসার সফরের কারণে বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে, ডাক্তার সকালে আবার প্রেসার দেখতে আসে। রাতে প্রেসার ছিল ১৭০-৮০। সকালে ১৪০-৭৫। রাতের ঘুমের ফলে প্রেসার স্বাভাবিক হয়ে আসে। চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছার সাথে সাথেই আমাকে বলা হল কাল দুপুরেই আমাকে ঢাকাতে পাঠিয়ে দেবে। এজন্যে আমি যেন মানসিকভাবে তৈরি থাকি।

৭ই সেপ্টেম্বর সকাল ১১-১৫ মিনিটে আমাদেরকে রুম থেকে কোর্টের উদ্দেশে রওয়ানার জন্যে বের হতে হল। ঢাকায় যদিও আমাদেরকে কোর্টে বা হাসপাতালে নিতে হলে এসি মাইক্রোবাস বা এম্ব্যুলেন্সের ব্যবস্থা করা হয়; কিন্তু চট্টগ্রাম জেলখানা থেকে কোর্টে যাওয়া আসা প্রিজন ভ্যানেই করতে হয়। সবাইকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই যেতে হয়। দাঁড়িয়ে যাওয়া কষ্টের হলেও এই সুযোগে রাস্তার দু'ধারে দাঁড়ানো লোকদের সাথে সালাম বিনিময়ের একটা সুযোগ হয়। দোকানে দোকানে বসে থাকা লোকেরাও বেশ আন্তরিকভাবে হাত নাড়া দিয়ে তাদের সহানুভূতি দেখাতে মোটেই কার্পণ্য করে না। জনতার এই আন্তরিক সহানুভূতিটুকু দাঁড়ানোর কষ্টটা অনেকাংশেই ভুলিয়ে দেয়।

কোর্টের কার্যক্রম শেষে ১২-৩০ টার দিকে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে ফিরে আসতেই, আমাকে বলা হলো কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার আমাকে ঢাকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করবে; আপনি প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সেরে নেবেন। আমি কোর্টে যাওয়ার আগেই মোটামুটি প্রস্তুতি সেরে রেখেছিলাম। কোর্ট থেকে এসে নামাজ শেষে দুপুরের খাবার কাজটাও চট জলদি সেরে নেই। দুপুর সোয়া দুটোর দিকে রুম থেকে জেল গেটের দিকে রওয়ানা হই। আনুষ্ঠানিকতা সেরে আড়াইটার দিকে গাড়ীতে উঠি। এই সময় আমার ছেলে মোমেন, ভাতিজা মিঠু ও ড্রাইভার আব্দুস সাত্তারও জেলগেটেই অবস্থান করছিল। তারাও আমার গাড়ীকে অনুসরণ করে ঢাকার পথে রওয়ানা দেয়। চট্টগ্রাম ঢাকা মোটামুটি বেশ লম্বা পথ। অতীতে আমরা ৪/৫ ঘণ্টায় যাওয়া আসা করলেও এখন ৮/৯ ঘণ্টা লেগে যায়। আমার এস্তেঞ্জার প্রয়োজনে মাঝে কোথাও একটু যাত্রা বিরতি অপরিহার্য। আমাদের সাথে পুলিশের যে স্কোয়াড দেয়া হয়, সব সময় তারা এক রকম হয় না বা এক রকম আচরণ করে না। এবারের স্কোয়াডটা তেমন কোন খারাপ আচরণ না করলেও তাদের চাকরির দোহাই দিয়ে নামাজ ও খাওয়ার জন্যে কোথাও থামতে তাদের অসুবিধার কথা বার বার বলতে থাকে এবং এ ব্যাপারে একজন অপরজনকে বোঝাতে থাকে। আমি প্রথমে Vita world এ থামতে চেয়েছিলাম। মাঝে একটা গ্যাস স্টেশনে গ্যাস নেওয়ার সময় আমার ছেলে জানালো যে মিয়ামীতে থামতে হবে।

আমি ভিটা ওয়ার্ল্ড থামার জন্যেই মানসিকভাবে তৈরি ছিলাম। অবশ্য ওখানে থামলে মাগরিবের সময় অনেক বাকী থাকতো। আবার মিয়ামী পৌঁছতে পৌঁছতে মাগরিবের সময় পার হয়ে যাবার আশংকা থেকে যায়। সেই সাথে আমার পক্ষে অতক্ষণ পর্যন্ত এস্তেনজা না করে থাকাটাও কষ্টসাধ্য হতে পারে। তারপরও মিয়ামীতেই থামার সিদ্ধান্ত নিলাম। মাঝখানে চৌদ্দগ্রাম বাজার ও মিয়া বাজার দিয়ে কুমিল্লা বাইপাস রাস্তা হয়ে কুমিল্লা শহরমুখী রাস্তার সংযোগস্থলে মিয়ামী হোটেলটির অবস্থান। ঘটনাক্রমে বার বার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ সত্ত্বেও গাড়ীটা হোটেল ক্রস করে সামনে এগিয়ে যায়। আমার ছেলেকে বহনকারী গাড়ীর ড্রাইভার কুমিল্লার মানুষ। রাস্তা ঘাট তার খুব ভাল চেনা। সে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে গিয়ে জানালো হোটেল পেছনে রেখে আসা হয়েছে। গাড়ী ঘুরিয়ে আবার সেদিকে যেতে বলে সে নিজের গাড়ী ঘুরিয়ে আমাদের গাড়ীর ড্রাইভারকে তাকে অনুসরণ করতে বলল। অবশেষে হোটেল মিয়ামীতে পৌঁছে

www.pathagar.com

দ্রুততার সাথে আমার কোমরের বেল্ট খুলে এস্তেঞ্জা ও অজু সেরে নিলাম। সেই সাথে গায়ের ঘামে ভিজা গেঞ্জিটা পরিবর্তন করে শুকনো একটা গেঞ্জি পরে নামাজ সেরে খাবার টেবিলে বসলাম। সাথে পুলিশ স্কোয়াডের দায়িত্বশীলকে বললাম, আমাদের লোকদেরকে রাতের খাবার এখানেই সেরে নিতে বলেন, সাথে চা বা কফি যা যার পছন্দের খেয়ে নিতে বলেন, বিশেষ করে ড্রাইভারকে অবশ্যই চা বা কফি খেয়ে নিতে বলেন যাতে গাড়ি চালাতে তার কোন অসুবিধা না হয়।

লম্বা পথে মাঝখানে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে যাত্রা বিরতি এটা একান্তই স্বাভাবিক প্রয়োজন। সেই সাথে খাবার প্রয়োজনটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছার পর রাতের খাবার খাওয়ার সুযোগ নাও পেতে পারি। সাথে যারা আছে তারাও মানুষ, খাবার প্রয়োজন তাদেরও আছে। আমরা পালাবার মত আসামী নই। অতএব আমাদের পথে কোন হোটেলে, এস্তেঞ্জা, অজু, নামাজ ও খাবার জন্যে যাত্রা বিরতিতে পুলিশের আপত্তি এবং চাকরির ভয়ের কারণকে দুর্বোধ্য বলব না অমানবিক বলব ভেবে পাই না।

অবশেষে হোটেলে পৌঁছলাম। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার পুলিশের ইনচার্জ আমার ছেলেকে হোটেলে ঢুকতেই বারণ করল। আমি বললাম ওকেও তো খেতে হবে। দুপুর থেকে আমার রওয়ানার প্রতীক্ষায় ছিল। এ কারণে তার হয়ত দুপুরেও খাওয়া হয়নি। তাকে হোটেলে ঢুকতে দেবেন না, খেতে দেবেন না এটা কেমন কথা। যা হোক এরপর আর তারা তেমন কিছু বলেনি। শুধু একটা অনুরোধ করেছে, মোবাইল ফোনে ছবি নিয়ে অনেক সময় তাদের জন্যে ঝামেলার সৃষ্টি হয়ে থাকে, এটা যেন এখানে না হয়। আমি তাদেরকে আশ্বস্ত করলাম, নিশ্চিত থাকুন এখানে এমনটি হবে না।

কুমিল্লা সংগঠনের ভাইয়েরা আতিথেয়তার সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল। পুলিশের লোকেরাও বেশ খুশি মনে স্বাচ্ছন্দ্যে খাবার খেল। কিন্তু ফাঁকে ফাঁকে তাদের চাকরির যেন কোন অসুবিধা না হয় এব্যাপারে কাকুতি মিনতি করতে থাকল কেউ কেউ।

নামাজ ও খাওয়া শেষে রাত আটটার দিকে আমরা ঢাকার পথে রওয়ানা হলাম। স্বাভাবিক অবস্থায় কুমিল্লা থেকে ঢাকা আসতে দুঘণ্টার বেশি লাগার কথা নয়। কিন্তু পথে পদুয়া বাজারের কাছে একটা দুর্ঘটনার কারণে কিছু জ্যামে পড়তে হয়। তাছাড়া কাঁচপুর ব্রিজ পর্যন্ত মোটামুটি ভালই এসেছি। কিন্তু শনিরআখড়া থেকে গুলিস্তান পর্যন্ত সাংঘাতিক রকমের যানজটে জান বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। গাড়ির এসি কোন কাজ করছিল না। গরমে আমার গায়ের গেঞ্জি ভিজে অবশেষে পাঞ্জাবী পাজামাও ভিজে যায়। জেল গেটে পৌঁছি রাত সাড়ে ১১টায়। এর আগের বারে ৬ই আগস্ট চট্টগ্রাম থেকে দুপুর ২-৩০ টা রওয়ানা করে ১২-১৫ টায় কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছে জানলাম, তারা আমার আসার খবর নাকি জানত না। এবারও তাদের একই কথা। সেটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ আমি চট্টগ্রাম জেল সুপার ও জেলারকে বলে এসেছি। তারাও ফ্যাক্স এবং ফোনের মাধ্যমে খবর দেবার নিশ্চয়তা দিয়েছে। যাহোক অবশেষে জেল গেটের আনুষ্ঠানিকতা সেরে রাত ১২-৩০ টায় আমার রুমে পৌঁছি। ২৬ সেলের কেউ জানতে পারেনি, আমার আসার কথা। তারা সবাই শাওয়ালের রোজার জন্যে শেষ রাতে উঠে দেখলেন। আমিও শেষ রাতে উঠে নামাজ পড়েছি। তবে লম্বা সফরের কারণে, চট্টগ্রামে ঢাকা থেকে যাওয়া আসার কারণে আমি নফল রোজা আপাতত না রাখারই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এ সিদ্ধান্ত নেয়াটা মানসিকভাবে অস্বস্তিকর হলেও, আমার শরীরের নানাবিধ অসুবিধার কারণে, এতবড় ছওয়াবের ও ফজিলতের রোজা পালন থেকে নিজেকে স্বেচ্ছায় মাহরুম রাখতে বাধ্য হওয়া, অবশ্যই দুর্ভাগ্যজনক। তবে ভরসা এটাই যে আল্লাহ তার বান্দার মনের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত এবং তিনি ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

৭ই সেপ্টেম্বর বুধবার দিবাগত রাতে আমি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় ফিরে এলাম। আমার সাপ্তাহিক পারিবারিক সাক্ষাতের নির্ধারিত দিন বৃহস্পতিবার। আমার চট্টগ্রাম থেকে ফিরে আসার পর স্ত্রী এবং বড় মেয়ের সাক্ষাতের প্রয়োজনটা ছিল খুব বেশি। ৮ই সেপ্টেম্বর রোজ বৃহস্পতিবারের নির্ধারিত সাপ্তাহিক

www.pathagar.com

সাক্ষাতের জন্যে রাতের শেষ প্রহর থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে থাকি। কারণ এবারের চট্টগ্রামে হাজিরার দিন, ছেলের সাথে আমার স্ত্রীও যেতে চেয়েছিল। আমিই বারণ করেছিলাম। খারাপ রাস্তা লম্বা সফরে একদিনে যাওয়া এবং পরের দিনই ফিরে আসার কষ্টের অনুভূতি আমার নিজের কেমন হয়েছে, ছেলে তা সচক্ষে দেখে গিয়ে তার মাকে নিশ্চয়ই বলেছে, বলেছে তার বড় বোনকেও। অতএব অন্য সময়ের চেয়ে এ দিনের সাক্ষাতের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এদিনে তাদের সাক্ষাতের জন্যে এসে জেলকর্তৃপক্ষের অসহযোগিতা ও অমানবিক আচরণের কারণে সাক্ষাৎ ছাড়াই হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়।

আজ ৯ই সেপ্টেম্বর শুক্রবারে তারা আবার আসে সাক্ষাতের জন্যে। গতকাল ১১টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষায় ছিলাম গেট থেকে পাঠানো খবরের ভিত্তিতেই। আমাকে গেট থেকে বসতে বলা হয়েছিল। সাক্ষাতের জন্যে উনারা গেটের বাইরে অপেক্ষা করছেন। সাহেব এসে দরখাস্তে সই করলেই কাগজ পাঠিয়ে দেয়া হবে। সেই কাগজ সই করার কেউই নাকি ছিল না। জেল সুপার বা জেলার কেউই ছিলেন না। তারা নাকি কোথায় মিটিংয়ে ছিলেন। বৃহস্পতিবার কোন ছুটির দিন নয়। তদুপরি সাপ্তাহিক সাক্ষাতের নির্ধারিত দিন। কাজের প্রয়োজনে জেল সুপার এবং জেলার দুজনই বাইরে যেতেও পারেন। তবে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের মত এত বড় প্রতিষ্ঠানে, সুপার বা জেলারের পরে কারও উপর দায়িত্ব থাকে না, এটা হতে পারে না। শুক্রবারে তো ছুটির দিন, অসংখ্য ভিআইপি বন্দীর সাক্ষাৎ থাকে। ঐদিনে তো সুপার বা জেলার কেউ অফিসে আসেন না, ছুটি কাটান, তাহলে এদিন কারা সাক্ষাৎ প্রার্থীদের দরখাস্তে সই স্বাক্ষর করে থাকেন? আমি আজ দেখা করতে গিয়ে সুপার বা জেলার আছেন কিনা জানতে চেয়ে জবাব পেলাম আজতো ছুটির দিন, উনাদের থাকার কথা নয়। তাহলে আজকে কার স্বাক্ষরে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা হল? এ প্রশ্নের উত্তর চেয়ে লাভ নেই, তাই নীরবে জেলপ্রশাসনের দায়িত্বহীনতা ও অমানবিক আচরণ হজম করতে হল। আমি এটা জেনে মনে দারুণ কষ্ট পেলাম, যে আমার অসুস্থ স্ত্রী দীর্ঘদিন থেকে ডায়াবেটিসে ভুগছেন সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত দীর্ঘ ৪ঘণ্টা অপেক্ষা করে ফিরে গেছে বনানীর বাসায়। কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বনানী যেতেও কম সময় লাগার কথা নয়। দুবেলা ইনসুলিন নিতে হয় এমন একজন ব্যক্তিকে, জেল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতা ও অমানবিক আচরণের কারণে, এত দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকা জীবনের জন্যে ঝুঁকিপূর্ণও হতে পারতো। জেল কর্তৃপক্ষের ঐ দিনের আচরণে আমার মনে স্থির বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে, তারা আমাদের মত বন্দীদের পরিবারের সদস্যদেরকে, মানসিকভাবে পীড়া দিয়েই আনন্দ অনুভব করে থাকে। তাদের কাছে মানবিক কোন আচরণ আশা করার কোন সুযোগই নেই এখানে। এদের এ ধরনের দায়িত্বহীন ও অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করারও কোন জায়গা নেই। অভিযোগের ফল নাকি হয় উল্টো। একদিন আমার ব্যারিস্টার ছেলের কথার প্রতিউত্তরে একজন ডেপুটি জেলার পরোক্ষভাবে হুমকি দিয়ে বলল, আপনি যেভাবে কথা বলছেন, এটা উপরে রিপোর্ট করলে, হিতে বিপরীত হতে পারে। অতএব এদের বিচারের ভারটা আল্লাহর উপর দেয়ার কোন বিকল্প নেই।

গতকালের সাক্ষাতের পর থেকে মনটা বেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। কারাকর্তৃপক্ষের এমন দায়িত্বহীনতা ও আমানবিক আচরণ সত্যিই উদ্বেগজনক এবং বিরক্তিকর। তাদের এই দায়িত্বহীনতা ও অমানবিক আচরণের প্রতিকার প্রতিবিধান চাওয়ার কোন ব্যবস্থাই এখানে নেই। আমি প্রথমে একজন জমাদারের মাধ্যমে জেলার বা জেল সুপারের সাথে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে, সালাম ও ম্যাসেজ পাঠাই, বৃহস্পতিবারে আমার পরিবারের লোকেরা সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত অপেক্ষা করে ফিরে যাওয়ার কথা শুনে। মাগরিবের পরপরই দুইজন সুবেদার ও একজন জমাদার এসে জানতে চাইলেন, কেন দেখা করতে চান, সমস্যা কী? আমি উত্তরে বললাম, আমি আমার ব্যক্তিগত কিছু সমস্যা একান্ত ব্যক্তিগতভাবেই উনাদের জানাতে চাই। সেই সাথে ঐদিন যে পরিবারের লোকেরা দীর্ঘ চার ঘণ্টা

www.pathagar.com

জেলগেটে অপেক্ষা করে ফিরে যেতে বাধ্য হন কেন, এর কারণটাও জানতে চাই। বিষয়টা আমি একটু বুঝতে চাই এমনটি কেন হল। উনাদেরকে আমার সালাম বলুন। উনারা নিজে এসে কথা বললে ভাল, তবে এমনটি আমি আশা করি। আমাকে অফিসে ডেকে পাঠালে আমি অফিসে গিয়েই কথা বলতে চাই। তারপর আরো ২দিন অতীত হল, আজ নিয়ে হবে তিন দিন এখনও কোন উত্তর আসেনি। কোন দিনই খবর আসার সম্ভাবনা নেই। খবর না আসার একটা কারণ এও হতে পারে যে, সুবেদার বা জমাদারদের মাধ্যমে যে খবর পাঠানো হয়, তা সুপার বা জেলার পর্যন্ত হয়তবা পৌঁছেই না। অথবা পৌঁছলেও প্রশাসন তাদের দুর্বলতা সম্পর্কে কোন কিছু শুনতে আদৌ প্রস্তুত নয়। অতএব বন্দীদের দুঃখ দুর্দশা বা সমস্যার কথা প্রশাসনের যেখানে নিজেই এসে জানার চেষ্টা করা তাদের দাপ্তরিক ও নৈতিক দায়িত্ব, সেখানে তাদের কাছে পৌঁছে কথা বলার সুযোগটাও তারা দিতে চান না। বন্দীদের এবং বন্দীদের পরিবারের সদস্যরা কষ্ট পেলেও তাদের কিছু যায় আসে না। কেন্দ্রীয় কারাগারে এভাবে একবছর দুই মাসে তাদের সাক্ষাৎ চেয়ে একদিনও কোন সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি। সাপ্তাহিক সাক্ষাতের দিন অফিসে থাকলে ২/১ বারে ভাগ্যক্রমে দেখা করে কথা বলার সুযোগ হয়েছে মাত্র।

এবারের ১লা রমজানই আমার শুরু হয় চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা সফরের মাধ্যমে। তাছাড়া রমজানের মধ্যেই আরো একবার যাওয়া আসা করতে হয়, চট্টগ্রামে আদালতে হাজিরা দেয়ার জন্যে। তাছাড়া কিছু দিন বারডেম হাসপাতালে যেতে হয় ফিজিওথেরাপি নিতে। এবারের রমজানের রোজা রাখার ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন সমস্যা না হলেও, মাঝে মধ্যে ব্লাড সুগার বেশ কমে যাওয়ায় কিছুটা হলেও আশংকার মধ্যে ছিলাম। কখনও কোন রমজানেই যেহেতু আমাকে রোজা কাজা করতে হয়নি, এবারও যেন না হয় সে জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করছিলাম। অতীতের যেকোন বছরের তুলনায় এবার মাঝে মধ্যে সুগার লেভেল বেশি কমে যাওয়ার কারণে মনে মনে একটু আশংকা থাকলেও, আল্লাহ বড় মেহেরবান, পূর্ণ মাস ব্যাপী বেশ ভাল ভাবেই রোজা পালনের এবং কোরআন তেলাওয়াতসহ রাত্রি জাগরণে সহায্য করেছেন। রমজানের রোজা ও ঈদ শেষে শাওয়াল মাসের ছয়টি নফল রোজা না রাখতে পরিবারের পক্ষ থেকেই আমাকে অনুরোধ করা হয়। আমার নিজেরও তেমন সাহস হচ্ছিল না। ঈদের মাত্র ক'দিন পরেই আরেক দফা চট্টগ্রাম সফর করে আসতে হল। এবারের সফরে কষ্ট হয়েছে অবর্ণনীয়। তাই এখানকার সাথীদের সাথে তাল মিলিয়ে আমার রোজা রাখা হয়ে উঠেনি। চট্টগ্রামের ধকল সামলিয়ে উঠার ২দিন পর থেকে অর্থাৎ গতকাল থেকে রোজা রাখা শুরু করেছি। আজ হবে আমার ২ দিন আর উনাদের ছ'টা রোজাই শেষ হবে আজই। আমাকে বাকীগুলো রাখতে হবে একা একাই।

আজ সৈয়দ আব্দুল্লাহ তাহেরের কোর্ট। তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে। প্রেসক্লাবের এক সমাবেশের বক্তৃতার জন্যেই এই মামলা। হাইকোর্ট জামিন দিয়েছিল চার্জশিট পর্যন্ত, এরপর আদালতে হাজিরা দিতে গেলে আদালতে থেকে সরাসরি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। আমি মনে প্রাণে তার জন্যে দোয়া করছি, যেন সে তাড়াতাড়ি জামিনে মুক্ত হয়ে বাইরে যেতে পারে। ইতঃপূর্বে মুজিবুর রহমান সাহেব দুই বার জামিন পেয়ে আবার জেলে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে জামিন পাওয়ার পর আর কোন অসুবিধা হয়নি। এখন তিনি বাইরে আছেন। সংগঠনের দায়িত্ব সাধ্যমত পালন করছেন। ডা. আব্দুল্লাহ তাহেরের মত যুবক মাঠ কর্মীদের এই সময় বাইরে থাকা খুবই জরুরি। আল্লাহ যেন খুব শিঘ্রই তাকে জামিনে মুক্তি পেয়ে বাইরে যাবার সুযোগ করে দেন। হয়ত ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এবং জজ কোর্টে জামিন হবে না। নিম্ন আদালতে জামিনের আবেদন না মঞ্জুর হলেই হাইকোর্টে যাওয়ার সুযোগ হবে। সেখানে কোন ভাল বেঞ্চে জামিনের আবেদনের সুযোগ হলে জামিন মঞ্জুর হয়েও যেতে পারে। আল্লাহ আমার মত একজন মজলুম বান্দার দোয়া কবুল করে তার জামিন মনজুরের ব্যবস্থা করুন, আমি মনে প্রাণে বার বার সেই দোয়াই করছি।

www.pathagar.com

এইমাত্র ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ তাহের কোর্ট থেকে ফিরে জানালো, তার জামিন মঞ্জুর হয়েছে। বেলবন্ড আনলেই সে জেল থেকে মুক্ত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। এখন আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, যেন তার মুক্তির পথে সরকারের পক্ষ থেকে আর কোন কৃত্রিম বাধা সৃষ্টি করা না হয়। বিনা বাধায় সহিসালামতে সে জেল থেকে মুক্ত হয়ে তার পরিবারের লোকদের সাথে মিলিত হবার সুযোগ পাক। সংগঠনের ভাইদের সাথে মাঠে ময়দানে ভূমিকা পালনের সুযোগ পাক, মহান আল্লাহর দরবারে আবারো তার জন্যে নতুন করে দোয়া করছি। আল্লাহ তার এই মজলুম বান্দার দোয়া কবুল করে দেশের ইসলামী শক্তি হিসাবে জামায়াতে ইসলামীকে হেফাজত করুন, দেশের ইসলামী জনতার নির্ভরযোগ্য ও আস্থার প্রতীক হিসাবে আল্লাহতায়ালা জামায়াতে ইসলামীকে কবুল করুন এবং ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের তৌফিক দিন। (আমীন)

আমার বয়স এখন সত্তর চলছে। জীবনের এই শেষ প্রান্তে এসে ইসলামী আন্দোলনকে বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়ার সুযোগ আমার হবে কিনা, জানি না। তবে আমাদের উত্তর সূরীদেরকে যেন আল্লাহ সেই তৌফিক দেন, দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার মুহূর্তে এই আশাবাদ নিয়েই বিদায় নিতে চাই।

চট্টগ্রামে যাওয়া-আসার বিড়ম্বনা- ০১

তথাকথিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্যে গঠিত আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত হওয়ার জন্যে একটা সমন পাই জুলাই ২০১১ এর মাঝামাঝি সময়ে। তারিখটা ঠিক মনে নেই। কোন তারিখে হাজিরা দিয়েছি তাও মনে নেই। তবে ঐদিন পরবর্তী হাজিরার তারিখ দেয়া হয় ১লা আগস্ট' ১১, ইতঃপূর্বে ঐ একই দিনে আমাকে হাজির হতে বলা হয় চট্টগ্রামে 'দশ ট্রাক অস্ত্র মামলার বিচারিক আদালতে'। সবাই বলতে শুরু করলেন ট্রাইব্যুনাল যেহেতু উচ্চতর আদালত, তাই ১লা আগস্ট তারিখে ট্রাইব্যুনালেই আসতে হবে। চট্টগ্রামে যেতে হবে না।

ইতোমধ্যে বারডেম হাসপাতালে আমার ফিজিওথেরাপি শুরু হয়েছে। ফিজিক্যাল মেডিসিনের প্রফেসর দূরের সফর করতে মানা করেছেন। তার লিখিত পরামর্শ কেন্দ্রীয় কারাকর্তৃপক্ষকে দেখানো হয়। তাছাড়া ট্রাইব্যুনালেরও হাজিরার তারিখ একই হওয়ায় আমাকে চট্টগ্রাম যাওয়া থেকে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারত। কিন্তু একজন ডেপুটি জেলার বললেন, চট্টগ্রাম থেকে বিশেষভাবে তাকিদ আসছে, কাজেই ঢাকায় তারিখ থাকলেও চট্টগ্রামেই যেতে হবে। ১লা আগস্ট কোর্ট, অতএব ৩১শে জুলাইতে নিলে আমি একদিন ফিজিওথেরাপি নেয়ার সুযোগ পেতে পারতাম। তারা তাও বিবেচনা করলেন না। ৩০শে জুলাই চট্টগ্রাম পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। চট্টগ্রামের কোর্টে ঐ একই মামলায় অভিযুক্ত মেজর জেনারেল রাজ্জাকুল হায়দার ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুর রহীম সাহেব প্রথম দিকে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারেই অবস্থান করতেন। পরবর্তীতে '২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলার' অভিযুক্ত হিসাবে ঢাকা চট্টগ্রাম আসা যাওয়া করছেন। এবারে উনাদের সাথেই আমাকে রওয়ানা করতে হয় চট্টগ্রামে। দিনটি ছিল ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আ: রহীম সাহেবের পিতার মৃত্যু দিবস। চট্টগ্রামে আমার প্রথম যাত্রার দিন উনাদের দুইজনের সাথে একই গাড়িতে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়।

আব্দুর রহীম সাহেব আবদার করলেন উনার পিতার মৃত্যু দিবস উপলক্ষে পথে দুপুরের খাবারের দায়িত্বটা উনিই বহন করবেন। আমাদের ঢাকা থেকে রওয়ানার সময় সিদ্ধান্ত ছিল কুমিল্লায় হোটেলে থামলে আমরা দুপুরের খাবারটা সেরে নিব। কিন্তু কুমিল্লা পৌঁছে জানা গেল ঐ হোটেলটা এখন বন্ধ। তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠা হল হোটেল হাইওয়ে ইন-এ। সেখানে আমাদের কয়েকজন দায়িত্বশীলকে উপস্থিত দেখলাম। তারাই মেহমানদারী করতে চাইলেন কিন্তু ব্রিগেডিয়ার আব্দুর রহীম সাহেবের আবেগ অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা

www.pathagar.com

প্রদর্শন করে আমি নিজেই তাদের বারণ করলাম। তাদের শুধু একটি আবদার রাখা হলো, খাওয়া শেষে কুমিল্লার ঐতিহ্যবাহী মিষ্টান্ন রসমালাইটা তারা পরিবেশন করবেন।

মুসাফির হিসাবে হোটেলেই জোহর আসর একসাথেই পড়ে নিয়েছিলাম। মাগরিব সম্ভবত চট্টগ্রাম শহরের অদূরে কোন একটা মসজিদে আদায় করেছিলাম। ওখানে অনেকেই আমাকে চিনে হাত মেলাতে এগিয়ে আসে। বিশেষ করে ছাত্র যুবকদের একটি গ্রুপ নামাজ শেষে দরজার সামনে অপেক্ষা করছিল আমাদের হাতে হাত মিলানোর জন্যে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম তারা চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন কলেজের ছাত্র। এভাবে রাতের প্রথম ভাগেই পৌঁছে গেলাম চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে।

আমরা ৩০শে জুলাই দিনগত রাতের প্রথম প্রহরেই চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছার পর ৩১শে জুলাইয়ে সারা দিন বিশ্রামের সুযোগ পেলাম। এখানে একজন সুবেদার পেলাম আমার এলাকার মানুষ। কারাগারে, তাও আবার ঢাকা থেকে চালান হয়ে প্রথম দিনেই নতুন এবং ভিন্ন কারাগারে এলাকার একজন মানুষ পাওয়া মানসিক শান্তির একটা উপাদান যোগ করল। তাকে আমার ছেলে এবং ভাতিজার মোবাইল ফোন নাম্বার দিলাম। ওদের বলতে বললাম, ৩১শে জুলাই-এর কোন সময়ে কারাকর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে তারা আমার সাথে দেখা করে যায়। যথারীতি ৩১শে জুলাইয়ের বিকেল ৩ টায় আমার ছেলে ব্যারিস্টার নাজিব মোমেন এবং আইনজীবী মনজুর আনসারী এসে দেখা করে গেলেন। কিছু খাবারও এনেছিল তারা সাথে। ছেলে আইনজীবী হওয়ার কারণে কোর্টেও আমার পাশে থাকার সুযোগ পায়।

৩০শে জুলাই জেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আমাকে বলা হয়েছিল ১লা আগস্ট চট্টগ্রাম কোর্টের হাজিরা থেকে আসার সাথে সাথেই আমাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে। ছেলেকে সেটাই জানিয়েছিলাম যাতে তারা সেভাবেই ঢাকায় ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করে। নাজিব মোমেন বলেছিল তারা কুমিল্লার কাছাকাছি কোন এক হোটেলে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। অবশ্য কোর্ট থেকে ফিরে আসার পর আমাকে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে জেল কর্তৃপক্ষের পূর্ব সিদ্ধান্তের কোন আলামত দেখতে পেলাম না। আমার সাথীরা অবশ্য রাতে সফর না করা উচিৎ বলেই পরামর্শ দিচ্ছিলেন। বিকাল ২টা ৩টার মধ্যে রওয়ানা সম্ভব না হলে আমিও ঐ দিন ঢাকা রওয়ানা না করার কথাই জোরেশোরে বলেছিলাম। জেল কর্তৃপক্ষ বলতে থাকলেন, তারা চেষ্টা করছেন। আসরের সময় পার হবার পর আমি একটু চিন্তায় পড়ে গেলাম। ছেলে জানে, আজ দুপুরেই ঢাকার পথে রওয়ানা হওয়ার কথা। পূর্বের ধারণা অনুসারে কুমিল্লার কোন হোটেলের কাছে কতক্ষণ আমার জন্যে অপেক্ষা করে, বিলম্ব দেখে মানসিক চাপে থাকবে, ইত্যাদি চিন্তা পেয়ে বসল আমাকে। ঠিক মাগরিবের একটু আগে সুবেদার এসে বলে গেলেন, আগামী ভোর ৬ টায় আপনাকে পাঠানো হবে। আজ রাতে পুলিশের স্কোয়াড পাওয়া যাচ্ছে না। তাছাড়া আবার ৭ই আগস্ট কোর্টের তারিখ হওয়া মাত্র এই কদিনের জন্যে যাওয়া আসা ও সরকারের এত টাকা খরচের দরকার কী? এমন প্রশ্নই নাকি পুলিশের পক্ষ থেকে করা হয়েছে। আদালতের সিদ্ধান্ত পেতেই নাকি এত সময় লেগেছে।

চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের ডাক্তার বেশ ভাল মানুষ। মানবিক দৃষ্টিতেই রোগীদের দেখে থাকেন। বারডেম হাসপাতালে আমার চিকিৎসা চলছে, এই কারণ দেখিয়েই ঢাকা পাঠানোর ব্যাপারে আদালতকে রাজি করাতে তিনি সক্ষম হন। নতুবা রমজানের প্রথম সপ্তাহটা ওখানেই থেকে যেতে হত। যাইহোক আজ ১লা আগস্ট ঢাকা যাওয়া হচ্ছে না। যেতে হবে আগামী কাল ২রা আগস্ট ১লা রমজান। এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবার পর আমার এলাকার লোক হিসাবে সুবেদার সাহেবকে আবার দায়িত্ব দিলাম আমার ছেলে অথবা ভাতিজাকে ফোনে জানিয়ে দিতে যে আমার আজ যাওয়া হচ্ছে না। তারা যেন আমার জন্যে কোথাও অপেক্ষা না করে ঢাকায় চলে যায়। এরপর দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে আগামী কালের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে সাথীদের সাথে এশার নামাজের পর তারাবিহটা আদায় করে নিলাম।

www.pathagar.com

রমজানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সেহরীর এক দেড় ঘণ্টা আগে উঠে একটু আল্লাহ-বিল্লাহ করার অভ্যাস ছোটবেলা থেকেই গড়ে উঠেছে। প্রথম রোজার জন্যে সেহরী শেষে ফজরের নামাজ আদায় করে একটু ঘুমানো একান্তই অপরিহার্য। কিন্তু আমাকে ভোর ৬ টার মধ্যে তৈরী থাকতে বলেছে। এর অর্থ ফজরের পর আর বিশ্রাম নেয়া যাবে না। তারপরও আগের রাতেই সফরের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সেরে রাখলাম যাতে ফজরের পর প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নেয়ার সময় না হলেও বিশ্রাম নেয়ার কিছুটা সময় বের হয়। তাছাড়া এরা যে সময় বলেছে সেই সময় ঠিক রাখা তাদের নিজেদের পক্ষেও তো সম্ভব নাও হতে পারে। ১লা রমজানের শুভদিনে আমার চট্টগ্রাম থেকে ঢাকার লম্বা সফর রমজানের রুটিন অনুসরণের পথে একটা বড় বাধা হয়ে দাঁড়ালো। তারপরও তো কিছু করার নেই। জেল জীবনের এই বিড়ম্বনা থেকে তো আর রেহাই পাওয়ার কোন উপায় নেই। অবশেষে সকাল ৭টার দিকে রুম থেকে বের হলাম। কারাগারের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে সকাল ৭:৩০ টায় গাড়িতে উঠলাম। কিন্তু গাড়ী ছাড়তে আরো ঘণ্টা খানেক দেরি হল। বাবর সাহেব আসতে বিলম্ব করার কারণে। অবশেষে সকাল সাড়ে আটটার দিকে রওয়ানা করা সম্ভব হল। আমি গাড়িতে উঠেই ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলাম রাতে এবং সকালে তার ঘুম ঠিকমত হয়েছে কিনা, সে হাঁ সূচক জবাব দেয়ায় মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে আল্লাহর নামে নিরাপদ জার্নির আশায় রওয়ানা দিলাম।

কিছুদূর যাওয়ার পরই দেখা গেল ড্রাইভারের ঘুম পাচ্ছে। সে বলেই ফেলল অন্য একজন ড্রাইভারের ব্যবস্থা করতে। আরো শুনে বিস্মিত হতে হল, সে নাকি গতকাল সিলেট থেকে বিকেল ৪টায় রওয়ানা করে বেশ গভীর রাতে চট্টগ্রামে পৌঁছেছে। এমতাবস্থায় সে সকালে গাড়ী চালাতে এসেছে। আমার কাছে ব্যাপারটা যেমন অমানবিক মনে হল, তেমনি মনে হল সফরটাতো নিরাপদ নয়। কোন মতে মিরশ্বরাই থানায় পৌঁছে ড্রাইভারকে রোজা ভেঙ্গে চা নাস্তা খেয়ে একটু চাঙ্গা করার জন্যে পুলিশ স্কোয়াডের ইনচার্জের পক্ষ থেকে একটা চেষ্টা করা হল। অন্যদিকে পুলিশ স্কোয়াডের সাথে থাকা এস.বি-র লোক একদিকে বিষয়টা পুলিশ হেড কোয়ার্টারে অবহিত করল। এই সাথে বিকল্প ড্রাইভারের ব্যবস্থা করার জন্যে চেষ্টা চলল। পুলিশদের হেড কোয়ার্টার থেকে তো আমাকে চট্টগ্রাম কারাগারে ফিরে আসতে বলা হল। আমি আমার চিকিৎসার বিষয়টি বলার পর এসবির লোকটি বেশ আন্তরিকতার সাথে পুলিশের একজন ড্রাইভারকে ফোনে যোগাযোগের মাধ্যমে খুঁজে পেল। বেচারা ছুটিতে বাড়ি গিয়েছিল। ঐ সময়ে চট্টগ্রামের পথে রওয়ানা করে সে ফেনী পর্যন্ত পৌঁছলে তার সাথে যোগাযোগের জন্য তাকে ফেনী-চট্টগ্রাম জেলার সীমান্ত এলাকার মুহরী ব্রিজের উপর দাঁড়াতে বলল। ওখান থেকে সে কুমিল্লা পর্যন্ত গাড়ী চালিয়ে নিয়ে আসবে। আর এই সময়টিতে গাড়ীর মূল ড্রাইভারকে পেছনের সীটে ঘুমিয়ে নিতে বলা হয়েছিল। কুমিল্লা পর্যন্ত এসে বিকল্প ড্রাইভার নেমে গেল। মূল ড্রাইভার এরপর থেকে মোটামুটি ভালভাবেই ঢাকা পর্যন্ত গাড়ী চালিয়ে আসল। ইফতারের প্রায় ১ ঘণ্টা আগে আমি কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছলাম। যেহেতু এটা ছিল ১লা রমজান, তাই জেল গেটে পৌঁছেই দেখলাম এ এলাকার কর্মীরা কয়েকজন ইফতার সামগ্রী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের দায়িত্বশীল মফিজুর রহমানসহ। তার বাড়ি কুমিল্লায় হলেও এখন ব্যবসা করেন ঢাকায়। তার সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় বগুড়ায় আজ থেকে প্রায় ১৮/১৯ বছর আগে। আমি কারাগারে ফিরে এলাম। ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে কোর্টে হাজিরা দেয়ার এটিই ছিল সূচনাপর্ব। এই পর্বের আরও কিছু কথা মনে পড়ছে। চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে আদালতে যেতে পথের ধারে দেখলাম অসংখ্য মানুষ দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে সালাম দেয়ার চেষ্টা করছে। আমাদেরকে কারাগার থেকে আদালতে নেয়া হচ্ছিল একটি প্রিজন ভ্যানে, যাতে বসার কোন ব্যবস্থা নেই। আমরা সবাই দাঁড়িয়ে আছি। আশপাশের লোকেরা যেমন আমাদের দেখছে তেমনি আমরাও তাদের দেখতে দেখতে যাচ্ছি। গাড়ীর বেশ পেছনে অসংখ্য প্ল্যাকার্ডসহ বিরাট একটা মিছিল চোখে পড়ল। আমাদের জেলখানার সাথী মেজর জেনারেল (অব.) রাজ্জাকুল হায়দার আমাকে লক্ষ্য করে বললেন আপনি আসছেন বলেই আজকের এই

www.pathagar.com

লোক সমাগম। এর আগে আর কোন দিন এমনটি হয়নি। পুলিশের তৎপরতা ছিল চোখে পড়ার মত। রাস্তার লোকদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আদালত বিল্ডিংয়ের বারান্দা থেকে শুরু করে আদালত কক্ষেও ঢুকে পড়ে। আদালত কক্ষ থেকে বাইরের এলাকাটা লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। পুলিশ বাধা দিলে তারা জানায় এটাকি ক্যাঙ্গারু কোর্ট নাকি যে লোকদের আসতে মানা? পুলিশের পক্ষে আর বেশী কিছু করা সম্ভব হয়নি। আমি আসাতেই নাকি এমনটি হল।

ঐ দিন কোর্টে আমাদেরকে নেয়ার কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা ছিল না। শুধু কোর্টে নেয়ার জন্যেই আমাদের নেয়া হয়, এতে কোন সন্দেহ নেই। এরপরের তারিখটাও কাছাকাছি দেয়ার অর্থও ছিল একই। যাই হোক চট্টগ্রামে ২০১০ সালে মার্চের দিকে লাল দীঘি ময়দানে বিশাল জনসভার পর এটাই ছিল আমার প্রথম উপস্থিতি। সফরের কষ্টের কথা বিশেষ করে ঢাকা-চট্টগ্রাম যাওয়া আসার কষ্টের কথা পরিবারের সদস্যদের সাথে আলাপের এক পর্যায়ে আমার মেয়ে মুহসিনা বলল আব্বু তো সফরেই থাকতেন। চট্টগ্রামে হাজিরা দেয়ার জন্য যখন যাবেন তখন মনে করবেন সফরে যাচ্ছি, তাহলে আর এত খারাপ লাগবে না বা কষ্টের অনুভূতি হবে না। আমার মামনি মহসিনার সান্ত্বনাসূচক কথাটি আমার বেশ ভাল লাগল।

চট্টগ্রামে হাজিরা দিতে গিয়ে আদালতে অসংখ্য নেতা-কর্মীদের সাথে দেখা হয়। তারা প্রাণভরে দোয়া করে আবেগ আপ্লুত হয়ে হাত মেলাতে আসে। পুলিশের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের উপচে পড়া ভিড়ের এ পর্যন্ত কমতি হয়নি। তাছাড়া আসা যাওয়ার পথে গ্যাস স্টেশনে তেল নেবার সময় অথবা হোটেল রেস্তোরাঁয় নেমে এস্তেঞ্জা, অজু, নামাজ ও খাবার সময় প্রায়ই ২/৪ জন পরিচিতদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ তথা কুশল বিনিময়ের সুযোগটাও একটা বাড়তি পাওনা। সেই সাথে আসা যাওয়ার পথে মুক্ত আকাশ ও সবুজ শ্যামল ফসলের ক্ষেত দেখতেও মনে একটা অন্য রকম অনুভূতির সৃষ্টি হয়। আমি কৃষিমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালনের সময় সড়ক পথে সফরকালে ফসলের জমিন দেখতে দেখতে যেতাম আর মনে মনে কবির কথাটি স্মরণে আনতাম 'সবুজ আমার ওরে আমার সবুজ দেশ। মাঠের পরে মাঠ চলেছে নাইকো তাহার শেষ'। তখন থেকে গড়ে উঠা এই অভ্যাস আমার স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ফলে পথ চলতে গাড়িতে বসে ডানে বায়ে যতদূর চোখের দৃষ্টি যায় আমি আমার প্রিয় জন্মভূমির সবুজে ভরা ফসলের মাঠ দেখতে দেখতে যাই। ঢাকা চট্টগ্রাম যাওয়া আসার সুযোগে এটা প্রাণ জুড়ানোর অবলম্বন বলা চলে।

আমি ১লা আগস্ট চট্টগ্রাম আদালতে হাজিরা দেবার পর পুনরায় হাজিরার তারিখ দেয়া হল ৭ ই আগস্ট। ঐ দিনে হাজিরার নিশ্চয়তা নিয়ে আদালত চট্টগ্রাম জেল কর্তৃপক্ষকে অনুমতি দেয় আমাকে ঢাকা পাঠানোর। ৭ই আগস্ট কোর্টে হাজিরার জন্যে ৬ই আগস্ট ঢাকা থেকে আবার চট্টগ্রাম নেয়ার ব্যবস্থা করেন কারা কর্তৃপক্ষ। রওয়ানা দিতে বেশ একটু দেরীই হল। রমজান মাস হওয়ার কারণে পথে খাবারের ঝামেলা ছিল না। তবে এস্তেনজা, অজু ও নামাজের জন্যে গ্যাস স্টেশনেই সব সেরে নিতে হলো। আশা করা হয়েছিল, চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছে ওখানে অবস্থানরত সাথীদের সাথেই ইফতার করতে পারব। কিন্তু যানজটের কারণে তা সম্ভব না হওয়ায় গাড়িতেই খেজুর আর পানি দিয়ে ইফতার সেরে নিলাম। চট্টগ্রাম সিটি গেটে কর্মী ভাইয়েরা ইফতার সামগ্রী হাতে নিয়ে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু পুলিশ স্কোয়াডের ইনচার্জ তাদেরকে দলীয় লোক হিসাবে অভিহিত করে গাড়ীর কাছেই ভিড়তে দিল না। বেচারারা হতাশ হয়ে অনেকক্ষণ গাড়ীর পেছনে পেছনে দৌড়েও কোন সুবিধা করতে না পেরে মনে একরাশ কষ্ট নিয়ে ফিরে গেল; এটা আমি আমার হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করলাম।

৭ই আগস্ট আদালতে হাজিরা দেয়ার পর কারাগারে ফিরে এলাম। আবার ৮ই আগস্টও কোর্টে যেতে হল। ঐ দিন কোর্ট থেকে আসার সাথে সাথে আমাকে জানানো হল ২টার মধ্যে প্রস্তুত থাকতে। আমি বিকেলে যেতে অস্বীকৃতি জানালাম কারণ বিকেলে রওয়ানা করলে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছাতে কত

www.pathagar.com

রাত হবে বলা যায় না। সারা দিন রোজা থেকে রাতে ওখানে ফিরে খাবার খেতে পারবো কিনা সে ব্যাপারে যেমন আশংকা ছিল, তেমনি তারাবিহটা পড়তে না পারার ব্যাপারটা ছিল বেশী দুশ্চিন্তার। কারণ আমি ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর একজন গোনাহগার বান্দা হলেও রমজান মাসটা মনের পূর্ণ আবেগ দিয়ে ইবাদত করে কাটানো ছোট বেলা থেকেই আমার অভ্যাস। তারাবিহর জামায়াত থেকে নিজেকে কখনও বঞ্চিত করতে চাইনি, আল্লাহও সুযোগ দিয়েছেন পূর্ণ ইহতেসামের সাথে তারাবিহতে শরীক হতে এবং শেষ দশদিনের এতেকাফ করতে। জেলকর্তৃপক্ষ অত্যন্ত চাপ সৃষ্টি করেই আমাকে ঢাকায় রওয়ানা করালো বেলা তিনটার দিকে।

আমি ইফতার ও মাগরিবের নামাজের জন্যে কুমিল্লার কাছে হোটেল হাইওয়ে ইন-এ উঠার জন্যে অনুরোধ করলে পুলিশের স্কোয়াডের ইনচার্জ একটু দৃঢ়ভাবেই অস্বীকৃতি জানালেন। আমি বললাম, আমিতো ডায়াবেটিক রোগী। সারাদিন রোজা শেষে ইফতারের সুযোগ না পেলে আমার অসুবিধা হতে পারে। পুলিশ স্কোয়াড ইনচার্জ বেশ রুক্ষ ভাষায় বলল তারা কোন হোটেলে ইফতার করতে পারবে না। অবশেষে গ্যাস নেয়ার জন্যে একটা গ্যাস স্টেশনে থামালো, আমি ওখানে নেমে ইস্তেনজা, অজু সেরে আসরের নামাজ আদায় করে নিলাম। স্টেশনের ম্যানেজার থেকে শুরু করে সব পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে মনে হল আমাকে তারা সবাই চিনেছে। সবাইকে খুবই আন্তরিক মনে হল। ম্যানেজার সাহেব পুলিশদের কাছে বলেছে উনি নাকি আমার ভক্ত। আমাদের সংগঠনের মধ্যে ভক্ত কথাটি চালু নেই। তাতে মনে হল তিনি আমাদের সংগঠনের কেউ নন; তবে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে ভালো জানেন। আসরের নামাজ আদায় করে গাড়িতে উঠে বসলাম। অল্প পরেই চৌদ্দগ্রাম থেকে বেশ দূরে একটা জায়গায় ইফতারের সময় অনেক বাকী থাকতেই পুলিশ কর্মকর্তা বললেন, হাইওয়ে ইনে যেতে পারব না। ইফতার এইখানে সেরে নিতে হবে। আমি বললাম, এখানে ইফতার করতে হলে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। এই সময়ে তো বেশ কিছু পথ এগিয়ে থাকা যেতো।' বেশী রাত হলে ঢাকায় পৌঁছাতে অসুবিধা হবে। বিশেষ করে ঢাকা শহরে ট্রাক ঢুকে পড়লে যানজট ভয়াবহ রূপ নেয়। তাতে কেন্দ্রীয় কারাগারে সেহরীর আগে পৌঁছাতে পারব কিনা আশংকা হয়। তাছাড়া আমার জন্যে ২/১ জন দায়িত্বশীল হাইওয়ে ইন-এ অপেক্ষা করতে পারে। আর এই হোটেলটার নাম ইতঃপূর্বে কোনদিন শুনিনি। পরিচিত কাউকে না পেলে কেমন হবে? ইত্যাকার নানা চিন্তা নিয়ে হোটেলে ঢুকলাম।

হোটেলটির নাম "রয়েল হোটেল"। আমি নামতেই দেখলাম একটা টেবিল বিশেষভাবে রাখা আছে। সেখানে আমার সাথের পুলিশ স্কোয়াডদের নিয়েই বসলাম। ইফতারের আয়োজনটা মোটামুটি বেশ ভালই মনে হল। অথচ এখানে আমার তো ইফতার করার কথা ছিল না। যারা বেশ ব্যস্ততার সাথে ইফতারের আয়োজন করছিলেন, তাদের কেউই আমার পূর্ব পরিচিত বলে মনে হল না। মনে হল, এরা বোধ হয় এ হোটেলেরই ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত, অথবা গ্যাস স্টেশন ম্যানেজার যেভাবে চিনতে পেরে বিশেষ খাতির যত্নের চেষ্টা করেছেন, এরাও সেরকমই হবে।

আমি কিছুটা পূর্ব সতর্কতার জন্যে যাকে দায়িত্বশীল মনে হল, তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, বিল কত হতে পারে? কারণ ছিল একটাই, আমার পিসির টাকা ছিল পুলিশ কর্মকর্তার কাছে। বিল আমার পক্ষে তিনিই পরিশোধ করবেন। পথে খরচের জন্যে যে পরিমাণ টাকা আলাদা করে রাখা হয়েছে তাতে হবে কিনা এ নিয়েই একটু চিন্তিত ছিলাম। আমার প্রশ্নের সাথে সাথে যাকে আমি হোটেলের ম্যানেজমেন্টের কেউ মনে করেছিলাম, তিনি বললেন, "বিল দিতে হবে না"। আমি এখানকার থানা আমীর। জেলা আমীর থেকে নির্দেশ এসেছে ইফতারের সব ব্যবস্থা যথাযথভাবে করার জন্যে। তিনি তার নাম পরিচয় বললেন। আবদার করলেন, অন্য হোটেল থেকে খিচুরি এনে খাওয়ানোর। পুলিশ কর্মকর্তা আবারও একই মেজাজে না করলেন। থানা আমির ওনাকে বললেন যে, আপনাদের থানার পাশে হোটেল অফবিট এর সামনে একটু দাঁড়াবেন, ৫ মিনিটের মধ্যে প্যাকেট খিচুরি দিয়ে দেয়া হবে।

www.pathagar.com

পুলিশ কর্মকর্তা এই শর্তে রাজি হলেন, হোটেলের সামনে যেন কোন জটলা না হয়। হোটেল রয়েল থেকে ইফতার শেষে মাগরিবের নামাজ আদায় করে আমরা আবার গাড়িতে উঠলাম, গাড়ী ছাড়ার আগেই কর্মী ভাইদের কয়েকজন হোন্ডা নিয়ে হোটেল অফবিটের দিকে দ্রুত চলে যায়। হোটেল রয়েল থেকে আগেই এখানে তাদেরকে প্যাকেট রেডি করে রাখতে বলা হয়েছিল। অতএব মোটেই দাঁড়াতে হয়নি। ঝটপট তারা বারটি প্যাকেট গাড়িতে দিয়ে দিল। আমরা মানুষ ছিলাম ড্রাইভার ও স্কোয়াডসহ ৮ জন। ভায়েরা প্যাকেট দিলেন ১২টি। পুলিশ কর্মকর্তা যিনি পূর্বে বিরক্ত হচ্ছিলেন, তিনি সবাইকে এক প্যাকেট করে দেবার পর অতিরিক্ত চার প্যাকেট নিজের কাছে রেখে দিলেন।

"অফবিটের" ভুনা খিচুরি আসলেই ছিল খুবই সুস্বাদু। তবে আমি কোন মতেই প্যাকেটের অর্ধেকের বেশী খেতে পারলাম না। পুলিশদের মধ্য থেকে অপেক্ষাকৃত কম বয়সের একজনকে বাকীটা খেতে দিলাম। ঘটনাক্রমে মিয়া বাজার পৌঁছাতেই গাড়ীর চাকা পাংচার হয়ে যায়। কোনমতে বাজারের মধ্যেই এক কোনায় গাড়ী থামিয়ে চাকা পরিবর্তনের চেষ্টা করতে গিয়ে দেখা গেল আমাদের গাড়ীর জ্যাক কাজ করছে না। ড্রাইভার পাশের কোন গাড়ী থেকে একটা জ্যাক যোগাড় করে চাকা পরিবর্তন করতে প্রায় ৪৫/৫০ মিনিট সময় লেগে গেল। ফলে ঢাকা শহরে ট্রাক ঢোকার আগে আমরা শহরে ঢুকতে না পারায় কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছাতে রাত ১২:০০ টায় হয়ে যায়। আর গেটের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে সেলে পৌঁছি রাত সাড়ে বারটায়। খিচুরিটা না খেলে কী যে অবস্থা হত।

তৃতীয় দফায় আমাকে চট্টগ্রাম যেতে হয় ২০১১ এর ৯ সেপ্টেম্বর। কোর্টে হাজিরার একদিন আগেই নিয়ে যাওয়া হয়। পথে খাওয়ার এবং নামাজের জন্যে সম্ভবত "ঠরঃধ ডড়ৎষফ" এ থামতে হয়। এদিন আমি একাই ছিলাম। ওজু এস্তেঞ্জা ও নামাজ সেরে দুপুরের খাবারটা বেশ নিরিবিলি পরিবেশেই খেয়ে নিলাম। পরের দিন কোর্টে হাজিরার পরেই ঢাকায় পাঠানোর ব্যবস্থা করল জেল কর্তৃপক্ষ। আমি বেশ জোরেশোরেই আপত্তি করলাম এত রাতে ঢাকায় পৌঁছতে আমার বেশ কষ্ট হয়। কাল সকালে বাকী সাথীদের সঙ্গেই আমাকে পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। আগের দিনও আমি জেল কর্তৃপক্ষকে বলেছিলাম, বিকেলে আমাকে পাঠাবেন না। একই সাথে উনারাও দুজন বলেছিলেন। উনাদেরকে ঠিক ঠিকই পরের দিন সকালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু আমার ব্যাপারটা বিবেচনা করা হল না। উল্টো আমাকে অনুরোধ করা হল তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্যে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হল যেতে না চাইলে তারা জোর করেই পাঠিয়ে দেবে। তা আমার জন্যে হবে অসম্মানজনক। তাই একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হয়ে গেলাম। আমার অন্য সাথীরা আমাকে না যেতে পরামর্শ দিচ্ছিলেন। আমি তাদের পরামর্শ অনুযায়ী অনেকক্ষণ দরকষাকষি করতে থাকলাম কোন ফায়দা হল না। অবশেষে আমি বললাম যদি যেতেই হয় তাহলে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করুন। বেশি রাতে ঢাকায় ট্রাক ঢুকে পড়লে যানজটের যে অবস্থা সৃষ্টি হয়, তাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছতে রাত শেষও হয়ে যেতে পারে। আজকেই যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেও বিকেল চারটার আগে তারা বের হতে পারল না।

যাহোক অবশেষে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। পুলিশ স্কোয়াডের ইনচার্জ এবং এসবির লোকটা বেশ সহানুভূতিশীল হওয়ায় নিজের পছন্দমত এবারে হোটেল "মিয়ামীতে" উঠে এস্তেঞ্জা অজু ও মাগরিবের নামাজ আদায় করলাম, অবশ্য অনেক দেরীতে। রাতের খাবারটাও আমি সেখানে সেরে নিলাম। পুলিশের পক্ষ থেকে একটাই আশংকা বার বার ব্যক্ত করা হল, যদি মিডিয়ায় খবর বের হয় তাহলে নাকি তাদের চাকরির অসুবিধা হতে পারে। যাহোক এ যাত্রায় কোন অসুবিধা হয়নি।

এরপরে চট্টগ্রামে হাজিরার তারিখ ছিল ০৩ অক্টোবর ২০১১। সম্ভবত এ দিন আমাদের তিনজনকে আলাদা আলাদা গাড়িতে হলেও একইদিনে একই সময়ে নিয়ে যায়। আমাদের সফর সঙ্গী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আঃ রহীম সাহেবের পছন্দের হোটেল "হাইওয়ে" এসেই আমরা এক সাথে ঢুকলাম, নামাজ আদায় শেষে এক টেবিলে বসে খাওয়া দাওয়া শেষে একসাথেই বের হয়ে গাড়িতে উঠলাম। কিন্তু

www.pathagar.com

পরের দিন জনকণ্ঠে খবর ছাপা হল আমি নাকি সেখানে দলীয় লোকজন নিয়ে গোপন মিটিং করেছি। জনকণ্ঠের এই মিথ্যা প্রতিবেদনকে কেন্দ্র করে জেল প্রশাসন ও পুলিশের মধ্যে বেশ নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া হয়। যদিও গোয়েন্দা রিপোর্টে এবং এসপির (কুমিল্লা) বক্তব্যে গোপন মিটিংয়ের কথা সত্য নয় বলে উল্লেখ করা হয়, তারপরও নাকি ১৫ জন পুলিশের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তাই ফেরার পথে আগের মত নামাজ এবং খাবারের জন্যে সুযোগ না দেয়ার ব্যাপারে পুলিশকে অনমনীয় মনে হল। তারা প্রস্তাব করল কোন হোটেল থেকে প্যাকেটের খাবারের ব্যবস্থা করতে, কুমিল্লা পার হয়ে কোন ফিলিং স্টেশনে তারা থামিয়ে খাবার ব্যবস্থা করবে। অবশেষে কুমিল্লা শহর এবং ক্যান্টনমেন্ট পার হয়ে রূপায়ন নামের নিরিবিলি একটি হোটেলে তারা থামতে রাজি হল। আমি এস্তেঞ্জা অজু ও নামাজ শেষে এখানেই খাবার (দুপুরের) খেয়ে ঢাকার পথে রওয়ানা দিলাম। হোটেলটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কিন্তু একেবারেই নিরিবিলি। কোন গাড়ীর ভিড় দেখলাম না। পথে আর নামার সুযোগ হয়নি, দরকারও হয়নি। আমি গাড়িতেই মাগরিব আদায় করে নিলাম। অন্য দিনের তুলনায় বেশ সকাল সকাল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছে গেলাম।

আমার সাথীরা আমার কিছু পরে রওয়ানা করেন। আমরা রূপায়ন হোটেল থেকে বিদায়ের মুহূর্তে আমাদের গাড়িতে আসা পুলিশদের কেউ তাদের স্কোয়াডের সাথে আলাপ করে জানলেন, তারা কুমিল্লার কাছাকাছি কোন গ্যাস স্টেশনে অবস্থান করছেন। ঢাকায় পৌঁছার পর তাদের কাছে শুনলাম তারা খাবারের ও নামাজের জন্যে একটা ভাল জায়গার সন্ধান পেয়েছেন। সেখানে খাবারের মানও ভাল, আবার বেশ সস্তাও। তবে আমার নিকট থেকে নিরিবিলি পরিবেশের কথা শুনে রূপায়নই ঠিক করার পরামর্শ দিলেন।

০৩ অক্টোবর ২০১১ এর পরে চট্টগ্রামে হাজিরার দিন ধার্য হয় ২৫ অক্টোবর ২০১১ তে। এজন্যে আমাকে ২৪ অক্টোবর ২০১১ সকালে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করতে হল। আমার সাথী দুজনের ঢাকায় মামলার হাজিরা থাকায় তাদেরকে বিকেলে নেয়ার ব্যবস্থা হয়। এবার আমি পথে খাবার জন্যে ২৬ সেলের চৌকা থেকে পরাটা বানিয়ে নিয়ে যাই। পুলিশের স্কোয়াডের জন্যেও ব্যবস্থা করা হয়। এডভান্স সিএনজি ফিলিং স্টেশনে নেমে অজু এস্তেঞ্জা করে নামাজ আদায় করার পর উক্ত স্টেশনের একটা নিরিবিলি রুমে আমাকে বসতে দেয়া হল। ওখানে বসেই আমরা খাবারটা খেয়ে নিলাম। পুলিশের স্কোয়াডের জন্যে আনা খাবারটা তারা খেয়ে নিল। এডভান্স ফিলিং স্টেশনের সাথে পপুলার ফুড প্যালেস নামে একটা হোটেলও আছে। ওখান থেকে আমাকে ভাত এনে খাওয়ানোর জন্যে আমাকে তারা অনুরোধ করল। কিন্তু পুলিশের কড়াকড়ির কারণে আমি এবারে তাদের অনুরোধ রাখতে পারিনি।

কুমিল্লা থেকে জোহর আসর একসাথে আদায় করে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে মাগরিবের কিছু পরেই চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছে যাই। মাগরিব আদায় করে নেই গাড়িতেই। আমার সাথী বাকী দুইজন পৌঁছেন মধ্য রাতের দিকে। এ দিনেও চার্জ গঠন না করে ১৪ নভেম্বর ২০১১ তে আবার তারিখ দেয়া হল। ২৬ অক্টোবর সকালের দিকে রওয়ানা করলাম ঢাকার দিকে। এবারে পুলিশের স্কোয়াড ইনচার্জ "এডভান্স সিএনজি ফিলিং স্টেশনে" থামতে রাজি হওয়ায় বেশ সুবিধা হল। ড্রাইভার সাধারণদের জন্যে নির্দিষ্ট এস্তেঞ্জার ও অজুর জায়গায় গাড়ী সরাসরি নিয়ে গেলে ওখানকার কর্তৃপক্ষ গাড়ী পিছিয়ে নিতে বলল এবং আমাকে মালিকের রুমে বসতে দিল। রুম সংলগ্ন বাথরুমে আমি অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে এস্তেঞ্জা ও অজু সেরে দোতলায় গিয়ে নামাজ আদায় করে এলাম। ইতোমধ্যেই মালিকের রুমে আমাকে ও পুলিশের ইনচার্জকে খাবারের জন্যে বসতে অনুরোধ করল। বাকীদেরকে হোটেলে বসিয়ে খাবার ব্যবস্থা করল। এখানে কয়েক প্রকারের ভর্তা ভাজি ছোট মাছের (মলা মাছ, খলসে মাছ ও টেংরা মাছের) তরকারি দিয়ে বেশ তৃপ্তির সাথে খেলাম। মালিক পক্ষের আতিথেয়তা পুলিশের লোকেরাও বেশ খুশি হল।

www.pathagar.com

১৪ নভেম্বর ২০১১ তারিখে কোর্টে হাজিরার জন্যে আবার ১৩ নভেম্বর ২০১১ তারিখে ঢাকা ত্যাগ করতে হল সকালের দিকে। সাথে খাবার নিয়েই যেতে হল। কারণ ঢাকা থেকে পুলিশ স্কোয়াড হিসাবে যারা যায়, তারা বেশি সতর্কতা অবলম্বনের জন্যে কোনও খাবার সুযোগ দেয় না। এডভান্স সিএনজি স্টেশন থেকে গ্যাস নিতেও রাজি হল না। রাস্তার ধারে একটা ফাঁড়িতে থামলো। আমি চৌদ্দগ্রাম থানায় নিয়ে যেতে বললাম তাতেও তারা রাজি হল না। রাস্তার ধারের ফাঁড়িতে থামিয়েই ড্রাইভারকে পাঠানো হল পাশের কোন হোটেল থেকে খাবার আনতে, অবশ্য আমাকে না বলেই। আমার খাবার তো গাড়িতে ছিল। কিন্তু গাড়ী নিয়ে খাবার আনতে যাওয়ার কারণে আমার খাবারও আমি খেতে পারছিলাম না। ডায়াবেটিসের রোগী হিসাবে আমার বেশ কষ্ট হচ্ছিল। অবশেষে আসর নামাজ শেষে অনেকক্ষণ অপেক্ষায় থাকার পর খাবার এলো। তাদের পছন্দ মত গরুর গোশ্ত এবং সবজি ও ভাত নিয়ে আসে। আমি শুধু সবজি নিয়ে অল্প কিছু ভাত খেয়ে নিলাম। ফাঁড়ির ইনচার্জ আমার এলাকার এবং এক বন্ধুর ছেলে হওয়ার কারণে প্যাকেটের খাবার প্যাকেটে খেতে হয়নি। তার পক্ষ থেকে প্লেট গ্লাসের ব্যবস্থা হওয়ায় একটু সুবিধা পেলাম।

চট্টগ্রাম জেল গেটে পৌঁছার পর পুলিশ স্কোয়াডের ইনচার্জ সাহেব বললেন, পিসিতে তিন হাজার টাকা জমা দেবার কথা আর বাকী দেড় হাজার দিয়েছিল পথে খাবারের জন্যে, ঐ দেড় হাজার টাকা কি আপনার না জেল কর্তৃপক্ষের? আমি বললাম যে সবটাই আমার। এখানে জেল কর্তৃপক্ষের কোন টাকা নেই। এরপর বেচারা পথে হোটেল থেকে খাবার আনতে এক হাজার টাকা খরচের জন্যে (বিনা অনুমতিতে) দুঃখ প্রকাশ করল। আমি সাধারণত তাদেরকে সাথে নিয়ে খাবার খেয়ে থাকি। বিলটা কোন শুভাকাঙ্ক্ষী উপস্থিত থাকলে তারাই দিয়ে দেয়। এ পর্যন্ত আমাকে খাবার জন্যে কোথাও বিল দেয়ার সুযোগ হয়নি। পুলিশের লোকদেরকে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা আসার পথে এবং ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম যাবার পথে খাবারের জন্যে কিছু টাকা দিয়ে দিতাম। এবার তারা আমার কথা উপেক্ষা করার জন্যে তাদের ফেরার পথে খাবারের জন্যে আর কিছু দিতে মন চাইল না।

এবারে কোর্টের কার্যক্রম ১৪ নভেম্বর ২০১১ তে শেষ না হওয়ায় ১৫ নভেম্বরও কোর্টে যেতে হল। আমাকে ঢাকায় পাঠানো হল ১৬ নভেম্বর ২০১১ তারিখে। এবারের স্কোয়াড ইনচার্জকে বেশি কাঠখোট্টা মনে হল। কোন কথা না শুনে রাস্তার পাশে একটি পুলিশ ফাঁড়িতে নামালেন। ফাঁড়িটাকে একটা গুদাম ঘরের মত মনে হল। ওখানে নামিয়ে "হোটেল নুর জাহান" থেকে খাবারের প্যাকেট আনার প্রস্তাব করলে আমি সোজা না করে দিলাম। আমার পিসির তিন হাজারের অতিরিক্ত এবারে টাকা ছিল মাত্র পাঁচশত। এতে সকলের খাবার যেহেতু হবে না, তাই আমার জন্যে পাউরুটি আর কলা আনতে বললাম। পাউরুটি নাকি পাওয়া গেল না তাই প্যাটিস এবং বিস্কুট ও কলা নিয়ে এল। আমি প্যাটিস না খেয়ে ফিরিয়ে দিলাম এবং কয়েকটা কলা ও বিস্কুট খেয়েই রওয়ানা দিলাম। অবশ্য ইতোমধ্যেই এস্তেঞ্জা অজু ও নামাজের পর্বটা সেরে নিয়েছিলাম। ঐ ফাঁড়ির ইনচার্জ নাকি পাবনার আতাইকুলা থানায় চাকরি করেছেন। সে জন্যে সে তার সাধ্যমত সহযোগিতার চেষ্টা করল। কিন্তু ঐ জায়গায় তেমন কিছু করার ছিল না। উনি আমার সাথের স্কোয়াড ইনচার্জকে অনুরোধ করলেন, "স্যার ডায়াবেটিসের রোগী তাই পথে কোন কিছু খাওয়ানোর ব্যবস্থা করবেন। তারা একথাকে আদৌ গুরুত্ব দিয়েছে বলে মনে হয়নি। ঐ কলা বিস্কুট খেয়েই সারা দিন কেটে গেল। রাতে ঢাকা গেটে পৌঁছলাম মাগরিবের কিছু পরেই। পিসিতে তিন হাজার টাকা জমা দেবার পর ওদের হাতে অতিরিক্ত পাঁচশত টাকার প্রায় সবটাই বেঁচে যায়। কলা বিস্কুটের দাম ছাড়া। পরিমাণ কত? তারা তা বলেনি। ইনচার্জ আমাকে জিজ্ঞাসা করল এটা কী করব? বললাম ওটা আর দরকার নেই আপনারা নিয়ে যান পথে চা টা খেয়ে নেবেন। দিনটা বেশ ভয়ে ভয়ে কাটে, সুগার লেভেলটা বেশি নেমে যাবার আশংকায়। কিন্তু আল্লাহ বড়ই মেহেরবান। রুমে পৌঁছেই সুগার টেস্ট

www.pathagar.com

করলাম মনে সাহস ফিরে পেলাম সুগার লেভেল ৭ এর কিছু উপরেই ছিল। অতএব সারা দিনের দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল। আল্লাহর সরাসরি সাহায্যের এটা ছিল একটা নমুনা।

এরপর ২৯ নভেম্বর ২০১১ তে চট্টগ্রাম কোর্টে হাজিরা দেয়ার জন্যে ২৮ নভেম্বর ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি। এবারও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আর পিসিতে জমা দেবার মত টাকার বাইরে কোন টাকা নেব না। কারণ ঐ টাকাটাকে পুলিশের ইনচার্জ মনে করে জেল কর্তৃপক্ষ পথে খরচের জন্যে দিয়ে থাকে। এবং সুযোগ মত তারা তাদের মর্জিমত খরচ করে ফেলে। এবার একটা টিফিন বক্সে রুটি, ভাজি নিয়েছিলাম। তারা আমার পছন্দের জায়গায় নামতে রাজি না হয়ে রাস্তার ধারে একটি হাইওয়ে ফাঁড়িতে গাড়ি থামল। আমি এস্তেঞ্জা, অজু ও নামাজ শেষে আমার টিফিন বক্সে আনা খাবার খেয়ে নিলাম। তারা পালাক্রমে হোটেলে গিয়ে তাদের মত করে খেয়ে আসার পর চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। শহরে পৌঁছে রাতের খাবার খেয়ে এশার নামাজ পড়ে শুয়ে পড়লাম। চট্টগ্রাম কারাগারের একজন ডাক্তারকে খুবই আন্তরিক পেয়েছিলাম। ডাকলেই দৌড়ে আসতেন। কিন্তু এই দিন তিনি উপস্থিত না থাকায় খবর দিয়েও আর কোন ডাক্তার পাওয়া গেল না। ব্লাড প্রেসারের অবস্থাটা তাই জানাও গেল না। তবে সাধারণত দীর্ঘ সফরে ব্লাড প্রেসার একটু হলেও পড়তেই থাকে। তবে এজন্যে কোন চিন্তা মাথায় না নিয়ে প্রয়োজনীয় ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়লাম। পরের দিন সকালেও কোর্টে যাবার আগ পর্যন্ত কোন ডাক্তার পেলাম না। অবশ্য বিকেলে কোর্ট থেকে ফিরে এসে কিছুক্ষণের মধ্যে ডাক্তার পেয়ে গেলাম। তিনি পরের দিন সকালেও দেখে গেলেন। আল-হামদুলিল্লাহ কোন সমস্যা হয়নি। প্রেসার মোটামুটি স্বাভাবিক পর্যায়েই ছিল।

২৯ নভেম্বর ২০১১ এর পরবর্তী তারিখ দেয়া হয় ৯ ডিসেম্বর ২০১১। আমাকে ৩০ নভেম্বর ঢাকায় পাঠানোর ব্যবস্থা হল। এ দিনও চট্টগ্রাম-ঢাকা লম্বা এই পথে কোথাও খাওয়ার সুযোগ দেয়া হয়নি। আগের মতই পথে সাথের সম্বল কলা বিস্কুট খেয়ে ঢাকায় পৌঁছি। পরবর্তী তারিখ ৯ ডিসেম্বর আমাকে চট্টগ্রাম যেতে হয়নি। বিএনপি তথা ২০ দলের রোড মার্চের কারণে উক্ত তারিখ পরিবর্তন করে ২৪ জানুয়ারী ২০১২ ধার্য করা হয়।

২৪ জানুয়ারি চট্টগ্রাম আদালতে হাজিরা দেয়ার জন্যে আমাদেরকে ২৩ জানুয়ারী ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে সকালের দিকে রওয়ানা করতে হল। এবারেও পুলিশের একই কথা, তাদের প্রতি নাকি নির্দেশ থানা বা পুলিশ ফাঁড়ি ছাড়া অন্য কোথাও থামাতে পারবে না। যে কথা সেই কাজ। কথা হল চৌদ্দগ্রাম থানায় থামবে। ওখানেই এস্তেঞ্জা, অজু, নামাজ ও খাওয়া সেরে নিতে হবে। আমি কাঁচপুর ব্রিজ পার হবার পরপরই নিকটবর্তী একটি ফিলিং স্টেশনে থামাতে বললাম এস্তেঞ্জা করার জন্যে। এতে পুলিশ স্কোয়াডের ইনচার্জ ধরে নেয় যে আর চৌদ্দগ্রাম থানায় যাওয়ার বা থামার প্রয়োজন নেই। আমার ভীষণ রাগ হলেও স্বভাবসুলকভাবে রাগটা চেপেই বললাম, আমি ডায়াবেটিক প্যাসেন্ট আমাকে খেতে হবে, 'সেই সাথে নামাজও পড়তে হবে। শুরুতেই এই পাকা-পাকা কথা হওয়া সত্ত্বেও চৌদ্দগ্রাম থানা এলাকা পার হয়ে এলেন। থামালেন না কেন? আমাকে নামাজের এবং খাবারের সুযোগ দিতে হবে।' অবশেষে কুমিল্লা জেলার সীমানা পেরিয়ে ফেনী জেলার মধ্যে একটি হাইওয়ে ফাঁড়িতে থামানোর ব্যবস্থা হল। আমি এখানে থেমে এস্তেঞ্জা, অজু সেরে নামাজ আদায় করে নিলাম। এরপর সাথে আনা টিফিন বক্স থেকে কয়েকটি রুটি ও সবজি দিয়ে আমার দুপুরের সংক্ষিপ্ত খাবার শেষ করলাম। পুলিশের লোকেরা ও ড্রাইভার পাশের কোন হোটেল থেকে খেয়ে আসার পর আবার রওয়ানা দিলাম চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের উদ্দেশ্যে। এবারে রাস্তায় হাতে আর কোন টাকা নেইনি। যেহেতু পথে খাবার সুযোগ দিতে তারা মোটেই রাজি হয় না। অতএব অফিসে পিসিতে জমা দেয়ার জন্যে ন্যূনতম একটা এমাউন্ট (২৫০০) নিয়ে রওয়ানা হই এবং গন্তব্যস্থলে (চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে) পৌঁছে ওটা জেল কর্তৃপক্ষের

www.pathagar.com

হাতে পিসিতে জমা দেয়া হয়। এবারে আর আগের মত পুলিশের পথে খাবার জন্যে কিছু দেয়া হল না। দেয়ার সুযোগ ছিল না।

এবারে ২৪ জানুয়ারী এবং ২৫ জানুয়ারী ২ দিনই আদালতে হাজিরা দিতে হল। এই দুই দিনে আমার বিরুদ্ধে একেবারে বানোয়াট সাক্ষী দিলেন প্রাক্তন সচিব ড. শোয়েব ও বিসিআইসি চেয়ারম্যান ও অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল ইমামুজ্জামান। দুজনের মিথ্যাচারের ধরন দেখে এবং কথা শুনে সত্যি অবাক হলাম। মূলত এই দুই ব্যক্তিকে দিয়ে ১৬৪ ধরায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দেওয়ানোই হয় আমাকে ফাঁসানোর জন্যে। এই দুই ব্যক্তি ছাড়া এই মামলার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট আর কোন ব্যক্তিই আমাকে নিয়ে কোন কথা বলেনি। এদের ভূমিকা দেখে আমাদের দেশের আদালতে একাংশের চরিত্র বোঝার সুযোগ পেলাম। তারা নিজেদের স্বার্থে কত নিচে নামতে পারে, কতটা নির্লজ্জ হতে পারে, এই দুজনের ভূমিকা তার একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

২৬ জানুয়ারী সকাল আটটার দিকে আমাকে প্রস্তুত থাকতে বলা হলেও রওয়ানা হলাম সকাল ৯-৫০ মিঃ। জেলগেটে মিঠু এসে পুলিশ স্কোয়াডের ইনচার্জের সাথে আলাপ করে তাদের জন্যে পাউরুটি ও কলা দিয়ে যায়। আমি আমার টিফিন বক্সে ভাজি রুটি নিয়ে নিয়েছিলাম। যদি আদৌ কোথাও কোন হোটেলে খেতে না দেয়, তাহলে যেন গত তারিখের মত শুধু বিস্কুটের উপর নির্ভর করতে না হয়।

যাহোক এবারে স্কোয়াড ইনচার্জের মন-মানসিকতা কিছুটা ইতঃবাচক মনে হল। তবে তাদের মিডিয়া ভীতির ব্যাপারে যথাসাধ্য সতর্কতার অনুরোধ জানাতে কসুর করেনি। এবারের স্কোয়াড ইনচার্জই গত তারিখেও আমার সাথে ছিল। গত তারিখে আমাকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের গেটে রেখে সে তার কোন আত্মীয়ের বাসায় কিংবা দোকানে উঠেছিল। তার কথায় জানা গেল তার ঐ আত্মীয় নাকি আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী। সে আরো বলল পথে তারা আমাকেও খাওয়ার সুযোগ দিতে পারেনি, নিজেরাও সুযোগ পায়নি। এভাবে তাদের ক্ষুধার্ত অবস্থা তুলে ধরে আত্মীয়ের সহানুভূতি আদায় করে তারা ঢাকা শহরেই গোশত রুটি খেয়ে তারপর চট্টগ্রাম রওয়ানা দেয়। আমার মনে হল আমার পথ খরচের জন্যে আনা পাঁচশ টাকা থেকে কলা বিস্কুট ৫০/৬০ টাকার বেশি খরচ হবার কথা নয়। বাকীটা তাদের স্কোয়াডের সবাইকে নিয়ে হালকা চা নাস্তা করতে বলেছিলাম। তার আর দরকার হয়নি। সম্ভবত ঐ টাকার কোন অংশ ইনচার্জ তার সাথীদেরকে না দিয়ে নিজেই হজম করেছে। সবাইকে জানিয়ে না দিলে নাকি এরকমই হয়।

এবারে মিঠুর সাথে স্কোয়াড ইনচার্জের আলোচনায় তাকে বেশ কিছুটা নরম এবং সহানুভূতিশীল মনে হল। এই ফাঁকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ যাত্রায় কি আমার পছন্দের জায়গায় এস্তেনজা, অজু, নামাজ ও দুপুরের খাবারের সুযোগ দেয়া যাবে? আমি যেখানে থামতে চাই, সেখানে আপনাদের কোন অসুবিধাটা হবার কথা নয়। আমি এডভান্স সিএনজি ফিলিং স্টেশনের কথা বলার সাথে সাথে ড্রাইভারও সমর্থন দিয়ে বলল স্থানটা বেশ নিরিবিলি।

আসলে ফিলিং স্টেশনটা খুব একটা নিরিবিলি নয়। বরং ব্যস্ততম স্টেশন। কিন্তু খাবারের ব্যবস্থাটা বেশ নিরিবিলি। বিশেষ করে আমার জন্যে বাথরুম ব্যবহারের, নামাজ ও খাবারের জন্যে তারা বেশ নিরিবিলি পরিবেশ করে দেয়। এর আগেও একবার চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা আসতে এখানে নেমেছি কোন অসুবিধাই হয়নি। একবার ঢাকা থেকে যেতে আমাকে হোটেলে খাবারের সুযোগ না দিলেও নিজের সাথে আনা পাউরুটি কলা খাবার জন্যে পুলিশের ইনচার্জ মালিক পক্ষের সাথে আলাপ করে আমার জন্যে একটা নিরিবিলি কামরার ব্যবস্থা করেছিল। হোটেল মালিক সেদিনও আমাকে ভাত এনে খাওয়াতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা আইন মেনে অভ্যস্থ বিধায় পুলিশ ইনচার্জের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হোটেল কর্তৃপক্ষকে কোন আয়োজন করতে দেইনি। এমনকি এক কাপ চাও খাইনি। অবশ্য ঐ দফায় ঢাকা ফেরার পথে কনস্টেবলদের চাপে পুলিশের ইনচার্জ ওখানে থামাতে বাধ্য হয়। খাবার ব্যবস্থায় দারুণ খুশিও হয়।

www.pathagar.com

গত শনিবার ঢাকা ফেরার পথে যিনি স্কোয়াড ইনচার্জ ছিলেন এবারো তাকেই দেখে আমি মোটামুটি পথে খাবারের সুযোগ পাওয়ার আশা ত্যাগই করেছিলাম। কিন্তু মিঠু রওয়ানার আগে জেল গেটে এসে গাড়িতে পুলিশের জন্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাউরুটি ও কলা দিয়ে গেল। সেই সাথে আমাকে বলল, এবার এডভান্স ফিলিং স্টেশনে থামবে, তার সাথে নাকি এ ব্যাপারে কথা হয়েছে। একই লোককে ইনচার্জ হিসাবে দেখে আমার তেমন একটা ভরসা হচ্ছিল না। যাহোক ফেনী জেলার সীমানা পার হওয়ার সময় আমি জিজ্ঞাসা করায় ড্রাইভারের সমর্থন পাওয়ায় উনিও রাজি হলেন। ঠিক একটা কয়েক মিনিটে আমরা উক্ত ফিলিং স্টেশনে পৌঁছে গেলাম। দিনটি ছিল জুমার দিন। এখানে পৌঁছার আগেই পুলিশের স্কোয়াড ইনচার্জ জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি কোন মসজিদে জুমা পড়তে চাই কিনা। আমি তাদের আশ্বস্ত করেছিলাম। আমি প্রথমত বন্দী তারপর সফরে আছি, আমার জন্যে জুমআ ওয়াজেব নয়, অতএব ফিলিং স্টেশনেই আমি এস্তনজা অজু সেরে জোহর পড়ে নিব। আপনাদেরকে কোন ঝামেলায় ফেলব না।

এডভান্স সিএনজি ফিলিং স্টেশনের মালিক দ্বীনদার লোক হবার কারণে দু' তলায় বেশ সুন্দর নামাজের ব্যবস্থা রেখেছে। ওখানে জুমআ হয় এটা আমার জানা ছিল না। পৌঁছেই ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করলাম উপরে নামাজের স্থানে কি জুমআও হয়। উনি বললেন, হ্যাঁ, হয়। আমি বললাম জামায়াত ক'টায় বললেন দেড়টায়। এরপর আমি বললাম তাহলে এস্তেনজা অজু ও জুমআর নামাজ শেষে খেয়ে নিব। এই বলে আমি গিয়ে যথারীতি এস্তেনজা অজু সেরে জুমআয় শরীক হবার নিয়ত করে বাথরুম সেরে বের হলাম। কারণ এখানে জুমআ আদায়ে আমার কাছে তেমন কোন সমস্যা হতে পারে বলে মনে হয়নি। তবে বাথরুম থেকে বের হতেই মিঠু বলল যে উনারা বলছেন উপরে নামাজের স্থানে অনেক প্যাসেঞ্জার নামাজ পড়ছে, তাই ওখানকার কর্তৃপক্ষ আমার জুম'আয় শরীক হওয়া ঠিক মনে করছেন না। অতএব এই রুমেই জোহর পড়ে নিলাম। আমিও সাথে সাথে জায়নামাজ চেয়ে নিয়ে জোহর আসর আদায় করেছিলাম। পুলিশের স্কোয়াড ইনচার্জও আমার সাথেই নামাজ আদায় করল।

নামাজ শেষে পুলিশ স্কোয়াড ইনচার্জ আমার সাথেই মালিকের খাস কামরায় খেয়ে নিল। পুলিশের অন্যরা পপুলার ফুড প্যালেসে গিয়ে খেয়ে নেয়। খাবার ও নামাজের নিরিবিলি পরিবেশ দেখে পুলিশের ইনচার্জও বেশ খুশি হলেন। শুধু একটু দোয়া চাইলেন যেন মিডিয়ার লোকেরা জানার সুযোগ না পায়। কয়েক প্রকারের ভাজি, ভুনা ডাল ও ছোট মাছের তরকারি দিয়ে বেশ তৃপ্তির সাথে খেলাম। ভাত খাওয়া শেষে একটু দই এবং এরপর দুধ চিনি ছাড়া এককাপ চা খেয়ে নীরবে গাড়িতে উঠে বসলাম ঢাকার উদ্দেশ্যে। কেন্দ্রীয় কারাগারের জেল গেটে পৌঁছে মাগরিবের নামাজ আদায় করলাম।

এবারে চট্টগ্রাম যাবার আগে সাপ্তাহিক সাক্ষাৎ কোন এক অজ্ঞাত কারণে হতে পারেনি। জেলখানায় আসার পর থেকেই প্রতি বৃহস্পতিবারে পরিবারের সদস্যদের জন্যে সাক্ষাতের দিন ধার্য আছে। কোন কারণে (যেমন কোর্ট থাকলে) নির্ধারিত দিনে সাক্ষাৎ সম্ভব না হলে পরের দিন ব্যবস্থা হত। এবার কোন কারণ ছাড়াই বৃহস্পতিবারে দেখা করতে এসে আমার স্ত্রী মেয়ে এবং ছেলে ফিরে যায়। তারা আশা করে ছিল পরের দিন শুক্রবারে দেখা করা যাবে। কিন্তু এ তারিখেও তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অবশ্য তাদের আনা ফলমূলগুলো আমার রুমে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। আমি মনের কষ্টে ফলমূলগুলো জেল গেটে ফেরত পাঠাতে চাচ্ছিলাম প্রতিবাদ স্বরূপ। দেখাই যখন করতে দিল না তখন এই ফলমূল দিয়ে আর কী হবে? কিন্তু জেল খানার অন্যান্য সাথীদের অনুরোধে মনের ক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ করে ওগুলো ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলাম।

পরবর্তী চট্টগ্রাম যাওয়ার তারিখ ২৩ জানুয়ারী ২০১২ রোজ মঙ্গলবার। ২৪ ও ২৫ জানুয়ারী ২ দিন আদালতে সাক্ষ্যগ্রহণ ও জেরা হয়। ওখানেই আমার ছেলে মোমেন বলল, জেল কর্তৃপক্ষের সাথে তার কথা হয়েছে আগামী শনিবারে দেখা করার সুযোগ দিতে পারে। এদিকে আমার আইনজীবীদের সাথে ৩ দিন ৩ ঘণ্টা ব্যাপী সাক্ষাতের আবেদন করা হয়। কিন্তু তিন দিনের স্থলে মাত্র একদিন ৩ ঘণ্টা কথা

www.pathagar.com

হয়েছে। আর একদিন ৩০ মিঃ মাত্র। তৃতীয় দিন তো সাক্ষাৎ হতেই পারেনি জেল কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতার কারণে। ঐদিনটার কথা ট্রাইব্যুনালে উল্লেখ করে আবার সাক্ষাতের তারিখ ঠিক করতে বলেছিলাম। ফলাফল এখনও জানি না।

যাহোক, চট্টগ্রাম থেকে ফিরে এসে শুনলাম, ২৬ সেলে ঐ দিনই সিনিয়র জেলসুপার সাহেব এসেছিলেন। আমি ছাড়া আর সবাই তার সাথে সেদিন বৈঠকে কথা বার্তা বলার সুযোগ পান। শুনলাম তিনি নাকি বলেছেন বিশেষ কারণে সাপ্তাহিক দেখা বন্ধ হয়েছিল। এখন থেকে চালু হবে, তবে আগামীকাল শনিবারে নিজামী সাহেবের আইনজীবীদের সাথে সাক্ষাৎ থাকার কারণে ঐদিন আর কারো সাক্ষাৎ হবে না।

সবাই আমাকে বললেন, 'আপনার নাম নেয়ার কারণে আমাদের আর কেউ কিছু বলেনি।' যেহেতু সুপার স্বয়ং এসে বলে গেছেন আমার সাথে সকাল ১০টা থেকে সারা দিনভর আইনজীবীর সাক্ষাৎ হবে এবং এজন্যে অন্যদের সাক্ষাৎ হবে না এতে কিছুটা খারাপই লাগল। কারণ জেল কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে দুটোই ম্যানেজ করতে পারে। ইতঃপূর্বে করাও হয়েছে।

পরের দিন অর্থাৎ ২৭ জানুয়ারী সকাল ১০টায় আইনজীবীদের সাথে সাক্ষাতের জন্যে আমি সকাল ৯:৩০টা থেকে প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষায় থাকলাম। দুপুর ১২টার দিকে একজন সিআইডি জমাদারের মাধ্যমে গেট থেকে খবর নিয়ে জানলাম তখন পর্যন্ত কোন আইনজীবী আসেননি।

আমার খুব খারাপ লাগল এই ভেবে যে আমার জন্যে অন্যদের সাক্ষাৎ বন্ধ করা হয়েছে। অথচ আমার আইনজীবী এখনও এসে পৌঁছল না কারণ কী? একটু পরে মাওলানা সাঈদী সাহেবের সাক্ষাতের স্লিপ আসল, একটু স্বস্তি পেলাম। তাহলে অন্যদের সাক্ষাৎ বন্ধের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়েছে। উনার সাক্ষাৎ শেষে প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে ইনশাআল্লাহ। ইতোমধ্যে জোহরের নামাজের সময় হয়ে এল। আমরা এখানে ১:১০ মিঃ জোহরের নামাজ জামায়াতের সাথে আদায় করি। জোহরের নামাজ শেষে সাক্ষাৎ থেকে ফেরা সাঈদী সাহেব পেছন থেকে উঠে আমাকে একটা কাগজ দিয়ে বললেন, তাড়াতাড়ি যান অনেকক্ষণ তারা অপেক্ষা করছে। আমি আরো জানতে চাইলাম আইনজীবীদের কারা কারা এসেছে। উনি বললেন, না আইনজীবী নয়, আমাদের দুই পরিবারের লোকেরা রীতিমত যুদ্ধ করে সাক্ষাতের সুযোগ আদায় করে নিয়েছে। তারা অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষায় আছে, তাড়াতাড়ি যান।

সাক্ষাতের স্লিপ সাধারণত কোন না কোন কারা রক্ষীর মাধ্যমে পাঠানো হয়। আমার স্লিপটা সাঈদী সাহেবের হাত দিয়ে দিয়েছে। আমাদের গেট পর্যন্ত যাওয়া আসার সময়ও কারারক্ষী সাথে যাওয়াই নিয়ম। ২৬ সেলে কর্তব্যরত কারা রক্ষীদের একজন ইনচার্জ থাকে। আমার সাথের সেবক ঐ ইনচার্জকে বললেন, "স্যার দেখায় যাচ্ছে, সাথে একজন কারা রক্ষী দেয়ার ব্যবস্থা করেন। এভাবেই দুই সপ্তাহের ব্যবধানে পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাতে গিয়ে তাদেরকে ভিআইপি সাক্ষাতের রুমে অপেক্ষমান পেলাম। তাদের কাছে শুনলাম আগের সপ্তাহে ২ বা ৩ দিন এসে অপেক্ষা করে ফিরে যাওয়ার দুঃখ কষ্টের কথা। আজ আমার বেগম সাহেবা আমার ও সাঈদী সাহেবের সন্তানদের নিয়ে আইনজীবী ও ডিআইজির বাসা পর্যন্ত নক করে সাক্ষাৎ আদায় করে ছেড়েছে। আবার ধানমন্ডিতে ফিরে গিয়ে আমার বড় মেয়ে মুহসীনাকে নিয়ে আবার জেল গেটে হাজির হয়েছে। আমিও তাদেরকে আমার পেরেশানীর কথা জানালাম গত সপ্তাহের সাক্ষাত না হওয়ার কারণে। আজকে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার অস্বস্তিকর মুহূর্তগুলোও ছিল কষ্টকর। ছেলে ব্যারিস্টার নাজিব মোমেনকে জিজ্ঞেস করলাম, আজ নাকি আইনজীবীদের সাথে সাক্ষাতের কথা? সুপার সাহেব সবাইকে এটা বলে তাদেরকে জানিয়েছেন, নিজামী সাহেবের আইনজীবীদের সাক্ষাতের কারণে আজ আর কোন সাক্ষাতই হবে না। ছেলে বলল, নাতো আজকে আইনজীবীদের সাক্ষাতের কোন কথাই হয়নি। অবাক হলাম সুপার সাহেব কি তাহলে ২৬ সেলের সকল ভিআইপি বন্দিকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে তাদের সাথে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন? আমি সাক্ষাৎ শেষে ফিরে

www.pathagar.com

এসে এখানকার সাথীদের বিষয়টি অবগত করলাম। সবাই তো বিস্মিত, হতবাক। উনি এত বড় মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারলেন?

আমার অনুপস্থিতিতে সুপার সাহেব আমাদের ২৬ সেলের সাথীদের উদ্দেশ্যে অনেক অলীক কথা বলেছেন, যা ইতঃপূর্বে জেলখানায় কেউই কোন দিন শুনে নাই। তিনি নাকি বলেছেন, একমাত্র দুধের বাচ্চা ছাড়া কোন ছোট ছেলে মেয়েদেরকে কোলে নেয়া যাবে না। আদর করা যাবে না। এমন কি তাদের গায়ে হাতও দেওয়া যাবে না মানুষ এমন হৃদয়হীন হতে পারে জেনে বিস্মিত হলাম।

ইতঃপূর্বে নির্দিষ্ট দিনের সাপ্তাহিক সাক্ষাত হতে না পারলে নিকটবর্তী কোন দিনে সুযোগ পাওয়া যেতো। এর পর সপ্তাহের নির্দিষ্ট বা নির্ধারিত তারিখটাও বহাল থাকতো। সেই বিশ্বাসে বৃহস্পতিবারে অপেক্ষায় ছিলাম সাক্ষাতের। মাওলানা সাঈদী সাহেব ঐ দিন বেশ সকাল সকাল ট্রাইব্যুনাল থেকে ফিরে এলেন কারণ সরকার পক্ষ সাক্ষী হাজির করতে পারেনি। উনাকে জিজ্ঞেস করলাম গেটে আমার পরিবারের লোকজন এসে অপেক্ষা করছে কিনা। উনি বললেন, গেট সার্জেন্টকে উনি অনুরোধ করেছিলেন যেন, উনার ছেলেদেরকে ফোনে শনিবারের সাক্ষাতের জন্যে একটু সকাল সকাল আসতে বলেন, কারণ ঐদিন তো অনেকের সাক্ষাত আছে। কাজেই আগে না আসলে বেশ অপেক্ষা করতে হতে পারে। উনার কথার জবাবে গেট সার্জেন্ট নাকি জানিয়েছে, ঐদিন অর্থাৎ শনিবারে শুধু সাঈদী সাহেবের আর আমার সাক্ষাত আছে অন্য কারো নেই। এই কথার মাধ্যমে এটাও পরিষ্কার হল যে, আমার সাপ্তাহিক সাক্ষাতটা এখন থেকে আর বৃহস্পতিবারে হবে না। শনিবারে হবে। অবশ্য এটা আমার পরিবারের লোকদের জন্যে ভালই হল। কারণ আমার স্ত্রী একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, মেয়ে একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির শিক্ষিকা। ছেলে কোর্টে যাওয়া আসা করছে, তাদের সবার জন্যে ওয়ার্কিং ডের পরিবর্তে একটা ছুটির দিন ধার্য হওয়া সুবিধাই হল। তবে এবারে বৃহস্পতিবারের পরে আরো দুই দিন প্রতীক্ষায় থাকতে হবে এই আর কি।

অবশেষে বৃহস্পতিবারের পরিবর্তে শনিবারই হয়ে গেল সাপ্তাহিক সাক্ষাতের জন্যে নির্ধারিত দিন। শনিবারে ভিআইপিদের সাক্ষাতের জন্যে বলতে গেলে বেশ অপেক্ষায় থাকতে হয়। কারণ অনেকের সাক্ষাতের নির্ধারিত দিন এটি। এক জনের সাক্ষাৎ শেষ হলেই আরেকজনের সাক্ষাতের স্লিপ এসে থাকে। এবারে আমাকে যেতে হল মনে হয় সবার পরে। বনানী থেকে আসতে একটু তো বেশি সময় লাগেই। ফলে আগে যারা আসে তারা আগে সুযোগ পায়। এবারে আমার বৌমা সানোয়ারাও এসেছিল। তারা কিছু দিনের মধ্যে লন্ডনে যাওয়ার কথা। সম্ভবত এজন্যেই এবারে এসেছে শরীরটা অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও। প্রতিবারের মত এবারেও আমার বেগম সাহেবার কথা, মন খারাপ করবেন না। বাইরের অবস্থা ভাল। তোমাদের কাছে যেসব পত্রিকা দেয়া হয়, ঐসব পত্রিকার রিপোর্টাররা জেনে বুঝে তোমাদের মন খারাপ করার নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে রিপোর্ট করে থাকে। আল্লাহ অবশ্যই সহায় আছেন এবং সহায় থাকবেন।

আমি আমার ছোট ছেলেটাকে নিয়েই এখন বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। সে ছাত্র হিসাবে লেখাপড়ার জন্যে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে, মালয়েশিয়ায় আছে। পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ মিশনে দরখাস্ত করে। কিন্তু নিছক রাজনৈতিক প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে তার পাসপোর্ট নবায়ন করতে বাংলাদেশ মিশন কর্তৃপক্ষ রাজি হয়নি। এ কারণে তার অনার্সের সর্বশেষ সেমিস্টারের রেজাল্টটাও তত ভাল হয়নি যতটা তার আশা ছিল। আমার সবচেয়ে নিরীহ ছেলেটা পাসপোর্টের সমস্যায় বিদেশের মাটিতে কতটা মনঃকষ্টে আছে, তা ভেবে আমি বিচলিত।

আল্লাহর দরবারে সারাক্ষণ দোয়া করছি, "আমার কারণে সবচেয়ে ছোট এবং নিরীহ ছেলেটা বিপদে পড়েছে। আল্লাহ একমাত্র তুমিই এখন তার সহায়। মজলুম পিতা হিসাবে বিপদগ্রস্ত সন্তানের জন্যে আমার প্রাণ উজাড় করা দোয়া কবুল করে তাকে এই বিপদ ও সমস্যা থেকে উদ্ধার কর।"

www.pathagar.com

প্রতিহিংসার রাজনীতি এতটাই নির্মম যে নিরপরাধ সন্তানদেরও এর শিকারে পরিণত হতে হয়। "আল্লাহ এই অপরাজনীতির কবল থেকে আমাদের দেশ ও জাতিকে রক্ষা করুন।"

এই মনঃকষ্টের মধ্যেও এটা জেনে সুখী হলাম উক্ত আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া কর্তৃপক্ষ আমার নিরীহ ছেলেটার প্রতি সহানুভূতিশীল। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া এই বিপদের সময়ে তার পাশে দাঁড়িয়েছে। এরপরও বিদেশের মাটিতে পাসপোর্টের সমস্যা, তাও আবার বৈরী রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে, তাই এ অবস্থায় দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া, পরীক্ষা ভালভাবে দেয়ার জন্যে যতটা শক্ত মনের প্রয়োজন। আমার এই বন্দী জীবনে সবচেয়ে ছোট ছেলের এই বিপদগ্রস্ত অবস্থা সবচেয়ে মনঃকষ্টের কারণ হয়েছে। আল্লাহ বিপদে একমাত্র সহায়। পিতা হিসাবে পুত্রের জন্যে আল্লাহ তার এই মজলুম বান্দার দোয়া কবুল করবেন, এটাই একমাত্র সান্ত্বনার উপায়।

৫ মার্চ ২০১২ ট্রাইব্যুনালে হাজিরার দিন ছিল। ঐ দিনই আব্দুল কাদের মোল্লা এবং সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীরও হাজিরার দিন। আমার আইনজীবীরা ইতঃপূর্বে সময় চাওয়ায় ৫ মার্চে সময় দেয়ার সিদ্ধান্তের পর আমার আইনজীবী এ সময়কে যথেষ্ট মনে না করায় আরো সময় বাড়ানোর প্রস্তাব করলে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে আভাস দেয়া হয়েছিল দেখা যাবে। যার অর্থ এটাই বুঝা গিয়েছিল যে ৫ মার্চে হাজির হবার পর আবার সময় বাড়ানো হবে। সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর চার্জ শুনানিতে সারা দিন লেগে যেতে পারে, আর আমার বিষয়টি ছিল মাত্র ১০/১৫ মিনিটের ব্যাপার। আদালত চাইলে আমারটার ফায়সালা দিয়েই সালাহউদ্দিন কাদেরের চার্জের শুনানি শুরু করতে পারতেন। কিন্তু কষ্ট দেওয়ার জন্যে, হয়রানি করার উদ্দেশ্যে যেহেতু এই মিথ্যা মামলা সাজানো হয়েছে, তাই প্রায় সারাক্ষণ বসিয়ে রেখে বেলা তিনটার দিকে জানানো হল ৭ মার্চ হাজিরা দিতে হবে। আদালতের সিদ্ধান্ত শিরোধার্য। তাই আবার ৭ মার্চও হাজিরা দিতে গেলাম। এই দিনে মাওলানা মুহতারাম সাঈদী সাহেবের সাক্ষীর জেরা হবার কথা। কিন্তু গিয়ে জানা গেল সাক্ষী হাজির করতে পারেনি। ইতঃপূর্বে সাক্ষী না এলে উনাকে কোর্টে না নিয়ে ট্রাইব্যুনালের হাজতখানা থেকেই জেলখানায় ফেরত পাঠানো হত। এবারে তা না করে উনাকে ডেকে নেয়া হল। পরবর্তী তারিখ জানিয়ে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান প্রসিকিউটরদের সাক্ষী হাজির করতে না পারার জন্যে মৃদু তিরস্কার করে সাঈদী সাহেবকে জেল খানায় ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেবার পর আমাকে ট্রাইব্যুনালে ডাকা হল। চেয়ারম্যানের আগের কথায় মোটামুটি একটা পরোক্ষ অঙ্গীকার ও প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত ছিল পুনরায় সময় বাড়ানোর। কিন্তু প্রসিকিউশনের আপত্তির কারণে সেটা সম্ভব হল না। তাছাড়া সময় মত প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে পঠনযোগ্য কাগজপত্র দিতে না পারার বিষয়টি নাকি ট্রাইব্যুনাল চেয়ারম্যানকে জানানো হয়নি। এটাকেও একটা অজুহাত বানানো হল। তাই সিদ্ধান্ত সাথে সাথে না নিয়ে ট্রাইব্যুনাল চেয়ারম্যান দুইপক্ষের আইনজীবীদেরকে তার খাস কামরায় উপস্থিত হতে বললেন। সেখানে বসে বেলা দুটোর দিকে একটা সিদ্ধান্ত জানানোর কথা। আজ ৮ মার্চের দুপুর পৌনে বারটা পর্যন্ত এ ব্যাপারে আমার কিছুই জানার সুযোগ হয়নি। আমার আইনজীবীগণ আমাকে আশ্বস্ত করেছেন অন্তত কিছুদিনের জন্যে হলেও চার্জ শুনানি স্থগিতের একটা আদেশ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

গতকাল ৮ মার্চের পত্রিকা মারফত জানা গেল ট্রাইব্যুনালে আমার বিরুদ্ধে চার্জ শুনানীর তারিখ নির্ধারণ করেছে ১৩ মার্চ। শুনে একটু দুশ্চিন্তা বাড়ল। কারণ চট্টগ্রামে কোর্টে হাজিরা দিতে হবে ১৪ মার্চেই। আর সেজন্যে চট্টগ্রামে রওয়ানা করতে হবে ১৩ মার্চেই। এখন ট্রাইব্যুনালে চার্জ শুনানিটা শেষে যদি চট্টগ্রাম যেতে হয়, তাহলে মধ্য রাতের আগে চট্টগ্রাম পৌঁছা যাবে না। মধ্য রাতে চট্টগ্রাম পৌঁছে পরের দিন সকাল ১০-১১টার দিকে কোর্টে হাজিরা দেয়া আমার বয়স ও শরীরের জন্যে হবে চরম কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু এ ব্যাপারে কিছু করার নেই। ট্রাইব্যুনালে চেয়ারম্যান উভয়পক্ষের আইনজীবীদের সাথে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নিলেও আমার পক্ষের আইনজীবীদের কথা আদৌ কোন গুরুত্ব দিয়েছেন বলে আমার মনে

www.pathagar.com

হল না। যাহোক ইতঃপূর্বে দুটি সোর্স থেকে সরকার পক্ষের দুই আইনজীবীর মন্তব্য শুনেছিলাম। তাদের মন্তব্যের সার কথা, দুই আইনজীবীর এক জনের দৃষ্টিতে তাদের তদন্তে আমাদের বিরুদ্ধে নাকি তেমন কিছুই পাওয়া যায়নি। আওয়ামী লীগের কিছু লোকেরা যা বলেছে তাতে তেমন কোন সারবত্তা নেই। অপর আইনজীবীর মন্তব্য কিছুই হবে না, শুধু হয়রানি করা হবে এটাই যা।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সেই হয়রানির মহড়াই চলছে। হয়রানির শিকার হতেই হবে। এ জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত হওয়াই সময়ের দাবি। তবে শারীরিক অসুস্থতা এবং বয়সের সীমাবদ্ধতাকে অস্বীকার করে চলা কতটা আর সম্ভব? বিশেষ করে আমার জন্যে চট্টগ্রাম যাওয়া আসার কষ্টের কথা আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে অনুমান করাও সম্ভব নয়। আমার এই কষ্টের কথা একমাত্র আল্লাহর কাছেই পেশ করে আসছি। নিজের এই কষ্টের সাথে ছোট ছেলে তালহার পাসপোর্ট নবায়নের ব্যাপারে মালয়েশিয়াস্থ বাংলাদেশ মিশনের অমানবিক আচরণে মনের কষ্টের সাথে একটা অতিরিক্ত মাত্রা যোগ হয়। আমার সবচেয়ে ছোট এবং নিরীহ ছেলেটা এভাবে অকারণে বিপদগ্রস্ত হবে, এমনটি ইতঃপূর্বে ভাবতে পারিনি। আওয়ামী লীগের প্রতিহিংসার রাজনীতি কতটা অমানবিক হতে পারে, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি তারা কতটা প্রতিশোধ পরায়ণ হতে পারে, কতটা সংকীর্ণ মনমানসিকতার পরিচয় দিতে পারে তার একটা জীবন্ত নমুনা দেখার সুযোগ হল আমার ছোট ছেলেটার সাথে তাদের অমানবিক আচরণ দেখে। পাসপোর্টের কারণে যে মানসিক চাপ পড়েছিল, তারই ফলে অনার্সের সর্বশেষ সেমিস্টারে যেমন ফলাফল তার হওয়ার কথা তেমনটি হতে পারেনি। আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, "হে আল্লাহ তোমার এই মজলুম বান্দার দোয়া কবুল করে তার নিরীহ নিরপরাধ সন্তানকে বিপদ থেকে উদ্ধার কর। তাকে বিপদমুক্ত হয়ে এবং দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়ে তার ক্যারিয়ারটার পূর্ণতা লাভের সুযোগ করে দাও তোমার পক্ষ থেকে গায়েবী মদদে এবং কুদরতি সাহায্যে।" আশা করি বিপদগ্রস্ত সন্তানের জন্যে আল্লাহ তার মজলুম বান্দার দোয়া অবশ্যই কবুল করবেন।

আমার সম্পদ বলতে ছয়টি ছেলে মেয়েই। মেয়ে দুটি তাদের স্বামীর সংসারে মোটামুটি ভালই আছে তারা নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার মত যোগ্যতাও অর্জন করেছে। বাকী চার ছেলের মধ্যে তিন জনের ক্যারিয়ার মোটামুটি পূর্ণতার দ্বারপ্রান্তে, চিন্তা শুধু ছোট ছেলেটা নিয়েই। তাকে সহ সব ছেলে মেয়েদেরকে প্রতিষ্ঠিত দেখে যাওয়ার তৌফিক কামনার পাশাপাশি তাদেরকে দ্বীন ও ঈমানের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত দেখে যেতে পারি, আল্লাহর দরবারে প্রতি নিয়ত এটা আমার দোয়া মুনাজাত। জেলে আসার পর পারিবারিক সাক্ষাতের প্রথম দিনেই আমি আমার স্ত্রীকে বলেছিলাম, "তুমি আমার সোনার টুকরো ছয়টি ছেলে মেয়েকে দেখে রাখবে।" আমি জেল জীবনে দোয়া মুনাজাতের মুহূর্তে ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীর জন্যে যে কথাটি আল্লাহর দরবারে বিশেষভাবে পেশ করে থাকি তা হল "আল্লাহ আমার ও আমার প্রিয় সহকর্মীদের স্ত্রী পুত্র পরিজনের আবেগ অনুভূতির দিকে চেয়ে আমাদেরকে সকল বিপদ আপদ বালা মুছিবত থেকে হেফাজত কর। তাদের সবাইকে তোমার পক্ষ থেকে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে রাখ, রহমতের ফেরেশতা দিয়ে তাদেরকে হেফাজত কর। আমার স্ত্রীর জন্যে দোয়ার সময় আমার মন থেকেই একথাটি এসে যায়, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নানা চড়াই উৎরাইয়ের বিভিন্ন মুহূর্তে আমাকে যেভাবে সে সাহস যুগিয়েছে সহায়তা করেছে, আল্লাহ তুমি এটা কবুল করে তাকে দুনিয়া আখেরাতে সর্বোত্তম পুরস্কারে ভূষিত কর। দ্বীনের সর্বোচ্ছ ও সর্বোত্তম খেদমতের জন্যে তাকে কবুল কর। আমার সন্তানেরা যেন তাদের মায়ের মধ্যেই তাদের আব্বুকেও খুঁজে পায়, এজন্যে তাকে সার্বিকভাবে সাহায্য কর। তাকে সহ আমার গোটা পরিবারকে ছবর ও ইস্তেকামাতের সাথে দ্বীন ও ঈমানের উপর কায়েম থাকার তৌফিক দিও।

আপাতত একদিনে ট্রাইব্যুনালে চার্জ শুনানিতে উপস্থিত থাকা, এরপরে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করাটা, তাও আবার ১৩ মার্চ, কিভাবে সম্ভব হবে এ নিয়ে স্বাস্থ্যগত কারণেই আমাকে ভাবতে হচ্ছে। এভাবে চট্টগ্রাম যাওয়া আসার ফলে আমার কোমরের ও হাঁটুর ব্যথা বাড়ছে। হাঁটুর ব্যথার জন্যে এখন

www.pathagar.com

স্বাভাবিকভাবে হাঁটতেও কষ্ট হয়, সিড়ি দিয়ে উপরে উঠতে এবং নীচে নামতেও বেশ কষ্ট। নামাজে সেজদায় যেতে এবং সেজদা থেকে উঠতে এখন আগের তুলনায় কষ্ট অনেক বেড়েছে। নফল সুন্নাত চেয়ারে বসে পড়ার চেষ্টা করি মাঝে মাঝে। কিন্তু মনে তৃপ্তি পাই না বিধায় দাঁড়িয়ে এবং পূর্ণাঙ্গ রুকু সেজদাসহ নামাজ আদায়েরই চেষ্টা করি। অবশ্য ডাক্তারদের পরামর্শ এবং সাথী সঙ্গীদেরও অনুরোধ চেয়ারে বসে যেন নামাজ পড়ি। ফরজ নামাজের জন্যে এই পরামর্শ শুনতে বা মানতে পারছি না, তবে বেশি কষ্ট হলে নফল নামাজ ও দোয়া কালাম চেয়ারে বসেই পড়ার চেষ্টা করি।

আগামীকাল পরিবারের লোকদের সাথে সাক্ষাতের নির্ধারিত দিন। সাক্ষাতে ছেলে মোমেন আসবে, আশা করছি তার সাথে ট্রাইব্যুনালে এবং চট্টগ্রাম কোর্টে যাওয়ার ব্যাপারে পরামর্শ করা যাবে। আইনজীবীদের সাথে সাক্ষাতের জন্যে কোর্ট অর্ডার অনুযায়ী আরো একদিন পাওনা আছে। সে ব্যাপারে কী হল বা হবে, তাও আশা করি জানা যাবে। বিশেষ করে প্রবাসে অবস্থানরত তিন ছেলে ও এক মেয়ে এবং পাঁচ নাতি নাতনীর খবরও পাওয়া যাবে, যদি কোন কারণে সাক্ষাত বাধাগ্রস্ত না হয়।

গতকালের আশংকাটা অক্ষরে অক্ষরে ঠিক হল। চট্টগ্রামে কোর্টের হাজিরা ১৪ মার্চ। ঢাকায় ট্রাইব্যুনালে হাজিরার নির্ধারিত তারিখ ১৩ মার্চ। ইতঃপূর্বে দেখেছি আমাদের সাথীদের যাদের ঢাকায় হাজির থাকত, তাদেরকে ঢাকার হাজিরা শেষে বিকেলে এমনকি মাগরিবের পরেও নিয়েছে। আমি ভেবেছিলাম আমার ব্যাপারেও তাই হবে। কিন্তু তা আর হল না। আমার শনিবারের পারিবারিক সাক্ষাতের সুযোগ তাহলে এবারো হতে পারছে না। এর আগে বিনা কারণে এক সপ্তাহের সাক্ষাত থেকে আমাকে এবং ২৬ সেলের সবাইকে বঞ্চিত করা হয়। কারণ এখনও জানানো হয়নি। পরের সপ্তাহে আমার পরিবারের লোকেরা সাক্ষাতের সুযোগ লাভের জন্যে ডিআইজি ও আইজির বাসা পর্যন্ত নক করে সাক্ষাত লাভের সুযোগ পেয়েছিল। সম্ভবত সিনিয়র জেল সুপার, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, এবার প্রতিশোধ নেয়ার জন্যেই আমাকে চট্টগ্রাম থেকেই গাজীপুরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। আমি আমার রুমে একবছর সাড়ে আট মাসে জমা হওয়া জিনিসপত্রগুলো নিজে দেখে কোনটা আমার দরকার, কোনটা আমার দরকার নেই এব্যাপারে একটা বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম। দীর্ঘদিনের সাথীদের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সুযোগটাও পেতাম। কিন্তু চট্টগ্রামের সুপার ডেপুটি জেলারের মাধ্যমে আমাকে জানান, তিনি চেষ্টা করেছেন কিন্তু ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বলেছেন, আমাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার হয়ে গাজীপুর আনতে নাকি কী সমস্যা আছে। আমার মাল তারা নিজেরাই পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন। আমি ১৬ মার্চ শুক্রবারে মাগরিবের একটু আগে গাজীপুর জেলা কারাগারে পৌঁছি। আর আমার মালপত্র ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে পৌঁছে রবিবার সন্ধ্যার দিকে।

আজ ১০ মার্চ ফজরের নামাজ শেষে ঘুমিয়ে আছি এমন অবস্থায় আমাদের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ২৬ সেলের সেবক হাবিব এবং রন্টু এসে ডেকে তুলল। তারা দুজনেই বলল চট্টগ্রামে যাবার কোর্ট স্লিপ আছে তিন জনের জন্যে। অপর দু'জনকে একটু পরে নেবে আপনাকে আগে নেবে। এখনই তৈরি হতে বলেছে। এত দিন ভেবে আসছিলাম চট্টগ্রামের কোর্টে হাজিরা দিতে হবে ১৪ মার্চ। তার একদিন আগে অর্থাৎ ১৩ মার্চ আমাদেরকে চট্টগ্রামে নেয়ার কথা। তার আগে নেয়ার কথা মনেও ভাবিনি। এদিকে ট্রাইব্যুনালে চার্জ শুনানির দিন ধার্য হয়েছে ১৩ মার্চ। ট্রাইব্যুনাল উচ্চতর আদালতের সমপর্যায় বিধায় ঐদিন চট্টগ্রামে আনলেও ট্রাইব্যুনালের চার্জ শুনানির পরেই আসার কথা। ১২ মার্চের বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক কর্মসূচির জন্যেই সম্ভবত এমনটি করা হয়েছে। ঘটনাক্রমে আজকের দিনটি ছিল আমার পারিবারিক সাক্ষাতের নির্ধারিত দিন। গতকালের দিনে ও রাতে আজকের সাক্ষাতের ব্যাপারটিই ছিল মনের সকল চিন্তা চেতনা জুড়ে। সপ্তাহ ব্যাপী যে একটি দিনের জন্যে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষারত ছিলাম, সেই সাক্ষাতটি আজ হবে না। ভাবতেই মনে দারুণ আঘাত অনুভব করলাম। সুবেদারকে ডেকে এনে অনুরোধ করলাম, আমাকে পরিবারের লোকদের সাথে সাক্ষাতের পরে নেয়া হোক। একবারে প্রস্তুত হয়েই গেটে যাবো। সাক্ষাতেও

www.pathagar.com

বেশি সময় নিব না, নির্ধারিত আধা ঘণ্টারও কম সময়ে সাক্ষাৎ সেরে গাড়িতে উঠে যাব। ইতঃপূর্বে তো অনেক বার দুপুরে নেয়া হয়েছে। আমাদের সাথীদের অন্য মামলায় কোর্টের হাজিরা শেষে মাগরিবের পরেও নেয়া হয়েছে। কাজেই সাপ্তাহিক সাক্ষাতের এই সুযোগটা থেকে আমাকে আমার পরিবারকে বঞ্চিত করবেন না। কিন্তু কোন অনুরোধেই তারা কান দিল না এবং তাড়াতাড়ি বের হওয়ার জন্যে তাগিদের পরে তাগিদ দিতে থাকল। ইতঃপূর্বেকার যেকোন দিনের তুলনায় আজ বেশি আগে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছাই। শুধু সাক্ষাতটা থেকে বঞ্চিত করার জন্যেই তাদের এরূপ আয়োজন ও আচরণ, এটা বুঝতে খুব একটা বুদ্ধি খরচ করার দরকার হয় না।

ইতঃপূর্বেও কয়েকবার খোঁড়া অজুহাতে আমার পারিবারিক সাক্ষাৎ হতে দেয়নি। একবার আইনজীবীদের সাথে সাক্ষাতের অজুহাতে। অথচ আইনজীবীদের সাথে সাক্ষাতের কারণে পারিবারিক সাক্ষাৎ বন্ধের কোন যুক্তিই থাকতে পারে না। আরেকবার আমাকে সেফ হোমে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে বৃহস্পতিবার ধার্য করা হলে, আমার ছোট ছেলে মালয়েশিয়া চলে যাবে বিধায় বৃহস্পতিবারের স্থলে তারা বুধবার সাক্ষাতের জন্যে দরখাস্ত নিয়ে এসে ফিরে যায়। অথচ ইতঃপূর্বে অনেকের ব্যাপারে এমন বিচার বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু আমার ছোট ছেলেটির যাবার আগে আমাকে দেখে যেতে পারল না।

জেল কর্তৃপক্ষের এই আচরণ দ্বৈত বা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড। বারবারই এটা দেখার সুযোগ হয়েছে। এক বছর আট মাস পার হল। জেল জীবনের এই দীর্ঘ সময়ে অনেক কিছুই দেখেছি ও উপলব্ধি করেছি। হয়ত বা দেশের সমাজ চিত্রের আমার অজানা একটি দিককে বাস্তবে পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবনের জন্যে আল্লাহ আমাকে এ অবস্থায় ফেলেছেন। দোয়া করি আল্লাহ যেন, জীবনের বাকী অংশে এই পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগানোর তৌফিক দেন।

প্রথম যখন চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে আসি তখন একই মামলায় অভিযুক্ত কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির পাশাপাশি রুমে থাকতাম। এক সাথে নামাজ পড়তাম, খাওয়া, নাস্তাও একসাথেই হত। এখানে ভিআইপিদের জন্যে তৈরি ডিভিশনের কামরাগুলোর অবস্থান ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ভিন্নতর। আমাকে এবার একাকীত্বের অনুভূতি সবচেয়ে বেশি পেয়ে বসেছে। আগে হেলাল নামের যে ছেলেটি সেবক হিসাবে ছিল এবারে এসে তাকেও পেলাম না। হাফেজে কোরআন ছেলেটা আমার সবকিছু বুঝে উঠেছিল কিন্তু এখন নাকি তাকে কক্সবাজার পাঠানো হয়েছে।

গতকাল মাগরিবের নামাজের একটু আগে আমার ব্লাড প্রেসার চেক করার জন্যে ডাক্তার সাহেব এসেছিলেন। তিনি চেক করে বললেন, উপরেরটা একটু বেশি নীচেরটা ঠিক আছে অর্থাৎ ১৬০/৭০। আমি যখন ঢাকা থেকে রওয়ানা করি তখন ছিল ১৮০/৭৫। অবশ্য সাথে সাথে একটা অতিরিক্ত ওষুধ (প্রোসান ৫০) খেয়ে নিয়েছিলাম। আমি আগে এই ওষুধটাই প্রথমে দিনে একবার খেতাম। গ্রেফতার হওয়ার পর ডিবি অফিসে রিমান্ডের ১৬ দিনের মাথায় পুলিশ হাসপাতালের একজন ডাক্তার বলেছিলেন প্রোসান খুবই মাইল্ডডোজের ওষুধ; ওটা এখন থেকে দিনে দুইবার খাবেন। সাথে ঘুমের জন্যে শোবার আগে টেনিন খাবেন। এটাতে কিছু দিন মোটামুটি ভালই চলছিল। কিন্তু জেলজীবন দীর্ঘায়িত হওয়ার ফলে ব্লাড প্রেসারের উঠানামা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

ইতোমধ্যে পিজির কার্ডিওলজির প্রফেসর সজল ব্যানার্জি বাবুকে কেন্দ্রীয় কারাগারে কল করে আনা হয়। উনি আগের রেকর্ড পত্র দেখে প্রেসারের ওষুধ পাল্টায়ে দিলেন। ওনার ব্যবস্থাপত্র মতে রাতের খাবারের আধ ঘণ্টা আগে ক্যাভাপ্রো ৩০০ এর সাথে টোপার ৩০ খাচ্ছিলাম। কিছু টোপারা ৩০ জেলহাসপাতালে না থাকায় বাইরেও পাওয়া না যাওয়ায় টোপার পরিবর্তে আমিটিড খাচ্ছি। এতেই মোটামুটি প্রেসার নিয়ন্ত্রণেই আছে বলা চলে। তবে মাঝে মধ্যে দিনের প্রথম দিকে বা মাঝামাঝি বেড়ে গেলে প্রোসান খেতে পারি কিনা, এ ব্যাপারে কারা হাসপাতালের সহকারী সার্জন জনাব শামসুদ্দিন সাহেব পরামর্শ দিলেন খেতে পারেন। সেফ হোমে ট্রাইব্যুনালের ইনট্রোগেশন টীমের জিজ্ঞাসাবাদের দিন শামসুদ্দিন

www.pathagar.com

সাহেব আমার সাথে ছিলেন। দুপুরের দিকে প্রেসার একটু বাড়তির দিকে মনে হওয়ায় তিনি একটা প্রোসান ৫০ খেয়ে নিতে বলেছিলেন। সেই থেকে আমি ক্যাভাপ্রোর পাশাপাশি প্রোসানটাও সাথে রাখি। কারণ ক্যাভাপ্রো ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র একবার। নির্ধারিত সময়ের মাঝখানে শেষের দিকে প্রেসার বৃদ্ধি পেলে বিকল্প একটা ব্যবস্থা থাকা উচিৎ। যদিও কোন কোন ডাক্তার বলেন মাঝখানে আর কোন ওষুধের প্রয়োজন নেই। কিন্তু ওষুধ খেতে হচ্ছে ২৪ ঘণ্টা পরপর। কোন দিন যেমন কাল সকালেই দেখা গেল প্রেসার উপরেরটা ১৮০। সন্ধ্যা পর্যন্ত তো এটা আরো বাড়ার আশংকা থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। তদুপরি সফরের কষ্ট এবং টেনশনতো আছেই। তাই প্রোসানটা খেয়ে রওয়ানা করার ফলে সফর থেকে এসে প্রেসার চেক করে দেখা গেল উপরেরটা ১৮০ থেকে ১৬০ এ এসেছে আর নীচেরটা ৭৫ থেকে ৭০ এ এসেছে। প্রফেসর সজল ব্যানার্জির মতে ডায়াবেটিসের রোগীদের প্রেসার উপরেরটা তুলনামূলকভাবে একটু বেশিই থাকে।

আজ ১১ মার্চ ২০১২। কালকের ১০ মার্চ প্রায় সবটাই কেটে গেছে ব্যস্ততায়। অবশ্য আগেই উল্লেখ করেছি অন্যান্য বারের তুলনায় এবারে বেশ একটু আগেই চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছেছি। কিন্তু গতকালের নির্দিষ্ট সাক্ষাতের সময়ে পরিবারের লোকেরা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের গেট থেকে ফিরে গেছে এক বুক ব্যথা নিয়ে। তাদের কথা ভাবতে ভাবতেই ঢাকা চট্টগ্রাম সফর শেষ করেছি। ছেলেটা, ভাতিজা মিঠুসহ চট্টগ্রামে আসে। পথে দেখাও হয়ে যায়। কিভাবে এটা ঘটল? তারা জানত ১৩ মার্চের আগে তো চট্টগ্রাম নেওয়ার কথা নয়। জেল গেটে দেখা করতে এসে হতাশ হয়ে ফিরতে গিয়ে কী এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১৪ মার্চ হাজিরা। আজ সহ তিন দিন এখানে নির্জনে বাস করতে হবে। মাঝে মধ্যে জানালার ফাঁক দিয়ে শাহজাহান চৌধুরী ও মেজর (অব.) লিয়াকতের দেখা পাওয়া যায়। এবারে চট্টগ্রাম এসেই মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি জেলে আছি। কালকের পারিবারিক সাক্ষাত না হওয়ায় মনে মনে যে যন্ত্রণা অনুভব করছি। আমার মা মনি মহসীনার মনের উপর এর কী যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা নিয়ে আমি বেশি চিন্তিত। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আমরা থাকি মোটামুটি এক অভিন্ন পরিবারের সদস্যের মত। একসাথে নামাজ, খাওয়া, নাস্তা এমনকি হাঁটাহাঁটিও হয় এক সাথেই প্রায়। এখানে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে আসতে হচ্ছে জুলাইয়ের ৩০ তারিখ থেকে। ১ আগস্ট ২০১২ হাজিরার জন্যে ৩০ জুলাইতেই নিয়ে এসেছিল। কোর্টে হাজিরার আগে একদিন পূর্ণ বিশ্রামেই ছিলাম। সেবারে আমার ছেলে ব্যারিস্টার নাজিবুর রহমান তার স্ত্রীসহ এসেছিল। ৩১ জুলাই তারা চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে আইনজীবী মনজুর আনসারী সহই এসে দেখা করেছিল। এবারে হঠাৎ করে নিয়ে আসার কারণে তাদেরকে কোন কথা বলে আসা সম্ভব হয়নি। আমি চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানার কয়েক ঘণ্টা পরে তারা জেল গেটে দেখা করতে এসে হতাশ হয়ে ফিরে গেছে এবং সেই সাথে হয়ত আমার চট্টগ্রাম আসার খরবটিও পেয়ে থাকবে। এখানে কোর্টে হাজিরার আগে পূর্ণ তিন দিন অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে। মোমেন মিঠু সময়মত খবর জানলে চট্টগ্রাম এসে আইনজীবীসহ অথবা আইনজীবী ছাড়াই আমার সাথে একবার দেখা করতে পারত। কিন্তু আমিই আসার সময় সুযোগ করে সেই মেসেজটা দিয়ে আসতে পারিনি। তারা নিজেরা বুদ্ধি করে কাল বা পরশু দেখা সাক্ষাতের উদ্যোগ নিতে পারবে কিনা তাও বলতে পারছি না। বুদ্ধি করে প্রথমবারে যেমন দেখা করেছিল সেভাবেই এবারেও দেখা করার সুযোগ ছিল। কিন্তু সেরূপ চিন্তা করছে কিনা তাতো আমার জানার উপায় নেই। মনে হচ্ছে কোর্টের দিন ছাড়া আর দেখা হওয়ার কোন সুযোগ হবে না। তারা আসল কিনা, এসে থাকলে কোথায় উঠেছে সে খবরটাও জানতে পারছি না। এবারে এমন তাড়াহুড়ো করে আসতে হয়েছে যে অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রই সাথে আনতে পারিনি। পুরো সপ্তাহটাই এবার মানসিক চাপে কাটবে তারই সূচনা হয়েছে সপ্তাহের প্রথম দিনে পারিবারিক সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত হবার ফলে।

ইতঃপূর্বে দুটো সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলাম, তাও সরকারী সিদ্ধান্তের কারণে। এবারেও ঘটল একই ব্যাপার। আর এক সপ্তাহে আমার পরিবারের লোকেরা পরপর ৩ দিন এসে ফিরে যায়, অজানা কারণে

www.pathagar.com

তারা দেখা করতে পারেনি। জেলকর্তৃপক্ষ (ঢাকার) অবশ্য বলেছে কিছু একটা কারণেই কোন সাক্ষাতই হতে পারেনি। পরে আমার ও সাঈদী সাহেবের পরিবারের সদস্যরা ডিআইজি ও আইজি প্রিজনারের বাসা পর্যন্ত নক করে সাক্ষাতের সুযোগ আদায় করেছিল। এ জন্যে তাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল প্রায় ৩/৪ ঘণ্টা। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের কর্তৃপক্ষ আসলেই মানসিক দিকটাকে মোটেই পাত্তা দিতে চায় না। আইনই নাকি তাদের কাছে বড়। অথচ জেল কোডের পরিপন্থী কাজ তারা করলে সেটা আইন ভঙ্গের আওতায় পড়ে না। কখনও কখনও শোনা যায় সিনিয়র জেল সুপারের কথাই নাকি আইন। যদি তাই হয় তা হলে তো আর জেলকোডের কোন মূল্যই থাকে না।

কারাগারে বসে দেশের পরিস্থিতি বলতে গেলে তেমন কিছুই বুঝতে পারি না। আমরা ঢাকায় যে চারটি পত্রিকা পাই তার সব কটিই জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতির ঘোরতর বিরোধী। বিএনপিসহ চারদলীয় জোটেরই বিপক্ষে তাদের অবস্থান।

জনকণ্ঠ বোম্বের রিলায়েন্স গ্রুপের মুখপত্রের ভূমিকা পালন করছে, এ ব্যাপারটি ওপেন সিক্রেটই বলতে হবে। ডেইলী স্টার জামায়াতের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি শক্ত অবস্থানে আছে। জামায়াত নেতৃবৃন্দের চরিত্র হনন ও বিকৃত ছবি প্রদর্শন তাদের যেন কাজ। শোনা যায় তাদের শেকড় নাকি অনেক গভীরে, সেই কারণে তারা দেশের বড় দুটি দলের মূল নেতৃত্বকেও তোয়াক্কা করে না। তারপর সংবাদ ও যুগান্তরের প্রতিবেদনে মাঝে মধ্যে সরকার বিরোধী কিছু থাকলেও জামায়াতে ইসলামীকে যতটা কোণঠাসা করা যায় তাতে তারা কেউ কারো থেকে পিছপা নয়। এই চারটি পত্রিকা পড়ে মুদ্রার একটি পিঠই দেখা যায়। অপরটি থেকে যায় ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

মাঝে মাঝে আমাদের জেলখানার চৌকস কোন সাথীদের কাছে আমার দেশ ও নয়াদিগন্ত এসে যায়, সংগ্রামও দুএকবার এসে যায়। এই তিনটি পত্রিকায় মুদ্রার অপর পিঠের চিত্রটির যে প্রকাশ ঘটে তা দেশ ও জাতির জন্যে মোটেই সুখকর মনে হয় না।

এবারে এখানে আমার কোর্টের নির্ধারিত তারিখ ১৪ মার্চ। ১৩ মার্চে ঢাকায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির হওয়ার কথা। ১২ মার্চের বিএনপি তথা চারদলীয় জোটের ঢাকা চল কর্মসূচির কারণে আমাদেরকে ৪ দিন আগে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম নিয়ে আসায় মনে হয়, সরকার বেশ মনস্তাত্ত্বিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে, অস্থিরতায় ভুগছে। এমনিতেই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতা এখন শুধু জাতীয় ভাবেই নয়, আন্তর্জাতিক ভাবেও সমালোচিত হচ্ছে। ৪২টি দূতাবাস সরকারের কাছে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে চিঠি দেয়ার সত্যতা একজন পুলিশ কর্মকর্তাও স্বীকার করেছে। এরপর সৌদি দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারী নিহত হবার ঘটনা ঘটে গেছে যা খুবই দুঃখজনক। কূটনৈতিক মহল বিশেষ করে যাদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা চেয়ে চিঠি দেয়া হয়েছিল, তাদের কাছে এ ঘটনাটির যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াও হবে তা বলাই বাহুল্য।

সরকারের কাছে তো বর্তমানে দেশের একমাত্র সমস্যা তথাকথিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার। বিচারের নামে এটা ইতিহাসের জঘন্যতম মিথ্যাচার। যে কোন রাজনৈতিক কর্মসূচির মধ্যে তারা দেখতে পায় তাদের প্রহসনের বিচার ঠেকানোর মতলব। এমনকি সৌদি কূটনীতিকের মর্মান্তিক মৃত্যু নিয়েও করছে ঐ একই তামাশা।

সৌদি লেবার মার্কেট থেকে বাংলাদেশীদের সরিয়ে যারা নিজেরা ঐ মার্কেটের একচেটিয়া দখল নিতে চায়, তাদের হাত এ হত্যাকাণ্ডের পেছনে থাকা অসম্ভব নয়। অথচ সে ব্যাপারে মাথা ঘামানোর কোন লক্ষণই দেখা যায় না। কারণ তাদের কাছে সমস্যাতো ঐ একটাই। রাষ্ট্র পরিচালনার তিন বছরে সরকার প্রতিটি সেক্টরে যে সীমাহীন ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, তা থেকে দেশবাসীর দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরানোর যে এটাই মোক্ষম হাতিয়ার। এছাড়া তাদের তো আর কিছু বলারও নেই করারও নেই। কিন্তু এভাবে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার অপচেষ্টা দেশের সচেতন জনতা অন্ধভাবে মেনে নেবে, এমন ভাবা বোকার স্বর্গে বাস

www.pathagar.com

করার শামিল ছাড়া আর কিছুই নয়। ইতিহাসের জঘন্যতম মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে, আর নিরপরাধ মানুষের উপর অকথ্য জুলুম ও নির্যাতন ও রাজনৈতিক নিপীড়ন চালিয়ে, দেশপ্রেমিক চরিত্রবান রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ইসলামী ব্যক্তিদের চরিত্র হনন করে পার পাওয়া যাবে না। আল্লাহ কোন সীমালংঘনকারীকেই বরদাশত করেন না। রশি একটু ঢিল দিয়ে রাখলেও তা কিছু সময়ের জন্যে। অবশেষে তার কুদরতি ব্যবস্থা অতীতে যেমন, এসেছে ভবিষ্যতেও আসতে থাকবে, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

মোমেন এবং মিঠু চট্টগ্রামে এসেছে কিনা এখনও জানার কোন উপায় হয়নি। মনে মনে আশা করছি, এসে থাকলে আজ অথবা আগামীকালের কোন এক সময় জেলগেটে এসে সাক্ষাতের চেষ্টা করবে। নতুবা কোর্টেই দেখা হবে। ১০ মার্চ ২০১২ তারিখে আমার স্ত্রী এবং বড় মেয়ে ও ছেলে মোমেন জেল গেটে দেখা করতে এসে কিভাবে ফিরে গেছে, কেমন প্রতিক্রিয়া নিয়ে ফিরে গেছে, মাঝে মাঝে কল্পনা করতে গিয়ে চোখের সামনে আমার মামনি মহসিনার অশ্রুভরা চেহারাটাই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। সে ছেলেমেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আবেগপ্রবণ, আমার প্রথম সন্তান হবার কারণে তার জন্যে আমারও মনটা একটু বেশিই কাঁদে তার জন্যে। অবশ্য আমার কাছে ছয় ছেলে মেয়েই সমান আদরের। সকল সন্তান আমার কাছে সমান। তবে প্রথম সন্তান হিসাবে মহসিনার ব্যাপারটা একটু ব্যতিক্রম। সেই সাথে ছেলেদের মধ্যে সবার ছোট এবং সন্তান হিসাবেও ছোট তালহার জন্যে মনে চিন্তাটা হয় সবচেয়ে বেশি। সে একটু বেশি সহজ সরল প্রকৃতির। আছে বিদেশে। বিদেশে পাসপোর্টই মানুষের বড় সম্বল। সেই পাসপোর্টের ব্যাপারে মালয়েশিয়াস্থ বাংলাদেশ মিশনের অসহযোগিতার কারণে সে দারুণ মনের কষ্টে আছে। আমার জন্যে তার দুশ্চিন্তার সাথে তার পাসপোর্টের সমস্যা তার মনের কষ্ট কত বাড়িয়ে দিয়েছে আমি জেলে এসে বসে তা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করছি। এই মনঃকষ্টের জন্যেই তার ফলাফল যত ভাল হবার কথা ততটা হয়নি, তবু আল্লাহর শুকরিয়া তার অনার্স ডিগ্রীটা হয়ে গেছে।

এখন চিন্তা তার ভবিষ্যত নিয়ে। মাস্টার্স ডিগ্রীর জন্যে অন্য কোথাও যেতে হলে তো আগে পাসপোর্টের সমস্যার সমাধান হওয়া দরকার। ওখানেই তার মাস্টার্স করার কথা ছিল। একটা এ্যাসিস্ট্যান্টশিপ পেয়ে যাবার আশাও করেছিল। তাহলে নিজের আয়েই নিজের খরচটাও বহন করতে পারত। পাসপোর্ট সমস্যা তার সেই আশা সেই স্বপ্ন গুঁড়িয়ে দিয়েছে। বন্দী অবস্থায় পিতা হয়েও বিপদগ্রস্ত ছেলের জন্যে আমার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হচ্ছে না। মজলুম পিতা হিসেবে বিপদগ্রস্ত সন্তানের জন্যে শুধু আল্লাহর দরবারে দোয়াই করে যাচ্ছি। আল্লাহ মজলুমের ফরিয়াদ কবুল করে তাকে বিপদ মুক্ত করে তার ক্যারিয়ারের পূর্ণতা অর্জনের সুযোগ করে দিন, কারাগারে বসে বার বার আল্লাহর দরবারে এই দোয়া মুনাজাতই করছি প্রাণ উজাড় করে। আল্লাহ আলেমুল গায়েব, তিনি জানেন আমাকে বিনা দোষে নিছক রাজনৈতিক প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে মিথ্যা মামলায় আটক রাখা হয়েছে। কিন্তু ছেলের তো কোন রাজনীতির সাথে এখানে কোন সম্পর্ক নেই। সে বিশ্বের অন্যতম সেরা একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করতে গেছে। পড়ালেখা শেষে দেশের জন্য সম্পদ হয়েই ফিরে আসবে। তাকে নিছক পিতার কারণে বিপদে ফেলার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। নিছক রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও সংকীর্ণ মনের পরিচয় ছাড়া এটাকে আর কোন ভাবেই ব্যাখা করা যায় না। আল্লাহর হাজার শোকর আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়ার কর্তৃপক্ষ তাকে ভাল জানে এবং তার পাশে দাঁড়িয়েছে পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে। তবে আমার ভরসা পুরোপুরি একমাত্র আল্লাহর সাহায্যের উপর। আল্লাহর সাহায্যে এবং কুদরতি ইশারায় উপলক্ষ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং সেখানে আমার পরিচিত কিছু ব্যক্তি তার পাশে দাঁড়াবে আশা করি। তবুও বাপ হিসাবে সন্তানের বিপদ মুক্তির চূড়ান্ত খবর না পাওয়া পর্যন্ত নিজেকে দুশ্চিন্তা মুক্ত করতে পারছি না। আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা যেন আমার সাধ্যের অতিরিক্ত পরীক্ষায় আমাকে না ফেলেন, এ জন্যে সব সময়ই করুণ কণ্ঠে তার দরবারে দোয়া করছি। আল্লাহ বিপদের মধ্যেও সুযোগ

www.pathagar.com

দিয়েছেন নির্জন নিভৃতে একান্তভাবে আল্লাহকে প্রাণ উজাড় করে ডাকার। এই সুযোগটারও যাতে সদ্ব্যবহার করতে পারি। এই সুযোগটাও যাতে কাজে লাগাতে পারি সে জন্যেও আল্লাহর কাছেই তৌফিক চাই। "হে আল্লাহ তুমি পছন্দ কর, যাতে তুমি রাজি খুশি এমন কথা, কাজ ও নিয়তের তৌফিক আমাদেরকে দান কর।"

আজ ১২ মার্চ ঢাকায় বিএনপি তথা চারদলীয় জোটের মহা সমাবেশের সর্বশেষ খবর জানার জন্যে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষায় ছিলাম। তেমনি প্রতীক্ষারত ছিলাম আজকের দিনের কোন এক সময়ে মোমেন হয়ত চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে আমার সাথে দেখা করার জন্যে আসতেও পারে। মহাসমাবেশের সাফল্যের খবর শুনে ভালই লাগল মনটা বেশ চাঙ্গা হল। এই সমাবেশ বানচালের জন্যে সরকারের গৃহীত চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও জুলুম নিপীড়ন সত্ত্বেও আশাতীত ভাবে সফল হওয়া আমাদের মত মজলুমদের জন্যে নিঃসন্দেহে একটু শুভ সংবাদ। সরকারের কূটচাল, অপপ্রচার এবং নিপীড়ন উপেক্ষা করে এভাবে সমাবেশকে জনসমুদ্রে পরিণত করা প্রমাণ করে জনমত সরকারের ব্যর্থতার জবাব দেবার জন্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জেগে উঠেছে। আজকের সমাবেশ সরকার বিরোধী আন্দোলনকে যৌক্তিক পরিণতিতে পৌঁছানোর জন্যে একটি মাইল ফলকের কাজ করবে এতে কোন সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোক আসার সম্ভাব্য সকল পথই সরকার বন্ধ করেছিল, ঢাকায় আবাসিক হোটেল ও হোটেলে লোক রাখার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া দেয়া নিষেধ করা হয়েছিল। নৌপথ ও সড়ক পথের যানবহনের চলাচলে পুলিশ ও দলীয় লাঠিয়াল বাহিনী নামানো হয়েছিল। এরপরও সমাবেশ সফল হওয়া প্রমাণ করে সরকার সামনের গণজোয়ারকে কিছুতেই রুখতে পারবে না। প্রয়োজন শুধু নেতৃত্বের বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের।

সমাবেশ নিয়ে চিন্তার পাশাপাশি আমি ভাবছিলাম কোর্টে যেতে হবে ১৪ মার্চ। ঢাকা থেকে আমাকে নিয়ে এল ১০ মার্চ। পরিবারের লোকেরা আগে না জানলেও সাক্ষাতের জন্যে এসে যখন ক্ষোভ আর হতাশা নিয়ে ফিরে গেছে তখন তো অবশ্যই জেনেছে। তারপর তো মোমেনের ও মিঠুর চট্টগ্রাম চলে আসার কথা। আর এত আগে এসে থাকলে জেলখানায় আমার সাথে দেখা করতে আসবে এটাই স্বাভাবিক মনে হয়েছিল। তাই মহাসমাবেশের চিন্তার সাথে সাথে দিনের কোন এক সময়ে মোমেন মিঠু দেখা করতে আসবেই, এ আশাও করছিলাম। কিন্তু দিন চলে গেল আজতো আর আসতে পারল না। এখন বুদ্ধি করে আগামীকাল আসার চেষ্টা করবে কিনা তাতো আল্লাহই ভাল জানেন। তবে আমি আশা নিয়েই প্রতীক্ষায় থাকলাম। আজ আসরের অল্প পরে একজন কয়েদী (বিডিআর) পাবনার ছেলে হঠাৎ এসে বলল আপনার জন্যে কিছু জিনিসপত্র এসেছে। আমি জানতে চাইলাম কেউ কি দেখা করতে এসেছে, সুযোগ না পেয়ে জিনিসপত্র দিয়ে গেছে? তার পক্ষে এটার উত্তর দেয়া সম্ভব ছিল না। প্রদত্ত জিনিসপত্রের মধ্যে কয়েক প্যাকেট সিগারেট ও ম্যাচ দেখে আমার সন্দেহ হল ঐ জিনিষ আমার জন্যে আসতে পারে না। আমি ওগুলো তার মাধ্যমেই ফেরত পাঠালাম।

কিছুক্ষণ পরে মাগরিবের অল্প আগে সুবেদার মুজিবুর রহমান (তার বাড়ি পাবনায়) আরো দুই ব্যাগ খাবার জিনিসপত্র নিয়ে হাজির হল। এবারে আর এতে সিগারেট জাতীয় কিছু ছিল না। আমার বাসা থেকে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে যেমন আপেল, কমলা, বিস্কুট, কলা, পাউরুটি পাঠানো হয় এবারে তাই পেলাম। আমার মনে বিশ্বাস জন্মাল হয়ত মোমেনই (আমার মেঝ ছেলে) এসেছিল সাক্ষাতের চেষ্টা করে সুযোগ পায়নি অথবা সাক্ষাতের নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পরে আসার কারণে সাক্ষাতের ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ করতে পারে নাই। তাই তাদের সাথে আনা খাবার সামগ্রীগুলো রুমে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছে। অবশ্য আমার জন্যে এসব খাবারের সামগ্রী থেকে সাক্ষাৎ হওয়াটাই ছিল বেশি প্রয়োজনীয়। কারণ গত শনিবারে পরিবারের সাথে নির্ধারিত দিনে তাদেরকে অনেক কথা বলার চিন্তা করেছিলাম যা বলার আর সুযোগ হয়নি। আজ অন্তত মোমেনকে কিছু বলতে পারতাম। তার কাছ থেকে কিছু শোনারও ছিল। ১৪ মার্চ

www.pathagar.com

কোর্টের ধার্যকৃত দিনের আগে আগামীকাল একটা দিন হাতে আছে, যদি ছেলেটা বুদ্ধি করে কাল আসতে পারে তাহলে, মনটা অনেকাংশেই হালকা হবে ইনশাআল্লাহ।

আজকের যুগান্তরের শেষ পাতায় একটি আজগুবি খবর দেখে বিস্মিত হলাম। আমার এলাকার আলোকদিয়া গ্রামের একজন লোক গতকাল কি পরশু নাকি সাঁথিয়া থানায় আমার নামে তাকে হত্যা প্রচেষ্টার একটা মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে। মানুষের পক্ষে মানুষের বিপদের সময় এমন জঘন্য মিথ্যা অভিযোগ এনে বিপদের বোঝা আরো ভারী করার উদ্যোগ নিতে পারে, এমনটি ভাবতেও অবাক লাগে। গ্রাম্য প্রবাদ আছে হাতি কাদায় পড়লে নাকি চামচিকাও লাথি মারে। লোকটার সাথে কোন বৈষয়িক সামাজিক বা রাজনৈতিক কোন বিষয়ে কোন প্রকার ঝগড়া বিবাদের কোন ঘটনাই জীবনে কোন দিন ঘটে নাই। সেই লোককে আমার পক্ষ থেকে হত্যা প্রচেষ্টার অভিযোগে মামলা দেবার মত জঘন্য মিথ্যাচারের আমি কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। আমার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হল তথাকথিত যুদ্ধাপরাধের বিচারে আমার বিরুদ্ধে তেমন প্রামাণ্য কোন তথ্যই সরকারের কাছে নেই। তাই একদিকে দশ ট্রাক অস্ত্র মামলায় জড়ানোর জন্যে সাবেক শিল্প সচিব ও বিসিআইসি চেয়ারম্যানকে দিয়ে মিথ্যা জবানবন্দী দিতে বাধ্য করার মতই কোন মহল আলমাস সাহেবকে দিয়ে মামলাটি করিয়েছে। সব মিথ্যাচারের জন্যে আমি এক আল্লাহর কাছেই বিচার প্রার্থী।

আমার ছেলে মোমেন চট্টগ্রাম এসে পৌঁছেছে কিনা এখনও বুঝে উঠতে পারছি না। কাল বিকেলে খাবার জন্যে কলা, বিস্কুট, আপেল, কমলা ও পাউরুটি পাঠানোর ব্যবস্থা করায় মনে হয়েছিল ওরা চট্টগ্রাম এসেছে। কাল দেখা করার সুযোগ করতে না পারলেও আজ আসবে। দিনভর চাতক পাখীর মত পথ চেয়ে তাদের আসার অপেক্ষায় ছিলাম। কিন্তু না দিনতো শেষ হয়ে গেছে। মাগরিবের পর টেবিলে বসেছি আজকের অনুভূতি ব্যক্ত করার জন্যে। জেল জীবনের এবারের একবছর আট মাসের মধ্যে আজকের মত একাকিত্ব বোধহয় আর কখনও অনুভূত হয়নি। আগামীকাল কোর্টে দেখা হতে পারে। যদি হয় তাহলেও হয়ত এই ৪/৫ দিনের মনের সকল কথা সংক্ষেপে হলেও বলতে পারব। আর তাতেই এই দুঃখ ভারাক্রান্ত মনটাকে কিছুটা হলেও হালকা করা যাবে।

চট্টগ্রামে আসা যাওয়ায় আমার দারুণ কষ্ট হয়, তারপরও কোর্টে এখানকার আইনজীবী ভাইদের আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করে, তাদের সাহচর্যে কিছুক্ষণ কাটাবার সুযোগে জেল জীবনের কষ্ট ক্লেশের কথা প্রায় ভুলেই যাই। এখানকার ভাইদের সাথে দেখা হওয়ায় মনে পড়ে আমার মা মনি মুহসিনার কথা। সে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল চট্টগ্রাম যাওয়া আসার সময় মনে করবেন সফরে যাচ্ছেন। আপনিতো সারাটি জীবন সফরেই কাটিয়েছেন। সত্যি বন্দী জীবনের ফাঁকে চট্টগ্রাম আসা যাওয়া অনেকটা সফরের মতই মনে হচ্ছে।

আগামীকাল বুধবার কোর্টে হাজিরার সময় আমার বিপক্ষের সাক্ষী অবসর প্রাপ্ত মেজর জেনারেল এবং সাবেক বিসিআইসি এর চেয়ারম্যানের জেরা হবার কথা। সেই সাথে চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানার এমডি মুহসিন তালুকদার সাহেবের আইনজীবীও তাকে জেরা করার কথা। কোর্টের কার্যক্রম আগামীকালের মধ্যে শেষ না হলে বিচারক পরের দিনও তারিখ দিতে পারেন। পরের দিন বৃহস্পতিবারে কোর্ট একটু সকালে শেষ হতে পারে। আমাকে এবং বাবর সাহেবকে সাধারণত ঐ দিনই বিকেলে ঢাকায় ফেরত পাঠিয়ে দেয়। আমি প্রত্যেকবারই তাদেরকে বলেছি দুপুরের পরে পাঠালে আমার খুবই কষ্ট হয়। তাই যে দিনই হোক, আমাকে যেন দিনের সকাল ভাগে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। এজন্যে বারবারই অনুরোধ জানিয়ে থাকি। জেল কর্তৃপক্ষ কখনও স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অনুরোধ রক্ষা করে থাকেন, আবার কখনও অপারগতা প্রকাশ করে আমাকে অনুরোধ করেন তাদেরকে সাহায্য করার জন্যে।

www.pathagar.com

আসলে বন্দী অবস্থায় আমাদের কিছুই করার নেই। কর্তৃপক্ষের মনে আল্লাহর সহানুভূতি সৃষ্টি করে দিলে তারা নিজেরাই বেশ আন্তরিকতার পরিচয় দিয়ে থাকে। কখনও কখনও ব্যতিক্রম হয় এতে আমাদের করার কিছুই নেই। আমি আমার মনের সকল ব্যথা দুশ্চিন্তা একমাত্র আল্লাহকেই জানাই।

গত তারিখে ১৪ মার্চের হাজিরা দেয়ার জন্যে চট্টগ্রামে যেতে হয় ১০ মার্চে যা আগেই উল্লেখ করেছি। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে না নিয়ে সরাসরি গাজীপুর জেল কারাগারে পাঠাবে এটা ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি। পেলে ওখানকার সাথী বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিতে পারতাম। কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথেও ভালমন্দ একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তাদের কাছ থেকেও বিদায় নিতে পারতাম। কিন্তু সেটা আর সম্ভব হয়নি। চট্টগ্রামে যারা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে যাওয়া আসা করেন তাদের মাধ্যমেই সালাম পাঠানো ছাড়া আর কোন সুযোগই পেলাম না।

আমি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার হয়ে আসলে আমার ১ বছর ৮ মাসে তিলতিল করে জমে উঠা জিনিসপত্র দেখে শুনে নিয়ে আসতে পারতাম। কিন্তু আমাকে জানানো হলো এতে নাকি কি কি অসুবিধা আছে তাই আমাকে আর অল্প সময়ের জন্যেও ঢাকায় কারাগারে নেয়া যাবে না। জিনিসপত্র কারাগার কর্তৃপক্ষ তাদের দায়িত্বে পাঠাবেন। যা এসে পৌঁছতে দুই দিন সময় অতিবাহিত হল। তারপর দেখা গেল আমার জরুরি একটা ওষুধের ফাইল আসেনি। মেডিপ্লাস ডি এস টুথ পেস্ট ও তার সাথে টুথ ব্রাশ একেবারে আনকোরা নতুন এটাও আসে নাই। আমার বড় মেয়ে মুহসিনার কাছে প্লাসটিকের একটা গামলা বা ঝুড়ি চেয়েছিলাম যাতে আমি একসাথে অনেকগুলো জিনিস যেমন দুধের প্যাকেট, চায়ের প্যাকেট, বিস্কুটের প্যাকেট, বাদাম-খেজুর ইত্যাদি রাখতাম। সেই বাসকেটটা আসেনি।

তাছাড়া জেলখানার তোষক ও বালিশ পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে যেটা আমার নয়। ফ্লোর ম্যাট এখানে প্রয়োজন নেই। আমি নিজে মাল গুছিয়ে আনলে ওটা ঐ রুমেই ফেলে আসতাম। অহেতুক ওটা পাঠানো হয়েছে। আমার ১২টা হ্যাংগার ঝুলাবার স্ট্যান্ডটা আমার বড় মেয়ে মুহসিনার পছন্দের। হ্যাংগার গুলো আসলেও স্ট্যান্ডটা আসেনি। এছাড়া ২ দিন পর জিনিসপত্র আসলেও কিছু মাল ঐ দিনই রাতে পেয়েছি স্যুটকেসটা তালামারা থাকায় পেয়েছি আরো একদিন পরে। চাবি দেয়া সত্ত্বেও ৫/৬ ঘণ্টা পরে। বইয়ের মধ্যে বড় মোটা হাদিসের ও সীরাতের কিতাব ছাড়া বাকীগুলো দেখে দেয়ার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সপ্তাহ চলে যায়, বই পাওয়া যায়নি। পরে আমিই বলে পাঠালাম যেগুলো দেয়ার মত নয় সেগুলো যেন আমার পারিবারিক সাক্ষাতের দিন (ঠিক এক সপ্তাহ পরে) আমার পরিবারের লোকদের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়। তার মধ্যে ট্রাইব্যুাল থেকে দেয়া মামলা সংক্রান্ত তিনটি ডকুমেন্ট ফাইল ফেরত দেয়া হয়নি, বলা হয় ঢাকায় কেন্দ্রীয় কারাকর্তৃপক্ষ নাকি বলেছে এগুলো তারা পাঠায়নি। কারাকর্তৃপক্ষ এমন কথা বলতে পারে না। কারণ তারা দেখে শুনেই ওগুলো আমাকে রুমে দিয়ে গিয়েছিল। এরপরও যদি এমন কথা বলে থাকে তাহলে সম্পূর্ণ অসত্য কথা বলেছে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যাহোক এ বিষয়টি ট্রাইব্যুনালের দৃষ্টিতে আসার পর তারা বলেছে দরখাস্ত নিয়ে গেলে তারা লিখিত অর্ডার দেবে। আগামী ৭ এপ্রিল আমার পরিবারের সাক্ষাতের নির্ধারিত দিনে সেটা পাওয়ার আশা করছি। দেখা যাক কী হয়?

গাজীপুর কারাগার যেহেতু জেলা কারাগার এজন্যে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের এবং চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের সাথে এর পার্থক্য বিরাট। অবশ্য বিল্ডিং নতুন হওয়ার কারণে ঢাকার ২৬ সেলের মত স্যাঁতসেঁতে ভাব এখানে নেই। কিন্তু আবার ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ২৬ সেলে চৌকার চারপাশ দিয়ে হাঁটার যে সুযোগ সে সুযোগটা এখানে নেই। এখানে জেলের একপ্রান্তে ভিআইপি ওয়ার্ডে মাত্র দুটো রুম ভিআইপি বন্দীর জন্যে। মাঝখানে একটু ফাঁকা জায়গায়, পূর্বপ্রান্তের রুমের পাশে রান্নাঘর। পশ্চিম প্রান্তের রুমের সাথে একটু ফাঁকা জায়গায় দরজাবিহীন কামরায় সেবক থাকে। লক আপের পর আমার রুমে আমি একা আর সেবক পাশের রুমে থাকে। তার রুম যেহেতু দরজাবিহীন সে কিচেন ও মাঝের ফাঁকা জায়গা ঘোরাফেরা করতে পারে। সেখানে কারারক্ষীদের ডিউটি থাকতে পারে। রাত্রিতে বেশি

www.pathagar.com

নিঃসঙ্গ মনে হয় এখানে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ২৬ সেলের বারান্দায়ও কারা রক্ষীরা ডিউটি দেয়। বারান্দার বাইরেও আরো কারারক্ষী দায়িত্ব পালন করে থাকে। পাশের রুমে কারাগারের সাথী বন্ধুরা থাকেন। ৪ জন সেবক কখনও ১৬ নং রুমে কখনও ২ নং রুমে থাকে। কোন অসুবিধা হলে পাশের রুমেও আওয়াজ পাওয়া যায়, দায়িত্বরত কারারক্ষীকেও ডাকা যায়। এখানে শুধু পাশের রুমের সেবককেই ডাকা যায়। তার মধ্যমে কারারক্ষীদের ডাকা যেতে পারে।

এখানে লোডশেডিংয়ের মাত্রা খুবই বেশি। আমাকে এজন্যে কেউ কেউ ২টি চার্জার ফ্যান ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকে। লোডশেডিং এর কষ্টের সাথে আর একটি অসহনীয় মাত্রা যোগ করে মশার যন্ত্রণা। নিঃসঙ্গতার সাথে এই দুই কষ্ট নিয়ে এখানে ১৬ মার্চের রাত থেকে আর কত দিন থাকতে হবে তা আল্লাহ আলেমুল গায়েব ছাড়া কারো পক্ষে অনুমান করাও সম্ভব নয়। আল্লাহর একজন নগণ্য বান্দা হিসাবে সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা করি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার চেষ্টা করি। তার মধ্যেই আমার আত্মা লাভ করে থাকে পরমতৃপ্তি ও পরম প্রশান্তি। এখানে আপনজন বলতে কেউ নেই। নির্জন নিরালায় আল্লাহই আমার একান্ত সাথী। আল্লাহই আমার জন্যে যথেষ্ট। তার ঘোষণাটি মাঝে মধ্যে আমাকে আবেগ আপ্লুত করে তুলে আর সেই ঘোষণাটি হল ঃ

"আল্লাহ তোমাদের দুশমনদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অবগত আছেন, আল্লাহই অভিভাবক হিসাবে যথেষ্ট, তিনি আল্লাহই সাহায্যকারী হিসাবে।" আল্লাহর এই ঘোষণার মধ্যে আমি হৃদয়ের গভীরে পরম প্রশান্তি অনুভব করি মনের মধ্যে পাই যথেষ্ট সাহস হিম্মত। আল্লাহর ঘোষণায় তিনি যখন আমাদের জন্যে অভিভাবক এবং সাহায্যকারী হিসাবে যথেষ্ট বলে

সান্ত্বনা দিচ্ছেন, তখন আর দুশ্চিন্তার কোন কারণই থাকতে পারে না। আল্লাহ তার এই ঘোষণাটির মর্মস্পর্শী ভাব আমার হৃদয়ে সদা জাগরুক রাখুন, এটাই মনে প্রাণে আল্লাহর দরবারে কামনা করি। আল্লাহর নৈকট্যলাভের এই দুর্লভ সময়ের যেন পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারি এটা হোক আমার সর্বাস্তকরণ সংকল্প।

চট্টগ্রাম আদালতে ৩ ও ৪ এপ্রিল হাজিরা দেবার পর ৫ এপ্রিল বিকেল ৫টার দিকে গাজীপুর কারাগারে পৌঁছার পর আজ শনিবারে ৭ এপ্রিল ছিল পারিবারিক সাক্ষাতের নির্ধারিত দিন। আমার ছেলে মোমেন বৌমাকে লন্ডনে তার মা বাপের কাছে রেখে দেশে ফেরার পথে ওমরাহ পালন করে ৫ এপ্রিল ঢাকায় পৌঁছে। গত সপ্তাহে সে সাক্ষাতেও আসতে পারেনি, চট্টগ্রামেও যেতে পারেনি। ১ এপ্রিলে ঢাকার ট্রাইব্যুনালেও সে উপস্থিত ছিল না। গত কদিন তার অনুপস্থিতি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছি। আজকের সাক্ষাতে সদ্য ওমরাহ পালন করে এসেছে বলে তার সাক্ষাতে আত্মায় এক অফুরন্ত ও অব্যক্ত প্রশান্তি অনুভূত হল। ছেলে আমার জন্যে কা'বা বায়তুল্লাহ তাওয়াফের সময়, কা'বা বায়তুল্লাহর গেলাপ ধরে মুলতাজিমে, মিজাবে রহমাতে দাঁড়িয়ে আমার জন্যে প্রাণ উজাড় করে দোআ করে এসেছে এর চেয়ে সৌভাগ্যের ঘটনা আর কিইবা হতে পারে। অবশ্য সারা দেশে এবং দুনিয়ার সর্বত্র যেখানেই আমাদের পরিচিত এবং সমর্থক শুভাকাঙ্ক্ষী আছেন সবাই দোআ করছেন, বর্তমান সময়ের শ্রেষ্ঠতম আলেমে দ্বীন ইউসুফ আল কারদাভী সালাম পাঠিয়েছেন জেনে আরো বেশি খুশি হলাম।

আমরা যারা জেলে আছি তারা যতনা কষ্টে আছি, তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্টে আছে আমাদের পরিবারের সদস্যগণ। পরিবারের সদস্যদের অন্তরের ব্যথা বেদনা ও পেরেশানী আমি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করি। তাদের এই ব্যথা বেদনা লাঘবের জন্যে রাসূলের শিখানো দুটো দোআ দুটো কাগজে আলাদা আলাদা করে লিখে হাতে হাতে দেয়ার জন্যে নিয়ে গিয়েছিলাম। তবে লিখিত সামান্য কোন জিনিসও আমি জেলকর্তৃপক্ষের সম্মতি বা অনুমোদন ছাড়া দেই না। সরল বিশ্বাসে একজন ডেপুটি জেলারকে দোআ দুটো দেখতে বলেছিলাম। দোআ দুটোই আরবীতে লেখা। তবে উপরে বিষয়বস্তুর উল্লেখ করেছি বাংলায় যাতে জেল কর্তৃপক্ষের বুঝতে অসুবিধা না হয়, কিন্তু ওরা এতটাই সংকীর্ণ মনা যে আমার এই

www.pathagar.com

সরলতাকে তারা মূল্যায়ন করতে পারল না। ডেপুটি জেলার সেলিম সাহেব বললেন কোন হুজুর ডেকে দেখাতে হবে। প্রথমে ডেকে আনে এক পোশাকী হুজুরকে যে বাস্তবে জাহেল, সে বলেছে এটা কোন সূরা থেকে নেয়া হয়েছে তার উল্লেখ নাই। তাই তার কোন বড় হুজুরকে দেখাতে হবে। অতএব ঐ দোআ দুটো আমার স্ত্রী বা ছেলে মেয়ের হাতে তুলে দিতে পারলাম না। ছোট্ট দুটি কাগজ আমি লুকিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু নৈতিকভাবে এমন কাজ করা পছন্দ করি না বলেই তাদের দেখতে দিলাম। আর তারা আমার এই সততা ও সরলতাকে অবমূল্যায়ন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করল না। কারণ একদিকে এদের ইসলাম সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানটুকুও অর্জনের সুযোগ হয়নি। দ্বিতীয়ত, আমাদের মত মোল্লা মুসল্লিদের প্রতি এদের মনের ভেতরে রয়েছে বিদ্বেষ ও অবজ্ঞার ভাব। ডেপুটি জেলার সেলিম সাহেব বলে দিলেন দোআ দুটো তাদের পছন্দের কোন বড় হুজুরকে দেখানোর পর সিদ্ধান্ত দেবে। আমি বলে আসলাম দোআর দুই টুকরো কাগজ দিতে জেলকর্তৃপক্ষের যদি আপত্তি থাকে, তাহলে যেন আমার কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়। একটি মুসলিম প্রধান দেশের একজন সরকারী কর্মকর্তার এহেন অজ্ঞতা এবং প্রকারান্তরে অবজ্ঞতার ভাব দেখে আমি অবাক হইনি, কারণ এদেরকে প্রাথমিক ইসলামী শিক্ষা দেয়ার কোন ব্যবস্থাও দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় নেই। যাহোক, আমার ছেলে নিজে আলেম, ও বলল ঐ দুটো দোআর একটা ওর মুখস্ত আছে, অপরটি হাদিসের কোন কেতাবে রাসূলের (দ.) দোআর অধ্যায় থেকে খুঁজে বের করে নিতে পারবে এবং পরিবারের অন্যান্যদেরকে দিতে পারবে। আল্লাহ এই অবস্থা থেকে দ্রুত মুক্তি দেবেন এই আশায় বুক বেঁধে তার দরবারে দোআ অব্যাবহত রাখার কোন বিকল্প নেই।

১৬ মার্চ বিকেলে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ফিরে যাবার পরিবর্তে আমাকে পাঠানো হয় গাজীপুর জেলা কারাগারে। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি এখানে অবস্থানের ক্ষেত্রে নেতিবাচক দিক তিনটি, ১. মশার অতিরিক্ত উপদ্রপ, ২. অতি মাত্রায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা লোডশেডিং, ৩. নিঃসঙ্গতা। এর সাথে ইতিবাচক দুটি দিকও আছে একটি হল, এ জেলখানার বিল্ডিং নতুন হওয়ার কারণে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের মত দেওয়াল চুইয়ে পানি পড়া সমস্যা নেই, মেঝেও স্যাঁতসেঁতে নয় এবং এখানে কোন সাথী সঙ্গীর সাথে গল্প গুজবে অংশ নেয়ার সুযোগ না থাকায় একান্তে আল্লাহকে একটু বেশি বেশি করে ডাকা যায়। আমার বর্তমান বয়সে এটা একটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় সুযোগ বড় নিয়ামত। আল্লাহ কিশোর বয়স থেকে তার দ্বীন কায়েমের আন্দোলনে একজন নীরব কর্মী হিসাবে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন। ছাত্র জীবনে এই নীরব কর্মীকে আল্লাহ ছাত্র সংগঠনের সর্বোচ্চ দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিয়েছেন। ছাত্র সংগঠন থেকে বিদায়ের পর বৃহত্তর ইসলামী আন্দোলনেও আমি একজন নগণ্য এবং নীরব কর্মী হিসাবেই কাজ শুরু করি। পরবর্তীতে আল্লাহ সর্বোচ্চ দায়িত্ব পালনের সুযোগ দিয়েছেন। আমি আমার জীবনে তেমন চমক সৃষ্টি করার মত কোন কর্মকাণ্ড করতে পারিনি। তারপরও আন্দোলনে যতটুকু করার তৌফিক আল্লাহ দিয়েছেন যদি দয়া করে তিনি তা কবুল করেন। জেল জীবনের নির্জন নিরালায় জিকির আজকার ও ইস্তেগফার কবুল করেন, তাহলে আমার এ জীবনকে আমি ধন্য মনে করব। আল্লাহ তার এই গোনাহগার, অধম, অখ্যাত পল্লীগ্রামে জন্ম গ্রহণকারী এক গরীব কৃষকের সন্তানের মাধ্যমে এদেশের দ্বীনি মাদরাসার ছাত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও ইসলামী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট করার তৌফিক দিয়েছেন, যার সুদূর প্রসারী ফল একদিন চর্মচোখেই মানুষ দেখতে পাবে। আধুনিক শিক্ষিত যুবকদেরকেও ইসলামের পথে আনার ব্যাপারে আল্লাহ তার এই অধম বান্দাকে দীর্ঘদিন সময় ও সুযোগ দিয়েছেন। দেশের নারী সমাজ ইসলামী শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে ইসলামী আন্দোলনেও পিছিয়ে ছিল। তাদের অংশ গ্রহণ ছিল না বললেই চলে। সমাজের অর্ধেক জনশক্তি এই নারী সমাজকে ইসলামী আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার জন্যে ছাত্র জীবনে উদ্যোগ নিয়ে কিছু করতে পারিনি। কারণ মুরুব্বীদের সম্মতি পাওয়া যায়নি। তদানীন্তন আমীরে জামায়াত এবং নায়েবে জামায়াত (জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা) সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.) আমাকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দেন '৭০

www.pathagar.com

এর নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবও উৎসাহ যোগান। সেই সুযোগে মুসলিম ছাত্রী সংস্থা নামে একটি ছাত্রী সংগঠনের সূচনা করা হয়। কিন্তু পরিস্থিতি দ্রুত পাল্টে যাওয়ায় সে উদ্যোগ সফল হয়নি। তবে আমার মনের বাসনা সংকল্পে রূপ নেয়। আমি আমার সমসাময়িক বন্ধুদের কারো কারো কাছে আমার মনোভাব এভাবে ব্যক্ত করি যে আল্লাহ তৌফিক দিলে বিয়ে শাদীর পর নিজের স্ত্রীর মাধ্যমেই এই ময়দানে কাজ করব, যাতে কোন মহলের বিরূপ মন্তব্য করার কোন সুযোগ না থাকে। সেই সময় থেকে সুরায়ে ফোরকানে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের দোআর অংশ বিশেষ আমার খুবই ভাল লাগে। বিয়ের আগেই আমি আল্লাহর দরবারে ওটাকে আমার দোআর বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রূপে নির্ধারণ করি। এবং আবেগ দিয়ে আল্লাহর দরবারে হাত তুললেই দোআ করি-
"হে আমাদের পরওয়ারদেগার, আমাদের স্বামী স্ত্রীদেরকে এবং সন্তানদেরকে চক্ষু শীতলকারী বানাও, আর আমাদেরকে সবাইকে (পরিবারের সদস্যদেরকে) আল্লাহ ভীরু লোকদের জন্যে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় বানাও।"
আমি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি আল্লাহ আমার এই দোআ কবুল করেছেন। আমার জীবন সঙ্গীনীর সহায়তায় ছাত্রী এবং মহিলাদের একটি অংশ বেশ দ্রুততার সাথেই ইসলামী আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছেন। এতে আল্লাহর অনেক বান্দা ও বান্দীরই অবদান আছে। তবে উদ্যোগী ভূমিকায় আল্লাহ আমাকে এবং স্ত্রীকে কবুল করেছেন, এজন্যে তার দরবারে লাখো শুকরিয়া, এ শুকরিয়া প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই।

চট্টগ্রামে যাওয়া-আসার বিড়ম্বনা- ০২

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ সুবহানাহুতায়ালা তার এই নগণ্য বান্দার মাধ্যমে কিছু কাজ নিয়েছেন, অন্য কথায় তার এই নগণ্য ও অযোগ্য অধম বান্দাকে তার দ্বীনের কাজ কিছুটা হলেও দিয়েছেন। এই সময় আমার মনে পড়ছে মরহুম আব্বাজানের কথা তিনি আমার এক উস্তাদকে বলেছিলেন, "আমার ছেলেকে বলবেন তাকে এ জন্যে লেখাপড়া করাচ্ছি না যে, সে লেখাপড়া শিখে আয় রোজগার করে আমাদের খাওয়াবে। আমি তাকে মাদরাসায় পড়তে দিয়েছি দ্বীনের কাজ করার জন্যে, দ্বীনের খেদমত করার জন্যে। আমি তাকে আল্লাহর দ্বীনের জন্যে তো ওয়াকফ করেছি। মরহুম আব্বার মনের বাসনা আল্লাহ কবুল করেছেন বলেই মনে হয়। অন্যথায় আমার মত একজন নগণ্য ব্যক্তির পক্ষে দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যতটুকু এগিয়েছি, এটা দ্বীনের দাবি অনুযায়ী যথেষ্ট না হলেও, আমার জন্যে এতটা এগিয়ে আসা আল্লাহর খাস রহমতেই সম্ভব হয়েছে। আর সে রহমত এসেছে মরহুম আব্বাজানের খালেছ নেক নিয়তের ফলে। তাই আব্বা আম্মা দুইজনের জন্যে আমার দোয়া ঃ রাব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানী ছগিরা।
কিশোর বয়স থেকে যে কাজটার জন্যে দোয়া করেছি, আল্লাহ কবুল করেছেন, সুযোগ করে দিয়েছেন। বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা পালনের তৌফিক দিয়েছেন। এই কাজ যেন মেহেরবানী করে আল্লাহ কবুল করেন। শুধু তাই নয় আমাদের সাথী-বন্ধুদেরকে, নতুন প্রজন্মকে, ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকে দ্বীনের কাজকে বিজয়ের দ্বার প্রান্তে পৌঁছানোর তৌফিক যেন তিনি দান করেন, আমাদের ভূমিকার সঠিক মূল্যায়নের তৌফিকও তাদের দান করেন। আজ আমাদের নিকট প্রতিবেশীর ভূমিকা আমাদের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্বের জন্যে সহায়ক না হুমকি এরও সঠিক মূল্যায়নের তৌফিক তাদের আল্লাহ দান করেন। ফারাক্কার মাধ্যমে ভারত আমাদের কতটা কল্যাণ করেছে আর কতটা অকল্যাণ করেছে, তা যেন তারা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে।

www.pathagar.com

দক্ষিণ বেরুবাড়ী আমরা দিয়ে দিলাম, কিন্তু তিনবিঘা করিডোর যেভাবে পাওয়ার কথা ইন্দিরা মুজিব চুক্তি অনুযায়ী সেভাবে কেন পেলাম না। এখন আবার বাংলাদেশের পরিবেশ বিজ্ঞানী ও পানি বিশেষজ্ঞদের মতের বিরুদ্ধে টিপাইমুখ বাঁধ দিয়ে ভারত বাংলাদেশের কী সর্বনাশটা করতে যাচ্ছে, বর্ডারে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে আমাদের প্রতি কতটা আস্থার পরিচয় দিয়েছে, নির্বিচারে গুলী করে সীমান্তে বাংলাদেশের মানুষ হত্যা করে বন্ধুত্বের পরিচয় দিচ্ছে না তাদের আগ্রাসী আধিপত্যবাদী সম্প্রসারণবাদী চরিত্রেরই নগ্ন প্রকাশ ঘটাচ্ছে এমন আচরণের মাধ্যমে, আজ সময় এসেছে এসব প্রশ্ন সামনে রেখে ভারতের বন্ধুত্বের সঠিক মূল্যায়নের। তিস্তা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার মমতা ব্যানার্জির মাধ্যমে চাণক্যনীতির পরিচয় দিল কিনা তাও ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

যাক কারা প্রাচীরের বাইরে আমার এই উপলব্ধি অনুভূতি তো প্রকাশের কোন সুযোগ নেই। তবে মহা কবি ইকবালের ভাষার অনুরূপ উচ্চারণে আমিও বলতে চাই মহান আল্লাহর দরবারে, হে আল্লাহ! আমার মনের এই উপলব্ধি গোটা দেশবাসীর মনে পৌঁছে দাও, বিশেষ করে পৌঁছে দাও দেশের নতুন প্রজন্মের মনে। তাদের কাছে যেন ভারতের বন্ধুত্বের আড়ালে আগ্রাসী, আধিপত্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী চরিত্রটি সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে চট্টগ্রাম আদালতে হাজিরা দিয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ফেরার পরিবর্তে আমাকে কেন, কি কারণে চট্টগ্রাম থেকে গাজীপুরে পাঠানো হলো তা কর্তৃপক্ষই জানে, তার চেয়েও বেশি জানেন আলেমুল গায়েব আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। তবে এখনকার আচরণে বুঝতে পারছি আমাদের এখানে পাঠানোর অন্তর্নিহিত উদ্দেশটা কী? রোদ বৃষ্টির মুহূর্তে ছাতার প্রয়োজনীয়তা বাংলাদেশের একজন গণ্ডমূর্খ মানুষের কাছে পরিষ্কার। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে এক বছর সাড়ে আট মাস আমার রুমে একটা গণ ছাতা ছিল। ২৬ সেলের প্রায় সবাই প্রয়োজনের সময় ওটা ব্যবহার করতেন। ওটা এক পর্যায়ে নষ্ট হবার পর অপেক্ষাকৃত ছোট আরেকটি ছাতার ব্যবস্থা করেছিল আমার পরিবারের পক্ষ থেকে। আমার মাল সামানা যা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ছিল তা দেখেশুনে আনার আমি সুযোগ পাইনি। কেন্দ্রীয় কারা কর্তৃপক্ষই তা পাঠিয়েছে। তার মধ্য থেকে আমার নিজের লেখা কিছু পুস্তিকাসহ মামলা সংক্রান্ত বই তিনটিও আমাকে এ পর্যন্ত দেয়া হয়নি। ছাতাটা জেলার সাহেব নিজে এসে নিয়ে গেছেন। ছাতাটা নষ্টও হয়ে গেছে। তবে এটা আমার কাছে পরিষ্কার নয় যে ছাতাটা কিভাবে নষ্ট হল? ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মালামালের সাথেই ছাতাটা এখানে এসেছে। অনেক মালামালের চাপেও নষ্ট হতে পারে, অথবা জেলারের রুমে গিয়েও নষ্ট হতে পারে কারণ জেলার সাহেব তো নিজে ওটা দেখেন না, তার স্টাফের লোকেরাই দেখে থাকে। আমার রুমে থাকা অবস্থায় মনে হয় ওটা ভাল অবস্থায়ই ছিল। যা হোক একটা ছাতায় কিছু যায় আসে না।

আমি আমার পরিবারের লোকদের মনের পেরেশানী দূর করার জন্যে রাসূলের (সা.) শিখানো দুটো দোয়া দুটো কাগজে লিখে জেল কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমেই পাঠাতে চেয়েছিলাম। দোয়া দুটি আরবীতে লেখা হলেও দোয়ার বিষয়বস্তু প্রতিটির উপরে বাংলা ভাষায় স্পষ্ট করে লিখে দেয়া সত্ত্বেও ডেপুটি জেলার ওটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যে তাদের কোন হুজুরের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত দিলেন। তারা যদি আপত্তি না দেয় তাহলে দেওয়া হবে বলে জানানো হলো। এ ঘটনা ৩১ শে মার্চের কিংবা ৭ এপ্রিলের হয়ে থাকবে। আজ ১১ এপ্রিল এখন পর্যন্ত এ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের কোন মতামত জানা যায়নি। গতকাল নিরাপত্তা বিষয়ক কর্মকর্তা এসেছিলেন আমার রুমে। তার কাছে থেকে জানা গেল প্রথমে মুয়াজ্জিন সাহেবকে দেয়া হয়, সে কোন মতামত দিতে না পারায় বড় হুজুরের কাছে দেয়া হয়েছিল। তিনি জানিয়েছেন, ৪টা দোয়া, এতে আপত্তিকর কিছু নেই। কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ সূত্রে এখনও আমাকে কিছু জানানো হয়নি। এই সব আচরণ থেকেই উপলব্ধি করা যায়, সর্বোচ্চ কারাকর্তৃপক্ষ আমার জন্যে অবশেষে গাজীপুর জেলা কারাগার কেন

www.pathagar.com

বাছাই করেছেন। যাক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে সর্বাস্থায় দোয়া, আল্লাহ যেন সর্বাস্থায় ছবর এবং শোকরের সাথে তার প্রতি রাজি থাকার তৌফিক দান করেন।

আমার পরিবারের পক্ষ থেকে আইজি প্রিজনারের কাছে দরখাস্ত দেয়ার কথা। ঢাকাস্থ পুরানো হাইকোর্ট বিল্ডিং-এ স্থাপিত ট্রাইব্যুনালে হাজিরা দিতে যেতে হবে। সাক্ষীর জেরা শুরু হলে যেতে হবে প্রতিদিন। হাজিরার দিন গাজীপুর কারাগার থেকে রওয়ানা করতে হয় সকাল ৭টার দিকে। শেষ রাতে ৩টা সাড়ে তিনটার দিকে উঠতে হয়, ফলে ফজরের নামাজের পর একটু না ঘুমিয়ে পারা যায় না। একটু ঘুমিয়ে গোসল, নাশতা সেরে ৭টায় রওয়ানা করা বাস্তবে একেবারে অসম্ভব। অতএব যদি প্রতিদিন এখান থেকেই গিয়ে কোর্টে হাজিরা দিতে হয় সেটা আমার জন্যে যে কতটা কষ্টকর হবে, তা আলেমুল গায়েব আল্লাহ মাবুদ মওলা ছাড়া আর কারো জানা নেই। কাউকে বলেও বোধহয় লাভ নেই। তবুও পরিবারের পক্ষ থেকে এবং আইনজীবীদের পক্ষ থেকে চেষ্টা চলছে দেখা যাক কী হয়।

আগামী ১৫ এপ্রিল ২০১২ ট্রাইব্যুনালে আমার পক্ষের আইনজীবীদের যুক্তি প্রদর্শনের জন্যে দিন ধার্য করা হয়েছে। পরের দিন অর্থাৎ ১৬ এপ্রিল আমাকে চট্টগ্রাম যেতে হবে ও কোর্টে হাজিরার দিন ধার্য হয়েছে ১৭ এবং ১৮ এপ্রিল। উক্ত তারিখের একদিন আগেই রওয়ানা করতে হবে গাজীপুর থেকে। আগের দিন গাজীপুর থেকে ঢাকায় ট্রাইব্যুনালে হাজিরার পরের দিনই গাজীপুর চট্টগ্রাম লম্বা সফর আমার শরীরের জন্যে কষ্টকরই শুধু নয় ক্ষতিকরও বটে। বারডেমের ফিজিক্যাল মেডিসিনের অধ্যাপক আমাকে লম্বা সফর করতে নিষেধ করেছেন, কিন্তু কারা কর্তৃপক্ষের কাছে এর কোন গুরুত্ব নেই।

ছোট ছেলেটার পাসপোর্টের ব্যাপারে হাইকোর্টের ইতিবাচক সিদ্ধান্তে মনে স্বস্তি ফিরে পেলাম। আল্লাহর দরবারে লাখ লাখ শুকরিয়া। তবে সংশ্লিষ্ট বিচারপতি রায় দিয়েই দেশের বাইরে যাওয়ার কারণে রায়ের সার্টিফায়েড কপিতে তার স্বাক্ষর পাওয়া যায়নি। তিনি ৮ এপ্রিলে দেশে আসার কথা। আসলেই স্বাক্ষর নিয়ে তালহার কাছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানোর কথা। আগামী শনিবারে পারিবারিক সাক্ষাতে অথবা রবিবার (১৫ এপ্রিল) ট্রাইব্যুনালে মোমেনের কাছ থেকে প্রকৃত অবস্থা জানা যাবে আশা করছি।

আমার মামলার কাগজপত্রগুলো গাজীপুর কারা কর্তৃপক্ষ এখনও আমাকে দেয়নি। ট্রাইব্যুনালের পক্ষ থেকে লিখিত কিছু পাওয়ার আশা করছি। তাও আগামী শনিবার বা রবিবারের আগে হবে বলে মনে হচ্ছে না। গত ক'দিন থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, এরপরও আমার ছাতা জেলার সাহেবের তত্ত্বাবধানে জেল গেটেই রয়ে গেছে। আমি অবশ্য রুমে শুয়ে বসে কখনও পায়চারী করে কাটাই। কিন্তু প্রয়োজনে সেবককে কোর্টে পাঠানোর জন্য ছাতাটার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি।

আজ শুভ শুক্রবার পবিত্র জুমআর দিন। জুমআর আজান শুনব, কিন্তু সে আজানের সাড়া দিয়ে জুমআর জামায়াতে যেতে পারব না, বাদ ফজর এই চিন্তা নিয়েই ঘুমিয়েছি। রুটিন মাফিক সকাল ৮টার দিকে গোসলের জন্যে ফরিদ গরম পানি এনে ডাক দেয়। নিয়মিত মঙ্গলবার আর শুক্রবারে নাপিত এসে ক্ষৌরকর্ম করে দিয়ে যায়। তাই গোসলের আগেই ক্ষৌরকর্ম সেরে গোসল শেষে নাস্তা করে, আমার রুটিন মাফিক কোরআন তেলাওয়াত করতে শুরু করব, এমন সময় সুবেদার সাহেব এসে বললেন, স্যার আপনাকে কাসিমপুর- ২ এ বদলি করা হয়েছে। এখনই তৈরি হয়ে যান। আমি বললাম, আমার ১ বছর ৯ মাসের জেল জীবনে টুকটাক অনেক জিনিসপত্র জমে গেছে। এগুলো গোছাতে একটু সময় লাগবে। তাছাড়া আমি নিজে এগুলো গোছাতে পারব না এজন্যে লোকের ব্যবস্থা করলে আমার প্রতি একটু এহসান হয়।

আমার সেবক ফরিদ হোসেন তার এক বন্ধু (কারাগারের সাথী) মেহেদীকে সাথে নিয়ে জিনিসপত্র মোটামুটি ঠিক করে দিল। বেশ তাড়াহুড়ো করেই আমাকে জেল গেটে উপস্থিত করা হল। কিন্তু সেখানে অপেক্ষা করতে হল অনেকক্ষণ। কারণ কাসিমপুর থেকে সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে গাজীপুর আনা

www.pathagar.com

হবে, আর আমাকে নেয়া হবে কাসিমপুর ২ নং এ। সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর গাড়ী ওখান থেকে রওয়ানা না করা পর্যন্ত আমাকে গেটেই অপেক্ষা করতে হল।

চৌধুরী সাহেবের গাড়ী রওয়ানার খবর হওয়ার সাথে সাথে আমাকে গাড়ীতে তোলা হল। গাজীপুরে জেলে ১৬ মার্চের রাত থেকে ১৩ এপ্রিলের সকাল পর্যন্ত কাটিয়ে আজ বিদায় নিচ্ছি। বিদায় কালে শুধু ডেপুটি জেলার সেলিম সাহেবকে পেলাম, জেলার/ সুপার এদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সুযোগ হল না।

গাড়ীতে উঠার আগে আমার মামলা সংক্রান্ত কাগজপত্রগুলো দেয়ার জন্যে ডেপুটি জেলার সেলিম সাহেবকে অনুরোধ করে কোন লাভ হল না। এগুলো আমার মামলা সংক্রান্ত কাগজ ট্রাইব্যুনাল থেকে আইনজীবীর মাধ্যমে আমি পেয়েছি। এটা আমার সম্পদ। আমি যখন তাদের জেল থেকে বদলি হয়ে অন্য জেলে আসছি, তখন আমার ব্যক্তিগত কাগজপত্র (মামলা সংক্রান্ত) তাদের কাছে রেখে দেয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণই থাকতে পারে না। আমার প্রতি তাদের একটি নেতিবাচক এবং বৈরি ধারণারই প্রতিফলন এটা।

যাক অবশেষে সর্বশেষ অনুরোধটি করে যখন তাদের কাছ থেকে ইতিবাচক সাড়া পেলাম না তখন মনের কোণে ব্যথা বেদনা ক্ষোভ ও অসন্তোষ নিয়ে গাজীপুর কারাগার ত্যাগ করলাম। কাসিমপুর- ২ নং এসে পৌঁছলাম সম্ভবত দুপুর একটারও পরে। পথে জুমআর আজান শুনে মনের উপর কি যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই। গাজীপুর জেল কর্তৃপক্ষের আচরণ থেকে মনে হচ্ছিল, এখানে আমার থাকাটা নিরাপদ নয়, অন্তত আল্লাহ আমার মনের এই অবস্থা বুঝে অপেক্ষাকৃত একটা ভাল পরিবেশে আমার ব্যবস্থা দিলেন, এজন্যে তার দরবারে জানাই লাখো শুকরিয়া।

এখানে কারা কর্তৃপক্ষের আচরণ গাজীপুরের তুলনায় অনেক ভাল মনে হয়েছে। গাজীপুর একাকীত্বের কারণে যে মানসিক ও মনস্তাত্বিক অসুবিধায় ছিলাম সেটা আপাতত দূর হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। এখানে আমার ছাত্র জীবন থেকে স্নেহভাজন দুই সাথী মুহাম্মাদ কামারুজ্জামান ও আব্দুল কাদের মোল্লাকে পেলাম। গাজীপুরে ২৭ দিনই একা নামাজ আদায় করতে হয়েছে। এখানে এসেই জোহর থেকে মাগরিব পর্যন্ত ওদের সাথে জামায়াতে নামাজ আদায় করছি। এশা এবং ফজর লক আপ অবস্থায় সেবক যুবরাজকে সাথে নিয়ে নামাজ পড়তে হচ্ছে। আশা করছি আজ দুপুর ১২টার দিকে আমার স্ত্রী, বড় মেয়ে ও মেঝ ছেলেসহ পরিবারের লোকেরা আমাকে নতুন জেলের নতুন পরিবেশে দেখে যাবে। আল্লাহ তাদের মনের কষ্ট লাঘব করুন। তাদের আবেগ অনুভূতির দিকে রহমতের দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে আমাকে সহ আমার সকল সাথী সহকর্মীদেরকে বন্দী জীবনের বিড়ম্বনা থেকে অতি দ্রুততম সময়ের মধ্যে মুক্ত করুন।

এখানে ১৩ এপ্রিল দুপুরে এসে পৌঁছি। পৌঁছেই একজন ডেপুটি জেলারকে আমার ছেলে নাজিব মোমেন এবং ভাতিজা মিঠুর ফোন নং দিয়ে দিলাম। গাজীপুরের ডেপুটি জেলারকেও বলে এসেছিলাম। আমার বাসায় যেন কাসিমপুর- ২ নং স্থানান্তরিত হবার খবরটা জানানো হয়। যাতে তারা শনিবারে দেখা করতে গাজীপুর কারাগারে না গিয়ে কাশিমপুরে এসে দেখা করে। গাজীপুর থেকে সম্ভবত খবরটা জানানো হয়েছিল। তাই শুক্রবারে বিকেলে মোমেন নিজেই এখানকার ডেপুটি জেলার মুশফিক সাহেবের সাথে ফোনে কথা বলে জানিয়ে দেয়, তারা শনিবারে দুপুর ১২টার দিকে দেখা করতে আসবে।

শনিবার ১৪ এপ্রিল পরিবারের লোকদের সাথে নতুন জেলে দেখা হল। রবিবারে ট্রাইব্যুনালে হাজিরার দিন (১৫ এপ্রিল)। আমার ছেলের কাছে শুনলাম ১৬ তারিখেও নাকি ট্রাইব্যুনালে শুনানি হবে এবং আমাকে যেতে হবে। আমি বললাম, চট্টগ্রামে ১৭ ও ১৮ এপ্রিল তারিখ দেয়া আছে। ১৬ এপ্রিল ট্রাইব্যুনাল থেকে গাজীপুরে এসে বা ট্রাইব্যুনাল থেকে চট্টগ্রাম যাওয়া আমার পক্ষে হবে খুব কষ্টকর এবং আমার শরীরের জন্যে হবে সাংঘাতিক ক্ষতিকর। ট্রাইব্যুনালকে বলে কিছু করার চেষ্টা করতে বলে দিলাম আইনজীবীদেরকে। ট্রাইব্যুনালের মাননীয় চেয়ারম্যান ঐ দিন আমাকে ট্রাইব্যুনালে হাজিরা থেকে

www.pathagar.com

অব্যাহতি দিলেন। কাশিমপুর থেকেই আমি ১৬ এপ্রিল চট্টগ্রামের উদ্দেশে রওয়ানা করি। আমাকে সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে তৈরি থাকতে বললেও রওয়ানা হই ১০-৩০ দিকে, জেল গেটে একটানা অপেক্ষার পর।

১৬ এপ্রিল মাগরিবের আজানের অল্প কিছুক্ষণ আগে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছলাম। এবারের সফরটা ছিল সবচেয়ে বেশি কষ্টকর। কোর্টের আদেশক্রমে এসির ব্যবস্থাসহ আমাদেরকে ভাল গাড়ী দেওয়ার কথা। কথাটা নাকি কাশিমপুর- ২ এর ডেপুটি জেলারের জানা ছিল না। আমার পারিবারিক সাক্ষাতের সময় তাকে কোর্ট অর্ডারের কপি দেখানোর পর অবশ্য স্বীকার করে বললেন ওটা উনার কাছে আছে। আমি ১৫ এপ্রিল কোর্ট থেকে ফিরে রুমে যাওয়ার আগেই আবার অনুরোধ করলাম এ দিন গাড়ী দেবার জন্যে। কর্তৃপক্ষ এসি গাড়ীর ব্যবস্থাই করলো বটে। তবে দুর্ভাগ্যবশত গাড়ীতে এসি চালু করলে ইঞ্জিন চাপ নিতে না পারায় এক পর্যায়ে এসি বন্ধ করেই যেতে হল। দ্বিতীয়ত পথে গাড়ীর গ্যাস শেষ হয়ে যাওয়ার পর নিকটবর্তী স্টেশন থেকে গ্যাস না নিয়ে পেট্রোলে চালানোর কথা বলে ড্রাইভার রওয়ানা দিল কিন্তু তার খবর ছিল না যে পেট্রোলও শেষ।

কুমিল্লা থেকে ২০/২২ কিলোমিটার দূরে কাঠফাটা রোদের মধ্যে গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকল প্রায় একঘণ্টার মত। ড্রাইভার একটা প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে চড়ে দুটো বোতল নিয়ে রওয়ানা করল। নিকটস্থ পেট্রোল পাম্পের দিকে। অবশেষে দুই বোতলে চার লিটার পেট্রোল নিয়ে একটি বেবিটেক্সিতে করে ড্রাইভার এসে পৌঁছল। পেট্রোল নেয়ার পরও গাড়ী চালু হতে কিছু সময় নিল। যাহোক অবশেষে আল্লাহর মেহেরবানীতে দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়ে কুমিল্লা শহরের পরেই একটা ভাল সিএনজি ফিলিংস্টেশনে গাড়িটা পৌঁছে যাওয়ায় স্বস্তি পেলাম। ওখানে বিশেষ ব্যবস্থা থাকায় ভাল পরিবেশে এস্তেঞ্জা ও অজু সেরে নামাজ আদায় করে দুপুরের কিছু খাবার খেয়ে নিলাম। মিঠু ও আমার ড্রাইভার আঃ সাত্তার পুলিশের লোকদের ও গাড়ীর ড্রাইভার এর খাওয়ার ব্যবস্থা করল বেশ দ্রুততার সাথেই। এসি ছাড়া কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম পৌঁছতে গরমে এবং সাইডের (পশ্চিম দিক) রোদের প্রকোপে বেশ খারাপ অবস্থায় এবার পৌঁছি চট্টগ্রাম কারাগারে। পরের দুই দিন কোর্টে যাদের সাথেই দেখা হয়েছে সবাই বলেছে এবারে আপনাকে খুবই অসুস্থ দেখাচ্ছে। কেউ বলেছে বেশ কাহিল দেখাচ্ছে। আমি পথের কষ্টের কথাটা কাউকেই ইচ্ছাকৃতভাবে জানাতে চাইনি। আলহামদুলিল্লাহ-আলাকুল্লিহাল। সর্বাবস্থায় আল্লাহর শুকরিয়া। শরীরের অবস্থা যাই হোক আমি মনের দিক দিয়ে মোটামুটি বেশ ভাল আছি এবং ভাল থাকার চেষ্টা করছি।

এই কথা সত্য অবধারিত। অতএব আজকের দুর্ভোগ দুঃসময়ের অবসান একদিন অবশ্যই হবে। হতেই হবে, আল্লাহর একজন নগণ্য বান্দা হিসেবে তার প্রতি ঈমানের ন্যূনতম দাবিই তার কথার প্রতি অবিচল আস্থা পোষণ করা।

১৬ এপ্রিল চট্টগ্রাম পৌঁছানোর পর ১৭ এবং ১৮ এপ্রিল পরপর এই দুই দিন কোর্টে হাজিরা দিতে হল। কোর্টেও বিদ্যুৎ থাকে না বললেই চলে। বিচারকের মাথার উপরে আইপিএসের সংযোগকৃত একটি পাখা এবং দেখা ও লিখার জন্যে একটি লাইট জ্বলে, বাকী আদালতে উপস্থিত সবাইকে ভ্যাপসা গরমে সিদ্ধ হতে হয়। দুইজন তরুণ আইনজীবী আজিমুদ্দীন পাটোয়ারী ও আলফেসানী কখনও হাত পাখা নিয়ে কখনও অন্যদের সাথে আসা হাত পাখা দিয়ে বাতাস করে। আমাকে কিছুটা হলেও স্বস্তিতে রাখার চেষ্টা করে। আমার ব্যারিস্টার ছেলে কখনও আমার আইনজীবীর পাশে দাঁড়িয়ে শলা পরামর্শ করে আবার কখনও আমার কাছে ছুটে আসে, সেও বাতাস দেয়ার চেষ্টা করে। ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম বা গাজীপুর থেকে চট্টগ্রাম আসা যাওয়ার কষ্ট অনেকটা ভুলে যাই এখানকার আইনজীবী ভাইদের আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারে।

এই দুই দিন অন্য সাক্ষীদের শুনানি চলতে থাকে। আমার প্রসঙ্গে কারো মুখ থেকে কোন কথা বের না হলেও উপস্থিত থাকতে হয় আইনগত বাধ্যবাধকতার কারণে। আইনজীবী অতন্দ্র প্রহরীর ন্যায় নোট

www.pathagar.com

করেন। সাক্ষীদের কোন কথা আমাদের পক্ষে বা বিপক্ষে যায় কিনা তার রেকর্ড করেন ভবিষ্যতে কাজে লাগানোর জন্যে।

এ পর্যন্ত এই মামলায় সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তিই তাদের সাক্ষী বা জেরায় আমার নামটিও উচ্চারণ করেননি। শুধু বিসিআইসির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) ইমামুজ্জামান ও তদানীন্তন শিল্প সচিবের মিথ্যা জবানবন্দীর কারণেই আমাকে এই মামলায় জড়ানো হয়েছে। অবশ্য জড়ানো হয়েছে সরকারী নির্দেশনায় আমাকে ঢাকা চট্টগ্রাম আসা যাওয়ার কষ্ট দেবার জন্যেই।

যাক সে কথা, ১৭ ও ১৮ এপ্রিলের পরে পরবর্তী তারিখ হল ৭ ও ৮ মে। সুতরাং ১৯ এপ্রিল আমাদের যার যার গন্তব্যস্থলে পাঠানোর কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এ ব্যাপারে চট্টগ্রাম কারা কর্তৃপক্ষ আমার প্রতি সুবিচার করতে পারলো না।

প্রথমত আমাকে ১৯ এপ্রিল সকাল ৯টায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। একবার ডেপুটি জেলার বলেছিলেন, স্যার সবাই ভাল গাড়ী চায়, একসাথে ভাল গাড়ী পাওয়া না গেলে আপনাকে পরের দিন পাঠাই। আমি খুব জোরেশোরে না করে দিলাম। কারণ আমার আইনজীবীদের সাথে সাক্ষাতের নির্ধারিত দিন শনিবার। আমাকে নিজের প্রস্তুতির জন্যে একদিন আগে অবশ্যই পৌঁছতে হবে।

পরে ডেপুটি জেলার সোহেল সাহেব আমার কথায় রাজি হয়ে গেলেন। আমি ৮-৩০ টার মধ্যে প্রস্তুত হয়ে বসে আছি। কোন খবর নেই। খবর এতটুকু পেলাম, আগে বাবর সাহেব যাবেন। তারপর আমাকে নিতে আসবে। বাবর সাহেব যখন যাবার আগে আমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এলেন, তখন একজন সুবেদার এসে বলে গেল, স্যার আপনাকে আজ পাঠানো যাচ্ছে না, পুলিশের স্কোয়াড পাওয়া যাচ্ছে না। আপনাকে কাল যেতে হবে। আমি ডেপুটি জেলারকে আসতে খবর পাঠালাম। তিনি দুপুর ১২টায় এসে বললেন, আপনি বেলা ২টায় রওয়ানা করবেন। দেড়টার মধ্যে প্রস্তুত হয়ে থাকবেন।

চট্টগ্রামে যাওয়া-আসার বিড়ম্বনা- ০৩

বেলা ২ টায় চট্টগ্রাম থেকে রওয়ানা করে কাশিমপুর দুই নম্বর কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছতে অন্তত রাত ১২টা হতে পারে। এই সময়টা আমার জন্যে খুবই কষ্টকর, একথা চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে আমি প্রতিবারেই জানিয়েছি। তারা ২/১ বার আমার কথাকে গুরুত্ব দিলেও অধিকাংশ সময়ই উপেক্ষা করেছে। ডেপুটি জেলার কোন অভিজ্ঞতা ছাড়াই বললেন, রাত ৮টার দিকে পৌঁছে যাবেন, যা ছিল একান্তই অবান্তর ও অবাস্তব কথা।

অবশেষে আমাকে ২টার দিকে জেল গেটে নেয়া হয় আর ডিএসবি এর একজন আসতে বিলম্ব হওয়ায় ২টা-৫০ মিঃ রওয়ানা করা সম্ভব হল। আমি মাঝ পথে বাথরুম ও নামাজের জন্যে দাঁড়ানোর আবদার করিনি। কারণ ইতঃপূর্বে দেখেছি তাতে লাভ হয় না। তারা কোনো আনছার বা পুলিশ ফাঁড়ি ছাড়া অন্য কোথাও থামতে চায় না। আমি বললাম, আপনারা একটা ফিলিং স্টেশন থেকে তেল নেবেন আর আমাকে নেমে একটু ইস্তেনজা এবং অজুর সময় দেবেন। আমি নামাজ গাড়ীতে আদায় করে নিব। পুলিশের স্কোয়াড এবং এসবি এর সম্মতিতে গাড়ী এডভান্স সিএনজি ফিলিং স্টেশন থেকে গ্যাস নিল। আমি ঐ স্টেশনে মালিকের খাস কামরা সংলগ্ন বাথরুমে একটু ইস্তেনজা ও অজু করতেই মাগরিবের সময় হল। আমি তাদের কাছ থেকে একটা জায়নামাজ চেয়ে নিয়ে মাগরিবের নামাজ আদায় করে নিলাম। ইতোমধ্যে মিঠু সবার জন্যে খাবারের প্যাকেট এনে হাজির করল। আমার জন্যে আনা প্যাকেটে ছিল নান রুটি, সাথে হয়ত আরো কিছু থাকতে পারে, আমি প্যাকেট খুলে দেখিনি। ওখানে সামান্য কিছু খেয়ে রওয়ানা করার কথা হলেও এক পর্যায়ে নামাজের পর আর তারা মোটেই দাঁড়াতে রাজি হল না। তাদের ভয় দেরী হলে মিডিয়া এসে গেলে তাদের চাকরির অসুবিধা হতে পারে। আমাকে উচ্চ রক্ত চাপের জন্যে

www.pathagar.com

রাতের খাবারের ৩০ মিনিট আগে ওষুধ খেতে হয়। রাত ১২টায় জেলে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত ওষুধ খেয়ে নিলাম এ আশায় যে এখান থেকেই খেয়ে রওয়ানা করব। কিন্তু পুলিশের লোকেরা এবং তাদের স্কোয়াড লীডার না খেয়েই যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আমার কাছে হাত জোড় করে মাফ চেয়ে না খেয়েই রওয়ানা করতে অনুরোধ করলেন। তারা পুলিশের লোক, যে কোন অবস্থায় খানা খেতে অভ্যস্ত। কিন্তু আমার পক্ষে চলতি গাড়ীতে প্যাকেটগুলো খুলে খাবার গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। তবে মিঠু বুদ্ধি করে আমার প্যাকেটের মধ্যে দুই পিস স্যান্ডুইচও দিয়েছিল। যেহেতু ওষুধ খেয়ে ফেলেছিলাম তাই চলতি পথে ৩০ মিনিট পরে একটি স্যান্ডুইচ খেয়ে পানি খেয়ে রাতের খাবার পর্ব সেরে নিলাম। পুলিশের লোকেরা তাদের প্যাকেটের খাবার বেশ স্বাচ্ছন্দ্যের সাথেই গ্রহণ করল। অবশ্য কেউ কেউ বলল এত সকালে তো আমরা খাই না, কাশিমপুর পৌঁছার পর খাওয়ার পর্ব শেষ করে তারপরে চট্টগ্রামের উদ্দেশে রওয়ানা করব।

চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা না এসে গাজীপুর, কাশিমপুর যাওয়ার বিকল্প রাস্তা আছে। আমাদের ড্রাইভারের এটা জানা বা চেনা ছিল না। তবে একটা স্টেশন থেকে তেল নেয়ার সময় আমার ভাতিজা মিঠু এবং ড্রাইভার আঃ সাত্তারের সাথে ড্রাইভার আলাপ করে নেয় এবং মিঠু ও আঃ সাত্তারের গাড়ীকে অনুসরণ করে কাশিমপুর ২নং জেল গেটে পৌঁছে। সময় তখন প্রায় রাত সাড়ে এগারোটা। কাশিমপুর দুই নম্বর কারাগারে ১১-৩০ টা পৌঁছলেও আমাকে আমার রুম পর্যন্ত যেতে রাত হয় প্রায় ১টা। কারণ কাশিমপুর দুই নম্বর জেলকর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম থেকে আমার আসার নাকি কোন খবরই পায়নি। রুমে ফিরেও জানলাম আমার এখানকার সাথীরা জেলকর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে জানার চেষ্টা করেছে আমার আসার ব্যাপারে, যাতে রাতের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু জেলকর্তৃপক্ষ যেহেতু চট্টগ্রাম থেকে কোন ম্যাসেজই পায়নি, তাই আমার সাথীদেরকেও নেতিবাচক খবরই দিয়েছেন। আমি রুমে আসার পর অন্য রুম থেকে আমার সেবককে ডেকে আনার সময় গিয়াসউদ্দিন ছুটে আসে চার্জার লাইট নিয়ে। কারণ তখন কারেন্ট ছিল না। তাদের কাছে থাকা নান রুটি এবং কাবাবও নিয়ে আসে খাবার জন্যে। আমি সেবককে মশারীটা ঠিক করে দিতে বললাম তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ার জন্যে।

আমার ঢাকা আসা নিয়ে চট্টগ্রামে যা ঘটেছে তা কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। ঢাকায় রওয়ানার কথা ছিল ৯টায়। তাই চট্টগ্রাম সেন্ট্রাল জেলে সকাল ৮:৩০টা থেকে প্রস্তুতি নিয়ে প্রতীক্ষায় ছিলাম। হঠাৎ ৯টায় জানলাম, আমাকে আজ পাঠাচ্ছে না। আমি তখনও আশা ছাড়িনি। ১১টার দিকে সুবেদার এসে বলল পুলিশের স্কোয়াড পাওয়া যাচ্ছে না তাই আপনাকে আগামীকাল পাঠাবেন। আবার ১২টায় এসে ডেপুটি জেলার বলে গেল ১২:৩০টার মধ্যে খানাপিনা সেরে ১:৩০টার মধ্যে তৈরি থাকবেন ২টার সময় রওয়ানা করবেন। অতএব সারাটা দিনই প্রায় অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটাতে হয়েছে। দুপুরে খাবার পরে বিশ্রাম আগে না নিলেও এখন এটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। সঙ্গত কারণেই আজ দুপুরে কোন বিশ্রাম হয়নি। প্রায় ১০ ঘণ্টার সফরের ক্লান্তিতে খুব তাড়াতাড়িই ঘুম আসার কথা। কিন্তু কেন যেন অনেক চেষ্টা করেও ঘুমুতে পারলাম না। এর এটা বড় কারণ গেটে কারারক্ষীদের যারা মালপত্র চেক করে থাকে তাদের নিষ্ঠুর ও নির্মম এবং অমানবিক ও অভদ্র আচরণে তারা আমার মাল-সামানার মধ্যে অবৈধ কিছু আছে কিনা এটা তালাশের চেয়েও আমার ব্যবহারের ইস্ত্রী করা, সুন্দরভাবে ভাজ করে রাখা কাপড়-চোপড়গুলো এলোমেলো করে ব্যবহারের অযোগ্য বানানোটাকে সব চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয়। আমি একজন সাবেক ক্যাবিনেট মিনিস্টার, দেশের তৃতীয় বৃহত্তম পার্টির প্রধান, বয়সেও এখন বার্ধ্যকের ছাপ, চুলদাঁড়ি সবই সাদা এবং যারা চেক করছে তাদের অনেকের বাপ চাচার বয়সের হওয়ার কথা। কিন্তু তাদের আচরণে মনে হয়েছে তাদের কাছে এসবের কোন মূল্যই নেই। ন্যূনতম ভদ্রতা ও মানবতাবোধ থাকলে তাদের পক্ষে আমার জামা কাপড় নিয়ে এ রকম আচরণ করা কিছুতেই সম্ভব হত না। রুমে এসে বিছানায় শুয়ে এদের এই অভদ্র এবং কুৎসিৎ আচরণের কথা চিন্তা করতে করতে এত ক্লান্তি সত্ত্বেও মোটেও ঘুমাতে পারলাম না। ইতোমধ্যে রাত সাড়ে তিনটা ঘড়িতে এলার্ম বেজে উঠল। ক্লান্তি শ্রান্তি

www.pathagar.com

সত্ত্বেও মনের দুশ্চিন্তা দূর করার জন্যে নামাজই মোক্ষম দাওয়াই, সবচেয়ে কার্যকর ফর্মুলা যা আল্লাহ প্রদত্ত এবং তার প্রিয় নবীর প্রদর্শিত উত্তম পন্থা। তাই ঘুমের চিন্তা আপাতত বাদ দিয়ে, বিছানা ছেড়ে উঠে এস্তেঞ্জা ও অজু করে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলাম। প্রায় নিত্য দিনের অভ্যাস অনুযায়ী কোন দিক থেকে ফজরের আযান কানে আসা পর্যন্ত নামাজ ও দোয়া কালামে ব্যস্ত থাকি। আযান শুনলেই ফজরের নামাজ সেবককে সাথে নিয়ে আদায় করে ঘুমুতে যাই। আজকেও তাই করলাম। কিন্তু আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগলে সহজে হজম করতে পারি না। আবার প্রকাশও করি না। তাই এর প্রভাব প্রতিক্রিয়া সহজে শেষও হয় না।

গত রাত ১২:৩০ মিঃ অর্থাৎ ২০ এপ্রিলের জিরো আওয়ারে রুমে পৌঁছে আমাদের কারাগারের সাথী এবং এখানকার খাবারের ম্যানেজার মামুনের পাঠানো নানরুটি ও কাবাবের কয়েক টুকরা খেয়ে রাত কাটিয়ে ছিলাম। সকালেও ঘুমিয়ে নিলাম। প্রথম দিনেই আমার অনুরোধ ছিল সকাল বিকেল ২ বেলা যেন আমার ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়। শুক্রবারে সকালে বিকেলে কোন ব্যবস্থা হয়নি। শনিবারেও সকালে হয়নি। ১১:৩০টার দিকে পারিবারিক সাক্ষাতে গিয়ে ডেপুটি জেলার মুশফিক সাহেবকে বললাম। তিনি বললেন, তাদের দিক থেকে নাকি বলতে কেমন কি একটা অসুবিধা আছে, অতএব কোন কারারক্ষীর মাধ্যমে আমাকেই ডাক্তার কল দিতে হবে। ঐ দিন বিকেলেও আর কাউকে পেলাম না। পরের দিন সকালে একজন কারারক্ষীর মাধ্যমে ডাক্তার কল করলাম। ডা. বাবু এসে বললেন, "আপনি যে চট্টগ্রাম থেকে এসেছেন এই খবরটাই আমরা পাইনি। বিকেলে একজন রাইটার (কয়েদী) আইয়ুব আলী আমার প্রেসার দেখতে এসে সেও বলল, আমি যে চট্টগ্রাম থেকে ফিরে এসেছি এটা তারা জানে না।"

১৯ এপ্রিল রোজ বৃহস্পতিবার দিনগত রাত ১২:৩০টায় চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কাশিমপুর ২ নম্বর জেলে ফিরে আসার একদিন পর আমার পরিবারের লোকেরা শনিবারে দুপুরের দিকে সাক্ষাতের জন্যে আসে। আসলে তারা এসেছিল বেশ সকালে। ডিএসবি এর লোকের আসতে দেরী হওয়ায় তাদেরকে বাইরে থাকতে বাধ্য করা হয়। তারা গেটে এসে পৌঁছার পর গেট থেকে আমার রুম পর্যন্ত আসতে অন্তত ১০ মিঃ সময় লাগার কথা। আমার কাছে খবর আসার পর আমি টয়লেট সেরে রওয়ানা দিতে আরো ৫ মিঃ এর মত বিলম্ব হয়। আমি সায়েটিকার রোগী হওয়ার কারণে জোরে হাঁটতে পারি না, তাই আমার রুম থেকে জেল গেটে পৌঁছতে অন্তত ১০/১২ মিনিটের কম সময় লাগার প্রশ্নই উঠে না। তারপরও আমাকে ডেপুটি জেলার মুশফিক সাহেবের রুমে আরো ১০ মিনিটের মত অপেক্ষা করতে হল। আমি কারণ জিজ্ঞেস করায় ডেপুটি জেলারের উত্তর এলো ডিএসবির লোকেরা আসতে বিলম্ব হওয়ার জন্যেই এমনটি হয়েছে।

বললাম, আমার সাক্ষাতে যারা আসে তারা সবাই ব্যস্ত মানুষ। তাদের সময় বের করে আসতে এমনি কষ্ট হয়। এরপর যদি গেটে এতক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়, তা হলে সেটা হয় তাদের জন্যে খুবই কষ্টকর। আমি হিসাব দিয়ে বললাম- জেলগেট থেকে আমার কাছে মেসেজ যেতে কত সময় লাগে? তারপর আমার আসতে আর কত সময় লাগার কথা এটা নিশ্চয়ই আপনাদের মাথায় থাকার কথা। তারপরও আমি এসে বসে অপেক্ষা করছি কতক্ষণ তাওতো আপনাদের বিবেচনায় থাকার কথা। এতক্ষণ এভাবে বাইরে অপেক্ষা করানোর পরিবর্তে ভেতরে এনে বসতে দিয়ে কি আমাকে খবর দিলে ভাল হত না? সরাসরি উত্তর না দিয়ে মুশফিক সাহেব বললেন, শনিবার তো ছুটির দিন। অর্থাৎ ছুটির দিনে একটু বাইরে কষ্ট করলে তেমন কি আর আসে যায়, ভাবখানা এমনই দেখালেন তার বক্তব্যে।

এখানে একটা ছোট ঘটনা উল্লেখ না করে পারছি না, পরিবারের লোকেরা সাধারণত সাক্ষাতের সময় কিছু ফলমূলসহ খাদ্যসামগ্রী বা কাপড় চোপড় এনে থাকে। গেটে এটা চেক করেই রুমে নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়। আমাকে ডেপুটি জেলার সাহেব বললেন, আপনার মালপত্র চেক করার সময় কি আপনি উপস্থিত থাকবেন? আমি নিজে না গিয়ে আমার ছেলে মোমেনকে পাঠালাম। সাক্ষাৎ শেষে ফেরার সময় মোমেন

www.pathagar.com

বলল তরমুজটা গাড়ীতেই চাপে এক জায়গায় একটু ফেটে গেছে। যারা চেক করছে তারা আমাকে ব্যাপারটা জানাতে বলেছে যেন আমি এতে মনে কিছু না করি, তাদের কারণে এমনটি হয়নি। গাড়ীতেই চাপ লেগে এমনটি হয়েছে। আমার ছেলে তাদের পক্ষেই কথা বলেছে। কিন্তু ফেরার পথে একজন সি,আই,ডি কারারক্ষী আমার সাথে আসতে আসতে বলল, স্যার একটা অভিযোগ করতে চাই যদি অনুমতি দেন। আমি বললাম, নিঃসংকোচে বলতে পারেন। তখন সে বলল, মালামাল চেক করার সময় আমার বিছানার চাদরটার ভাঁজ খুলে এলোমেলো করার পর, আমার ছেলে তাকে এতটুকু বলেছে, আপনি ভাঁজ ভেঙ্গেছেন, ভাঁজ করে দিন। এই কথাটা নাকি তাদের খারাপ লেগেছে। ডেপুটি জেলার মুশফিক সাহেব নাকি একটু রাগত স্বরে বলেছেন, এমন কথা বলল কেন? মুশফিক সাহেবের সুরে সুর মিলিয়ে আরো কয়েকজন কারারক্ষী নাকি একই ভাবে আমার ছেলের এই কথাটার তীব্র সমালোচনা করেছে।
আমি ঐ কারারক্ষীকে বললাম, কাপড় চোপড়ের ভাঁজ যে ভাঙ্গবে তাকেই ভাঁজ করে দিতে হয় এটাতো একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। এই কথায় এতটা ক্ষোভ প্রকাশ, তাও একজন ডেপুটি জেলারসহ কারারক্ষীদের একটা গ্রুপ মিলে, আমার কাছে শুভলক্ষণ মনে হচ্ছে না। আমি পরে এক সময় ঐ কারারক্ষী (স্বপন) কে বললাম ৫ বছর মন্ত্রীত্ব করার সময় আমার ছেলেদের কেউ কোন দিন কারো সাথে খারাপ আচরণ করেছে এমন অভিযোগ পাইনি। এখন আমি ও আমার দল বিপদগ্রস্ত, এই সময় আমার ছেলেরা কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করবে, তাও আবার জেল গেটে এসে, এটা বিশ্বাস করতে আমার একটু কষ্ট হচ্ছে। তখন বেচারা একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, স্যার ব্যাপারটা পরে আমার কাছেও পরিষ্কার হয়েছে। আসলে ডেপুটি জেলারের উচিত ছিল ভাঁজ করা বেড সিটটা যে এলোমেলো করেছে তাকেই ভাঁজ করতে বলা। উল্টা আমার ছেলের কথার সমালোচনা করছে, অন্যদেরকেও এতে শরীক করছে। সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর কথা মনে পড়ল। এমনই কোন একটা ব্যাপার নিয়ে মুশফিক সাহেব (ডেপুটি জেলার) সালাহউদ্দিন কাদেরের ছেলের সাথে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে একটা অপ্রীতিকর ঝববহ পৎবধঃব করেছিল। হয়ত বা আমার ছেলেকে নিয়েও তাদের এমন একটা পরিকল্পনা ছিল। যাক আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এই জেলে যতদিন থাকতে হয়, অত্যন্ত ধৈর্যের সাথেই থাকতে হবে। পরিবারের কারো সাথে যাতে গেটে কোন কর্মকর্তা কর্মচারী ঝগড়া বিবাদের পরিস্থিতি সৃষ্টির সুযোগ নিতে না পারে, সে ব্যাপারে পরিবারের সব সদস্যকে সতর্ক করে দিতে হবে। এই ছোট ঘটনাটি আমার নিজের মধ্যেও বেশ নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দিয়েছে। আমাদের মত লোকদেরকে অপমানিত করার বা বিপদে ফেলার জন্যে একটা চক্রকে সক্রিয় বলে মনে হয়েছে।

২০/০৪/২০১২

১৯ এপ্রিল বিশেষত রাত ১২-৩০টায় চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কাশিমপুর- ২ কেন্দ্রীয় কারাগারে আসার পরের দিন একসাথে পরিবারের সদস্য এবং আইনজীবীদের সাথে সাক্ষাতের প্রোগ্রাম ছিল। কিন্তু বিশেষ কোন কারণে আইনজীবী আসতে না পারায় শুধু পরিবারের সাথেই সাক্ষাৎ হয়। এরপর ২৪ এপ্রিল ট্রাইব্যুনালে হাজিরা দেয়ার কথা। কিন্তু ২৩ ও ২৪ এপ্রিল একটানা হরতাল চলায় আমাকে ২৫ তারিখে হাজির হতে বলা হয়। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে সাধারণত ৯-৩০ মিনিটে তৈরি থাকতে বলা হয়। ওখান থেকে ট্রাইব্যুনালের অবস্থান খুব কাছে হবার কারণে কোন সমস্যা হত না। কিন্তু এখানে কোর্টের দিন সকাল ৬-৩০ মিনিটে তৈরি হতে বলে। ফলে গোসল ও নাশতা খুবই তাড়াহুড়া করে সারতে হয়। ২৫ এপ্রিল এখান থেকে সকাল সাড়ে ৭ টায় রওয়ানা করে ১০টার একটু আগেই ট্রাইব্যুনালে পৌঁছলাম। এবারে মুজাহিদের সাথে দেখা হল অনেক দিন পরে। তার মামলা দুই নাম্বার ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত দিয়েই তাকে নারায়ণগঞ্জ জেলে পাঠিয়ে দেয়া হল। এরপর এলেন জনাব সাঈদী সাহেব (অবশ্য মুজাহিদ সাহেব থাকতেই তিনি এসে পৌঁছেন)। সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে আগে ডাকা হল।

www.pathagar.com

বলেছিলাম ছোট ছেলেটাকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কথা। সে স্টুডেন্ট ভিসায় পড়া শোনা করার জন্যে মালয়েশিয়ায় গিয়েছে। অনার্স ফাইনাল পরীক্ষা চলাকালে যখন দেশে এসেছিল তখন যদি জানা যেত দূতাবাসের কর্মকর্তারা তার পাসপোর্ট নবায়ন করবে না, তাহলে জরুরি ফি দিয়ে এখান থেকে ২/১ দিনের মধ্যেই পাসপোর্ট নবায়ন করে নিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু পাসপোর্ট নবায়নে দূতাবাস সহযোগিতা না করে বাধ সাধবে এমনটি ভাবতে না পারার কারণেই সেখানে যায় এবং পাসপোর্টের মেয়াদ কিছু থাকা অবস্থায়ই নবায়নের জন্যে আবেদন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বিষয়ক ডাইরেক্টরের মাধ্যমে। দূতাবাস কর্মকর্তা কত নিষ্ঠুর হলে পরীক্ষারত একজন ছাত্রকে বলতে পারে "যাও দেশে গিয়ে পাসপোর্ট করে নিয়ে আস।" এটা করতে গেলে তাকে পরীক্ষা বাদ দিতে হয়। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে তার অবস্থানটা কী হতে পারত?

অবশেষে আইনের আশ্রয় নেয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং দূতাবাস শোকজের কোন জবাব দেয়নি। এরপর হাইকোর্ট চার সপ্তাহের মধ্যে তাকে পাসপোর্ট দিয়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু এই কোর্ট অর্ডারের সত্যায়িত কপি এখনও পাওয়া যায়নি। বিচারপতি রায় দিয়ে বিদেশে চলে যান। এপ্রিলের ৮ তারিখে ফিরে এলে আজ ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত ঐ অর্ডারে মামলার বিচারপতির স্বাক্ষর হবার খবর পাই নাই। এ ব্যাপারে আমাদের নিজেদেরও তৎপরতার কোন ঘাটতি আছে কিনা জানি না। কেন যেন আমার মনে একটু খটকা লাগে। ছেলেটাকে দুশ্চিন্তামুক্ত করতে হলে যত দ্রুত সম্ভব তাকে পাসপোর্ট দিয়ে দেবার জন্যে হাইকোর্ট অর্ডারটা তার কাছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছা দরকার। তার পাসপোর্ট নবায়ন হবার খবরটা না পাওয়া পর্যন্ত কেন যেন মনটাতে স্বস্তিবোধ করছি না। আমার তো আর এখানে থেকে তার জন্যে একমাত্র আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। আগামী ০৩ মে ট্রাইব্যুনালে পৌঁছে অথবা শনিবারে সাপ্তাহিক সাক্ষাতের দিন একটা ভাল খবর পাওয়ার আশা করছি। আমার ছোট ছেলে সহ গোটা পরিবারের, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, নাতী-নাতনীদের, উত্তম অভিভাবক তো আল্লাহই। তাঁরই হাতে এদেরকে সোপর্দ করে এসেছি। তিনি অবশ্য রহমতের ছায়া তলে তাদের আশ্রয় দেবেন।

বড় ছেলেটাকে নিয়েও আমি একেবারে দুশ্চিন্তা মুক্ত নই। ছোট ছেলে সবচেয়ে নিরীহ এবং সহজ সরল হওয়া সত্ত্বেও তাকে নিয়ে দৈনিক সংবাদে হলুদ সাংবাদিকতার একমুখো প্রচারণা দেখলাম। উক্ত সংবাদের শিরোনাম ছিল নিজামীর ছোট ছেলে মালয়েশিয়ায় অপপ্রচার চালাচ্ছে। অথচ সে সেখানে পড়াশোনা ছাড়া আর কোন কিছুর সাথেই জড়িত নয়। তার পাসপোর্ট নবায়নে সমস্যা হবার পর আমার মেঝ ছেলে মোমেন গিয়েছিল মালয়েশিয়ায়। তার রিপোর্ট শুনে আমি আল্লাহর শুকরিয়া জানাই হাজার বার। মোমেন বলল আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মালয়েশিয়া, কর্তৃপক্ষ তালহার আচার ব্যবহারে খুবই খুশি। তার প্রতি সবাই সহানুভূতিশীল। সংবাদ পত্রিকাটির সাংবাদিকতার সাথে যারাই পরিচিত তারাই জানেন, ইসলামের প্রতি বৈরী এই পত্রিকাটির অন্যতম ব্রত হল ইসলাম পন্থীদের বিরুদ্ধাচারণ ও চরিত্র হনন।

বড় ছেলেটা মেধার দিক দিয়ে সব ভাই বোনের মধ্যে একটু উন্নত। সেই সাথে একটু চটপটে চঞ্চলও বটে। অন্যদের তুলনায় তার মধ্যে সহনশীলতার একটু কমতি আছে বলে আমার মনে হয়। সেই জন্যে সতর্কও একটু বেশি করে থাকি। আমাদের দেশের এবং পরিচিত একজন স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ এবং শিক্ষক তাকে বিপদে ফেলার অনেক চক্রান্ত করেছে। তার দ্বিতীয় সন্তান জন্ম লাভের ২/১ দিন আগেই তাকে দেশে ফিরে আসতে বাধ্য করার মত অমানবিক পদক্ষেপও নিয়েছিল ঐ ব্যক্তিটি। আল্লাহর মেহেরবানীতে তার সে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। তবে আমার ছেলেটাকে বেশ কষ্ট করতে হয়েছে ২টি বছর। এ ক্ষেত্রে মানসিক যন্ত্রণাই ছিল বেশি। আমার গ্রেফতার হবার পর থেকে সে দেশে আসার জন্যে অস্থিরতা প্রকাশ করেছে বার বার। কিন্তু আমি তার মায়ের মাধ্যমে সব ছেলে মেয়েকেই জানিয়েছি, আমার কারণে

www.pathagar.com

যেন কোন ছেলে বা মেয়ের লেখাপড়ার ক্ষতি না হয়। সবাইকে আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে এবং চরম ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। আমি তার পিএইচডি ডিগ্রীটা হয়ে যাওয়ার শুভ সংবাদের প্রতীক্ষায় দিন গুনছি জেলে বসে।

হঠাৎ শুনলাম সে ওয়াশিংটনে এসে নাকি বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধের বিচার প্রসঙ্গে ন্যাশনাল প্রেসের সাথে কথা বলেছে। যারা ওয়েবসাইটে ভিডিও দেখেছে তারা সবাই খুব প্রশংসা করেছে। কিন্তু ইসলাম বিরোধী মহলের অনেকের মনেই আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। পিযুষবন্দোপাধ্যায় নামক এক উগ্র সাম্প্রদায়িক মিডিয়া ব্যক্তিত্ব খুব বাজে ভাষায় জনকণ্ঠে তার সমালোচনা করেছে। কিন্তু তার কোন বিষয়টি তার কাছে আপত্তিকর এটা চিহ্নিত করা তার পক্ষেও সম্ভব হয়নি। এই বিদ্বেষান্ধ লোকদের কোপানলে পড়া থেকে আল্লাহ যেন তাকে হেফাজত করেন।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে আমার গাজীপুর জেলা কারাগার হয়ে অবশেষে কাশিমপুর- ২ নম্বরে আগমন খুব একটা স্বাভাবিক ভাবে হয়নি। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের পিসিতে আমার হিসাব মতে কারাপক্ষের দেয়া কার্ডের রেকর্ড মতে ব্যালান্স ছিল ৮৩৮০.৮০ টাকা। চট্টগ্রাম যাওয়ার সময় তা থেকে নিয়েছিলাম বোধ হয়। মাত্র ২৫০০ টাকা নিয়েছিলাম। অতএব ৮৩৮০/- থেকে ২৫০০/- টাকা বাদ দিলে থাকার কথা ৫৩৮০.০০ টাকা। একটু আগে ঢাকা থেকে স্থানান্তরিত হবার দেড় মাস পরে ওখান থেকে খবর নিয়ে জানা গেল ওখানে নাকি আমার ব্যালান্স মাত্র ৩ হাজার একশ কয়েক টাকা আছে। এখন এ নিয়ে আর কিছু বলার বা করার সুযোগ নেই। বিচার আল্লাহই করবেন।

তালহার পাসপোর্টের ব্যাপারে হাইকোর্ট ডিভিশনের অর্ডারের বা রায়ের সার্টিফায়েড কপিটা আজকের মধ্যে পাওয়ার ব্যাপারে অনেকটা নিশ্চিতভাবেই আশা করছি। সেই সাথে আল্লাহর কাছে দোয়াও করছি। আমার মত হতভাগা পিতার জন্যে কোন সন্তানের যেন কোন ক্ষতি না হয়, এ জন্যে তাদের সবাইকে যেমন আমি আবেগ তাড়িৎ না হয়ে বাস্তববাদী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছি, তেমনি আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করার এবং ছবর ও ইস্তেকামাতের সাথে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার পরামর্শ দিয়েছি। আমার জীবন-সঙ্গীনীকে বিশেষভাবে বলেছি, "তোমার দায়িত্ব অনেক, একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বের পাশাপাশি সংগঠনের দায়িত্বটাও অনেক বড়। তবে কোন অবস্থায় আমার সোনার টুকরা ছেলেরা যেন তাদের পিতার অভাব অনুভব না করে, বরং তাদের মায়ের মাঝে পিতার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারে, এমন ভূমিকাই তোমার কাছ থেকে আমি আশা করি। এবং আল্লাহর দরবারে যখনই দোয়ার জন্যে হাত তুলি, তখনও আমার মনের এই কামনা বাসনাই আল্লাহর দরবারে পেশ করে থাকি আমি। দৃঢ়ভাবে আশাবাদী আল্লাহ আমাদেরকে নিরাশ করবেন না ও কখন আমরা তার রহমত থেকে নিরাশ হতে পারি না।

২৫ এপ্রিল ট্রাইব্যুনালের গারদে বসে বসেই কাটাতে হয় সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪-৩০ মিঃ পর্যন্ত। এরপর ২৯ এপ্রিলে তারিখ দেয়া হল। ২৯ ও ৩০ এপ্রিল ২০১২ হরতাল থাকায় কোর্টে আর নেয়া হয়নি। পরবর্তী দিন ধার্য করা হয়েছে ৩ মে অর্থাৎ আগামীকাল বৃহস্পতিবারে সকাল ৭টায় রওয়ানা করতে হবে কাশিমপুর থেকে পুরাতন হাইকোর্ট ভবনের ১ নং ট্রাইব্যুনালে। এত সকালে রওয়ানা করাটা আমার জন্যে খুবই কষ্টকর। দূরের পথ যানজটের ভয়ে ৭টায় রওয়ানা না দিয়ে উপায় নেই। কারারক্ষীরা বার বার তাগিদ দিতে থাকে ৬-৩০টার মধ্যে তৈরি হবার জন্যে। অথচ এত সকালে নাশতাও তৈরি হয় না। তাই সকালে বিশ্রাম ছাড়া খুব তাড়াহুড়ো করে গোসল ও নাশতা সেরে রওয়ানা করতে হয় জেল গেটের দিকে। জেল গেট পর্যন্ত পৌঁছতেই আমার শরীরটা ঘেমে যায়। এই ঘর্মাক্ত শরীর নিয়েই কোর্ট সেরে ফিরে আসতে হয় আমার থাকার জায়গায়। এইভাবে কষ্ট দেবার জন্যেই আমাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে স্থানান্তর করা হয়েছে।

গতকাল ৩ মে আমার পক্ষের আইনজীবী সরকার পক্ষের আনীত অভিযোগ খণ্ডনের জন্যে আইন ও যুক্তিসঙ্গত বক্তব্য তুলে ধরেন, কিন্তু ট্রাইব্যুনাল চেয়ারম্যান মনমানসিকতার যা প্রকাশ ঘটালো আমার

www.pathagar.com

আইনজীবীর যুক্তি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে, তাতে এখানে ন্যায়বিচারের আশা করা সুদূর পরাহত। আমার আইনজীবীদেরকে ইতঃপূর্বে খুবই আশাবাদী দেখেছি। কিন্তু ট্রাইব্যুনাল চেয়ারম্যান তার অপর সঙ্গীদের কথাবার্তায় তাদেরকেও আজ কেন যেন কিছু হতাশ মনে হল। তবে আমি নিজে যেহেতু নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার এবং আল্লাহ আলেমুল গায়েবের কাছেও পরিষ্কার, রাজনৈতিক ভূমিকার বাইরে কোন অনৈতিক কাজে বা মানবতাবিরোধী কোন কাজে কখনও কোন অবস্থায় জড়িত হইনি। আমার প্রতি এটা আল্লাহরই বিশেষ মেহেরবানী। আজকের দিন পর্যন্ত আমাকে তিনি পদে পদে সকল প্রকারের অনৈতিক কাজ থেকে হেফাজত করেছেন, তাই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কাল্পনিক অভিযোগকারীদের বিষয়টি আল্লাহই স্বয়ং সরাসরি দেখবেন। দুদিন আগেই হোক আর পরেই হোক।

০৪/০৫/২০১২

আগামীকাল ৫ মে শনিবার আমার পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাতের দিন। পরের দিন রবিবার ৬ মে চট্টগ্রামে যেতে হবে। ওখানে ৭ ও ৮ মে কোর্টে হাজিরা দিতে হবে। অন্য কোন অসুবিধা না হলে ৯ মে বুধবারে ঢাকায় ফিরে আসার কথা। ফিরে আসার দুদিন পরে সামনের শনিবারে ১২ মে'তে দেখা হবে আমার স্ত্রী, বড় মেয়ে, মেঝ ছেলের সাথে। চট্টগ্রাম যাওয়া আসাটাই আমার জন্যে বেশি কষ্টকর। পথে যেতে আসতে কেন যেন নিরাপত্তাহীনতার দুশ্চিন্তাও মাঝে মধ্যে পেয়ে বসে। এ পর্যন্ত যাওয়া আসার পথে বেশ কয়েকবার আল্লাহ দুর্ঘটনার কবল থেকে রক্ষা করেছেন। তারপরও আর কিছু করার নেই। যতদিন আল্লাহর মেহেরবানীতে এই মুছিবত থেকে মুক্তির ফায়সালা না আসছে, ততদিন এই কষ্ট বরদাশত করতেই হবে। যাওয়া আসার পথে কষ্ট আর দুশ্চিন্তাটাই বড়। তবে চট্টগ্রাম গিয়ে যতক্ষণ থাকি মনে বেশ একটু প্রশান্তি অনুভব করি। বিশেষ করে আদালতে আইনজীবী ভাইদের আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহারে ঢাকা-চট্টগ্রাম পথের কষ্ট যেন একেবারেই ভুলে যাই।

আজকের সাক্ষাতে আমার তৃতীয় ছেলে ডা. খালেদের স্ত্রী রাইয়ান এবং তার মেয়ে নাঈমাও এসেছিল আমার স্ত্রী, মেয়ে এবং ছেলের সাথে। বাংলাদেশে থাকার সময়ে নাঈমা দু'বছর আমার খেলার সাথী ছিল। অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার দিন গাড়ীতে যখন উঠিয়ে দিলাম বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে, তখন সে তার আব্বা-আম্মা ও দাদীকে বলছিল দাদা যাবেন। তারা অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার ছয় মাস পরে গ্রেফতার হয়ে জেলে এসেছিলাম। কারাগারে আসার আগে যখন ফোন করত বা অন লাইনে আসত তখন কথা হত। আমার জেলে আসার পর দীর্ঘদিন সে বাসায় ফোনে তার দাদীকে বলত দাদাকে দাও। অনেক দিনই এভাবে সে দাদাকে চেয়ে পায়নি। কিন্তু এবারে জেলখানায় আমাকে দেখতে এসে কেন যেন আমার কোলেই এল না। শুধু আব্বা আর আব্বা বলে কাঁদতে লাগল। কিন্তু আমার এত আদরের নাঈমাকে কোলে নিয়ে একটু আদর করতে পারলাম না। সামনের সাক্ষাতে সে স্বাভাবিক হয়ে আমার কাছে আসতে চায় কিনা, আমার আদর নেবে কিনা, সেই প্রতীক্ষায় কাটাতে হবে একটি সপ্তাহ। আজ মনের প্রশান্তির সাথে অশান্তির একটা মাত্রা যেন যোগ হল।

গত ৬ মে রোজ রবিবার সকাল ১০টায় চট্টগ্রামের উদ্দেশে রওয়ানা দিয়ে বিকেল ৫-৩০টার দিকে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছলাম। ঐ দিন বাদ মাগরিব ব্লাড প্রেসার চেক করে দেখা গেল উপরেরটা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু নিচেরটা ঠিকই আছে অর্থাৎ ১৭০/৭০। পরের দিন সকালে ১৪০/৬০। ডাক্তার স্যালাইন খেতে বললেন। আধা লিটার পানিতে এক প্যাকেট খাবার স্যালাইন খেয়ে কোর্টে গেলাম। কোর্ট থেকে এসেও দেখা গেল প্রেসার নিচেরটা বেশ কম অর্থাৎ মাত্র ৬০ তাই আবারও স্যালাইন খেতে হল। ডায়বেটিস মোটামুটি নিয়ন্ত্রণেই মনে হল। কোর্টের পরিবেশ যাই হোক মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক চাপ একটা থাকেই। বিদ্যুৎ থাকে না এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। জজ সাহেবের মাথার উপর এবং পেশকারের মাথার উপর আইপিএসের দুটো ফ্যান ঘুরতে থাকে আমরা বসে বসে এটা দেখি। কিন্তু হল ভর্তি মানুষ যে বিদ্যুতের অভাবে কষ্ট করছে এটা দেখার ও বোঝার কেউ নেই। এবারের দুদিনই

www.pathagar.com

জোহরের নামাজের বিরতি পাওয়া যায়নি। যাহোক অবশেষে ২১ এবং ২২ মে তারিখ ঘোষিত হবার পর আমরা কোর্ট থেকে বিদায় নিয়ে বেশ দেরিতে ৩-৩০ টার পরে জোহরের নামাজ আদায় করে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছি। এবার চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাকর্তৃপক্ষ সদয় হয়ে আমাকে ৯ এপ্রিল সকাল ১০টায় কাশিমপুর- ২ কেন্দ্রীয় কারাগারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করার ব্যবস্থা করায় গত তারিখের তুলনায় এবারের সফরটা মোটামুটি ভালই কাটল। গতবারে যারা পুলিশ স্কোয়াডে ছিলেন তারা গাড়ীতে বসে থেকে খাবার প্যাকেট গাড়ী না থামিয়ে খাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আমার পক্ষে পথে গাড়ীতে বসা অবস্থায় খাওয়া সম্ভব ছিল না।এবারে পথে পুলিশ আমাকে খাবার সুযোগ দিলেও নিজেরা প্যাকেট গাড়ীতে নিয়ে কুমিল্লা ছাড়িয়ে এসে পথের পাশে গাড়ী দাঁড় করিয়ে প্যাকেটের খাবার খেয়ে নিয়ে ঢাকায় কাশিমপুর -২ কারাগারের পথে রওয়ানা করে। এভাবে বেশ সকাল সকালই পৌঁছে যাই।

কাশিমপুর-২ থেকে প্রথম যখন চট্টগ্রাম যাই তখন পিসির টাকা নেয়ার ব্যাপারে আলাপ করে জানলাম পিসির বাইরে ক্যাশ টাকা দেয়া নাকি বেআইনী। আমি জেলারকে বললাম, প্রায় ১ বছর হয়ে আসল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে চট্টগ্রাম যেতে এবং চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ঢাকা আসতে পিসির বাইরে পথের খাওয়াসহ প্রয়োজনীয় বা জরুরি খরচের জন্যে অতিরিক্ত কিছু টাকা দিতে কোন দিন ঢাকা বা চট্টগ্রাম জেল কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোন প্রশ্নই তোলেনি। তাহলে কি তারা আইন বোঝে না। আমার কথার পরে জেলার সাহেব পিসির বাইরে এক হাজার টাকা অতিরিক্ত দিতে রাজি হন এবং ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এবারে ডেপুটি জেলার সাহেব কিছুতেই রাজি হলেন না।

৮ থেকে ১০ ঘণ্টার সফরে মাঝ পথে বন্দীকে (তাও ভি আই পি বন্দী) কিছু খাওয়ার সুযোগ দেয়া হবে না, এটা যে কত অমানবিক আচরণ তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে আমার বয়সের ডায়বেটিক রোগীর জন্য এটা রীতিমত বিপদজনক। পুলিশের লোকেরা অনেকেই আন্তরিকতা ও সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও চাকরির ভয়ে এ সুযোগ দেয়ার ইচ্ছা থাকলেও দিতে পারে না। আবার কেউ এটাকে মানবিক দৃষ্টিতে একটু ঝুঁকি নিয়ে হলেও ব্যবস্থা করে দেয়। চট্টগ্রাম ঢাকা যাওয়া আসার পথে এদের এই ভিন্ন ভিন্ন আচরণ যেমন দেখার সুযোগ হচ্ছে তেমনি তাদের মনের ক্ষোভের প্রকাশ দেখেও আমি বিস্মিত হয়েছি। তারা বলতে চায়, তাদের প্রতি কোন সরকার সুবিচার করেনি। তারা বলেছে, আপনাকে তো ইতঃপূর্বে এত কাছে পাওয়ার সুযোগ ছিল না, এক অসিলায় একটু সুযোগ পেয়ে কথাগুলো বলছি। আশা করি ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে একটু দেখবেন।

এবারেও চট্টগ্রাম জেল কর্তৃপক্ষের নিকট আমার পিসিতে তাদের ওখানে যে ৩,০০০ টাকা জমা হয়েছিল। তার কিছুই এবার খরচ হয়নি বলে আসার সময় পিসিতে দুই হাজার এবং পিসির বাইরে ১০০০ টাকা দিয়ে দেয়। সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা এখানে (কাশিমপুর- ২) পিসির দুই হাজারের সাথে ক্যাশ ৫০০ টাকা, মোট আড়াই হাজার টাকা জমা করেন। কাশিমপুর- ২ এর জেলকর্তৃপক্ষের কাছে এটা একটা শিক্ষণীয় প্রমাণ হতে পারে। আগের বারও পিসির এবং পিসির বাইরের ক্যাশ হিসাবে ৪০০ টাকা জমা দেয়া হয়। কিন্তু এরপরও তারা একগুঁয়েমী পরিহার করতে রাজি হয়নি। হয়ত সামনেও হবে না। গেটে মালামাল চেকিংয়ের ক্ষেত্রেও এদের বাড়াবাড়ি অসহনীয়। আমার ব্লাড সুগার টেস্ট করার মেশিনগুলোর মিটার পর্যন্ত তারা খুলে নাড়াচাড়া না করে ক্লিয়ারেন্স দিতে রাজি হয় না।

কাপড়-চোপড় এমন ভাবে তছনছ করে দেখে যাতে কোন একটা কাপড়ও আর দ্বিতীয়বার ইস্ত্রী করা ছাড়া পড়ার যোগ্য থাকে না। এগুলো যারা করে তাদের ভদ্রতা জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব আছে বলেই আমার মনে হয়েছে দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার ফলে। কোন একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে তাদেরকে গাইড করলে হয়তোবা এ ধরনের অমানবিক ও অভদ্র আচরণ থেকে আমাদের মত নিরীহ বন্দীরা একটু রেহাই পেত।

www.pathagar.com

আমার গত সপ্তাহের সাক্ষাতের দিন চা খাওয়ার জন্যে ইলেক্ট্রিক কেটলী আনতে দেয়নি, ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। অথচ রুমে এসে জানলাম এখানে সবার রুমেই এটা আছে। অন্যদের আনতে দিলে আমাকে কেন দেওয়া হল না, এমন কী রহস্য আছে এখানে, এ প্রশ্ন জাগাটা তো খুবই স্বাভাবিক।

গতকাল ১১ মে শনিবার ছিল আমার পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাতের নির্ধারিত দিন। গত সপ্তাহে নাঈমা এসেছিল। কিন্তু তার আব্বাকে অস্ট্রেলিয়ায় রেখে এসে সে খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল না। এসেই আব্বু যাব, আব্বু যাব বলে কান্না শুরু করে। ভাবছিলাম এতদিন একটু স্বাভাবিক হয়ে আসার কথা, তাই এবারের সাক্ষাতে সে আমার কাছে আসবে, আমার আদর নেবে, আমাকেও আদর করবে। কিন্তু না এবারে নাঈমাকে আনা হয়নি। তার আম্মার সাথে নানীর বাড়ী বেড়াতে যাওয়ার কারণে। ইতঃপূর্বে যখন ১/১১ এর পরে জেলে গিয়েছিলাম তখন নাঈমা ছিল খুবই ছোট্ট। তার দাদাকে জেলে দেখে তার ভাল লাগেনি। সে খুব বেশি কান্নাকাটি করেছিল। আমার মনে হয় প্রায় ২ বছর পর দেশে এসে দাদাকে বাসায় না পেয়ে তার মনটা ভীষণ খারাপ হয়েছে। মাসুম বাচ্চা মনে মনে আল্লাহর পক্ষ থেকে টের পায়, সম্ভবত সে কারণেই আমাকে জেলে দেখে তার মনে ভীষণ দুঃখ ব্যথা জমে আছে, তারই প্রকাশ ঘটেছে তার কান্নার মধ্য দিয়ে। যাক নাঈমার না আসায় আমার মনটাও কেমন যেন দুঃখ ভারক্রান্ত মনে হল, এবং এখনও হচ্ছে।

এতদিন আমার ডায়বেটিস মোটামুটি নিয়ন্ত্রণেই ছিল। হঠাৎ চট্টগ্রাম থেকে সোজা গাজীপুরে চালান হয়ে আসার পরে আমার একটা মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবের কারণেই হোক আর অন্য কোন কারণেই হোক, বর্তমানে কাশিমপুর-২ কারাগারে আসার পর থেকে ডায়বেটিস একটু ঊর্ধ্বমুখী মনে হচ্ছে। এদিকে আমার বাম পায়ের বৃদ্ধ আঙ্গুলটাতে কিছুটা সমস্যা হওয়ার কারণেও মাঝে মাঝে দুশ্চিন্তায় পেয়ে বসে। কারণ ডায়বেটিসের রোগীদের জন্যে এরূপ সমস্যা বিপদের কারণও হতে পারে। চট্টগ্রাম থেকে আসার পথে মিঠুকে বলেছিলাম অন্যান্য ওষুধের সাথে ব্লাড সুগার টেস্ট করার স্ট্রিপ ও জেল নিয়ে আসতে। ওষুধের একটা প্যাকেট দেখে মনে করেছিলাম ওর মধ্যে বোধহয় ওটাও আছে। তাই সাক্ষাতের সময় আমি আর এ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করি নাই, সাক্ষাত শেষে রুমে ফিরে এসে ভুলটা বুঝতে পারলাম। এদিকে স্ট্রিপ একেবারে শেষ। মাত্র একটা ছিল বিকেলেই ওটা শেষ হয়ে যায়। আগামী সপ্তাহের সাক্ষাতের আগে পর্যন্ত আর ব্লাড সুগার টেস্ট করা যাবে না। আগামী সপ্তাহেও যদি না আনে তা হলে তো দুই সপ্তাহ কেটে যাবে। তবে বিকল্প একটা পথ বেরিয়ে আসল। আজ আব্দুল কাদের মোল্লা ও কামারুজ্জামান কোর্টে যাবার কথা। ইতোমধ্যে এসে গেছে মোল্লা, তিনি এই রোগের ব্যাপারে আমারও সিনিয়র এবং অনেক অভিজ্ঞ। তাকেই দায়িত্ব দিলাম, আমাদের আইনজীবী ভাইদের সহযোগিতায় কোন একটা ব্যবস্থা করার জন্যে।

আমার ছেলে মোমেন গতকাল কাশিমপুর- ২ এ আমার সাথে দেখা করেই সাঁথিয়া গেছে। সে ঢাকায় থাকলে আজ কোর্টে আসত। তার সাথে সম্ভবত মিঠুও সাঁথিয়া গেছে। সাঁথিয়ার হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি শ্রী অজিত দাস সম্প্রতি কোলকাতায় চিকিৎসা করতে গিয়ে মারা গেছেন। বয়সে আমার চেয়ে ৩/৪ বছরের বড় হবে। ছোট বেলায় এক সাথে খেলা-ধুলা করেছি। অজিত বাবুকে মুরুব্বীর মতই শ্রদ্ধা করতাম। তিনিও আমাকে স্নেহ করতেন, নাম ধরেই ডাকতেন। মোমেন তার পরিবারের সদস্যদের দেখা করে আমার শোক ও সমবেদনা জানাতেই ওখানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমিও তাকে আমার পক্ষ থেকে শোকসন্তপ্ত ঐ পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানানোর দায়িত্ব দিয়েই পাঠালাম। আমার জেলে আসার পর কিছু দিনের মধ্যেই আমার অভিভাবক, আমার একান্ত শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী ও গুরুজন বড় মামা ইন্তেকাল করেন, তার জানাযায় ও দোয়ার মাহফিলে মোমেনই আমার প্রতিনিধিত্ব করেছে। এরপর আরো একজন মুরুব্বী আমার বড় দুলাভায়ের ছোট ভাই সাঁথিয়া পাইলট হাইস্কুলের প্রাক্তন হেডমাস্টার মোজাম্মেল হক সাহেব মারা গেছেন। তার জানাযাতে শরীক হতে না পারলেও তার দোয়ার মাহফিলে

www.pathagar.com

মোমেন শরীক হয়েছে। ইতোমধ্যে আমাদের পরিবারের অন্যতম মুরুব্বী আলহাজ্ব আবুল হোসেন খান (অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক) ইন্তেকাল করেন। তারও জানাযায় শরীক হতে না পারলেও দোয়ার মাহফিলে মোমেন শরীক হয়েছে। গত দু'বছর শীতকালে শীতবস্ত্রও বিতরণ করেছে। ইতোমধ্যে আমার আর এক মুরুব্বী বেড়া থানার চাকলা গ্রামের জনাব নুরুল হক মাস্টার ইন্তেকাল করেছেন, তার দোয়ার মাহফিলেও মোমেন উপস্থিত হয়েছিল। এভাবে সে এলাকার মানুষের কাছে আমার উত্তরসূরী হিসাবে যেন গ্রহণযোগ্য হয় সেই দোয়াই আল্লাহর কাছে করছি।

এবারে চট্টগ্রাম থেকে আসার পর থেকে প্রথমে বাম পায়ের হাঁটুতে ব্যথা অনুভব করছিলাম, তাও সিঁড়ি দিয়ে নামা উঠার সময়। ক'দিন থেকে হাঁটুর (বাম পায়ের) ব্যথার সাথে সাথে বাম পাশে কোমরের ব্যথাও একটু বেশি মনে হচ্ছে। হাঁটতে রীতিমত কষ্ট হচ্ছে। প্রায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়েই হাঁটতে হচ্ছে। এ অবস্থায় আগামী ২০ মে আবার চট্টগ্রাম যেতে হবে। আল্লাহ যদি দয়া করে তাঁর পক্ষ থেকে শেফা দান করেন, তা হলে তো আর কোন সমস্যা হবার কথা নয়। তবে নিছক মানবিক দৃষ্টিতে মাত্র এই ৪টি দিনের মধ্যেই এই ব্যথা কমে যাওয়া বা সেরে যাওয়া বাস্তব মনে হয় না। অবশ্য আল্লাহর কুদরতি ফায়সালাতে জাগতিক সকল নিয়মনীতির উর্ধ্বে। তাঁর উপর ভরসা করছি। তাঁর কাছেই শেফার জন্যে দোয়া অব্যাহত রেখেছি, কবুল করার মালিক তিনি। আর দোয়া তো ইবাদত, তাই যেকোন অবস্থায় দোয়া করতে থাকাই ঈমানদার হিসাবে আমাদের কর্তব্য। আল্লাহ চাইলে তো এভাবে আমার কষ্টসাধ্য ঢাকা চট্টগ্রাম সফরের প্রয়োজন যেকোন মুহূর্তে শেষও করে দিতে পারেন। আল্লাহর কুদরতি ফায়সালার প্রতি আস্থা নিয়েই কারাগারে দিনগুলো কাটিয়ে যাচ্ছি অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে।

আমার হাঁটুর ও কোমরের ব্যথার জন্যে এখানে কোন অভিজ্ঞ ডাক্তারের সাথে এখন পর্যন্ত পরামর্শ করতে পারিনি। এখানকার ডা. আহসান হাবিব সাহেব বেশ ভাল মানুষ। এর আগে ১/১১ পরে যখন গ্রেফতার হই তখন তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতালে ছিলেন, আমাকে ওখানেই দেখেছেন বলে জানালেন। এখানে তার ব্যস্ততা অনেক বেশি। তারপরও একবার এসেছিলেন, আর একবার জেল গেটে কথা হয়। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাকর্তৃপক্ষের কাছে আমার চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজপত্র রয়ে গেছে। আমার কাছে শুধু বারডেমের নিওরোলজী বিভাগের প্রধানের প্রেসক্রিপশনটা আছে। তিনি ঢাকায় যোগাযোগ করে কোন ইতিবাচক কিছু পাননি। ঐ কাগজপত্র ছাড়া পরবর্তী চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে বেশ অসুবিধাই হচ্ছে। ওখান থেকে কাগজপত্রগুলো আদৌ পাওয়া যাবে কিনা তাও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। আমার তাৎক্ষণিক প্রয়োজন ছিল ফিজিক্যাল মেডিসিনের প্রফেসরের সাথে পরামর্শ করা। এখানকার ডা. সাহেবকে আসার জন্যে দু'দিন থেকে খবর দিচ্ছি। খবরটা আদৌ উনারা কাছে পৌঁছে কিনা আল্লাহই ভাল জানেন। উনি খবর পেলে অবশ্যই আসতেন। হয়তো যাদের মাধ্যমে খবর দিয়েছি, তারা ঠিক মত উনার কাছে খবরটি পৌঁছাতেই পারেননি।

গত সাক্ষাতের আগের সাক্ষাতে আমার বেগম সাহেবাকে একজন মহিলা কর্মী, সম্ভবত হোমিও ডাক্তার কিছু ওষুধ আমার জন্যে দিয়েছেন। ওগুলোর মধ্যে এজমা কাশি ও গিঁটে ব্যথার জন্যে একটা ওষুধ আছে, সেই সাথে যে কোন ব্যথা নিরাময়ের জন্যে একটা বায়োকেমিক ওষুধও আছে। আল্লাহর কাছে শেফা কামনা করে আপাতত ঐ দুটো ওষুধ খাচ্ছি। আল্লাহর মর্জি হলে এতেই ভাল হয়েও যেতে পারে।

আমার জন্মস্থান সাঁথিয়া উপজেলা এবং আমার নির্বাচনী এলাকা হিসাবে পরিচিত সাঁথিয়ার সাথে বেড়া উপজেলার অধিকাংশ মানুষ আমার হৃদয়ের গভীরে স্থান নিয়ে আছে। যখন যেখানে যে অবস্থায়ই থাকি না কেন এই এলাকার কথা, এলাকার মানুষের কথা আবেগের সাথেই মনে পড়ে। এলাকায় আমি ৫ বার নির্বাচন করেছি। অফিশিয়ালি মাত্র দু'বার, ১৯৯১ সালে ও ২০০১ সালে নির্বাচিত হই। কিন্তু বাকী তিনবারের নির্বাচনেও জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবারই কথা। কখনও ব্যালট ডাকাতি, কখনও প্রশাসনিক কারচুপি, আবার কখনও ফখরুদ্দীন মইন ইউ আহমদের ডিজিটাল কারচুপির কারণে জনগণের

www.pathagar.com

প্রত্যাশা এবং বিপুল সমর্থন থাকা সত্ত্বেও নির্বাচিত হতে পারিনি। এই তিনটি নির্বাচনে নির্বাচিত হতে না পারার জন্যে আমি এলাকার জনগণের প্রতি আস্থা হারাইনি। তাই ২০০৮ এর নির্বাচনের পরও আমি এলাকার সাথে সম্পর্ক রেখে চলার চেষ্টা করছি। গ্রেফতার হবার আগে দু'বছর শীতকালে আমি নিজে এলাকায় গিয়ে শীত বস্ত্র বিতরণ করেছি। জনগণের মধ্যে এমনকি রাজনৈতিকভাবে যাদের অবস্থান আমার বিপক্ষে, তারাও এ ব্যাপারে আমাদের পক্ষে ইতিবাচক মন্তব্য করতে কার্পণ্য করেনি। ক্ষমতায় থেকেও প্রতিমন্ত্রী যা না করতে পারছেন, জামায়াত ক্ষমতা ছাড়াই তা করছে। এর একটা ইতিবাচক প্রভাব সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। ঢাকায় বসে গ্রেফতার হবার আগ পর্যন্ত আমি মোটামুটি সরাসরিই এলাকার খোঁজখবর রাখার চেষ্টা করেছি, আমার কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক দায়িত্বের পাশাপাশি।

জেলে এসে নিজের জন্যে একেবারেই কিছু ভাবি না এমন অতি মানবীয় দাবি আমি কখনও করব না, আমি অবশ্য নিজের জীবনের শেষ পরিণতি কী হতে যাচ্ছে, আল্লাহ তার এই বান্দাকে আর কতটুকু সুযোগ দেবেন তার দ্বীনের খেদমতের, এ চিন্তা তো অবশ্যই হয়।

পরিবারের সদস্যদের নিয়েও যে চিন্তা হয় না এমন অস্বাভাবিক দাবি আমি করতে পারবো না। আমার জীবন সঙ্গীনী প্রিয়তমা স্ত্রী এই মুহূর্তে আমার ছয়টি ছেলে মেয়ে ও নাতি নাতনীদের আগলে রাখার ক্ষেত্রে কতটা কষ্ট করছে, তার মনের অবস্থা কেমন যাচ্ছে, এসব চিন্তা তো এমনিতেই মনে এসে যায়। আমার বড় মেয়েটি বেশি আবেগপ্রবণ। প্রথম সন্তান হওয়ার কারণে তার কথা বেশি মনে পড়ে। সব সন্তান মা বাপের কাছে সমান হলেও সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে ছোট সন্তানের প্রতি মনের টান তুলনামূলকভাবে একটু বেশি থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু নিজের এবং নিজের পরিবারের বিষয়টি আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে অনেকটাই নিশ্চিন্ত হতে সক্ষম হই। যা হোক, কিশোর বয়স থেকে ইসলামী আন্দোলনে যোগদান করে তিলে তিলে গড়া সংগঠনের ভাবনাই আমার হৃদয় জুড়ে প্রধান্য বিস্তার করে আছে। এই সংগঠনের মাধ্যমেই দেশ সেবা, দেশের উন্নতি, অগ্রগতি নিয়ে চিন্তা করতে শিখেছি। তাই যুগপৎভাবে দেশের কথা এবং সংগঠনের কথা সমান্তরাল ভাবেই চিন্তা করে থাকি, চিন্তা করতে বাধ্য হই। সংগঠনের মাধ্যমে এলাকায় নির্বাচনে গিয়ে জনগণের ভাগ্যের সাথে নিজের ভাগ্যকে একাত্ম করে ফেলেছি। নিজে এমপি মন্ত্রী হবার আশা আকাঙ্ক্ষা আমার কোন দিনই ছিল না। আমার এলাকার পূর্বসূরীদের একটা আফসোস দূর করার জন্যে সর্বোপরি সংগঠনের সিদ্ধান্তে আমি নির্বাচন করেছি। আমার এলাকার মানুষ সাক্ষী বিশেষ করে সাঁথিয়াবাসী সাক্ষী, সাঁথিয়ার উন্নয়নে আমি ভূমিকা রেখেছি। বেড়াবাসীও মনে রাখবে তাদের বড় সমস্যা যমুনা নদীর ভাঙ্গন রোধে আমি কী ভূমিকা রেখেছি। বেড়া নাটিয়াবাড়ী রাস্তা এবং কৈটোলা চাকলা রাস্তার জন্যে আমি কী করেছি। অতএব এলাকার লোকেরা আমাকে যেমন ভালবাসে, তেমনি আমিও তাদের ভালবাসার মূল্যায়ন করতে চাই। ১/১১ এর ঘটনা একটি জাতীয় দুর্ঘটনা। এর মধ্যে ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী শক্তিকে কোণঠাসা করে একচেটিয়াভাবে ভারতীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই ছিল যার লক্ষ্য। জেনারেল মইন ইউ আহমদের ভারত সফরের ঘটনা এবং ভারতের ঘোড়া কূটনীতি এর জীবন্ত স্বাক্ষর। ২০০৮ এর নির্বাচনে আমাকে পরাজিত হতে হয়েছে। যাহোক এ পরাজয়ে আমার চেয়ে এলাকাবাসীই বেশি ব্যথিত হয়েছে। তাই এলাকাবাসীর প্রতি এই নির্বাচনের ফলাফলে আমার আস্থায় কোন চিড় ধরেনি। আমি সুখে দুঃখে তাদের সাথে থাকার চেষ্টা করার সাধ্যমত প্রয়াস অব্যাহত রেখেছি সরাসরি, যতদিন বাইরে ছিলাম। জেলে আসার পরে সেই সুযোগ নেই। তবুও হৃদয় জুড়ে আছে এলাকাবাসীর আস্থাজনিত ভালবাসার আবেগ অনুভূতি।

আমার গ্রেফতারের পর ২টা শীতকাল অতিবাহিত হয়েছে। আমার পক্ষ থেকে ছেলে মোমেন জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছে অল্প কিছু শীতবস্ত্র নিয়ে। সরকার দলীয় মন্ত্রী এই বারেই প্রথম ইসলামী ব্যাংকের সহায়তায় এবং উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণের সুযোগ পায়। কিন্তু আমি শুনে অবাক হয়েছি ঐ শীতবস্ত্র বিতরণের অনুষ্ঠানে গিয়ে প্রতিমন্ত্রী আমাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ভাবে অসৌজন্যমূলক বক্তব্য দিয়েছে,

www.pathagar.com

যার সমালোচনা খোদ আওয়ামী লীগের লোকেরাও করতে বাধ্য হয়েছে। কারণ, সবাই জানে ক্ষমতায় থেকেও যা করতে পারেনি তা করার সুযোগ করে দিয়েছে ইসলামী ব্যাংক। আর সেখানে গিয়ে ইসলামী দল ও ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বিষোদগার ও অসৌজন্যমূলক বক্তব্য প্রদান কোন ভদ্র রাজনীতিকের জন্যেই শোভনীয় হতে পারে না।

আমি কমবেশি আমার ছেলের মাধ্যমে এবং ভাতিজা মিঠুর মাধ্যমে এলাকার মানুষের খোঁজ রাখার চেষ্টা করছি। গত শনিবারে ছেলে মোমেন কাশিমপুর- ২ জেল খানায় সাক্ষাত করেই এলাকায় গিয়েছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের একজন বড় নেতার মৃত্যুতে সেই পরিবারের সদস্যদেরকে সমবেদনা জানাতে ওখানে গিয়েছে। গতকাল বা পরশু ফিরে আসার কথা।

গতকাল সকালের দিকে লোক মারফত খবর পেলাম মোমেন শনিবারে গিয়ে রবিবারেই ফিরে এসেছে। তার এ বারের সাঁথিয়া সফরটা কেমন হল ইনশাআল্লাহ শনিবারের সাক্ষাতের সময় জানা যাবে। শনিবারে আমার নাতনী নাঈমারও আসার কথা আছে। প্রথমবারে সে স্বাভাবিক হতে পারেনি। পরবর্তীতে আমি আশা করেছিলাম সে আসবে কিন্তু মায়ের সাথে নানানানীর ওখানে যাওয়ার কারণে আসতে পারেনি। এবারে দেখি সে স্বাভাবিক হয়ে তার দাদার সাথে কথা বলতে পারে কিনা। তাদের অস্ট্রেলিয়া যাবার আগ পর্যন্ত তার সাথে আমার সম্পর্কই ছিল বেশি। অন্য নাতি নাতনীদেরকে সে আমার কাছে আসতে দিতে চাইতো না। ২ বছর অস্ট্রেলিয়া থেকে এবং বাসায় ফোনে কথা বলতে দাদাকে না পেয়ে তার এমন প্রতিক্রিয়া হয়েছে, নাকি তার আব্বুকে রেখে দেশে আসার কারণে এমন হয়েছে, আল্লাহই ভাল জানেন। ইতঃপূর্বে তারেকের মেয়ে নাজিফা তার মায়ের সাথে এসেছিল, এখানে তার আব্বুকে না পেয়ে তার অবস্থা ছিল এর চেয়েও খারাপ। সে সারাক্ষণই কান্নাকাটি করত। নাজিফা তার মায়ের সাথে দেশে আসার কিছু পরেই ১/১১ এর সময়ে আমাকে গ্রেফতার করা হয়। তখন প্রথমবার দেখা করতে গিয়ে নাঈমা (তখন খুবই ছোট) ভীষণ কান্নাকাটি করেছিল। ছোট মানুষ হলেও মনে মনে বুঝেছিল তার দাদা ভাল কোন জায়গায় নেই। নাঈমা এবারেও হয়ত তাই ভাবছে, এত দিন কেন সে দাদাকে পায়নি।

আমার জন্যে মাসে প্রায় দুইবার করে চট্টগ্রামে যাওয়া আসা এমনিতেই কষ্টকর। তার উপরে এবার আমার হাঁটুর ব্যথা এবং কোমরের ব্যথাও তুলনামূলকভাবে অন্য সময়ের চেয়ে একটু বেশি অনুভব করছি। তারপর বাড়তি সমস্যা হচ্ছে, এবারের সাপ্তাহিক সাক্ষাতের পরের দিনই চট্টগ্রাম যাওয়ার কথা। কিন্তু যদি ঐ দিন হরতালের কর্মসূচি এসে যায়, তাহলে একদিন আগে অর্থাৎ আমার সাক্ষাতের দিনেই আমাকে চট্টগ্রাম নেওয়ার সিদ্ধান্ত আসতে পারে। এমতাবস্থায় জেল কর্তৃপক্ষ চাইলে আমার সাক্ষাতের সাথে চট্টগ্রাম রওয়ানার একটা সমন্বয়ও করতে পারে। পুলিশের স্কোয়াডকে একটু দেরীতে আসতে বললে এবং আমার সাক্ষাতটাকে একটু সংক্ষেপ করলে উভয়কূল রক্ষা হতে পারে। যদি মানবিক দৃষ্টিতে জেল কর্তৃপক্ষ এই বিবেচনাটুকু না করে তবে সেটা আমার এবং পরিবারের সদস্যদের জন্যে বিশেষ করে আমার স্ত্রী এবং বড় মেয়ের জন্যে হবে একটা বড় রকমের মানসিক চাপ। জেল কর্তৃপক্ষ কী করবেন তা আল্লাহই ভাল জানেন।

আমাদের এখানে কর্তব্যরত সুবেদার মামুনকে ডেকে ডেপুটি জেলার মুশফিক সাহেবকে আমার সাথে দেখা করার জন্যে সালাম পাঠালাম। যদি আসে তাহলে বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিতে বিবেচনা করার জন্যে অনুরোধ করার ইচ্ছা করলাম। না হলে তো আর কিছু করার নেই। অন্তত আমার স্ত্রী এবং বড় মেয়ে এবং খালেদের স্ত্রী ও মেয়ের সাথে এ সপ্তাহের দেখাটা না হওয়া আমার নিজের জন্যে হবে বেশ কষ্টকর। খালেদের মেয়েটা গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে এসে স্বাভাবিক হতে পারেনি। পরবর্তী সপ্তাহে তাকে আনা হয়নি। এ সপ্তাহেও যদি দেখার সুযোগ না পাই তাহলে আর একটি সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে আমার দু'বছরের খেলার সাথী আদরের নাতনী নাঈমাকে দেখার জন্যে। আল্লাহ কবে যে এই অনিশ্চয়তার অবসান ঘটাবেন তাতো তিনিই ভাল জানেন। তবে মানুষ সৃষ্টিগতভাবে চঞ্চল প্রকৃতির। এ চঞ্চলতা ছোট

www.pathagar.com

বেলায় আমার মধ্যে ছিল অনেক বেশি। ইসলামী আন্দোলনের চড়াই উৎরাই ও ঘাত প্রতিঘাতে তা কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও মানুষের সহজাত প্রকৃতিতে তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধারণত আসে না।

এবারে চট্টগ্রামে কোর্টে হাজিরার দিন তারিখ হল ২১ ও ২২ মে, ২০১২। স্বাভাবিকভাবে ১ দিন আগে যাবার কথা। ২০ মে রবিবারে হরতাল হলে তার একদিন আগে অর্থাৎ শনিবারে নিতে পারে। অবশেষে জানা গেল রবিবার বা ২০ মে কোন হরতালের ঘোষণা নেই। তবুও জেল কর্তৃপক্ষ শনিবারেই চট্টগ্রাম পাঠানোর সিদ্ধান্তে অটল। একবার পুলিশের স্কোয়াড চাওয়া হয়েছে তাই আর এখানে পরিবর্তনের নাকি কোন সুযোগ নেই। এই শনিবারের দিনটি আমার ও আমার পরিবারের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক সপ্তাহের পরে এই একটি দিনের ৩০ মিঃ সময় পরিবারের সদস্যদের সাথে একত্রিত হবার সুযোগ যে কোন জেলবন্দী ব্যক্তির জন্যে মহামূল্যবান। আমি এই দিনটাকে হারাতে চাই না। জেল কর্তৃপক্ষকে অনেক অনুরোধের পর তারা একই দিনে পরিবারের লোকদের সাক্ষাৎ শেষে চট্টগ্রাম পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদি বাস্তবে এটা সম্ভব হয়, তাহলেও কিছুটা স্বস্তি অনুভব করব মানসিকভাবে। বাস্তবে ফল কী হবে সেতো আল্লাহ ছাড়া কেউ জানেনা।

আল্লাহর উপর ভরসা করে তার কুদরতি সাহায্যের প্রতীক্ষায় দিন গুণতে গুণতে প্রায় দুই বছর পার হবার পথে। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া আল্লাহই স্বয়ং নিষেধ করেছেন, বলেছেন "আল্লাহর রহমত থেকে তোমরা নিরাশ হবে না। আল্লাহর রহমত থেকে তো কেবল কাফেররাই নিরাশ হয়।" অতএব আল্লাহর কাছে কঠিন পরীক্ষা থেকে তো সব সময় পানাহ চেয়েছি, ন্যূনতম পরীক্ষা থেকেও পানাহ চেয়েছি, কিন্তু রাসূলের নির্দেশ পরীক্ষা চাইবে না, তবে পরীক্ষা এসে গেলে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। বিপদ আপদ থেকে মুক্তির জন্যে আল্লাহ ছবর এবং সালাতের মাধ্যমে তাঁর সাহায্য কামনা করতে বলেছেন। আল্লাহর এই নির্দেশনাকে সামনে রেখে সাধ্যমত তাঁর সাহায্য কামনায় নিজেকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করছি। আল্লাহ তার পরিকল্পনা অনুযায়ী সাহায্য করবেনই, এই একীনই ঈমানদারের বড় পাথেয়। আল্লাহ যেন তার থেকে আমাদেরকে কখনও বঞ্চিত না করেন, সেজন্যেও একমাত্র আল্লাহরই সাহায্য কামনা করি।

এবারে শনিবারে চট্টগ্রামে গেলে ফিরে আসতে প্রায় এ সপ্তাহটাই কেটে যাবে। চট্টগ্রামে যাই মাত্র ক'দিনের জন্যে, কোর্ট কখনও একদিন বা দুইদিন চলে, তিন দিনও চলতে পারে, এ সম্ভাবনা মাথায় রেখেই যাই। তাছাড়া যেতে একদিন আর আসতে একদিন চলে যায়। অতএব এই পুরো একটা সপ্তাহ লেখাপড়া কিছুই করা সম্ভব হয় না।

কদিন থেকে কোমর ও হাঁটুর ব্যথা বেড়েছে। এজন্যে ওষুধ খেয়ে একটু আরাম বোধ করলেও পূর্ণ সুস্থ নই। অন্তত আর এক দিন বিশ্রাম নিয়ে ও ওষুধ খেয়ে নেয়ার সুযোগ পেলে হয়ত আর একটু সুস্থতা বোধ করতাম। যাক এখানে নিজের ইচ্ছার কোন মূল্য নেই, কর্তৃপক্ষের আদেশই শিরোধার্য। মুমিনের ভরসাস্থল কেবল আল্লাহই।

চট্টগ্রামে যাওয়া-আসার বিড়ম্বনা- ০৪

চট্টগ্রামে যাবার পূর্বে পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ প্রদানের জন্য প্রথমে রাজি না হলেও এক পর্যায়ে জেল কর্তৃপক্ষ রাজি হয় এবং পরিবারের সদস্যদেরকে সকাল ৯টার মধ্যেই জেল গেটে এসে পৌঁছতে বলে দেয়। জেল কর্তৃপক্ষের এতটুকু সহযোগিতার জন্যে আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই এবং পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাতের পর্বটি একটু সংক্ষিপ্ত করে আমি চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই।

আশা করা গিয়েছিল ২১ ও ২২ মে ২ দিন কোর্ট শেষে ২৩ মে কাশিমপুর কারাগারে ফিরে আসতে পারব। কিন্তু সংশ্লিষ্ট আদালতে মাননীয় জজ সাহেব একটানা ২১ মে থেকে শুরু করে ২৪ মে পর্যন্ত

www.pathagar.com

প্রতিদিন প্রায় বেলা ৫-৩০ পর্যন্ত আদালতের কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এই আদালতে এ পর্যন্ত কোনদিন সারাক্ষণ বিদ্যুৎ থাকাতো দূরের কথা এক ঘণ্টা বা ৩০ মিঃও একটানা বিদ্যুৎ না থাকার ঘটনা ঘটতে দেখেছি। আদালত ভর্তি মানুষ ভ্যাপসা গরমে অতিষ্ঠ হয়ে বসে থাকে। জজ সাহেবের মাথার উপরে আইপিএসের একটি ফ্যান চলার কারণে তার পক্ষে হয়ত আদালত ভর্তি লোকদের দুর্দশা দুর্ভোগ সম্পর্কে কোন ধারণা করার সুযোগ হয় না।

গতকাল ১১-৩০ থেকে বিকেল ৫-৩০ পর্যন্ত একটানা এই অসহনীয় গরমে ঘর্মাক্ত শরীর নিয়ে আমার মত বয়স্ক লোকের অবস্থা জেলের ডাক্তার সাহেবরা বেশ সহানুভূতির সাথে উপলব্ধি করছেন। প্রতিদিনই বিকেলে ব্লাড প্রেসার নিচেরটা ৬০/৬৫ তে নেমে আসত ঘামের কারণে। জেল কর্তৃপক্ষ স্যালাইনের ব্যবস্থা করেন। কী পরিমাণ পানিতে এক প্যাকেট স্যালাইন খেতে হবে নিজে ডাক্তার সাহেব দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। আদালতের পরিবেশ যতই অসহনীয় হোক না কেন চট্টগ্রাম কারা কর্তৃপক্ষীয় বিশেষ করে ডাক্তারদের ব্যবহারে আমি যেন সব কষ্ট ভুলে যেতাম। এবারে একদিন আগে যাওয়ায় এবং কোর্ট একটানা ৪ দিন চলায় আমাকে চট্টগ্রামে অবস্থান করতে হয় ৫ দিন আর যাওয়া আসা ২ দিন মোট এক সপ্তাহের সফরে কষ্ট হলেও একজন জেলখানার সাথীর কাছ থেকে তিনটি মূল্যবান বই পেয়েছিলাম পড়ার জন্যে। যার একটি তুরস্কের বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিন্তাবিদ হারুন ইয়াহইয়ার Allah's Miracle in the Quran.

রবিবারের অবসরে প্রায় সবটাই পড়ে ফেলি। আরো দুটো বই ছিল পড়ার মত কিন্তু বাকী চার দিন আদালতে যেভাবে কাটাতে হয় তারপর আর পড়া শোনার কোন সুযোগ করা যায়নি। যা হোক একটানা সাত দিনের কষ্টসাধ্য সফর অবস্থা সত্ত্বেও মনে তৃপ্তির একটাই বিষয় ছিল এবারে ঐ বইগুলো পড়ার সুযোগ পাওয়া। এ জন্যে আল্লাহর দরবারে জানাই খালেস শুকরিয়াত।

২৪ মে ২০১২ বৃহস্পতিবারে আমার ছেলে মোমেনের সাঁথিয়ায় প্রোগ্রাম থাকায় সে মঙ্গলবারেই (২২ মে) বিকেলে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় ফিরে যায়। অবশ্য মিঠু থেকে যায় শেষ দিন পর্যন্ত এবং শুক্রবারে ২৫ মে তারিখে চট্টগ্রাম থেকে আমার গাড়ীর সাথেই রওয়ানা দেয় ঢাকার উদ্দেশ্যে। ২৪ মে সাঁথিয়ায় প্রোগ্রামে মোমেনের এই প্রথম অংশ গ্রহণ। মিঠু চট্টগ্রাম থেকেই তার সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ রাখছে এবং সাথে সাথে আমাকে জানাতে থাকে যে, প্রোগ্রামটা খুব ভাল হচ্ছে। সাঁথিয়া ও বেড়া উপজেলার কৃতী ছাত্রদের সম্বর্ধনার এই অনুষ্ঠানটি বেশ সফল হয়। মোমেনও এই প্রথম ছাত্র সুধীদের সাথে আমার ছেলে হিসেবে বক্তব্য দিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। প্রোগ্রাম শেষে ঐ দিনই সে ঢাকায় ফিরে আসে। আমি শুক্রবারে কাশিমপুরে ফিরে আসি। শনিবারের সাক্ষাতে তার সফরের বিস্তারিত জানায়।

২৬/০৫/২০১২

চট্টগ্রাম থেকে ফেরার পরের দিন বেশ সকাল সকালই আমার পরিবারের লোকেরা সাক্ষাতের জন্যে এসে যায়। আমি অন্য সময় আগে থেকেই প্রস্তুত থাকি, এবারে আর সেটা সম্ভব হয়নি। ওদের আসার খবর পাওয়ার পর টয়লেট সেরে সাক্ষাতের জন্যে রওয়ানা হলাম। অবশ্য নাশতা খাওয়া অবস্থায় এবার সাক্ষাতের খবর পাই। কিন্তু তারপরও দেখি তারা ভেতরে আসেনি। সাক্ষাতের স্থলে অন্য পরিবারের লোকদের সাথে ছোট্ট একটা বাচ্চা মেয়ে দেখে আমি ভাবছিলাম, আমার নাতনী, তৃতীয় ছেলের মেয়ে, নাঈমাই হবে। কাছে যেতে যেতেই ঐ পরিবারের লোকদের পাশে সরিয়ে নেয়া হল। আমার সাক্ষাতের স্থানে আমি অপেক্ষায় থাকলাম। এসবির লোকের কারণেই অন্য সময় দেরী হত। এবারে তারা জেল গেটের একটু দূরে গাড়ীতেই অপেক্ষা করছিল পরে তাদেরকে খবর দিয়ে আনা হল। আমার সাক্ষাতটি এদিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে পরের দিনই ট্রাইব্যুনালে চার্জ গঠন করা হবে।

চার্জ গঠনের সময় দোষী না নির্দোষ এই প্রশ্নের উত্তরে কয়েক মিনিট বক্তব্য দেবার সুযোগ পাওয়া যায়। এই ব্যাপারে আমি আইনজীবীদের পরামর্শ এবং একটা সংক্ষিপ্ত ব্রিফিং আশা করছিলাম। আশা ছিল ২৮

www.pathagar.com

মে'র আগে একদিন আইনজীবীদের সাথে সাক্ষাৎ হবে। একদিন পারিবারিক সাক্ষাৎ ও আইনজীবী সাক্ষাতের কোর্ট অর্ডার জেল কর্তৃপক্ষের কাছে আসে। অর্থাৎ পারিবারিক সাক্ষাতের দিনেই কোর্ট থেকে আইনজীবীদের সাথে সাক্ষাতের নির্দেশ আসে। দুটো সাক্ষাতের জন্যে আমি একবারেই তৈরি হয়ে যাই। কিন্তু গেটে পৌঁছার পর আমার ছেলে বলল তার সাথে যে আইনজীবীর আসার কথা সে আসতে পারিনি। পরেও আর কোন উদ্যোগ নেয়নি। একদিন আমি আইনজীবীদেরকে প্রসিকিউটরের কথার জবাবে কিছু পয়েন্ট দিয়েছিলাম বলার জন্যে। তখন আমার আইনজীবী তাজুল ইসলাম সাহেব বললেন সব কথা আগেই বলা ঠিক নয়। ওরা ওদের ভুল ভ্রান্তি সম্পর্কে সতর্ক হয়ে পরে সংশোধনের সুযোগ নিতে পারে। তাদের এই কথার কারণেই আমার কি বলা উচিৎ হবে আর কি বলা উচিৎ হবে না এ বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করা আমি খুবই জরুরি মনে করেছিলাম। তারা কথাও দিয়েছিল। কিন্তু কেন যেন তারা আমাকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কোন পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারলেন না। আমার ছেলের কাছ থেকে বিচারকের অবস্থান সম্পর্কীয় একটি ব্যাখ্যা পেয়েছিলাম। আমার বক্তব্যের উপসংহার ওটাকেই কাজে লাগাই।

আইনজীবীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল এবারে ৫ মিঃ এর বেশী সময় দেবে না। পরে আরো কথা বলার সুযোগ আসবে। সাঈদী সাহেব কোন মতে ৫ মিঃ এর স্থলে ৮ মিঃ বলার সুযোগ পান। আপনার বেলাও তাই হবে। এত অল্প সময়ে এতকথা এত অভিযোগের জবাবসহ বক্তব্য কিভাবে দিব?

আমার পক্ষে এটা সম্ভব হবে কিনা আমি একটু দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম। কারণ এমনিতেই আমি স্বভাব বক্তা নই। সংগঠনের প্রয়োজনেই বক্তব্য দিয়ে থাকি। তারপর দীর্ঘ প্রায় দুবছর কোন বক্তব্য দেয়ার বা বক্তৃতার সুযোগ হয়নি। কথায় আছে, অনভ্যাসে বিদ্যা নষ্ট। মুহতারাম সাঈদী সাহেবের কথা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তিনি স্বভাব বক্তা। যত বড় বড় মাহফিলে তিনি সিংহের মত গর্জন করে বক্তব্য দেয়ার সুযোগ পেয়ে আসছেন দীর্ঘ দিন থেকে, এমন ক্ষেত্রে যে আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয় মানুষের মনে, আমার নিজের মনে নিজের বক্তব্য সম্পর্কে এরূপ আত্মবিশ্বাসের জন্ম নেয়নি। আমি এখন বক্তৃতা করতে সংকোচ বোধ করি। জামায়াতে ইসলামীর আমীরের পরিচয় নিয়ে বক্তব্য দিতে আমি আরো বেশি সংকোচ বোধ করি। কারণ হলো আমার দুর্বল উপস্থাপনায় জামায়াতের ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় কিনা।

এ দুশ্চিন্তা আমি কাটিয়ে উঠতে পারিনি। আদালতে কথা বলার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ আলাদা। ১/১১ এর পরে সিএমএম কোর্টে অল্প সময়ের জন্যে কিছু কথা বলেছিলাম তা ছিল গ্রেফতার হবার পরের দিনই। তখন যেহেতু চলমান অবস্থায় কোন না কোন অনুষ্ঠানে কথাবার্তা বলেই আসছিলাম, তাই সেদিন কোন জড়তা বোধ করিনি। কিন্তু এবারে এক বছর এগারো মাসের মাথায় এসে কী বলতে কী বলে ফেলি এব্যাপারে আমাকে একটু বেশিই সতর্কতা অবলম্বন করার বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। জুম'আর খোৎবা দেয়ার সূত্রে মুহতারাম সাঈদী সাহেবের কথা বলার অভ্যাস সীমিত পরিসরে হলেও অব্যাহত আছে। কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষের বিশেষ সতর্ক নজরে থাকার কারণে জুমআর নামাজের ইমামতি ও খুৎবা দেয়া থেকে বিরত থেকেছি। তাই বলছিলাম এক বছর এগারো মাসে বক্তৃতা দেয়ার অভ্যাস একেবারেই যেন শেষ হয়ে গেছে। তারপর নাজুক এবং অবাঞ্ছিত একটি মামলায় মিথ্যা অভিযোগের পাহাড় দাঁড় করানো হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে তার মাধ্যমে আমাদের চরিত্র হনন করা হচ্ছে। মিডিয়ার অপপ্রচারের মাধ্যমে জনগণের মাঝে আমাদের সম্পর্কে ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এক তরফা প্রপাগাণ্ডার জবাবে ৫/১০ মিঃ কথা বলার সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্যে আমি অভিজ্ঞ আইনজীবীদের সহযোগিতা পাওয়ার আশায় প্রতীক্ষারত থেকে ভুলই করেছি বলে মনে হয়েছে। আমার বক্তব্য শেষে এক আইনজীবী বলেন, আমরা মনে করেছিলাম চারদলীয় জোটের প্রসঙ্গ আসবে।" কিন্তু মনে মনে তারা যা চাচ্ছিল তা আমাকে আগে বলেননি কেন? আমি আল্লাহ ভরসা করে, তিনি যা বলার তৌফিক দিয়েছিলেন তাই বলেছি। তবে মনে অনেক কথা অনেক ব্যথা। সীমিত সময়ে তার সবটা যথাযথভাবে ব্যক্ত করতে না পারায় আমার

www.pathagar.com

মনের মধ্যে একটা অতৃপ্তির ভাব নিয়েই আমাকে ট্রাইব্যুনাল চেয়ারম্যানের বার বার হস্তক্ষেপের কারণে বক্তব্য শেষ করে আপাতত আদালত প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে কাশিমপুর জেল খানায় ফিরে আসতে হয়।

আমার বিরুদ্ধে আনীত ষোলটি চার্জই মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। এগুলো যদি আদৌ সত্যই হবে তাহলে কোন একটি অভিযোগের জন্যেও তো সংশ্লিষ্ট এলাকার থানায় একটি জিডি বা এফআইআরও করা হয়নি কেন? আমি আশা করব আমার আইনজীবীগণ এ বিষয়টির উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করবেন। ট্রাইব্যুনাল চেয়ারম্যান যে ভাষায় ১৬টি মিথ্যা অভিযোগ উপস্থাপনা করলেন তা ধৈর্যের সাথে শুনে মেজাজের ভারসাম্য রক্ষা করে শান্ত ও সংযত ভাষায় দুটো কথা বলতে পারায় আল্লাহর দরবারে জানাই লাখো শুকরিয়া।

ট্রাইব্যুনালে চার্জ গঠনের ও আমার বক্তব্য প্রদানের পর গারদে ফিরে দেখি মোল্লা সাহেব বেশ আগেই ট্রাইব্যুনাল- ২ থেকে গারদে ফিরে এসেছেন। ওখানেই সালাহউদ্দীন কাদের চৌধুরীর সাথেও দেখা হল। তিনি অবশ্য আগেই এসেছিলেন। মুহতারাম মাওলানা সাঈদী সাহেবকেও পেয়ে গেলাম। উনাদের সবার জিজ্ঞাসা ছিল আমি কোন কথা বলার সুযোগ পেয়েছি কিনা। পেয়ে থাকলে কতক্ষণ কথা বলেছি। আমি নিজেও জানতাম না কতক্ষণ কথা বলতে পেরেছি। কারণ আমাকে যখন দোষী না নির্দোষ এক কথায় জবাব দিতে বলা হয়, তখন আমি ঘড়ির দিকে তাকানোর সুযোগ পাইনি। ইতঃপূর্বে ২/১ জনকে কথা বলার যে সুযোগ দেয়া হয়েছে আমাকে সে সুযোগটা থেকে বঞ্চিত না করার অনুরোধ করলে সময় বেধে না দিয়ে খুব সংক্ষেপে বলতে বললেন। চেয়ারম্যান এক ফাঁকে বললেন আপনার আইনজীবীদের জন্য কিছু বলার সুযোগ রাখবেন। এটা অবশ্য তিনি বলেন আমার বক্তব্য চলার ফাঁকে। আমি তাকে আশ্বস্ত করে বললাম, মামলার আইনগত দিকগুলো অবশ্যই তারা বলবেন। চার্জগুলো সম্পর্কে আমার কথাগুলোতো আমি খুব সংক্ষেপেই বলার চেষ্টা করছি। মনের মধ্যে অনেক কথাই তো জমা হয়েছে। অন্তত এর কিছুটা আমাকে প্রকাশ করার সুযোগ দিতে হবে। যা হোক আমাকে আমার আইনজীবী বলেছিলেন এবারে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় দেবে না। সাঈদী সাহেব ৮ মিনিট বলেছিলেন, আপনি বড় জোর টেনেটুনে অতটুকু সময় নিতে পারেন। আগেই বলেছি আমাকে এব্যাপারে ফিডব্যাক স্বরূপ কিছু পয়েন্টস দেবার কথা ছিল। কিন্তু তা আর হয়ে উঠেনি। আল্লাহর উপর ভরসা করে উপস্থিত যা মনে এসেছে তাই বলেছি। পরের দিন কার মাধ্যমে যেন আমার টেবিলে দৈনিক সংগ্রামটা পেয়ে গেলাম। সংগ্রাম আমার ছবিসহ প্রথম পাতায় উপরে ডান দিকে তিনকলাম হেডিং দিয়ে প্রায় হুবহু আমার বক্তব্য রিপোর্ট করেছে। দেখে মনে বেশ তৃপ্তি পেলাম। অন্তত প্রায় দুই বছর পর সংগ্রামের পাঠকবৃন্দ আমার বক্তব্য জানার একটা সুযোগ পাবে। সংগ্রামের রিপোর্ট থেকেই জানলাম আমি নাকি ১৮ মিঃ বক্তব্য দিয়েছি। এটা কী করে সম্ভব হল তা আমার জানা নেই। অত সময় বলার সুযোগ আর কেউই পাননি। মোল্লা সাহেব যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়ে গিয়েছিলেন, উনাকে নাকি ২/৩ মিনিটের বেশি বলতে দেয়া হয়নি। আবারো আল্লাহর শুকরিয়া জানাই মনের সব কথা বলার সুযোগ না হলেও আল্লাহ আমার মুখ থেকে ঐ মুহূর্তে যে কথাগুলো বলিয়েছেন সেটাই আমার জন্যে আমার প্রিয় সংগঠন জামায়াতে ইসলামীর জন্যে কল্যাণকর হবে এই বিশ্বাসটা বেশ দৃঢ়ভাবেই আমার মনে গেঁথে গেছে। আমি কথা শেষ করছিলাম আল্লাহর কোরআনের শিখানো একটি দোয়ার মাধ্যমে আর তা হল : একমাত্র আল্লাহর উপরই আমরা ভরসা করছি। হে আমাদের রব, আমাদের ও আমাদের (কওম) প্রতিপক্ষের তুমিই হকের ভিত্তিতে ফায়সালা করে দাও। তুমিই উত্তম ফায়সালাকারী। আল্লাহ যেন এই দোয়া কবুল করেন।

জোহরের নামাজের সময় কামারুজ্জামানের কাছে শুনলাম আমার ট্রাইব্যুনালে প্রদত্ত বক্তব্যটা নাকি হুবহু ইন্টারনেটে দেয়া হয়েছে। কে বা কারা এত তাড়াতাড়ি এভাবে বক্তব্যটা রেকর্ড করে ইন্টারনেটে ছেড়ে দিয়েছে। তা জানার আমার সুযোগ হয়নি। তবে যারাই করে থাকুক আল্লাহ যেন তাদের এ কাজটিকে কবুল করেন এবং যাদের কাছে কথাগুলো পৌঁছবে তাদেরকে যেন আল্লাহ ইসলামী আন্দোলনের প্রতি

www.pathagar.com

অধিকতর আগ্রহী এবং সহানুভূতিশীল হওয়ার তৌফিক দান করেন। সম্ভব হলে যারা এটাকে ইন্টারনেটে দিয়েছে, তারা যেন এটাকে ইংরেজীতে অনুবাদ করে ইন্টারনেটে প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

সংগ্রামের পাশাপাশি নয়াদিগন্ত এবং আমার দেশও মোটামুটি ভালই কভারেজ দিয়েছে। তবে বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে আমার দেশের রিপোর্টটা বেশ বড় হলেও এবং বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানোর সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমার একটু খারাপ লেগেছে। রিপোর্টার সম্ভবত নতুন কেউ হয়ে থাকবে কিছু ভুল ভ্রান্তি রিপোর্ট ও বক্তব্যের সৌন্দর্য কিছুটা হলেও নষ্ট করেছে। আসলে আমাদের বক্তব্য সঠিক ভাবে রিপোর্ট করতে হলে ইসলামী বিষয়ে ন্যূনতম কিছু পড়াশোনা থাকা বেশ জরুরি মনে হয়।

০২/০৬/২০১২

শনিবার, আমার পারিবারিক সাক্ষাতের দিন। বেশ সকাল সকালেই সাক্ষাতের স্লিপ পেলাম। আমি অন্য দিন আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকি। এবার খবর পাওয়ার পর প্রস্তুত হতে বেশ একটু সময় লেগে গেল। তারপরও গেটে গিয়ে আমাকে প্রায় ২০ মিঃ অপেক্ষা করতে হল। তাদের নিয়ে আসা হল। অন্য দিন এসবির লোকদের আসতে বিলম্ব হবার অজুহাত দেয়া হত। এবারে এসবির লোক দাবি করল সে নাকি সাড়ে আটটায় এসে পৌঁছেছে। আমাদের লোকেরা ক্লিয়ারেন্স না পেয়ে গাড়ী থেকে নেমে গেটে গরমে অপেক্ষা করার চেয়ে গাড়ীতে অপেক্ষা করাই পছন্দ করে। তাই নাকি তাদের ডেকে আনতে দেরী হয়ে যায়।

যাক, এবারে জেল কর্তৃপক্ষকে অন্যান্য সময়ের তুলনায় একটু নমনীয় মনে হল। গত তারিখে আমার ইলেক্ট্রিক কেটলিটা ফেরত দিলেও এবারে আর আপত্তি করল না, তবে ডেপুটি জেলার মোশফেক মিঞা বললেন এটা নিয়ে চট্টগ্রাম যেতে পারবেন না। আমি এ নিয়ে তার সাথে কথা বলা আর সমীচীন মনে করিনি। আজ সময়ের ব্যাপারেও তারা কিছু বলেনি।

তাদের বলার আগেই আমরা নিজেরা কথা শেষ করে বিদায় নেই। এবারে আমার তৃতীয় ছেলে ডা. খালেদের মেয়ে কিছু স্বাভাবিক হলেও এখনও দাদার সাথে আগে যেভাবে খেলা করত আদর দিত আদর করতো সে রকম হয়ে উঠেনি, তবে তার চাচাকে যেহেতু তার আব্বুর মতই দেখায় এজন্যে চাচাকে নিয়ে খুবই ব্যস্ত এবং চাচাকে জ্বালায়ও একটু বেশি। তাকে নিয়েই এবারের সাক্ষাতের সময়টা কেটে যায়। সময় অপেক্ষাকৃত কিছুটা বেশি পেলেও মনে হল যা যা বলার কথা চিন্তা করে গিয়েছিলাম তার অনেক কিছুই বলা হয়নি। এব্যাপারটা প্রত্যেক বারেই ঘটে। এজন্যে আমাকে সবাই লিখিত নোট নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু আমার এই কাজটাই করা হয় না। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে থাকতে লিখিত নোট নিয়ে গেছি কিন্তু কেন যেন ঐ নোট দেখতেও ভুলে গেছি। এবারে ২৮ মে ট্রাইব্যুনালে বক্তৃতার ব্যাপারে অনেকেই আমাকে নোট করে নেয়ার পরামর্শ দেন। আইনজীবীরাও কিছু ব্রিফিং দেয়ার কথা বলেছিল। কিন্তু আমার নিজের যেমন নোট করা হয়নি, তেমনি আইনজীবীদের পক্ষ থেকেও কোন ফিডব্যাক পাওয়া যায়নি। আল্লাহর উপর ভরসা করে চেয়ারম্যানের কণ্ঠে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মত আক্রমণাত্মক ভাষায় চার্জের বিবরণ শুনে তাৎক্ষণিক যে প্রতিক্রিয়া হয় অবশেষে তার ভিত্তিতেই বক্তব্য দিতে বাধ্য হই। পরে ট্রাইব্যুনাল থেকে ফিরে এসে মনে হল আমি অন্যদের তুলনায় সময় একটু বেশি নিয়েছি। ঐ দিন আল্লাহ এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছিলো, যাতে আমার মনে হয়েছে আমি চাইলে আরো কিছুক্ষণ বক্তব্য দিতে পারতাম। কিন্তু মনে মনে চিন্তা করা অনেক কথাই বাদ রেখে বক্তব্য শেষ করতে হয়েছে। কারণ এ ব্যাপারে কোন কথাটা বলা ঠিক হবে না, কোন কথাটা বলা ঠিক হবে, এব্যাপারে আগেই আমাকে একটু ইংগিতও দেয়া হয়েছিল। তাই সুযোগটা পুরো কাজে না লাগিয়েই বক্তব্য শেষ করি।

সামনে ১২ জুন চট্টগ্রামে কোর্টে হাজিরা দেয়ার কথা। ১১ জুন বিরোধী দলের মহাসমাবেশ। এ কারণে ১০ জুন চট্টগ্রামে যাওয়া লাগতে পারে, ছেলে মোমেনকে এ ব্যাপারে জেল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে বলে দিয়েছি। চট্টগ্রামে ১০ তারিখেও যদি যেতে হয় তা হলেও তার আগের দিন শনিবার ৯ জুনে

www.pathagar.com

পারিবারিক সাক্ষাৎ হবার কথা। আমার ছেলে মোমেন বোধ হয় এটা অনুধাবন করতে না পেরেই বিদায়ের সময় বলে গেল ১২ জুন দেখা হবে, যে দেখা হবে চট্টগ্রাম কোর্টে। তার আগেই যে সাপ্তাহিক সাক্ষাতের নির্ধারিত একটি দিন আমাদের পাওনা আছে সেটা হয়ত ঐ মুহূর্তে তার মনে ছিল না। আসলে তার একার উপর দিয়ে অনেক চাপ যাচ্ছে। জুনে অথবা জুলাইয়ে সুপ্রিম কোর্টের জয়েনিংয়ের জন্যে তাকে পরীক্ষা দিতে হবে। তার স্ত্রী সন্তান সম্ভবা, সম্ভাব্য তারিখ জুলাইয়ের মধ্যবর্তী সময়ে। এ দিকে আমাকে নিয়ে ব্যস্ত। আল্লাহ এ কঠিন মুহূর্তে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন তার জন্যে সহজ করে দিন।

চট্টগ্রামে যাওয়া-আসার বিড়ম্বনা- ০৫

চট্টগ্রাম আদালতে একটানা চার দিন দুপুর ১১.৩০ মিঃ থেকে, কোন দিন ১২টা থেকে বিকেল ৫-৩০ মিঃ পর্যন্ত হাজিরা দিয়ে ১৬ জুন ২০১২ তারিখে অত্যন্ত ক্লান্ত পরিশ্রান্ত শরীর নিয়ে কাশিমপুর- ২ এর জেলখানায় পৌঁছি। মানবতা বিরোধী আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে চার্জ গঠনের তারিখ ছিল ২৮ মে। এরপরই আবার ১২ জুন চট্টগ্রাম আদালতে হাজিরার দিন ধার্য হয়। ১৬ জুন বিরোধী দলের মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে এবারেও ১২ তারিখের হাজিরার জন্যে ৯ জুন চট্টগ্রাম নেয়ার চিন্তাভাবনা ছিল জেল কর্তৃপক্ষের। এ সম্পর্কে একজন ডেপুটি জেলারের সাথে আলাপে যা মনে হল তা থেকে আমার মনে হল বিনা কারণেই এরা দুই দিন আগে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করছে। বিরোধী দলের প্রোগ্রাম ১১ তারিখে তার আগের দিন ১০ জুনে কোন প্রোগ্রাম নেই। ১২ তারিখের আগের দিন ১১ তারিখে মহাসমাবেশ হবার কারণে খুব স্বাভাবিক ভাবেই ১০ জুন নিতে পারে। আমি সুযোগমত সিনিয়র জেল সুপারকে পেয়ে তাকে ব্যাপারটি বুঝিয়ে বললাম। ৯ জুন শনিবার। সপ্তাহে এই একদিন ৩০ মিনিটের জন্যে পরিবারের লোকদের সাথে সাক্ষাৎটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বন্দীদের জন্য। এটাকে যেন ডিস্টার্ব করা না হয়।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের রুমে আমরা কয়েকজন কথাবার্তা বলছি। এই সময় ফেরদৌস নামে একজন ডেপুটি জেলার আলমগীর সাহেবের পারিবারিক সাক্ষাতের স্লিপ নিয়ে আসল। তার কাছ থেকে আমার চট্টগ্রাম যাওয়ার ব্যাপারে তাদের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত জানতে চাইলাম। সে বলল, সুপার সাহেব সিদ্ধান্ত দিয়েছেন ১০ জুন আপনাকে চট্টগ্রাম নেয়া হবে। শুনে মনে একটু স্বস্তিবোধ করলাম। সুপার সাহেব আমার সমস্যাটি বিবেচনা করায় তাকেও ধন্যবাদ।

০৯/০৬/২০১২

শনিবারে পরিবারের লোকদের সাক্ষাতের জন্যে আমি একটু আগে থেকেই তৈরি থাকি। দেরী হলে গেটে লোক পাঠিয়ে খবর নেই। আজও ১০টার দিকে খবর নিয়ে জানলাম এখনও আসেনি। ১১টার দিকে খবর পেলাম তারা এসেছে। এরপর আমি টয়লেট সেরে গেটে গিয়ে দেখি তারা তখনও গেটের বাইরে। আমি গেটে পৌঁছারও ১৫/২০ মিঃ পরে তাদের আনা হল সাক্ষাতের নির্দিষ্ট কামরায়। এবারের সাক্ষাৎ শেষে আমার রুমে ফেরার সময় ঘটল এক অদ্ভুত কারবার। ভিআইপিদের সকলের কাছেই সেফটি রেজর থাকে। ইতিপূর্বে আমি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে, চট্টগ্রামে বা গাজীপুরে কোথাও এনিয়ে কোন আপত্তির কথা শুনিনি। আজ ডেপুটি জেলার মুশফিকুর রহমান সাহেব আমার জন্যে আনা এক প্যাকেট সেফটি রেজর ও দুইটি কলম আমার হাতে দেয়ার আগে জেলার বাবুর অনুমতি নিতে গেল। জেলার বাবু রেজরের অনুমতি দিলেন না। কলমের প্যাকেটটা মুশফিক সাহেব আমার হাতে দিলেন আর সেফটি রেজরের প্যাকেটটা আমাকে না দিয়ে কারারক্ষীর হাতে দিয়ে বললো এটা ঐ এলাকার সুবেদারের কাছে থাকবে। প্রয়োজনের সময় তার কাছ থেকে একটা করে নিতে হবে। পরের দিনই কোন একরুমে আমরা

www.pathagar.com

ক'জন বসা। সেখানে সুবেদার মামুন সাহেব আমার জন্যে ছোট্ট ছোট্ট দুটো খাতা তাদের পক্ষ থেকে কিছু শর্তসহ আমাকে দিতে আসে। তখন আমি তাকে সেফটি রেজরের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করায় অন্য সবাই অবাক হয়ে তাকেই চার্জ করল, "আমাদের সবার কাছেই তো এটা আছে উনার কাছে থাকতে পারছে না কেন? বেচারা সুবেদারের এখানে করার কিছু ছিল না। তার উত্তর একটাই, জেলারের পক্ষ থেকে নাকি ডেপুটি জেলার তাকে এটা বলেছে। তার তো এখানে আর কিছুই করার নেই। যাই হোক, আমি এব্যাপারে জেলার ও সুপারকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইবো আমার সাথে এই বিশেষ আচরণের কারণটা কী?

চট্টগ্রামে হাজিরার একদিন আগে যাওয়ায় কোন সমস্যা হয়নি। কোর্ট দুই দিন অর্থাৎ ১২ এবং ১৩ জুন চলার পর পরবর্তী তারিখ দেয় ৩ ও ৪ জুলাই। এদিকে ট্রাইব্যুনালে পয়লা জুলাই থেকে সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা শুরু হলে প্রতি ওয়ার্কিং ডে'তেই কোর্ট চলবে। এ'দুয়ের মধ্যে সমস্যা দেখা দিলে সমাধান কিভাবে হবে তা আইনজীবীদের পক্ষ থেকে বলতে হবে।

জেলজীবনের দুবছর পূর্তি হবে বর্তমান (জুন) মাসের ২৯ তারিখে। এই দীর্ঘ সময়ে একটা বিষয় খুবই ক্ষোভের সাথে আমি লক্ষ্য করছি। আমি নিজে আমার ছাত্র জীবনের শুরু থেকে আধুনিক শিক্ষিত এবং দ্বীনি শিক্ষিতদের মধ্যে একটা সমন্বয়ের জন্যে সেতু বন্ধনের কাজ করে আসছি। আমার প্রাণপ্রিয় সংগঠন দেশের এই আধুনিক ও দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিতদের মাঝে বিরাজিত বিভেদের প্রাচীর অনেকটাই ভাঙ্গতে সক্ষম হয়েছে। এখানে আলেমে দ্বীনের অবস্থানের পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষিতদের অবস্থানের একটি সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। জামায়াতে ইসলামীতে দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিতরা যেমন আছেন, তেমনি আধুনিক শিক্ষিত লোকেরাও আছেন। আবার উভয় শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদেরও একটা বিরাট অংশ এখানে আধুনিক ও দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিতদের সাথে সেতুবন্ধনের ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন।

আমি ছাত্র জীবন থেকেই আধুনিক শিক্ষারত ছাত্রদের সাথে মেলা মেশা করেছি। আমার মাদরাসা জীবন শুরু হয় সাঁথিয়া উপজেলা সদরে অবস্থিত বোয়ালমারী মাদরাসায়। মাত্র কোয়ার্টার মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত হাইস্কুলের ছাত্রদের সাথে আমার ছিল সুন্দর সম্পর্ক। গ্রামের বাড়ী থেকে তাদের সাথেই একত্রে মাদরাসায় যাওয়া আসা করতাম। প্রায় ৩/৪ গ্রামের স্কুলের ছাত্রের সাথে আমি একলা একজন মাদরাসার ছাত্র আসা যাওয়া করতাম। হাইস্কুলের ছাত্রদের সাথে যেমন ছিল বন্ধুত্বের সম্পর্ক, তেমনি হাইস্কুলের শিক্ষকদেরকেও নিজের শিক্ষকের মতই ভক্তি-শ্রদ্ধা করতাম।

১৯৬১-৬২ তে আমি মাদরাসা আলীয়া ঢাকার ছাত্র থাকা অবস্থায় নিকটস্থ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোস্টেলের ছাত্রদের সাথে সুসম্পর্ক রেখে চলতে আমার কোন অসুবিধা হয়নি। সেই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাসে আমি গিয়েছি, আমার কাছেও মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আসা-যাওয়া করতো। আমি কখনও ভাবিনি ওরা মিষ্টার আর আমরা মোল্লা। কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষের মধ্যে কিছু ব্যক্তির আচার-আচরণে আমার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মেছে এরা ইসলামী ব্যক্তিদের, দাঁড়ি টুপিধারী ব্যক্তিদেরকে ভিআইপি বন্দী হিসাবে মেনে নিতে পারে না। মনে হয় যেন এদেরকে ভিআইপি হিসাবে গ্রহণ করতে তাদের মনে, কলিজায় ব্যথা অনুভব করে।

আমার নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে লজ্জা লাগে। তারপরও সত্য প্রকাশের খাতিরে বলতে হয় আমি ক্যাবিনেট মিনিস্টার ছিলাম জামায়াতে ইসলামীর মত একটা বড় মাপের ইসলামী সংগঠনের প্রধান হবার কারণে। আমাকে সিনিয়র মিনিস্টারদের মধ্যেই গণ্য করা হত, অথচ জেল কর্তৃপক্ষের আচার-আচরণে তার কোন ন্যূনতম স্বীকৃতিও লক্ষ্য করিনি এত দিনে। শুধু আই.জি প্রিজনারের সাথে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে কথা হবার দিন ডিসি নিজে আমাকে ডেকে নিয়ে তার পাশে বসিয়েছিলেন। এছাড়া অন্য কারও আচরণে এমনটি দেখা যায়নি।

www.pathagar.com

একদিন চট্টগ্রাম থেকে ফিরে আসার পর জেল গেট থেকে রুমে আসতে একজন কারারক্ষী বলেই ফেলল, "স্যার অন্যান্য ভিআইপিদের সাথে যে ব্যবহার করা হয় আপনাদের সাথে তো এমনটি করতে দেখি না।" অন্য একদিন আর একজন কারারক্ষী বলেই ফেলল, "স্যার আমরা তো মনে করি সাবেক কেবিনেট মন্ত্রী হিসাবে এখানে আপনাকেই বেশি গুরুত্বসহ মূল্যায়ন করা উচিত। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কেন যেন এমনটি করছে না।" আমি হঠাৎ করেই বলে ফেললাম, "দাঁড়িওয়ালা টুপিওয়ালাদেরকে ভিআইপি হিসাবে মেনে নিতে সবার না হলেও কারো কারো মনে বেশ কষ্ট লাগে। তারা নাকি প্রগতিশীল আদর্শের অনুসারী। আমাদেরকে হয়ত তারা ধর্মান্ধ মনে করেই এমনটি করে থাকবে।"

১৬/০৬/২০১২

গতকাল ছিল শনিবার আমার পরিবারের লোকদের সাথে সাক্ষাতের জন্যে সপ্তাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান দিন। অন্যান্য সময় আমি সময়ের আগেই তৈরি হয়ে অপেক্ষায় থাকি। কিন্তু গতকাল আর তা করিনি। সিদ্ধান্তক্রমেই তা করিনি। কারণ প্রতিবার দেখেছি, তৈরি হয়ে অনেকক্ষণ প্রতীক্ষার পরও গেটে গিয়ে দেখা যায়, আমার পরিবারের লোকেরা বাইরেই অপেক্ষায় আছে। গেট থেকে খবর নিয়ে যে আসে, তার আসতেও ৮/১০ মিঃ সময় কমপক্ষে লাগার কথা। খবর নিয়ে আসার পর আমার রুম থেকে গেটে যেতে ১০/১২ মিনিট এর কম লাগার কথা নয়। কারণ আমি হাঁটুর ও কোমরের ব্যথার কারণে জোরে হাঁটতে পারি না। বরং খুবই ধীরে সুস্থে হেঁটে যেতে হয়। তারপরও সাক্ষাতের রুমে আমাকে কমপক্ষে ১৫/২০ মিঃ অপেক্ষার পর আমার সাক্ষাৎ প্রার্থীদেরকে গেটের বাইরে থেকে সাক্ষাতের নির্দিষ্ট কামরায় আনা হয়। এ ব্যাপারে প্রতিবারই আমি আপত্তি জানাই, কিন্তু এখানে কার কথা কে শুনে। মানবাধিকার! এর এখানে কোন স্থানই নেই।

এবারে সাক্ষাতের খবর যখন আসে তখন আমি টয়লেটে ছিলাম। টয়লেট সেরে অজু করে, কাপড় চোপড় পরে তৈরি হতে অন্তত ১০/১৫ মিনিটের মত কিংবা তার চেয়েও বেশি সময় লাগার কথা। তারপর হেঁটে যেতেও অনুরূপ সময় লাগার কথা। ভাবছিলাম এবারে আমারই গেটে পৌঁছতে বিলম্ব হল। হয়তবা আমার পরিবারের লোকদেরকে সাক্ষাতের স্থলে অপেক্ষারত দেখতে পাব। কিন্তু না আমার ধারণা সঠিক প্রমাণিত হল না। আমি রুমে পৌঁছার ১০/১৫ মিঃ পরে তাদেরকে জেল গেটের বাইরে থেকে ভেতরে আনা হল। দাঁড়ি টুপির প্রতি এদের মনে কেন যেন একটা বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করা যায়। তেমনি মহিলাদের ক্ষেত্রে বোরকা পরিহিতা বা পর্দানশীল মহিলাদের ব্যাপারেও তাদের মনে একই নেতিবাচক ধারণা আছে বলে এদের আচর-আচরণ থেকে বুঝতে বাধ্য হয়েছি। আল্লাহ এদের মনে সীলমোহর দিয়ে দিয়েছেন। তাই কোন অনুরোধ তাদের কাছে কোন গুরুত্বই পায় না।

গতকালের সাক্ষাতে আমার মা-মনি মুহসিনা আসতে পারেনি। সে তার স্বামী এবং ছেলে মেয়েদেরসহ ওমরায় গিয়েছে। আমি দোয়া করি আল্লাহ যেন তাদের ওমরা কবুল করেন এবং ওমরাহ কালীন সময়ে তাদের সকল দোয়া আল্লাহ যেন কবুল করেন।

আমার দাম্পত্য জীবনের ৩৭ বছরে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাত অতিক্রম করে আজকের অবস্থানে পৌঁছতে হয়েছে। আমাদের দাম্পত্য জীবনের শুরুতে ছিল দারুণ অর্থনৈতিক কষ্টের সময়। তাছাড়া মাঝে মধ্যেই রাজনৈতিক প্রতিকূলতাও অতিক্রম করতে হয়েছে। এমতাবস্থায় আমার সাংগঠনিক জীবনে সবচেয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে আমার প্রিয়তমা জীবন সঙ্গীনি। এবারের জেল জীবনের প্রায় দুবছরের সময় পার হবার পথে কোন দিন দুর্বলতা দেখায়নি। বরং দারুণ আস্থার সাথে সাহস যুগিয়েছে। সম্প্রতি তার একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। পুস্তিকাটি পড়ে আমি দারুণভাবে উজ্জীবিত হয়েছি। আশা করি অন্যরাও উজ্জীবিত হবেন। কিন্তু কাল কেন যেন তাকেও একটু অন্যরকম মনে হল। ছেলেমেয়ে ও নাতি নাতনীদের নিয়ে নিজের সংসারকে আল্লাহর নেয়ামত ও সোনার সংসার হিসেবে

www.pathagar.com

উল্লেখ করে মনের আবেগ বলে ফেলল, এই সোনার সংসারে তুমি আমাদের মাঝে থেকেও নেই। কথাটা বলতে তার যে দারুণ কষ্ট হচ্ছিল, তার অশ্রুসজল চোখ দুটিই এর জীবন্ত সাক্ষী। তার চোখের পানি দেখে সাময়িকভাবে আমি নিজেও আবেগ আপ্লুত হই। ক্ষণিকের জন্যে আমার মনটাও যেন একটু দুর্বল হয়ে আসে বলে অনুভব করলাম।

আসলে এমনটি হওয়ার পেছনে হঠাৎ করে আমাদের প্রিয় ভাই মাওলানা সাঈদী সাহেবের বড় ছেলের মর্মান্তিক ইন্তেকালের ঘটনাও কাজ করেছে বলে মনে হল। আমি ১৪ জুন বেলা ১১-৩০ মিনিটের দিকে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে গাজীপুর জেলায় অবস্থিত কাশিমপুর- ২ কেন্দ্রীয় কারাগারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়ার কিছুক্ষণ পরই একজন পুলিশের কাছ থেকে খবরটি পাই। আমার নিজের জন্যেও খবরটি ছিল বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত, মনের উপর আচমকা আঘাতের মত। আমার নিকটতম সাথী জেলখানার ও দীর্ঘদিনের সাথী তিনি, যদিও এখন আর দেখা শোনার খুব একটা সুযোগ নেই। কিভাবে তাকে তার শোকাহত পরিবারের সদস্যদেরকে সমবেদনা জানাব, সান্ত্বনা জানাবো তার কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

আমার ঢাকা ফেরার পথে একই সময়ে চট্টগ্রাম জেল গেট থেকে আমার ভাতিজা মিঠু অন্য একটা গাড়ীতে করে আমাদের পিছে পিছে আসছিল। জরুরি প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য পুলিশের কাছে তার ফোন নাম্বার দিয়েছিল এবং সেও পুলিশের ফোন নাম্বার নিয়েছিল। সেই পুলিশের কাছে প্রথমে জানতে চায় সাঈদী সাহেবের বড় ছেলের ইন্তেকালের খবরটা আমি জেনেছি কিনা। এই সুযোগে আজ পুলিশের মাধ্যমে মিঠুকে মেসেজ পাঠাই, সে যেন তার চাচীমাকে সাঈদী সাহেবের বাসায় যেতে বলে, আর মোমেনকে জানাযায় উপস্থিত থেকে মাওলানা সাঈদী সাহেবকে, তার পরিবারকে আমার সালাম ও সমবেদনা জানায়। আমি তাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে ছবরের তৌফিক চেয়ে এবং তার ছেলের জন্যে সার্বক্ষণিক দোয়ায় নিয়োজিত আছি, এটাও যেন জানানোর ব্যবস্থা করে। একটু পরেই মিঠু উক্ত পুলিশের ফোনে জানাল, আমার বেগম সাহেবা সাঈদী সাহেবের বড় ছেলে রফিক বিন সাঈদীর ইন্তেকালের খবর শোনার সাথে সাথেই সাঈদী সাহেবের বাসায় যায় এবং রাত ১০টা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে। আমার ছেলে ব্যারিস্টার নাজিব মোমেন ওখানেই তাদের সাথে অবস্থান করছে। সাঈদী সাহেবের প্যারোলে মুক্তি পেতে দেরী হয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী স্টেশনে না থাকার কারণে। যাহোক তিনি বিকেল পাঁচটার দিকে মতিঝিল গভঃ হাইস্কুল মাঠে (যেখানে সাঈদী সাহেবের তাফসির মাহফিল অনুষ্ঠিত হত) পৌঁছে নিজের ছেলের জানাযায় ইমামতি করেন। পিতার জন্যে পুত্রের জানাযা পড়া কত যে কষ্টদায়ক তাতো ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ উপলব্ধি করতে পারে না।

যাহোক, আমি নিজে মাওলানা মুহতারামকে ও তার পরিবারের শোকসন্তপ্ত সদস্যদেরকে সরাসরি সববেদনা ও সান্ত্বনা জানানোর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেও আমার স্ত্রী এবং ছেলের মাধ্যমে আমার যথার্থ প্রতিনিধিত্ব হওয়ায় আমি আমার দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে একটু স্বস্তির সুবাতাস অনুভব করলাম।

মাওলানা সাঈদী সাহেবকে আল্লাহ আরো বেশি ধৈর্য ধরার তৌফিক যেন দান করেন, সেই সাথে দান করেন এর যথার্থ প্রতিদান ও পুরস্কার আল্লাহর কাছে। মন খুলে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এ দোয়া করছি। জেল জীবনে তার আদরের নাতনীর (বড় ছেলের বড় মেয়ের) বিয়েতে তিনি সশরীরে হাজির হতে পারেননি। আল্লাহর রহমতের ছায়া স্বরূপ তার আম্মাজান জেলখানায় তাকে দেখতে আসতেন, মাথায় হাত বুলায়ে দোয়া করতেন। তিনিও এই সময়ে ইন্তেকাল করেন। যাকে কেন্দ্র করে সাঈদী সাহেবের পরিবার এবং তার ভক্তকূলের ছিল অনেক অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা সেই বড় ছেলের এই মৃত্যুর শোক সহ্য করা সহজ ব্যাপার নয়। তাই বার বার এ জন্যে আল্লাহর সাহায্য কামনা করছি।

এবারের জেল জীবনের প্রথম দিনের প্রায় কাছাকাছি সময়ে মুহতারাম সাঈদী সাহেব ও আমি ডিবি অফিসে পৌঁছার একটু পরেই মুজাহিদ সাহেবও পৌঁছেন। মুজাহিদ সাহেবকে আলাদা রুমে রাখা হয়।

www.pathagar.com

আমাকে এবং সাঈদী সাহেবকে প্রথমে এক রুমে উঠালেও একটু পরেই আলাদা রুমে নেয়ার সিদ্ধান্ত জানায় ডিবি কর্তৃপক্ষ। আমরা একত্রে আসর ও মাগরিবের নামাজ আদায় করার সুযোগ চাওয়ায় সহজেই ডিবি কর্তৃপক্ষ রাজি হয়ে যায়। মাগরিবের পরপরই মনে করেছিলাম দুজনের কোন একজনকে অন্য কামরায় স্থানান্তর করবে। কিন্তু সেরকম কিছু মনে হল না। দুজন এশার নামাজও এক সাথে পড়লাম, ভাগাভাগি করে এক সাথেই রাতের খাবারও সেরে নিলাম। কিন্তু এ পর্যন্ত কাউকে অন্যত্র স্থানান্তরের জন্যে আর কোন কথাই শুনা যায়নি। তবে যে কামরায় প্রথমে আমাকে এবং একটু পরেই সাঈদী সাহেবকে নেয়া হয় সেখানে আরো ১৫/১৬ জন লোক পূর্ব থেকে অবস্থান করছিল। আমার জন্যে জানালার ধারে কম্বল বিছিয়ে বিছানা করে দেয়। আর জানালার বাইরে একটা স্ট্যান্ড ফ্যানের ব্যবস্থা করা হয়।

আমাকে এই কামরাতেই রেখে সাঈদী সাহেবকে যেহেতু অন্য কামরায় নেয়ার সিদ্ধান্ত ছিল, তাই এই কামরায় তার জন্যে আর কোন বিছানার ব্যবস্থা করা হয়নি। অবশেষে একটি কম্বল বিছিয়ে আর একটি কম্বলকে বালিশ বানিয়ে আমাদের দুজনকে একই বিছানায় রাত কাটাতে হয়।

আমার সাধারণত অন্য কারো সাথে এক বিছানায় শুলে ঘুম হয় না। তাছাড়া আলোর মধ্যে ঘুমাতে পারি না। আমি ডিম লাইটও ব্যবহার করতে অভ্যস্ত নই। এমনকি ছোট বেলা থেকে লক্ষ্য করছি জানালা দিয়ে চাঁদের আলো ঘরে ঢুকলে সে ঘরেও ঘুমাতে পারিনি। আর গ্রেফতারের প্রথম রাতটিতে শুতে হয় রুম ভর্তি মানুষের মধ্যে এক বিছানায়, বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি মুহতারাম মাওলানা সাঈদী সাহেবের সাথে। রুমে জ্বলেছে উচ্চ পাওয়ারের বাল্বের আলো। বাসা থেকে দিয়ে যাওয়া ওষুধগুলো ডিবির লোকেরা তাদের কাছে রেখে দেয়ায় ঘুমের ওষুধও খেতে পারিনি। পরে রাত ১টার দিকে ওষুধ চেয়ে নিয়ে খেতে হল।

কিন্তু ফজর পর্যন্ত তাতেও কোন কাজ হয়নি। অবশ্য বাইরের মসজিদে ফজরের আযান শোনার সাথে সাথে নামাজ পড়ে একটু ঘুমানোর প্রয়াস পাই। মুহতারাম সাঈদী সাহেব বললেন বাদ ফজর থেকে নাস্তা পর্যন্ত নাকি ঘুম বেশ ভালই হয়েছে। এরপরের ঘটনা অনেক আগেই বলে এসেছি। আজ আবার জেল জীবনের প্রথম দিকের কথা মনে পড়ে গেল সাঈদী সাহেবের বড় ছেলের মৃত্যুর মর্মান্তিক ঘটনার সময় সাঈদী সাহেবের পাশে থেকে তাকে সান্ত্বনা দিতে না পারার কারণে।

বন্দী জীবনের পরের দিন ডিবি অফিস থেকে আদালত হয়ে আমাদের তিনজনকে কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানোর পর কিছু দিনের মধ্যেই আমাদেরকে আবার ডিবি অফিসে নেয়া হয় রিমান্ডের জন্যে। প্রথমে মুজাহিদ সাহেব ও সাঈদী সাহেবকে কয়েক দিন পর আমাকেও নেয়া হয় ওখানে। ডিবি অফিসে কম্বলের বিছানায় একাধারে ১৭ দিন কাটানোর পর আদালত হয়ে কেন্দ্রীয় কারাগারে ফিরে আসার কিছু দিন পরেই আমার পিঠের ডান দিকে ঘাড় থেকে কোমর পর্যন্ত একটা নতুন রোগ দেখা যায় যার নাম ইতঃপূর্বে কোন দিনই শুনিনি। রোগটার নাম 'হারপিচ'। এতে নাকি দারুণ ব্যথা হয় এবং সারতে দুই থেকে তিন সপ্তাহ লেগে যায়। কথাটা আমাকে জানালেন কারা হাসপাতালের সহকারী সার্জন ড. শামসুদ্দিন সাহেব। ইতোমধ্যেই রমজানের রোজাও এসে যায়।

ঐ সময়ে আমার পিঠের ব্যথার সাথে বুকের ডান পাশেও ব্যথা হতে থাকে এবং ঐ রোগটা বুকের ডান পাশেও দেখা দেয়। ঐ প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে রোজা অবস্থায় আরো তিন দিন রিমান্ডে যেতে হয় ডিবি অফিসে। ডিবি অফিস থেকে ফিরে আসার পরও বেশ কিছু দিন 'হারপিচের' ব্যথায় ভুগতে হয়। সেই কঠিন মুহূর্তে জনাব সাঈদী সাহেব একান্ত আপন জন হিসেবে আপন ভাইয়ের মত, বরং তার চেয়েও বেশি আবেগ নিয়ে প্রতি দিন একাধিক বার আমার পিঠের অবস্থা দেখতেন এবং শেফার জন্যে দোয়া করতেন। আজ তার এই শোকার্ত মুহূর্তে আমি পাশে থেকে তাকে সান্ত্বনা দেয়ার সুযোগ পাচ্ছি না, এটা আমার জন্যে খুবই দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার। সাঈদী সাহেবও নিশ্চয়ই এই সময়ে আমাকে পাশে পেলে একটু

www.pathagar.com

বেশি স্বস্তি ও প্রশান্তি বোধ করতেন, আমার প্রতি তার বিশেষ আবেগজনিত ভালবাসার কারণে। আল্লাহর কাছে আরজ, "দূরে থেকেই আমার হৃদয়ের অনুভূতি আমার প্রিয় ভাইয়ের হৃদয়ে পৌঁছে দাও, তাকে এই কঠিন শোক ও কষ্ট সহ্য করার শক্তি দাও, তোমার পক্ষ থেকে বিশেষ কুদরতি ব্যবস্থায় মানুষের হৃদয়ের অনুভূতি মানুষের হৃদয় পর্যন্ত কেবল তুমিই পৌঁছাতে পার।

গতকাল বাদ মাগরিব শুনলাম মীর কাসেম আলীকে গ্রেফতার করেছে। এতদিন মনে হচ্ছিল তাকে বোধ হয় গ্রেফতার করা নাও হতে পারে। এখন মনে হচ্ছে জামায়াতের বা ইসলামী আন্দোলনের জন্যে ভবিষ্যতে ভূমিকা রাখতে পারে এমন কাউকেই ওরা বাইরে থাকতে দেবে না। মীর কাসেম আলীর বয়স আমার থেকে অনেক কম। ছবিতে তাকে লাঠি ভর করে দাঁড়ানো দেখে মনে হল, তারও কোমর ব্যথার দুরারোগ্য ব্যাধিতে পেয়ে বসছে। কামারুজ্জামান ও আব্দুল কাদের মোল্লার মত তারও ডিভিশন পাবার কথা। কিন্তু পাবে কিনা বলা যাচ্ছে না। আল্লাহ সবাইকে ছবর ও ইস্তেকামাতের তৌফিক দিন। সবার জন্যে ঈমানের পরীক্ষাকে সহজ করে দিন। আমি নালায়েক গোনাহগার আল্লাহর দরবারে সব সময়ের জন্যে এই দোয়াই অব্যাহতভাবে করে আসছি। আল্লাহ তার দ্বীন কায়েমের প্রতিষ্ঠান হিসাবে, দেশের সংগঠিত ইসলামী শক্তি হিসাবে টিকিয়ে রাখার জন্যে বরং আরো শক্তিশালী হিসাবে সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্যে বিশেষভাবে মদদ করুন, কুদরতিভাবে সাহায্য করুন (আমীন)।

এবারে চট্টগ্রাম আদালতে একজন আইনজীবী আমাকে আল-ইসলাম নামক একটি ইংরেজী মাসিক পত্রিকা, কোয়ান্টাম মেথড এর উপর একটি পুস্তিকা এবং তথাকথিত যুদ্ধাপরাধীর বিচার প্রসঙ্গে একটি পুস্তিকা ও এসংক্রান্ত সেক্রেটারী জেনারেলের প্রেস কনফারেন্সের বক্তব্য সম্বলিত অপর একটি পুস্তিকা দেন। শেষোক্ত পুস্তিকা দুটি আমাদের মামলার সাথে সংশ্লিষ্ট। আমি চট্টগ্রাম থেকে ফিরে কাশিমপুর- ২ এর জেল গেটে অত্যন্ত সরল বিশ্বাসে উপস্থিত ডেপুটি জেলারকে বললাম, আমি যাবার সময় "মহানবীর জীবন চরিত" নামক একটি বই এবং সেই সাথে একটি দোয়ার বই নিয়ে গিয়ে ছিলাম। তার সাথে চট্টগ্রামের একজন আইনজীবী আমাকে এই তিনটি পুস্তিকা ও একটি মাসিক ইংরেজী পত্রিকা দিয়েছে। এর মধ্য আমার মামলার সাথে সংশ্লিষ্ট পুস্তিকা দুটোই আমার প্রয়োজন। বাকী ইংরেজী মাসিক পত্রিকা ও কোয়ান্টাম মেথডের বুকলেট আমার না হলেও চলবে। কোয়ান্টাম মেথডের ব্যাপারে তো আমার কোন চাহিদা নেই। অতএব অন্তত আমার মামলা সংক্রান্ত পুস্তিকা দুটি যেন আমাকে দেয়া হয়। আমি ইচ্ছা করলে ঐ ছোট্ট দুটি পুস্তিকা লুকিয়েও আনতে পারতাম। কিন্তু জিন্দেগীতে এমন লুকোচুরির অভ্যাসে অভ্যস্ত হইনি। এখন বৃদ্ধ বয়সে জীবন সায়াহ্নে এসে এমনটি করার মত রুচি আমার নেই। কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ আমার সরলতার কোন মূল্যায়ন না করে আমার প্রয়োজনীয় দুটি পুস্তিকা দিতে অস্বীকার করে এবং যে দুটোর প্রয়োজন নেই বলে বলেছিলাম, সেই দুটোই আমার হাতে দেয়। আমি ও দুটো ভদ্র ভাষায় ফিরিয়ে দিয়ে আমার মামলা সংক্রান্ত পুস্তিকা দুটি দেবার জন্যে অনুরোধ করলাম। ডেপুটি জেলার আমাকে জেলারের সাথে কথা বলতে বললেন। আমি রুমে ফিরে এসে আমাদের এলাকার সুবেদার মামুনের মাধ্যমে 'জেলারের সাথে আমি কথা বলতে চাই' এই মর্মে সালামসহ একটা মেসেজ দেই। জেলার বাবু বেশ দ্রুতই সাড়া দিয়ে পরের দিনই বা ঐ দিনই দেখা করতে আমার রুমে আসলেন, আমি ডেপুটি জেলারের পরামর্শের আলোকে, সেফটি রেজর এবং আমার মামলা সংক্রান্ত পুস্তিকা দুটির ব্যাপারে কথা বললাম। তিনি 'রেজর' সুটকেসে তালাবদ্ধভাবে রাখার শর্তে দিতে রাজি হলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই পাঠিয়ে দিলেন। তবে পুস্তিকা দুটোর ব্যাপারে বললেন, উনি আগে দেখবেন তারপর জানাবেন। গতকাল বাদ মাগরিব তিনি এসে বললেন, পুস্তিকা দুটি যেহেতু আপনাদের দলীয় বক্তব্য এবং দলীয় প্রকাশনা পরিবেশিত, অতএব সুপার সাহেব বলেছেন এ দুটো দেয়া যাবে না। আমি বললাম, আমি জেলে এসেছি দলের জন্যে। দল আমার বা আমাদের পক্ষে বক্তব্য দেবে এটাতো স্বাভাবিক ব্যাপার। তাছাড়া পুস্তিকা দুটি সরাসরি ঐ মামলার সাথে সংশ্লিষ্ট যে মামলার কারণে আমাদের জেলে আসতে হয়েছে। কিন্তু

www.pathagar.com

এটা তাদের কাছে আদৌ বিবেচনার কোন বিষয় বলে মনে হল না। এই মুহূর্তে আল্লামা ইকবালের কবিতার একটি ক্ষুদ্র অংশ মনে পড়ে গেল। তার বাংলা অর্থ হল "যখন জালেমের নিয়ত বদলে যায়, তখন তার কাছে আর কোন যুক্তি প্রমাণই কাজে আসে না। সরকারের, ট্রাইব্যুনালের, প্রসিকিউশনের এবং জেল কর্তৃপক্ষের আচরণে বারবারই কবির এই পর্যাবেক্ষণের বাস্তবতা আমরা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করছি। ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে, ট্রাইব্যুনালের পক্ষ থেকে, আমরা যা জীবনে কখনও বলিনি বা করিনি, অবলীলাক্রমে তা আমাদের নামে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। কিন্তু আমরা যা করেছি তা বলতে দেয়া হচ্ছে না। তাহলে সেখানে ন্যায়বিচার পাওয়া যাবে কিভাবে? আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে একতরফা মিথ্যা অভিযোগ, নির্জলা মিথ্যা অভিযোগ, আমাদের উপর গোয়েবলসীয় কায়দায় চাপিয়ে দিয়ে ইতিহাসের জঘন্যতম মিথ্যাচারে যারা লিপ্ত, তাদের কাছ থেকে ন্যায়বিচার তো দূরের কথা ন্যূনতম মানবিক আচরণও কি আশা করা যায়?

চট্টগ্রামে যাওয়া-আসার বিড়ম্বনা- ০৬

চট্টগ্রাম কোর্টে ১০ জুলাই ২০১২ তারিখে হাজিরা দিতে যাই। সাক্ষী পুলিশের একজন সাবেক ডিআইজি। তিনি কোর্টে হাজির হননি। অপর একজনের সাক্ষী নিতে চাইলে আসামী পক্ষের আইনজীবীরা আপত্তি করায় কোর্ট মুলতবি করা হয় এবং পরবর্তী তারিখ দেয়া হয় ২৯, ৩০ ও ৩১ জুলাই । আমাকে ১১ জুলাই সকাল ১০টায় চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কাশিমপুর- ২ এর উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সকাল ১০টায় রওয়ানা করে ৫-৩০ থেকে ৫-৪৫ মিঃ এর মধ্যে (বিকেল) গন্তব্যে পৌঁছি। কিন্তু বিনা কারণে জেল গেটে প্রায় ৪৫ মিঃ অপেক্ষা করে তারপর রুমের যাবার সুযোগ পাই। এখানে আমাদের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের দারুণ অভাব। তাই ব্যাগ ব্যাগেজের প্রতিটি আইটেম তন্ন তন্ন করে গেট খুলে দিলে রুমের দিকে রওয়ানা করার সুযোগ পাওয়া যায়। ব্যাগ ব্যাগেজগুলো বহন করার মত প্রয়োজনীয় লোক খুঁজে পেতেও যথেষ্ট সময় লাগে। কারারক্ষীরাও কোন কোন সময় ব্যাগ ব্যাগেজ বহন করে থাকে। তবে তাদের ভীষণ আফসোস তারা নাকি এর বিনিময়ে কিছুই পায় না। একজন কারারক্ষী একদিন ক্ষোভের সাথে বলল, 'এ পর্যন্ত যত ভিআইপির মালামাল টানলাম, বাইরে থেকে মুটেগিরি করলে দিনে অন্তত ৫০০ টাকা কামাই করতে পারতাম'। তার কথাটা বেশ ইঙ্গিত বহ। তারা এর বিনিময়ে কিছু পেতে চায়। আমরা বন্দীরা তো নিজের কাছে নগদ রাখতে পারি না। অতএব তাদের মনের এই চাহিদা পূরণ করার তো কোন উপায় নেই। আমার সাথে অনেক কারারক্ষী বেশ ভাল ব্যবহার করে, তাদেরকে তাদের খাবার জন্যে কমলা বা বিস্কুট দিলে অনেকেই কিছু নিতে চায় না। এভাবে ভালমন্দ মানুষ প্রায় সব ক্ষেত্রেই আছে। যাক অবশেষে ১১ জুলাই মাগরিবের সময় আমি রুমে পৌঁছে ইস্তিঞ্জা ও অজু সেরে মাগরিবের নামাজ আদায় করে একটু হালকা নাশতা ও চায়ে শরীক হলাম কারাগারের অপর তিন জন রক্ষীর সাথে।

১২ ও ১৩ জুলাই দুই দিন গেল পারিবারিক সাক্ষাতের প্রতীক্ষায়। এবার মোমেন ১০ জুলাই চট্টগ্রাম না গিয়ে ১১ জুলাই যেতে চেয়েছিল। কিন্তু ১০ জুলাইয়েই কোর্টের পরবর্তী তারিখ ২৯ জুলাই ঘোষণা করায় তাকে আর চট্টগ্রাম যেতে হয়নি। ১৪ জুলাই শনিবারে পরিবারের সদস্য আমার স্ত্রী এবং ছেলে মোমেনের সাথে শুধু মফিজ এসেছিল। মহসীনা তার বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস থাকার কারণে আসতে পারেনি। সাক্ষাতের সময় জানলাম ১৫ জুলাই আমাকে কোর্টে পাঠাবে। জেল কর্তৃপক্ষকে কিছু জানানো হয়নি। বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করে জানা গেল কোর্ট হবে ১৬ জুলাই সোমবারে। ঐ দিন আবার মোমেনের পাবনায় যাবার কথা। আমার মনে হচ্ছিল ঐ দিন কোর্টে তার সাথে দেখা নাও হতে পারে। কিন্তু সে পাবনা যাওয়ার

www.pathagar.com

পথেই কোর্টে আমার সাথে দেখা করে যায়। ঐ দিনই রাতে পাবনা থেকে ফিরে আসার কথা। আমার বেগম সাহেবাও জমিজমা সংক্রান্ত ব্যাপারে ঝিনেদা যাওয়ার কথা বলেছিল। গিয়েছিল কিনা এখনও এ সম্পর্কে কিছু জানার সুযোগ হয়নি। আগামীকাল ১৯ জুলাই বারডেমে আমার দাঁতের চিকিৎসার জন্যে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আজ বিকেলে নিশ্চিত হওয়া যাবে। ওখানে চিকিৎসা যেহেতু নিজ খরচে, তাই পরিবারের সদস্যদের কারো না কারো উপস্থিতি জরুরি। তাই বারডেমে যেতে হলে সে খবরটাও পরিবারের সদস্যদেরকে জানাতে হবে। আজ বিকেলে নিশ্চিত হয়ে তাদেরকে কিভাবে জানানো যাবে তাই ভাবছি। জেল কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা করলে এটা কোন সমস্যাই নয়। কিন্তু সব সময় তাদের মনোভাব এক রকম থাকে না বিধায় কখনও সহযোগিতা পাওয়া যায় আবার কখনও পাওয়া যায় না। অবশ্য আমি ইতিবাচক ভূমিকাই আশা করছি। গতকাল ১০ জুলাই বিকেল ৪টার দিকে আসরের নামাজের আগে একটু কোরআন তেলাওয়াত করছিলাম। এমন সময় আমাদের এখনকার দুজন সেবক যুবরাজ ও দুলাল এসে রুমে ঢুকেই বললেন আপনার একটা সুসংবাদ আছে। আমি প্রথমে বুঝে উঠতে পারিনি ওরা কি বলছে। এরপর একজন বলল নাতনী হয়েছে, ওরা বলল আমার ছেলে নাকি ডেপুটি জেলার মোসাদ্দেককে জানিয়েছে। সুবেদার আসার আগেই আমরা শোনার সাথে সাথে আপনাকে খবরটা জানাতে এসেছি। সুবেদারও একটু পরেই হয়ত এসে যাবে। ওরা আমার রুম থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই সুবেদার মামুন সাহেব এসে বললেন একটা সুসংবাদ আছে, আর তা হলো আপনার নাতি হয়েছে। আরো একটা দুঃসংবাদ আছে, আর তা হলো আপনার কালকে বারডেমে যাওয়া হচ্ছে না, পুলিশের স্কোয়াড পাওয়া যাচ্ছে না। আমি সাথে সাথে বলেছিলাম এটা কোন দুঃসংবাদ নয়, আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যেই করেন। আমি আর রমজানের আগে বা রমজানের মধ্যে কোন চিকিৎসা নিতে চাই না। আল্লাহর কাছে নিজেকে সোপর্দ করেছি, তিনি আমার জন্যে যা পছন্দ করেন, তাই আমার জন্যে কল্যাণকর হবে।

মোমেনের স্ত্রীর প্রথমবার সন্তান হওয়ার সময়ের আগে সন্তান নষ্ট হয়ে যায়। মাঝখানে অনেক সময়ের ব্যবধানে এই তাদের প্রথম সন্তান হল। মোমেন বৌমার কাছে তার সন্তান প্রসবের সম্ভাব্য তারিখের আগেই যেতে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আমার স্ত্রীও যেতে বলেছিল। কিন্তু মাঝখানে ছোট ছেলেকে দেখার জন্যে মহসীনাদের সাথে মালয়েশিয়া যাওয়ার কারণে লন্ডনে যাওয়ার প্রোগ্রাম পরিবর্তন করেছে। মোমেনের ২/৩ দিনের মধ্যেই যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ট্রাইব্যুনালে সাক্ষী চলাকালে সে বাইরে থাকবে এটাও যেমন তার জন্যে কষ্টের, তেমনি সন্তান ভূমিষ্ট হবার মুহূর্তে স্ত্রীর সাহচর্যে থাকাটাও তার জন্যে জরুরি। তাছাড়া মোমেনের সুপ্রিম কোর্টে প্রাকটিসের জন্যে পরীক্ষাও দিতে হবে এই মাসেই। তাই জুলাই মাসটা তার জন্যে বেশ একটা ঝামেলাপূর্ণ। আল্লাহ হয়ত তার জন্যে একটা সুরাহা করে দেবেন।

বৌমার প্রথম বারে সমস্যা হওয়ায় আমরা কিছুটা দুশ্চিন্তায় ছিলাম। কোন সমস্যা ছাড়া সন্তান ভূমিষ্ট হবার কথা শুনে আল্লাহর দরবারে লাখো শুকরিয়া জানালাম। যারা খবর নিয়ে এল তাদেরকে আমার কাছে থাকা আম্বর আতর লাগিয়ে দিয়ে আমার নাতির জন্যে দোয়া চাইলাম।

এই দিনে সবাই বাইরে থাকায় জোহর আদায় করেছি যুবরাজকে সাথে করে আমার রুমেই। আসরের সময় সাথে ছিল দুলাল, হাতেম ও যুবরাজ। মাগরিবের সময় কামারুজ্জামান, আঃ কাদের মোল্লা ও মামুনকে পেয়ে তাদের হাতে আতর লাগিয়ে দিয়ে আমার নাতি হবার শুভ সংবাদটি জানালাম। এই শুভ সংবাদের খুশির বিনিময় পরিবারের সদস্যদের সাথে হবে পহেলা রমজান শনিবারে সাপ্তাহিক সাক্ষাতের মুহূর্তে।

আমাদের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা ছিল মোমেন আগেই ওখানে গিয়ে তার স্ত্রীর পাশে থাকবে। তাতো হয়ে উঠল না। বাচ্চা প্রসবের সম্ভাব্য তারিখ যেটা ডাক্তার জানিয়েছিল তার আগেই আল্লাহর সিদ্ধান্তে আল্লাহর বান্দা দুনিয়ায় এসে গেছে। এটা মোমেনের প্রথম সন্তান, সন্তানকে দেখার জন্যে মনে একটা পিতৃসুলভ

www.pathagar.com

আবেগ থাকাটাই স্বাভাবিক। তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লন্ডনে যেতে হবে। মামলা দেখার জন্যে সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট আইনজীবী ভাইয়েরা আছেন। তাছাড়া এ ব্যাপারে একমাত্র ভরসা তো করছি আল্লাহর উপরই। ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করা আসলেই সম্ভব নয়। তবে আল্লাহ এত মিথ্যাকে বরদাশত করবেন, এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, আসলে আদৌ বিশ্বাস করি না। আল্লাহ তার কুদরতি ব্যবস্থায় একটা পথ অবশ্যই বের করবেন। আল্লাহর উপর এভাবে তাওয়াক্কুল করেই চরম দুঃসময়েও হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ করি। দুশ্চিন্তা মুক্ত মনে, প্রশান্ত চিত্তে যেন আল্লাহ আমাদের জেল জীবনের সমাপ্তি ঘটানোর ব্যবস্থা করেন সম্মানজনকভাবে। নিজেও আল্লাহর কাছে এজন্যে দোয়া করি। যাদের সাথে দেখা হয়, তাদের কাছেও এ জন্যে দোয়া কামনা করি। কোরআন তেলাওয়াতের সময় বর্তমান অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ বার্তাগুলোর মর্ম হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি। বর্তমান পরিস্থিতির সাথে সংগতিপূর্ণ বার্তাগুলো বুকে ধারণ করে যথেষ্ট শান্তি ও স্বস্তি ফিরে পাই। গতকাল ছিল আমার পরিবারের সাথে সাক্ষাতের নির্দিষ্ট তারিখ। প্রতিবারের মত এবারেও এজন্যে প্রতীক্ষা করতে হয় অনেকক্ষণ। এরপর দেখার স্লিপ আসার সাথে সাথেই রওয়ানা দেই। জেল গেটের নির্দিষ্ট স্থানে সাক্ষাৎ প্রার্থীদের সাথে আধ ঘন্টার সংক্ষিপ্ত আলাপ হয়। ঘটনাক্রমে কাল ছিল ১ রমজান। বাসা থেকে নিয়ে আসে আমার জন্যে প্রয়োজনীয় কিছু খাদ্যসামগ্রী যার অধিকাংশই ফল ফলাদি। এর মধ্যে আমার পেটের সমস্যা ও ডায়বেটিসের দিকে খেয়াল রেখে কিছু খাদ্যসামগ্রী পাঠানো হয়। এরমধ্যে এক প্যাকেট কোয়েকার ছিল। প্যাকেটটা গেট সার্জেন্ট খুলে ফেলে, এর পর এটা জেলারের অনুমতির জন্যে পাঠানো হয়। আমার ছেলে মোমেন নিজে জেলারের সাথে কথাও বলে। জেলার সুপারের অনুমতি নিয়ে দিয়ে দেবেন বলে কথা দেন। কিন্তু কাল সারা দিন কোন খবর পাওয়া যায়নি। আজ ২২/৭/১২ তে ট্রাইব্যুনালে হাজিরা ছিল। সরকার পক্ষ ট্রাইব্যুনালে সাক্ষীর নাম তালিকা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা দিতে ব্যর্থ হয়। তারা কোন সাক্ষীও হাজির করতে পারেনি। তাই আগামী ৫ আগস্ট তারিখ ধার্য করে আমাকে কাশিমপুর- ২ এ পাঠিয়ে দেয়া হল। গেটে এসে আমার কালকের রেখে যাওয়া, একটি প্যাকেট অর্থাৎ কোয়েকার ঔটস সম্পর্কে জানতে চাইলাম। ডেপুটি জেলার মুশফিক সাহেব আগামী কাল দেবার কথা দিয়ে একটা দিন কষ্ট করতে বললেন। আমি রুমের দিকে রওয়ানা দেয়ার পরপরই ওটা পাঠিয়ে দেয়া হল একজন কারারক্ষীর মাধ্যমে। রুমে নিয়ে এসে দেখি প্যাকেটের মধ্যে সর্বনিম্নস্তরে ছোট ছোট ১০টি প্যাকেট সুন্দর ভাবে সাজানো আছে কিন্তু তার উপরের সারিতে আছে মাত্র ঐ ছোট ছোট প্যাকেটের মত মাত্র দুটি প্যাকেট। আমার সেবক সাথে সাথেই বলে ফেলল, নীচে যেভাবে দশটা প্যাকেট সাজানো আছে উপরেও তো এভাবেই ১০টা প্যাকেট সাজানো থাকার কথা। মাত্র দুটো প্যাকেট কেন? সে এটাও বলল নিশ্চয়ই ৮টি প্যাকেট এখান থেকে রেখে দেয়া হয়েছে। বিষয়টি দেখে অবাক হলাম। জেলারের রুমে জেলার নিজে রেখে দেন সুপারের অনুমতির জন্যে। সেখান থেকে ঐ প্যাকেটের আটটা প্যাকেট গায়েব হওয়া দুঃখজনক এবং জেল কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতার পরিচয় বহন করার জন্যে যথেষ্ট। জিনিস যতই তুচ্ছ হোক, এটা জেলার স্বেচ্ছায় আমানত হিসাবে রেখে দেন। সুপারের অনুমতির পর নিজ দায়িত্বে যেখানে পাঠিয়ে দেয়াই ছিল তার কর্তব্য, সেখানে জিনিসটার প্রায় অর্ধেকই গায়েব হয়ে গেল কী করে? এটাই একমাত্র ঘটনা নয়। এখানকার গেটের অসংখ্য অসদাচরণের ঘটনা দেখার সুযোগ হয়েছে যা এদের কর্তব্যনিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধের মূল্যায়ন করার জন্যে যথেষ্ট। বোধ হয় তারা ভেবে নিয়েছে এরা নিরীহ ভদ্রলোক, এগুলো নিয়ে কিছুই হয়ত বলবে না।

একদিন একজন কারারক্ষী আমাকে বলেছিল, স্যার, অন্যান্য ভিআইপিদেরকে ওরা এক চোখে দেখে আর আপনাকে দেখে ভিন্ন চোখে। আমার জানা মতে আপনার সাথে তাদের ব্যবহার ভিআইপিদের সাথে ব্যবহারের মত মনে হয় না। অন্যদিন আর একজন কারারক্ষী বলল, স্যার, এ জেলখানায় যদি একজনকে ভিআইপি হিসাবে গণ্য করা হয় তাহলেও তো আপনাকেই গণ্য করতে হয়। এরপরও প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গি

www.pathagar.com

যেন কেমন মনে হয়। আমাকে বন্দী করা হয়েছে, রাজনৈতিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে। মামলার সবটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এখানে শুধু আইনী লড়াই যথেষ্ট নয়। রাজনৈতিক ভাবেও এর মোকাবিলা করতে হবে। আমাকে ১৫ জুলাইয়ে হাজির হতে বলা হয়েছে সাক্ষীগ্রহণের সূচনা বক্তব্যের জন্যে। এর আগে ৮ জুলাইও একই উদ্দেশ্যে তারিখ দেয়া হয়। আমি উপস্থিত হলেও আমাকে ট্রাইব্যুনালে তোলা হয়নি। পরের দিন ৯ জুলাই যেতে বলা হয়। আমাকে ১০ জুলাই চট্টগ্রাম কোর্টে যেতে হবে বিধায় ৯ তারিখে হাজির হওয়া সম্ভব নয় আদালতে এটা জানানোর পর আমাকে উপস্থিত হওয়া থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। এ নিয়ে আমাদের আইনজীবীদের মধ্যে একটু মতপার্থক্যও হয়। যাহোক আমি ৯ জুলাই চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি ১০ জুলাইয়ে কোর্ট হাজিরার জন্যে। পরে শুনলাম সূচনা বক্তব্য ১৫ জুলাই ধার্য করা হয়েছে।

চট্টগ্রামে সাধারণত পরপর দুই বা তিন দিন একাধারে কোর্ট চলে। কিন্তু যে সাক্ষীর জেরা চলছিল তার অনুপস্থিতির কারণে কোর্ট মুলতবি হয়ে যায়। আমি ১১ জুলাইয়ে কাশিমপুর- ২ এ চলে আসি। ১৪ জুলাই পারিবারিক সাক্ষাতের দিন একজন ডেপুটি জেলার বললেন, ১৫ তারিখে কোর্টের কোন ইনফরমেশন তাদের কাছে নেই। বিকেল নাগাদ আসলে আসতে পারে। কিন্তু বিকেলেও কোন খবর না আসায় ১৫ তারিখে ট্রাইব্যুনালে যেতে হয়নি। এর পরিবর্তে ১৬ জুলাই কোর্টে যেতে হল। ঐ দিন সাক্ষ্য গ্রহণে দীর্ঘ সূচনা বক্তব্য শেষে মাত্র ৫ দিন পরে সাক্ষী গ্রহণের তারিখ ঘোষণা করা হল। ইতঃপূর্বে এ ব্যাপারে দুই সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহ সময়ের ব্যবধানে, কারো জন্যে ১০ দিনের ব্যবধানে সাক্ষী গ্রহণের দিন দেয়া হয়।

এবার ২১ জুলাইয়ে পারিবারিক সাক্ষাতের সময় জানা গেল, সরকার পক্ষ তাদের সাক্ষীর তালিকা এখনও জমা দিতে পারেনি। কোন সাক্ষী হাজির করতেও পারছে না। অতএব ২২ তারিখে আবার কয়েকদিনের জন্যে সাক্ষী গ্রহণ মূলতবি হতে পারে, বাস্তব হলোও তাই। কোন সাক্ষী হাজির না হওয়ায় সাক্ষ্য গ্রহণের তারিখ ঘোষণা করা হল ৫ আগস্ট আর এটা করতে হয়েছে সরকার পক্ষে সাক্ষীর তালিকা পেশ ও সাক্ষী হাজির করতে ব্যর্থ হবার কারণে। এবারে আমাদের আইনজীবীদের কোন আবেদন ছাড়াই তারিখ পিছিয়ে দেয়া হয়। অথচ প্রচার করা হল ডিফেন্সের আবেদনের প্রেক্ষিতে নাকি তারিখ পিছানো হয়েছে, যা একান্তই অসত্য। আদালতই যদি এভাবে অসত্য ও মিথ্যাচারের আশ্রয় নেয়, তাহলে ন্যায়বিচারের কোন আশা করা যায় কি? তবে আমাদের আফসোস, আমাদের পক্ষ থেকে এই কথা বলার সুযোগ কেন নেয়া হল না যে, সরকার পক্ষের সাক্ষী হাজির করতে ব্যর্থ হওয়া ও সাক্ষীর তালিকা জমা দিতে ব্যর্থতার কারণেই ২২ তারিখের পরিবর্তে ৫ আগস্ট দিন ধার্য করা হয়েছে। পত্রিকায় এই তথ্যটি প্রচার হওয়া খুবই দরকার ছিল। রাজনৈতিক দৃষ্টিতে এমনটি করা খুবই জরুরি ছিল। কিন্তু আমাদের আইনজীবী অথবা সংগঠনের কেউ এটা অনুধাবন কেন করতে পারলেন না, আমার বুঝে আসলো না।

মেঝ ছেলে তার প্রথম সন্তানকে দেখার জন্যে গতকালই লন্ডন চলে গেছে, আসবে আগামী মাসের (আগস্ট) ১০ তারিখে। আমার সাক্ষী গ্রহণ ও সাক্ষীর জেরা শুরু হবে ৫ আগস্ট থেকে। যদিও তার অনুপস্থিতিতে কোন কাজেই তেমন কোন অসুবিধা হবার কথা নয়, তবুও নিজের একটা মাত্র ছেলে ২ বছর যাবত আমার খোঁজ খবর নিয়ে আসছে। তার অনুপস্থিতিতে আমার স্ত্রীও একেবারে একা হয়ে পড়ল। আমি তাকে কাছে পেলে যে প্রশান্তি অনুভব করতাম, কিছু দিন পর্যন্ত তা থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে। তবে তার কাছ থেকে শুনেছিলাম, ইনশাআল্লাহ পাবনা থেকে কোন সাক্ষী আসবে না। আপাতত তা সত্যই মনে হচ্ছে। তদন্ত কমিটি কিছু দিন আগে প্রস্তাবিত সাক্ষীদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ ও কথাবার্তা বলার চেষ্টা করে সুবিধা করতে পারেনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার একান্ত নিকটের এলাকার লোকদের বাড়ী বাড়ী গিয়েও সুবিধা করতে পারেনি। সরকারী আইনজীবী সময়মত সাক্ষীর তালিকা দিতে ব্যর্থ হওয়া ও সাক্ষী হাজির করতে না পারায় মনে বেশ কিছুটা প্রশান্তি পাচ্ছি। আল্লাহ তার কুদরতি ব্যবস্থায় ওদের সকল

www.pathagar.com

ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেবেন, এ বিশ্বাস আগেই করতাম, এখন তার কিছু কিছু আদালতে প্রকাশ পাওয়া শুরু করেছে। আল্লাহ তার মজলুম বান্দাদের ফরিয়াদ কবুল করবেন, মজলুমদের পক্ষে তার অসংখ্য বান্দা গ্রামে গঞ্জে দেশে বিদেশে প্রাণ উজাড় করে দোয়া করছে, সে দোয়া আল্লাহ অবশ্যই কবুল করবেন। এই বিশ্বাসকে সম্বল করে নিশ্চিন্তে সময় কাটাচ্ছি। আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা ও কুদরতি ব্যবস্থার প্রতি অধীর আগ্রহে চেয়ে আছি। আল্লাহ অবশ্যই মজলুমদের ফরিয়াদ কবুল করবেন।

গত তারিখে চট্টগ্রামে হাজিরা দিতে গিয়ে চট্টগ্রাম মহানগরী আমীর শামসুল ইসলাম এমপির সাথে কারাগারেই কথা হয়। তার কাছে শুনলাম গ্রাম পর্যায়ের কর্মী সমর্থক শুভাকাঙ্ক্ষীরা যে কত কাতর কণ্ঠে প্রাণ উজাড় করে আমাদের জন্যে দোয়া করছেন, তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এত মানুষের অন্তরের কান্না হৃদয়ের ফরিয়াদ আল্লাহ অবশ্যই শুনবেন, যদি তিনি চান। আল্লাহ সীমাহীন ধৈর্যশীল। তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের পরীক্ষা কতটা করবেন, এটা তাঁরই একক এখতিয়ার। তেমনিভাবে তাঁর প্রিয় বান্দাদের প্রতিপক্ষকে কতটা সময় দেবেন, তাদের জন্যে রশি কতটা ঢিলা করবেন, এটা তাঁরই একক সিদ্ধান্তের ব্যাপার। তবে, আল্লাহ অভয় দিয়ে বলেছেন, আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের ব্যাপারে অনেক বেশি ওয়াকেফহাল আছেন। আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক হিসাবে যথেষ্ট, আল্লাহই তোমাদের সাহায্যকারী হিসাবে যথেষ্ট (সূরা নিসা)। আল্লাহর পক্ষ থেকে এই অভয় বাণী শোনার পর কোন ঈমানদারের মনে কোন রূপ দ্বিধা সংশয় বা হতাশা নিরাশার স্থান থাকতে পারে না।

আমার মেঝ ছেলে মোমেন তার প্রথম সন্তানকে দেখার জন্যে গত পরশু লন্ডন যাওয়ার কথা ছিল। যেতে পারছে কিনা জানার সুযোগ হয়নি। তবে আশা করি সে যেতে পেরেছে এবং আল্লাহর রহমতে ভালভাবেই পৌঁছে গিয়ে থাকবে। আমার সামনের সপ্তাহের সাক্ষাতের দিনই চট্টগ্রাম রওয়ানা করতে হবে। পরিবারের লোকেরা যদি বুদ্ধি করে একটু সকালে আসে, তাহলে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করেই আমি চট্টগ্রাম রওয়ানা করতে পারব। ঠিক মত এই খবরটা পৌঁছানো খুব সহজ নয়। মোমেন থাকলে কোর্টে আমাদের অন্যান্য ভাইদের কাছ থেকে সহজেই খবরটা জানতে পারত। গতকাল বৃহস্পতিবারে জেলারকে আসার জন্যে সুবেদারের মাধ্যমে খবর দিয়েছিলাম, তিনি এসেছিলেন। তাকে বললাম, ২৮ জুলাই শনিবারে আমাকে চট্টগ্রাম যেতে হবে। আবার ঐ দিনই আমার পারিবারিক সাক্ষাৎ আছে। আমি যেন পরিবারের লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করেই চট্টগ্রাম রওয়ানা করতে পারি এমন ব্যবস্থা করলে আমার জন্যে ভাল হবে। এজন্যে পুলিশের স্কোয়াড যেন বেশি সকালে না এসে সকাল ১০টার দিকে আসে, আর আমার পরিবারের লোকদেরকেও সকাল ৯টার মধ্যে আসতে বলতে হবে। সেই সাথে আমার একটা জরুরি ওষুধ আনার জন্যেও বলতে হবে। জেলার বাবু তাৎক্ষণিকভাবে সুবেদারকে আমার পরিবারের ফোন নম্বর ও ওষুধের নামটা লিখে নিয়ে জানিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আমি আশা করছি চট্টগ্রাম যাবার আগে তাদের সাথে ইনশাআল্লাহ সাক্ষাৎ হবে।

গত ২৮ জুলাই সকালে ৯টার দিকে আমাকে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে যাবার প্রস্তুতি নিয়ে থাকতে বলা হল। ৯-৩০টাতে একজন কারারক্ষী এসে খবর দিল। পরিবারের লোকেরা দেখা করার জন্যে এসেও উপস্থিত। এ দিকে চট্টগ্রামে যাবার জন্যে গাড়ী এবং পুলিশের স্কোয়াডও এসে গেছে। আমি ৯টার দিক থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষায় ছিলাম। ১০/১২ মিনিটের মধ্যে জেল গেটে পৌঁছে গেলাম। এবার সাক্ষাতে আমার ছেলে মোমেন আসেনি। কারণ সে তার প্রথম সন্তান ছেলেকে দেখার জন্যে লন্ডন গিয়েছে। এবারে সে চট্টগ্রামও যেতে পারবে না। আমি একটু সংক্ষিপ্তভাবে সাক্ষাৎ সেরে চট্টগ্রাম রওয়ানার চিন্তা করছিলাম। কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ সময় শেষের কোন সংকেত দেয়নি। আমরা নিজেরাই জেল কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলাম আমার কথা শেষ করেছি। এবার চট্টগ্রামের জন্যে রওয়ানা করা যেতে পারে। পরিবারের সদস্য অর্থাৎ আমার স্ত্রী ও বড় মেয়ে দুজনেই এবার আমার সাথে সাথে জেল গেট পার হয়ে গাড়ীর কাছে

www.pathagar.com

এসে পৌঁছল। তারা দুজনে আমাকে বিদায় দিল। আমিও তাদের থেকে বিদায় নিয়ে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম।

এ যাত্রায় রমজান মাস হওয়ার কারণে দুপুরের খাবারের কোন প্রয়োজন নেই। তবে এস্তেনজা অজু ও নামাজের জন্যে আমার পছন্দের একটা সিএনজি ফিলিং স্টেশনে সময় মত থামতে বলায় পুলিশের পক্ষ থেকে এবার আর তেমন কোন আপত্তি উঠেনি। আমরা জোহরের নামাজের সময় কুমিল্লা শহর পার হয়ে এডভান্স সিএনজি ফিলিং স্টেশনে কিছুক্ষণের জন্যে যাত্রা বিরতি করি। এখানে নামাজ আদায় শেষে আবার চট্টগ্রামের পথে রওয়ানা দেই। রওয়ানার সময় ভায়েরা আমার জন্যে এবং পুলিশের জন্যে (ড্রাইভার সহ) ইফতারের প্যাকেট দিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে। অবশ্য আমরা ইফতারের প্রায় একঘণ্টা আগেই চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছে যাই। আমাকে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছে দিয়ে তাদের অনুষ্ঠানিকতা শেষ করে পুলিশের স্কোয়াড বিদায় নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল। ঢাকার পথে কিছুদূর এগিয়ে গিয়েই তারা ইফতার করতে পারবে। রাতের খাবারও খেয়ে নিতে পারবে।

আমি চট্টগ্রাম জেল গেটের আনুষ্ঠানিকতা শেষে আমার নির্দিষ্ট রুমে পৌঁছে এস্তেঞ্জা অজু সেরে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ইফতার করলাম। সাথে আনা প্যাকেট ছাড়াও এখানকার তৈরি কিছু ইফতার সামগ্রী আমার জন্যে ব্যবস্থা করা হয়। আমি সেহরীতে দুধ খাওয়া এবং তারাবির আগে চা খাওয়ায় অভ্যস্থ। কিন্তু রুমে ফ্লাস্ক না থাকায় গরম পানির অভাবে দুধ ও চা বানানো যায় না। সমস্যাটা চট্টগ্রামের আমাদের এক ভাই আব্দুর রহীম সাহেবকে জানাতে বলেছিলাম। মিঠু সাথে সাথেই তাকে এটা জানিয়ে দেবার কারণে আমি চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছার আগেই গরম পানি ভর্তি একটি সুন্দর এবং বেশ বড় সাইজের ফ্লাস্ক আমার রুমে পৌঁছানো হয়। ফলে চা ও দুধ বানাতে আর কোন সমস্যা হয়নি।

এবার চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে আমাকে অবস্থান করতে হয় চার রাত এবং তিন দিন। ৩১ জুলাই পর্যন্ত তিন দিন কোর্ট চলার পর ১ আগস্ট, '১২, সকাল ৯ টা ৩০ মিঃ চট্টগ্রাম থেকে কাশিমপুর- ২ কেন্দ্রীয় কারাগারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই থানায় একটু যাত্রা বিরতি করে এস্তেঞ্জা সেরে নিলাম। জোহরের নামাজের জন্যে আমার পছন্দের সিএনজি ফিলিং স্টেশনে যাত্রা বিরতির কথা বলায় পুলিশের স্কোয়াড লীডার একটু মৃদু আপত্তি জানিয়ে মিডিয়া সম্পর্কিত ভয়ের কথা উল্লেখ করে। তাদের সাথে থাকা এসবিএর লোকটা তাকে বুঝিয়ে বলল, উনি যেখানে নামাজ পাড়ার কথা বলেছেন ওটা খুবই নিরাপদ ও নিরিবিলি। তাছাড়া নামাজ পড়ার সুযোগতো দিতেই হবে।

আমরা ঠিক জোহরের সময় কুমিল্লার ঐ নির্দিষ্ট সিএনজি স্টেশনে পৌঁছে যথারীতি নামাজ আদায় করে ১ টা ৫০ এর দিকে ঢাকার পথে (কাশিমপুর- ২ কেন্দ্রীয় কারাগারের উদ্দেশ্যে) রওয়ানা দিলাম। এবারও আমাদের সাথে ইফতারের প্যাকেট দিয়ে দেয়া হল।

আল্লাহর মেহেরবানীতে অন্যান্য দিনের তুলনায় যানজটের ঝামেলা এবার একটু কমই ছিল। ফলে বিকেল সাড়ে ৫ টায় কাশিমপুর- ২ কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছে যাই। অবশ্য এখনকার ব্যবস্থাপনা একটু ভিন্ন ধরনের হবার কারণে গেটে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয়। যাইহোক আমি ইফতারের নির্দিষ্ট সময়ের বেশ আগেই রুমে পৌঁছাই এবং এস্তেনজা অজু সেরে এখানকার সাথীদের সাথে এফতার করতে সক্ষম হই। আমার সাথে কুমিল্লার মায়ামী রেস্তোরার প্যাকেট ইফতারীতে সবাই শরীক হন। এখানকার তৈরি ইফতারের সাথে আমার আনা ঐ ইফতারের মত সামান্য ইফতারীও যোগ হওয়ায় বেশ ভালই লাগল।

এবার চট্টগ্রামের কেন্দ্রীয় কারাগারে মোট চার দিন ইফতার করতে হয়। প্রথম দিন কুমিল্লা থেকে সাথে নিয়ে আসা প্যাকেটের সাথে কারাগারের বিশেষ ব্যবস্থায় তৈরি ইফতার যোগ হয়। পরে দুই দিন অর্থাৎ ২৯ জুলাই ও ৩০ জুলাই চট্টগ্রামের আইনজীবী ভায়েরা কোর্ট শেষে ফেরার পথে ইফতারের জন্যে বিশেষ

www.pathagar.com

মানের হালিমের ও ফিরনীর দুটো প্যাকেট দিয়ে দিলে ওগুলো আরো তিনজনকে ভাগ করে দিয়ে বাকীটা আমি খেয়েছি। কিন্তু ৩১ জুলাই কোর্ট একটু সকাল সকাল শেষ হওয়ায় ইফতারী দিতে পারেনি। তারা আমাকে বলল ওটা জেল গেটে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হবে। আমি কোর্ট থেকে জেল গেটে পৌঁছেই রুমে ফেরার আগে একজন ডেপুটি জেলারকে বলে আসলাম, আমার ইফতারী আনলে রুমে পৌঁছার ব্যবস্থা করার জন্যে। এসেই নামাজ আদায় করে আমার সেবক আব্দুল হালিমকে গেটে গিয়ে খোঁজ নিতে বললাম, সেই সাথে আমার ব্লাড প্রেসার চেক করার জন্যে ডাক্তার বা ফার্মাসিস্টকে আসার জন্যে খবর দিতে বললাম। আঃ হালিম গেট থেকে এক প্যাকেট জিনিস ও এক ছড়ি বাংলা কলা নিয়ে এল। আমার মনে হল এটা চট্টগ্রামের ঐতিহ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। নিশ্চয়ই আরো কিছু দিয়ে থাকবে যা ঢুকতে দেয়নি বা অন্য কিছু ঘটে থাকবে। আমি সুবেদারকে ডেকে এনে বিষয়টি জানালাম। খোঁজ খবর নিয়ে বলল এছাড়া আর কিছু নাকি আসে নাই। আমার মনে সন্দেহ দূর হল না। পরের দিন চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বিদায়ের মুহূর্তে মিঠুর সাথে দেখা হওয়ায় তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কালকে ইফতার এর জন্যে শুধু জিলাপি ও কলাই পাঠিয়েছিল নাকি আরো কিছু পাঠিয়েছিল যা আমার কাছে পৌঁছে নাই। মিঠু বলল আমিতো ওনাদের সাথে গেট পর্যন্ত এসেছিলাম। অনেক কিছুই তারা এনেছিল। কিন্তু জিলাপি এবং কলা ছাড়া বাকীগুলো ফেরৎ দিয়েছে। তারা ভেতরে পাঠানোর জন্যে এক দুই আইটেম ছাড়া গ্রহণ করতে রাজি হয়নি।

চট্টগ্রামে যাওয়া-আসার বিড়ম্বনা- ০৭

০১ আগস্ট ২০১২ বুধবার সকাল ১০টায় চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে রওয়ানা করেছিলাম সাড়ে ৫ টার দিকে। কাসিমপুর- ২ কেন্দ্রীয় কারাগারে মোটামুটি ভাল ভাবেই আল্লাহর মেহেরবাণীতে পৌঁছতে সক্ষম হই। তবে সফরের ক্লান্তি পরের দিনও অনুভব করি। গতকাল ২ আগস্ট তেমন কিছুই করতে পারিনি, লেখা পড়ায় মন বসানো সম্ভব না হওয়ায় বার বার বিছানায় শুয়ে সময় কাটাতে বাধ্য হই। ক্লান্তির ছাপ বোধহয় চেহারাতেও প্রকাশ পাচ্ছিল। তাই গতকাল জোহরের কিংবা আসরের নামাজের সময় আব্দুল কাদের মোল্লা আমাকে জিজ্ঞেস করল, সফরের জন্যে শরীরটা কি বেশি কাহিল মনে হচ্ছে। আমার মনে হল উপলব্ধি সঠিকই হবে। আসলে কোমর ও হাঁটুর ব্যথা নিয়ে চট্টগ্রাম- ঢাকা লম্বা সফর আমার জন্যে কত যে কষ্টের তা ভাষায় প্রকাশ করার উপায় নেই। আর তা প্রকাশ করে কোন লাভও নেই। আল্লাহ যত দিনে এর অবসান না ঘটাচ্ছেন, তত দিন নীরবে এ কষ্ট সয়েই যেতে হবে। তাই আল্লাহর কাছেই এ কষ্টের কথা জানাতে চেষ্টা করি, আল্লাহ আলেমুল গায়েব তিনি আরো ভাল জানেন আমার কত কষ্ট হচ্ছে, তিনি এটাও জানেন কারা কষ্ট দিচ্ছে। আমি এই মুহূর্তে আল্লাহর ঐ অভয় বাণীটা বার বার স্মরণ করি। "তোমাদের দুশমনদের ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে বেশি ভালভাবে অবগত আছেন। আর আল্লাহই অভিভাবক হিসাবে যথেষ্ট। আল্লাহই সাহায্যকারী হিসাবে যথেষ্ট।" আল্লাহর এই ঘোষণা ও অভয়বাণীটি বার বার স্মরণ করি আর এরই সূত্র ধরে দোয়া করি।

এবার চট্টগ্রাম থেকে আসার পর অর্থাৎ ১ আগস্টের রাত থেকে ৩ আগস্ট পর্যন্ত ক্লান্তি শ্রান্তি নিয়েই কেটে যায়। আজ ৪ আগস্ট শনিবার পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে আল্লাহর রহমতে সব ক্লান্তি-শ্রান্তি কেটে গেল। এবারের সাক্ষাতে আমার বেগম সাহেবার সাথে বড় মেয়ে বড় জামাই সাইফুল্লাহ মানসুর এসেছিল। তাদের সাথে ছিল মিঠু ও মফিজ। কে কেমন আছে এটা নিয়েই আলোচনা করতে করতে সময়টা কেটে গেল। বর্তমানে ছেলেরা সবাই বাইরে। অবশ্য মোমেন আগামী ১০ আগস্ট চলে আসার কথা। তার প্রথম সন্তান ছেলেকে দেখার জন্যে লন্ডন গিয়েছে। বাকী তিনজনের মধ্যে ছোট

www.pathagar.com

ছেলের পাসপোর্টের সমস্যা এখনও সমাধান হয়নি। হাইকোর্টের অর্ডার সত্ত্বেও বাংলাদেশের মালয়েশিয়াস্থ হাইকমিশন কেন যে পাসপোর্ট নবায়ন করছে না তা বুঝে আসছে না।

পাসপোর্ট সমস্যার কারণে তার অনার্স পরীক্ষার ফল খুব খারাপ না হলেও তা আশানুরূপ হয়নি। আমরা আশা করছি মাস্টার ডিগ্রীতে সে ভাল করবে। কিন্তু পাসপোর্ট সমস্যার সমাধান না হওয়ায় তার মধ্যে বেশ হতাশা বিরাজ করছে বলে তার মায়ের সাথে ফোন আলাপে মনে হয়েছে। আমি তো বাপ হয়েও জেল বন্দী অবস্থায় ছোট ছেলের এই সমস্যা সমাধানে কোন ভূমিকা রাখতে পারছি না। প্রাণ খুলে আবেগ ভরে শুধু দোয়াই করছি, আল্লাহ এই জালেম সরকারের সকল জুলুম নির্যাতনের কবল থেকে গোটা দেশবাসীকে নাজাত দেয়ার ব্যবস্থা করুন। আর এ জন্যে তাঁর কুদরতি ব্যবস্থা ছাড়া আর কোন উপায় আছে বলে মনে হয় না। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে তারা নিরপরাধ একজন কিশোর ছাত্রকেও হয়রানি করতে কুণ্ঠাবোধ করছে না। "আল্লাহ তুমি এই জালেমদের বিরুদ্ধে তোমার পক্ষ থেকে কুদরতি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে মজলুম জনগোষ্ঠী তথা দেশবাসীকে সাহায্য কর, প্রতিটি ভুক্তভোগী মানুষের এটাই এখনকার প্রত্যাশা, এটা সকলের অন্তরের কান্না এবং হৃদয়ের ফরিয়াদ। আল্লাহ তুমিই একমাত্র এইসব বিপদগ্রস্ত মানুষের ফরিয়াদে সাড়া দিয়ে তাদের একমাত্র ত্রাণকর্তা হিসাবে তুমিই এদেরকে জুলুম থেকে উদ্ধার কর"। অসহায় অবস্থায় এই প্রার্থনাই অহরহ করছি।

আমার তৃতীয় ছেলে ডা. নাঈমুর রহমান খালেদের স্ত্রী দেশে এসেছে। ইতঃপূর্বে দুইবার জেল গেটে এসে দেখাও করেছে। কিন্তু কিছু দিন থেকে সে অসুস্থ। সে অবশ্য সন্তান সম্ভবা। তার মেয়ে নাঈমাও নাকি সপ্তাহ যাবৎ জ্বরে ভুগছে। কারা জীবনে আপনজনদের অসুস্থতার কথা শুনলে মনটা একটু বেশিই অস্থির হয়ে উঠে।

আজকের সাক্ষাতে বড় জামাই মানসুর আসায় বেশ ভাল লাগছিল। কিন্তু তালহার পাসপোর্টের সমস্যার সমাধান এখনও না হওয়ায় এবং বৌমা ও নাতনির শরীরের অবস্থা জেনে মনটা বেশ ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। আল্লাহর কাছে দোয়া করা ছাড়া তো আমার আর কিছুই করার নেই। আমার অবর্তমানে আমি তো আমার পরিবার ও সংগঠনকে আল্লাহর হাতেই সোপর্দ করেছি। আল্লাহর চেয়ে উত্তম সাহায্যকারী, উত্তম অভিভাবক আর কে হতে পারে? এই বিশ্বাসকে পুঁজি ও সম্বল করে নিজেকে সাধ্যমত দুশ্চিন্তা মুক্ত রাখার চেষ্টা করছি। আল্লাহই সর্বোত্তম অভিভাবক, আল্লাহই সর্বোত্তম সাহায্যকারী। কবে, কখন, কিভাবে তা না জানলেও পূর্ণ আস্থাসহ বিশ্বাস করি, আল্লাহর পরিকল্পনা মাফিক ঠিক সময়েই আল্লাহর সাহায্য আসবে। আল্লাহর সেই সাহায্য পাওয়ার জন্যে আমাদেরকে উত্তম নামাজ ও সর্বোত্তম মানের ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ধরনা দিতে হবে। জেল জীবনের অনেক বিড়ম্বনা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আল্লাহকে একান্তে ডাকার, একান্তে তার কাছে মনের সকল ব্যথা বেদনা চাওয়া পাওয়ার কথা যেভাবে ব্যক্ত করা যায়, তা মুক্তজীবন কোন দিন অনুভব করিনি। তাই আল্লাহর কাছে এটাও আমার একান্ত কামনা, এই জেল জীবনকে যেন আল্লাহ তাঁর নৈকট্য লাভের অছিলা হিসাবে কবুল করেন। তার নেয়ামত প্রাপ্ত প্রিয় বান্দাদের কাতারে শামিল হওয়ার উছিলা হিসাবে কবুল করেন। সুদিন দুর্দিনের নিরংকুশ মালিক তিনি। তিনিই আজকের দুর্দিনকে সুদিনে পরিণত করবেন।

হাইকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও তালহার পাসপোর্টের সমস্যার সামাধান না হওয়ায় সে যেমন দুশ্চিন্তায় ভুগছে, ফোনে তার মায়ের কাছে যে দুশ্চিন্তার প্রকাশ করছে, তা আমাকে আরো বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করেছে। সবচেয়ে ছোট ছেলে আজ আমার জন্যে বিপদগ্রস্ত। মালয়েশিয়ায় পড়তে গিয়ে আজ পাসপোর্টের নবায়ন না হওয়ায় অস্থিরতায় ভুগছে। এটাকি সরকারের নির্দেশে হচ্ছে, নাকি ওখানকার বাংলাদেশ দূতাবাস কর্মকর্তাদের নিজেদের সিদ্ধান্তে হচ্ছে, তা আল্লাহই ভাল জানেন। তবে এটা যে একটা বড় রকমের অন্যায় এবং জুলুম তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমার নিরীহ এই ছেলেটাকে আল্লাহ আমি তোমার হেফাজতে সোপর্দ করছি। তুমি তাকে তোমার পক্ষ থেকে নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে রাখ। তাকে রহমতের

www.pathagar.com

ফেরেশতা দিয়ে পদে পদে সাহায্য কর। মজলুম পিতা হিসাবে বিপদগ্রস্ত সন্তানের জন্যে আল্লাহর দরবারে এই দোয়া মুনাজাত ছাড়া আর তো কিছু করার নেই। প্রিয় নবী বলেছেন, 'মজলুম বান্দা ও আল্লাহর মাঝখানে আর কোন পর্দা থাকে না। অতএব মজলুম পিতা হিসাবে আমার বিপদগ্রস্ত সন্তানের জন্যে যে দোয়া করছি, আল্লাহর রাসূলের সুসংবাদ অনুযায়ী তা কবুল হবারই কথা। তবে কবে, কখন, কিভাবে হবে সেটা আল্লাহর নিজস্ব সিদ্ধান্তের ব্যাপার।

আমার মেঝ ছেলে মোমেন তার প্রথম সন্তানকে দেখতে লন্ডন গিয়েছে। এ মাসের ১০ তারিখে (১০/৮/১২) দেশে ফেরার কথা। আশা করছি আগামী ১১/৮/১২ তারিখে পরিবারের লোকদের সাথে সাক্ষাতের সময়ে তার সাথে দেখা হবে। তালহার জন্যে পরবর্তী পদক্ষেপ কিছু নেয়া যায় কিনা, তাও তার সাথে আলাপ করেই নিতে হবে। মালয়েশিয়াস্থ দূতাবাস কর্মকর্তা গণ নিশ্চয়ই জানে হাইকোর্টের অর্ডার সত্ত্বেও পাসপোর্ট না দেওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা হতে পারে; এরপরও কেন যে তারা এমন করছে, বুঝা যায় না। তবে আমার একটা ছেলের ক্যারিয়ার নষ্ট করাই তাদের উদ্দেশে এটা সহজেই অনুমেয়।

গতকাল ট্রাইব্যুনালে সাক্ষীর জবানবন্দী প্রদান ও জেরার কথা ছিল। কিন্তু সাক্ষী হাজিরা না করতে পারায় ২৬ আগস্ট পরবর্তী তারিখ দিয়েছে।

অন্যদিকে দশট্রাক অস্ত্র মামলার জন্যে ২৭ ও ২৮ আগস্ট চট্টগ্রামে হাজিরা দিতে হবে। এমনও হতে পারে, আমাকে কাসিমপুর- ২ এর কারা কর্তৃপক্ষ একবারেই ট্রাইব্যুনাল হয়ে চট্টগ্রাম পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারে। একজন ডেপুটি জেলারের কথায় এমনটাই মনে হল। যদি তাই হয় তাহলে সেটা হবে আমার জন্যে খুবই কষ্টের। আমার শরীরের বর্তমান অবস্থা এতটা কষ্ট বরদাশত করার মত নয়। তবে আল্লাহ যা তাকদিরে রেখেছেন সেটাতো খন্ডনযোগ্য নয়। আল্লাহর কাছে ছোট বড় সব রকমের পরীক্ষা থেকেই পানাহ চাই। এরপরও যদি পরীক্ষা এসেই যায় তাহলে সবর ও ইস্তেকামাতের সাথে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার তৌফিক চাই।

জেলের প্রধান কষ্টই হল নিঃসঙ্গতা। পরিবার থেকে, সংগঠন থেকে এবং জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এভাবে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন মনের উপর যে কেমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তা কেবলমাত্র ভুক্তভোগীরাই উপলব্ধি করতে পারে। পরিবারের হোক আর সংগঠনের হোক অথবা দেশের কোন পরিস্থিতির ব্যাপারেই হোক না কেন, ইচ্ছা করলেই কিছু জানার সুযোগ নেই। সংগঠনের দায়িত্বশীল ভাইয়েরা কে কেমন আছেন, কোন পরিস্থিতিতে কী করলে ভাল হয় এ ব্যাপারে মত বিনিময় তো দূরের কথা কোন প্রস্তাব পরামর্শ পাঠানোও সম্ভব নয়। কদিন আগে জানলাম আমার তৃতীয় ছেলে খালেদের স্ত্রী এবং মেয়ে অসুস্থ। ওরা এখন কেমন আছে, প্রতি মুহূর্তে তা জানার জন্যে মনটা বেশ অস্থির হয়ে উঠে। কিন্তু সেই সপ্তাহ শেষে সাক্ষাতের দিন ছাড়া তাদের অবস্থা জানার আর কোন সুযোগই নেই।

নিজের শরীরের অবস্থা হঠাৎ করে একটু খারাপ হলে তা প্রকাশ করার মত কোন লোকও ধারে কাছে পাওয়া যায় না। আমি দাঁতের সমস্যায় ভুগছি অনেক দিন থেকেই। রমজানের আগেই একবার বারডেমে ডেন্টাল বিভাগে দেখানোর জন্যে কারা হাসপাতালের ডাক্তার সাহেবকে অনুরোধ করেছিলাম। জুলাই মাসের ১৯ তারিখে বারডেমে যাবার ব্যবস্থাও হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ ১৮ জুলাই বিকেলে আমাকে জানানো হল পুলিশের স্কোয়াড পাওয়া যাচ্ছে না। তাই ১৯ তারিখে বারডেমে যাওয়া হবে না। রোজা অবস্থায় দাঁতের চিকিৎসা করাতে চাই। তাই আর যাওয়া আপাতত হচ্ছে না। তবে মাঝে মধ্যেই দাঁতের ব্যথার কারণে মাথা পর্যন্ত ব্যথা করলে দারুণ অসহ্য লাগে। কিন্তু রোজা অবস্থায় কাতরাতে হয়, একটু খোঁজ নেয়ার বা সান্ত্বনা দেবার মতও কাউকে পাওয়া যায় না।

ছোট বেলায় অসুস্থ হলে মা সারাক্ষণ আমাকে চোখে চোখে রাখতেন। পাশে থাকতেন। বর্তমান অবস্থায় কখনও অসুস্থ হলে স্ত্রী পুত্র কন্যারা যেমন পাশে থাকে, তেমনি সংগঠনের ভাইদেরকেও পাশে পাই। কিন্তু

www.pathagar.com

কারাজীবনে কোন সময় শরীর খারাপ হলে ওভাবে কাউকে পাশে পাওয়ার আশা করা দুরাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারা হাসপাতালের ডাক্তার আছে, তাদের খবর পৌঁছানোও কোন সহজ ব্যাপার নয়। খবর পেলেই যে সাথে সাথে আসবেই তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। গত দুই দিন হঠাৎ করেই মেরুদণ্ডের মধ্যবর্তী স্থানে বেশ ব্যথা অনুভব করলাম। দুদিন ঘুমোতে এমনকি শুতেও বেশ অসুবিধা হচ্ছিল। কোন ডাক্তারকে এ জন্যে আর খবর দেইনি। এমনিতেই কোমরে ও হাঁটুতে প্রতিদিন বিকেলে হট ওয়াটার এর সেক নিয়ে থাকি। এই দুইদিন ঐ ব্যথার জায়গাতেও সেক দিলাম। আল্লাহর রহমতে আজকে আর ওখানে কোন অনুভূত হচ্ছে না।

১০/০৮/২০১২

আগামীকাল শনিবার ১১ই আগস্ট আমার পারিবারিক সাক্ষাতের দিন। মোমেন তার ছেলেকে দেখে আজই (১০ই আগস্ট) ফিরে আসার কথা, আশা করি সেও কাল আসবে। তার কাছে শোনা যাবে তার প্রথম সন্তানটি কেমন হয়েছে। এটা আমার বিবাহিত ছেলের ঘরে প্রথম ছেলে সন্তান। আল্লাহ যেন তাকে আমার পরিবারের পক্ষ দ্বীনের মশালবাহী হিসাবে কবুল করেন। তার জন্মের খবর পাওয়ার পর থেকে এই দোয়াই করছি।

সাক্ষাতের সময় অনেক কিছু বলার থাকে কিন্তু সময়মত কিছুই যেন মনে থাকে না। তালহার পাসপোর্ট সমস্যা সমাধানের নাকি সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। দূতাবাস কর্মকর্তারা যেখানে ইতঃপূর্বে তাকে দূতাবাসের ঢুকতে দেয়নি, এবারে তাকে ডেকে নিয়ে আশ্বাস দিয়েছে। তারা কথা রাখলে ইনশাআল্লাহ এ সমস্যা দ্রুতই কেটে যাবে। আমার বড় ছেলে তারেক ওয়াশিংটনে একটি প্রেস কনফারেন্সে আমাদের পক্ষে এবং তথাকথিত মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের বিপক্ষে বেশ জোরালো বক্তব্য দিয়েছে। বক্তব্যটা নাকি আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় বেশ গুরুত্বসহ কভারেজ পেয়েছে। এখানে জনকণ্ঠে বাবু পিযুষ রায় তার বিরুদ্ধে বেশ বিষোদগার করেছে, বিশেষ প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে জনকণ্ঠে। এ নিয়ে আবার তাকে কোন ঝামেলায় ফেলে কিনা, মাঝে মাঝে মনের কোণে এমন চিন্তাও উঁকি ঝুঁকি মারে। কারণ ছোট ছেলে তালহা সবচেয়ে নিরীহ। ওখানে পড়াশোনা ছাড়া আর কোন কিছুতেই তার ভূমিকা আছে বলে জানি না। ইবাদত বন্দেগীর ব্যাপারে সে আমার আব্বার মতই বেশ যত্নবান। গত বছরেও সে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে দশদিন ইতেকাফ করেছে। এবারো করবে বলে বাসায় জানিয়েছে। তার মত ছেলে বিনা কারণে পাসপোর্ট নবায়নে সমস্যা সৃষ্টি হওয়ায় অনার্স পরীক্ষার ফলাফল আশানুরূপ করতে পারল না। তখন তারেক হঠাৎ করে আবেগ তাড়িত হয়ে তার আব্বার পক্ষে বক্তব্য দিতে গিয়ে পিযুষ রায়দের মত ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষীদের কুনজরে পড়ার ফল যে কী হয়, এমন ভাবনা থেকে মুক্ত থাকতে পারছি না।

পরবর্তী সাক্ষাৎ সম্ভবত ঈদের আগের দিনই। শনিবারে সাক্ষাতে আসতে আমার স্ত্রীর এবং বড় মেয়ের বেশ অসুবিধা হয়। আমার স্ত্রী একটি স্কুল এন্ড কলেজের প্রিন্সিপাল। বড় মেয়ে একটি প্রাইভেট বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, তাই শনিবারে আসতে তাদের দুজনেরই অসুবিধা। তারা শুক্রবারে আসতে চায়। উপস্থিত ডেপুটি জেলার জানালেন, শুক্রবারে তাদের নাকি কিছু অসুবিধা হয়। শুক্রবারে রাস্তায় তেমন ট্রাফিক জ্যামের আশংকা না থাকায় বাসা থেকে সকাল সকাল রওয়ানা করলে কারো জুমআর নামাজে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আমরা বন্দী অবস্থায় তো এখানে জুমআ আদায় করা থেকে বঞ্চিতই আছি। ডেপুটি জেলার তার উপরস্থ কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ করে আগামী সাক্ষাতের সময় জানাবেন।

এবারের সাপ্তাহিক সাক্ষাতের আগের দিন পত্রিকায় শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা আজিজুল হক সাহেবের ইন্তেকালের খবর দেখলাম। আমার পক্ষ থেকে তার শোকার্ত পরিবারের সাথে দেখা করে সমবেদনা জানানোর জন্যে আমার স্ত্রী এবং ছেলেকে বলার চিন্তা করে সাক্ষাতে যাই। কিন্তু এটা ওটা আলোচনা এবং ডেপুটি জেলারের সাথে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত বাদানুবাদ হওয়ায় কথাটা বলতে ভুলে যাই।

www.pathagar.com

পরে অবশ্য মোল্লা সাহেব কোর্টে গেলে যাতে আমার পরিবারের কাছে ম্যাসেজটা পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে এজন্যে বলে দিলাম। কামারুজ্জামানকেও একই দায়িত্ব দিলাম। যাতে আমার আশানুযায়ী আমার পরিবারের পক্ষ থেকে ভূমিকা পালন করা হয়।

আজ ২৫ রমজান। দেখতে দেখতে জেলখানায় তিনটি রমজান কেটে গেল। ১৯৮০ সাল থেকে প্রতি রমজানে শেষ দশ বা নয় দিন ইতেকাফে কাটিয়েছি। রমজানের মাসে নিজ বাসায় সম্ভবত ২/১ দিনই ইফতার করেছি। আর মসজিদে ইতেকাফে থাকা অবস্থায় বাসার ইফতার খেয়েছি। বাকী দিনগুলোতে ইফতার করেছি জমজমাট ইফতার পার্টিগুলোতে। এই তিনটি রমজানে এমন পরিবেশে ইফতার করার সুযোগ থেকে বঞ্চিতই থাকতে হল। মসজিদে জমজমাট তারাবিহর অনুষ্ঠান থেকেও এই তিন রমজানে বঞ্চিত থাকতে হল। রাতের খাবার এবং সেহরীতে পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতির সেই মহব্বতের পরিবেশ থেকেও এই তিনটি রমজানে বঞ্চিতই থাকতে হল। বিশেষ করে একাকী সেহরী খাবার সময় মনের অবস্থা যে কেমন হয় তা অন্তর্জামী আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

সাপ্তাহিক দেখার সময় তো স্বপ্নের মত কেটে যায়। জেলে আসার পর হতে বাসা থেকে প্রচুর ফল ফলাদি পাঠানো হচ্ছে। বাইর থাকতে এত ফল খাওয়া তো দূরের কথা চোখেও দেখিনি। এ সকল খাবার কেবল নিজে নিজেই খাই না, অন্যদেরও দিয়ে থাকি।

পরিবারের সদস্যদের বা সংগঠনের ভাইদের অনুপস্থিতিতে ভাল ভাল খাবার যেন মুখে যেতে চায় না। মিথ্যা, সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগে এভাবে আর কতদিন কাটাতে হবে নিঃসঙ্গ অবস্থায়? এখানে সময় প্রচুর পাচ্ছি। নামাজ ও দোয়ার বাইরে আর কোন কাজেই যেন সময়টা কাজে লাগাতে পারছি না। ১/১১ এর পরে জেলে অল্পদিন থাকলেও প্রচুর বই পুস্তক এনেছিলাম। এবারে খুব কম সংখ্যক বইই আনতে পেরেছি।

তাও পড়ার সুযোগ করতে পারছি না। সময় পাচ্ছি না এমন নয়, তবে মানসিক ভাবে লেখাপড়ার মত প্রস্তুতি গ্রহণ কেন যে এবারে সম্ভবই হচ্ছে না। ১/১১ এর পর মাত্র ২ মাসে রাসূলুল্লাহর মক্কার জীবনটা লিখতে পেরে মনে বেশ প্রশান্তি লাভ করেছিলাম। অবশ্য ওটা লিখেছিলাম বাসায় বসে নিজের পড়ার টেবিলে প্রয়োজনীয় বই পুস্তক পাশে রেখে। জেল খানার পরিবেশ বাসার চেয়ে অনেক নিরিবিলি। এখানে টেলিফোনের অত্যাচার নেই। অন্যকারো সাথে দেখা সাক্ষাৎ বা আলাপ আলোচনার ঝামেলা নাই। প্রচুর সময় একান্ত নির্জন নিরালায় কেটে গেল। কেন যে নিজের ওয়াদা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহর মদীনার জীবনটায় হাতই দিতে পারলাম না। আল্লাহ আমাকে আমার ওয়াদা পালনের সুযোগ আদৌ দিবেন কিনা তিনিই ভাল জানেন। নিজেরকৃত ওয়াদা পালনে ব্যর্থতার জন্যে বেশ আত্মগ্লানিতে ভুগছি। এত অবসর সময় পাওয়ার পরও কেন যেন সময়টা কাজে লাগাতে পারলাম না, এর কোন ব্যাখ্যা বা কৈফিয়ত দেয়ার সাধ্য আমার নেই। আমি কোন পেশাদার লেখক নই। সাধারণত বক্তৃতাগুলোই পরে বই আকারে এসেছে। তাছাড়া বিশেষ প্রয়োজনে বাধ্য হয়েছি লিখতেও। এবারে লেখার জন্যে মনটাকে তৈরি করতে কেন যেন ব্যর্থ হলাম। এই ব্যর্থতা নিয়েই কি আমার জীবনের শেষ অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটবে? আমার তো আরো অনেক কিছু লেখার স্বপ্ন ছিল, তা কি আর কখনও বাস্তবতার মুখ দেখবে না? এবারে গ্রেফতার হবার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় ৩০ টি বছর যাবত প্রতিবছর রমজানের শেষ ১০ দিন বা ৯ দিন ইতেকাফে কাটিয়েছি। মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব নিয়ে কোন বছর ১০ দিন কোন বছর অন্তত ৫দিন ইতেকাফ করেছি। মসজিদে তারাবিহর জামাতে শরীক হয়ে আসছিলাম আরো অনেক আগে থেকে। এমনকি সফরেও আমি মসজিদে তারাবিহ আদায় করেছি। অনেকে এটাকে তেমন জরুরি মনে না করে মসজিদের জামায়াতে না যাওয়ার পরামর্শ দেয়া সত্ত্বেও গিয়েছি। পরপর তিনটি রমজানে যেমন ইফতার মাহফিলের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে হল, তেমনি তারাবিহ ও সেহরীর আনন্দ থেকেও বঞ্চিতই হত হল। আল্লাহ তার এই সব নেয়ামত থেকে আর কত কাল বঞ্চিত রাখবেন তাতো কেবল তিনিই জানেন। গত রাতটাই ছিল ২৭ রমজানের

www.pathagar.com

রাত। মনে কত ব্যথা কত যন্ত্রণা নিয়ে যে রাতটা কেটে গেল তা কেবলমাত্র আলেমুল গায়েব আল্লাহই ভাল জানেন। আমার ছেলেরা ইতেকাফের সময় মসজিদে আমার সঙ্গ দিত। এক ইতেকাফে আমার বড় ছেলে তখন খুবই ছোট, আজিমপুর ছাপড়া মসজিদে গিয়ে দৌড়ে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরে আব্বু আব্বু করছিল, সেই দৃশ্য এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে। একবার মগবাজার চাঁন মসজিদে আমার "খালেদ" ও "মোমেন" উপস্থিত হয়ে আমাকে বলল, আব্বু আমাদের জন্যে কোরআন শরীফের একটি বিশেষ জায়গা থেকে কিছু শিক্ষা দিন। আমি তাদের দুইভাইকে লক্ষ্য করে সুরা লোকমানের দ্বিতীয় রুকুর তরজমা ও ব্যাখ্যা খুবই সংক্ষেপে শুনাই। আমার ইতেকাফের সাথীরাও তা শুনছিলেন। আমার ছোট ছেলে তালহা অনেকবার ২৭ শে রমজানের পুরো রাতটা মসজিদে আমার সাথেই কাটাতো। সে এখন দেশের বাইরে, শুনেছি সে গত বছরও মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে দশ দিন ইতেকাফ করেছে। এবারো করছে। আমার মোমেন বৃটেনে থাকতে ইস্ট লন্ডন মসজিদে বেশ কয়েকবার ইতেকাফ করেছে। বর্তমানের তিনটি রমজান সে ছেলেদের মধ্যে একাই দেশে আছে বিধায়, তাকে আমাকে নিয়েই অনেক ব্যস্ত সময় কাটাতে হচ্ছে। তারপরও পরিবারের সবাইকে নিয়ে আযাদ মসজিদে তারাবিহতে শরীক হচ্ছে। আমার ছোট ছোট তিন নাতনীরাও তারাবিহতে অংশ নিচ্ছে। এভাবে আমার স্ত্রী, আমার ছেলে মেয়ে ও নাতি নাতনীদেরকে দ্বীন ও ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকুক, দ্বীনের মশালবাহী হিসাবে গড়ে উঠুক এটাই আমার অন্তরের কামনা।

আজ ২৯ শে রমজান। আজ চাঁদ দেখা গেলে আগামী কালই ঈদ হবার কথা। তবে শুনলাম সৌদি আরবেও নাকি আগামী কাল ঈদ। আমাদের সাথে তাদের একদিনের পার্থক্য স্বাভাবিক। কিন্তু প্রায়ই দুই দিনের পার্থক্য হয়ে থাকে। আমাদের ঈদও যদি আগামী কালই হয়, তাহলে অনেক দিন পরে এটা হবে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা দেখা যাক সন্ধ্যায় কি ঘোষণা আসে।

আজকে আমার সাক্ষাতের দিন ছিল। সাক্ষাতের আলোচনায় প্রাইরিওটি পায় দুই নবাগত নাতির কথা। গত মাসে লন্ডনে মোমেনের ছেলে হয়েছে। আর গত পরশু খালেদের ছেলে হয়েছে। দুজনকে ছবিতে দেখলাম। মোমেন এবং খালেদ যেন যমজ দুই ভাই। এই দুই ভাইয়ের দুই ছেলেকেও দেখতে প্রায় একই রকম মনে হল ছবিতে। আল্লাহ তাদেরকে সুস্থ রাখুন এবং দীর্ঘজীবী করুন।

আমার পরিবারের সাথে সাক্ষাতের তারিখ ছিল গতকাল। ঈদের আগে গরীব কয়েদীদের জন্যে সম্ভবত সংগঠনের সহযোগিতায় আমার পরিবারের লোকেরা একশ পাঞ্জাবী নিয়ে এসেছিল। ডেপুটি জেলার মামুন সাহেব বললেন, এগুলোর জন্যে একটা দরখাস্ত দিতে হবে। মিঠু সাথে সাথে দরখাস্তটা লিখে দিল। উনি এর মাধ্যমে আমার পক্ষ থেকে ১৮০টা পাঞ্জাবী রিসিভ করলেন এই মর্মে একটা রিসিভাল দেয়ার কথা। কিন্তু বিদ্যুৎ না থাকার কারণে ঐ দরখাস্তের উপর স্বাক্ষরকৃত কাগজটা তখনই আমার হাতে দিতে পারেননি। পরে পাঠিয়ে দেয়ার কথা বললেন।

আমার এলাকায় ডিউটিরত সুবেদার মামুনকে আমি ডেকে পাঠালাম ঐ রিসিভালটা আনার জন্যে। সুবেদার মামুন সাহেব একটা কাগজ পকেট থেকে বের করে শুধু বললেন আমি জেলারের পক্ষ থেকে আসছি। আপনাদের আনা ১০০টি পাঞ্জাবীর কতটা আপনারা চান জেলার সাহেব জানতে চেয়েছেন। আপনারা যা চান সেগুলো আপনাদের কাছে দিয়ে বাকীগুলো প্রশাসন বিলি করবে। আমি সুবেদার মামুনকে আব্দুল কাদের মোল্লা ও কামারুজ্জামানের রুমে পাঠালাম। তারা এখানে আমার চেয়ে অনেক বেশি দিন আছে। অতএব কিছু লোকের সাথে পরিচয় থাকলে তাদের সাথেই আছে। মোল্লাকে ডেকেও আমি একটা তালিকা করার জন্যে বলে দিলাম। কিন্তু কি কারণে যে কালকের দিনের মধ্যে মোল্লা এটা করতে পারলনা তা আমার বুঝে আসছে না। আজ একজন সুবেদার এসে জানিয়ে গেল আমাদের একশ পাঞ্জাবীর লিস্ট করে তাদেরকে খবর দেয়া হয়ে গেছে। আজকে তাদের মাঝে ওগুলো বিতরণ করা হবে। মামুন সুবেদার নাকি যা বলে গেছে তা ঠিক নয়।

www.pathagar.com

গতকাল জেল গেটে দায়িত্ব পালনরত কর্মচারীরা ডেপুটি জেলার মামুনের উস্কানিতে একটা অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাচ্ছিল। সাক্ষাৎ শেষে আমি পরিবারের সদস্যদের যখন বিদায় দিব তখন আমার মালামাল চেক করা নিয়ে অহেতুক একটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়। আমি সাক্ষাতের রুম থেকে গিয়েই শুনলাম আমার মালগুলো চেক করা হয়ে গেছে। কিন্তু তারপরও আবার একজন চেক করা শুরু করল। এই সময় ডেপুটি জেলার মামুনকে ঘিরে একটা গ্যাংয়ের মত জটলা লক্ষ্য করলাম। আমার রেডিওটা সারাতে দিয়েছিলাম। রেডিওর ব্যাটারীর স্থানটা খুলে বেচারা কী যেন খোঁজাখুঁজি করল এরপর বন্ধও করল, আমি বললাম এই রেডিও জেলখানায় ছিল, জেল খানা থেকে মেরামতের জন্যে পাঠিয়েছিলাম। এর আগে তো কোন দিন এমনটি করতে দেখিনি। ডেপুটি জেলার বললেন, অনেকে রেডিওর মধ্যে মোবাইল ফোন নেয় তো এই জন্যেই দেখতে হচ্ছে। কথাটা শুনে আমি নিজেও বিক্ষুব্ধ হই। কিন্তু তা প্রকাশ সেভাবে না করলেও বললাম আমাকেও কি সেই পর্যায়ে ফেলা হচ্ছে? ঐ দিকে আমার বেগম সাহেবা এবং মেয়েও একটু প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে অত্যন্ত মৃদু এবং ভদ্র ভাষায়। ডেপুটি জেলার এবং তার সাথের গ্যাং তাদের সাথে বিতর্ক শুরু দিলে আমি আমার স্ত্রী ও মেয়েকে থামতে বললাম। তাদের থামানোর জন্যেই বললাম, জেল খানাতো আসলে সম্মানিত লোকদের অসম্মানিত করার জায়গা, নিজেদের মানসম্মান রক্ষার জন্যে এখানে কোন কথা না বলাই ভাল, তোমরা চুপ কর। আমার এই কথায় ডেপুটি জেলার মামুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ মেজাজে বলে উঠলো, আপনার এই কথায় আমরা অপমানিত বোধ করছি। আমি বললাম, আমি তো আমার লোকদের নিয়ন্ত্রণের জন্য বলছি আপনি নিজের গায়ে নিচ্ছেন কেন? তার সাথে তার গ্যাংও সুর মিলিয়ে ঝগড়ার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। আমি শুধু এতটুকু বলে আমার পরিবারের সদস্যদেরকে বিদায় দিলাম, আমি যা বলেছি আমার তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে বলেছিলাম, আমার পরিবারের সদস্যরা চলে যাওয়ার পরও আমাকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হল, তাদের পক্ষ থেকে বলা হল সেবক ফিরে আসে নাই। অথচ গেটের বাইরেই সেবক দাঁড়িয়ে ছিল। এদের মিথ্যা কথা বলাই যেন পেশা এবং নেশা। সত্য বলার অভ্যাসই যেন এদের নেই। আমি এই ফাঁকে বলে ফেললাম, আমাকে এভাবে দাঁড় করিয়ে রেখে কি সম্মান দেয়া হচ্ছে? সেই সাথে বললাম একদিন চট্টগ্রাম থেকে এসে গেটে একঘণ্টা দাঁড়ানো অবস্থায় ছিলাম। পরে ডিউটিরত একজনকে বললাম ভাই আপনাদের বাপ-চাচা নেই? আমি ৮/১০ ঘণ্টা সফর শেষে এখানে এসে প্রায় ঘণ্টা খানেক দাঁড়িয়ে আছি, আপনারা খেয়ালই করছেন না, খোশ গল্পে মেতে আছেন, আমারই লোক দিয়ে মাল চেক করাচ্ছেন, আমাকে বসার জন্যে একটি চেয়ারের ব্যবস্থা করার চিন্তাটাও আপনাদের কারো মনে আসল না। একজন উঠে এসে বলল, "স্যার এখানে তো চেয়ার নেই আপনি বসতে চাইলে ঐ রুমে গিয়ে বসতে পারেন।

আমি ইতঃপূর্বে ২/১ জন ভিআইপি বন্দীর কাছে কাসিমপুর- ২ কেন্দ্রীয় জেল গেটের ব্যাপারে কিছু ঘটনা শুনেছি। কাজেই আমার অসাক্ষাতে মালামাল চেক করুক আমার মন সায় দেয় না। তারা ষড়যন্ত্র করে বিপদে ফেলতে পারে। কোন প্রয়োজনীয় জিনিস গায়েবও করতে পারে। অতএব দাঁড়িয়ে থেকেই সেখান থেকে বিদায় নিলাম। এটাকি একজন মানুষকে অসম্মানিত করা নয়?

চট্টগ্রামে যাওয়া-আসার বিড়ম্বনা- ০৮

দেখতে দেখতে কারাজীবনে তিনটি রমজান কেটে গেল। রমজান মাস কোরআন নাজিলের মাস। মাসব্যাপী রোজা পালনসহ পুরো মাসের সামাজিক কার্যক্রম মূলত কোরআন নাজিলের উৎসব এবং কোরআনের মত আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ের মধ্যে দিয়েই পালিত হয়ে থাকে। আমরা জেল প্রাচীরের অভ্যন্তরে রোজা পালন করলাম ঠিকই, কিন্তু বাইরে মসজিদে মসজিদে যে মহা সমারোহে তারাবিহর জামায়াত অনুষ্ঠিত হয়, তার আনন্দ ও পুণ্য পরিবেশের স্পর্শ আমরা পেলাম না। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকতে কারাগারের উত্তর দিকের তিনটি ঐতিহ্যবাহী মসজিদের আযান, একামত

www.pathagar.com

ও তেলাওয়াত সবই প্রায় শুনতে পেতাম। মনটা ছুটে যেতে চাইত মসজিদের দিকে। কিন্তু এখানে আমরা খাচার পাখীর মত, চাইলেই উড়াল দেবার কোন উপায় নেই। তারাবিহ ছাড়া একসাথে রোজাদারদের ইফতারের আঞ্জামও ব্যতিক্রমধর্মী। আমরা সেই আনন্দ থেকেও বঞ্চিত। পরিবারের লোকদের সাথে মিলে সেহরীর আনন্দও অতুলনীয়, পরপর তিনটি রমজানেই এসব কিছু থেকে বঞ্চিতই থাকতে হল।

এবারে ঈদের একদিন আগে এবং ঈদের দিন পরিবারের লোকদের সাথে দেখা হল। আমার এবারের জেল জীবনের দ্বিতীয় বছরের শেষের দিকে এবং তৃতীয় বছরের প্রথম দিকে এসে তিনটি নাতি হবার শুভ সংবাদ পেলাম। প্রথমটি ছোট মেয়ের, দ্বিতীয় নাতি জন্মগ্রহণের সংবাদ পাই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকতেই। দ্বিতীয় নাতি মেঝ ছেলের প্রথম সন্তান জুলাইয়ের প্রথম কি জুনের শেষের দিকে জন্মগ্রহণ করে। মোমেন তার প্রথম ছেলেকে দেখে ৯ জুলাই পর্যন্ত লন্ডন থেকে যাত্রা করে দেশে পৌঁছল ১০ জুলাই। আমার তৃতীয় নাতি তৃতীয় ছেলের দ্বিতীয় সন্তান প্রথম ছেলে জন্মগ্রহণ করে ১৭ আগস্টের রাতে। ১৮ আগস্টে খবরটি পেলাম। ১৯ আগস্ট পরিবারের সদস্যদের সাক্ষাতের সময় বিস্তারিত খবর পেলাম। আমার স্ত্রী সবার জন্যে বিশেষভাবে দোআ করার অনুরোধ করে বিদায় নেয়। ঈদের পরের দিনও বাসা থেকে কিছু রান্না করা তরিতরকারি পাঠানো হয় যা আমার একান্ত পছন্দের খাবার হলেও গোটা রমজানে, অর্থাৎ কাসিমপুর- ২ এ আসার পর থেকে তা আর কখনও পাইনি। ২৬ আগস্ট ২০১২ ট্রাইব্যুনালে হাজিরা দেয়ার কথা আছে। আবার ২৭ আগস্ট চট্টগ্রাম কোর্টে হাজিরার উদ্দেশে ২৬ আগস্টই চট্টগ্রাম রওয়ানা করার কথা। এ পর্যন্ত পরপর দুই তারিখে ট্রাইব্যুনালে কোন সাক্ষী হাজির হয়নি। ২৬ আগস্ট যদি সাক্ষী আসে তাহলে চট্টগ্রামে রওয়ানা করতে দেরী হবার আশংকা আছে। আর যদি আগের দুদিনের মতই কোন সাক্ষী না আসে তাহলে ট্রাইব্যুনাল থেকেই একটু সকাল সকাল চট্টগ্রাম রওয়ানা হওয়া যাবে। আসলে কী হবে তা তো আলেমুল গায়েব আল্লাহ ছাড়া আর কারোই জানা নেই।

মামলার পরিণতি কি হবে তাও আল্লাহ ছাড়া আর কারো জানা নেই। তবে শাস্তি যা দেবার তা তো চট্টগ্রামে আসা যাওয়ার মাধ্যমে দিয়ে দিচ্ছে। আমার এই বয়সে পুরানো সাইটিকারোগী হিসাবে এভাবে মাসে ২ বার চট্টগ্রাম ঢাকা যাওয়া আসা শরীরের জন্যে যেমন ক্ষতিকর, তেমনি মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে ভীষণ চাপ অনুভব করি রাস্তায় চলার প্রতিটি মুহূর্তে। সকল সরকারের প্রতি পুলিশদের ক্ষোভের কথা শুনতে শুনতেও মাঝে মাঝে মনের মধ্যে বেশ বিরক্তির ভাব অনুভব করি। ২৬ আগস্ট ভোরে ট্রাইব্যুনালে রওয়ানা করার তাগিদ এলো কারা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। একই সাথে বলা হল, ওখান থেকেই চট্টগ্রাম যেতে হবে। সেভাবেই যেন প্রস্তুতি নিয়ে বের হই। আমাকে সকাল সাড়ে ছয়টায় তৈরি থাকতে বলা হলেও সকাল সাতটায় রুম থেকে বের হওয়া গেল। জেল গেট থেকে ট্রাইব্যুনালের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম সকাল সাড়ে ৭টায়। ঘটনাক্রমে যে গাড়িতে চট্টগ্রাম যাবার কথা সেই গাড়ীটি ট্রাইব্যুনাল পর্যন্ত যেতেই তিন বার বিকল হয়। এমন গাড়িতে করে বিকেলে রওয়ানা দিয়ে চট্টগ্রাম পৌঁছতে স্বাভাবিক ভাবেই অনেক রাত হবার কথা। এই গাড়িতে যেতে যে কী অবস্থা হবে, সে বিষয়ে বেশ দুশ্চিন্তা পেয়ে বসে। আল্লাহর ফয়সালার প্রতি পূর্ণ আস্থা ও সন্তুষ্টি নিয়ে দুশ্চিন্তামুক্ত হবার চেষ্টা করি।

ট্রাইব্যুনালে আজ মেসবাহ নামের একজন লোককে হাজির করা হয়। তার পক্ষে ট্রাইব্যুনাল চেয়ারম্যানকে ভূমিকা পালন করতে দেখে বিস্মিত হইনি। কারণ এই চেয়ারম্যান সাহেবই তো ঘাদানিক কমিটির সদস্য সচিব ছিলেন। মেসবাহ মিয়া তার সাক্ষীর জবানবন্দীতে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় নেয়। ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম মুলতবি হয় তার বক্তব্য শেষ হবার পর। জেরা হিসাবে টুকটাক দুই একটি প্রশ্নই করার সুযোগ পান ডিফেন্স আইনজীবী। বিকেল ৪-১৫ মিনিটে ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম মুলতবি ঘোষণার পর আমি বিকেল সাড়ে ৪ টায় চট্টগ্রামের উদ্দেশে ঐ দুর্বল গাড়িতেই রওয়ানা করি। গাড়িটি কুমিল্লা পর্যন্ত যেতে তিনবার বন্ধ হয়।

www.pathagar.com

কুমিল্লা পৌঁছার আগেই গাড়ীতে মাগরিব আদায় করি। আর একটি সিএনজি ফিলিং স্টেশনে পৌঁছে এশার নামাজ ও রাতের খাবার খেয়ে নেই। এই সময় আমার নিজস্ব ড্রাইভারকে দিয়ে ভতিজা মিঠু গাড়ীটা চেক করিয়ে বলল আপাতত আর সমস্যা নেই। তবুও ওদেরকে সাথে সাথে থাকতে বললাম। তারা জেল গেট পর্যন্ত সাথেই ছিল। জেলের রাস্তা ড্রাইভার চিনত না, তাই তাদের পথ দেখিয়ে চলার জন্যে বলা হয়। আমরা রাত সাড়ে ১২ টায় চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছি। ট্রাইব্যুনালে সাক্ষী দিতে এসে মেসবাহ মিয়া সরকারের আনুকুল্য লাভের আশায় যে বক্তব্য দিয়েছে তাতে আমার সম্পর্কে কয়েকটি ভুল তথ্য জামায়াত বিদ্বেষ এবং গোলাম আযম ও ব্যারিস্টার আঃ রাজ্জাক সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগের ফিরিস্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। মেসবাহের বক্তব্য একটি জঘন্য মিথ্যাচারের দলিল।
আমাদের আইনজীবীগণ যদি তার বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে জেরা করেন, তাহলে তাকে এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রমাণ করার যথেষ্ট সুযোগ পাবেন। সে নিজেকে তৎকালীন ইসলামী ছাত্রসংঘের একজন কর্মী, এমনকি সদস্যও দাবি করেন। কিন্তু তার গোটা বক্তব্য পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে ইসলামী ছাত্রসংঘ সম্পর্কে তার ন্যূনতম ধারণা নেই। সে আমাকে তৎকালীন পাকিস্তান জমিয়তে তালাবার সভাপতি হিসেবে উল্লেখ করেন এবং এও বলেন যে তখন নাকি পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘ নামে কোন ছাত্র সংগঠন ছিল না। আবার আলবদরের সবাই ইসলামী ছাত্রসংঘের লোক একথাও দাবি করেন। তার বক্তব্যের কোথাও পাকিস্তান জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার কথা উল্লেখ করা হয়নি। জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার কেউ আলবদরে ছিল এরও উল্লেখ নেই। অথচ আমাকে উক্ত জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার সভাপতি হিসেবে চিত্রিত করে আলবদরের কমান্ডার থাকার কথা দাবি করে বসেন।

যে লোকটা পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘ এবং পাকিস্তান জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার মধ্যকার পার্থক্যটুকুই জানত না বা বুঝত না, সে ছাত্রসংঘের কর্মী, সদস্য তো দূরের কথা একজন সমর্থকও হতে পারে না। কারণ জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া ছিল মাদরাসা (আলীয়া নেছাবের) ছাত্রদের সংগঠন। মাদরাসার ছাত্র ছাড়া ঐ সংগঠনের নেতৃত্বে থাকার সুযোগই কারো ছিল না। আর পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘ ছিল একদিকে সমগ্র পাকিস্তান ভিত্তিক একমাত্র ছাত্র সংগঠন। অপর দিকে ঐ প্রতিষ্ঠানের সাথে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদরাসা, মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যে উন্মুক্ত একটি অনন্য ছাত্র প্রতিষ্ঠান। আমার পরে এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচিত হন তদানীন্তন পাকিস্তানের করাচী শহরের এনএডি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র জনাব তসনিম আলম মানজার। মেসবাহ মিয়া এই পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের অস্তিত্ব অস্বীকার করে বলেছেন, আমরা পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘ বলতে পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘকেই বুঝতাম। এই কথার সাথে তিনি বলে ফেললেন, আমি নাকি ছিলাম পাকিস্তান জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার সভাপতি। মিথ্যাচার মূলত মাকড়সার জালের চেয়েও দুর্বল ষড়যন্ত্রের জাল। তাই এ জাল সামান্য ফুৎকারেই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে বাধ্য। মিসবাহর কথাই প্রমাণ করে তিনি কিছু জানতেন না। এখনও জানেন না। মিথ্যাবাদীদের মিথ্যার জাল ছিন্ন করার জন্যে তাদের মুখোশ উন্মোচন করার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহর কুদরতি ব্যবস্থায় মিসবাহ সাহেব নিজের কথার জালে নিজেই আটকে যাবে, এতে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,
"আল্লাহ তোমার শত্রুদের সম্পর্কে ভাল ভাবে জ্ঞাত আছেন। অভিভাবক হিসেবে তিনিই যথেষ্ট, তিনিই যথেষ্ট সাহায্যকারী হিসেবেও।"
সাক্ষী হিসাবে মিসবাহ সাহেবদের জবানবন্দীর স্লিপটা আমার হাতে না আসলেও আমি কানে যা শুনেছি এবং ল্যাপটপের রেকর্ডে যা দেখেছি সারা রাস্তা তাই নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে করতে চট্টগ্রাম পৌঁছি।

www.pathagar.com

চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের গেটে পৌঁছি রাত সাড়ে ১২ টায়। কারাগারের আনুষ্ঠানিকতা শেষে আমি রুমে পৌঁছি রাত একটারও পরে। আমার লাগেজপত্র রুমে পৌঁছার পর বিছানাপত্র ঠিক করে ঘুমোতে যাই রাত দুটোর দিকে।

রাত দুটোয় ঘুমোতে গিয়ে খুব ভাল ভাবে ঘুমোতে যে পারিনি তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ফজরের আযানের কিছুক্ষণ আগেই বিছানা ছেড়ে ইস্তেঞ্জা ওজু সেরে ফজরের আযানের অপেক্ষা করতে থাকি। আযানের সাথে সাথে ফজরের নামাজ আদায় করে আবার ঘুমানোর চেষ্টা করি। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত শরীরে বেশ অবসাদ অনুভব করছিলাম। অল্প কিছুক্ষণের জন্যে এপাশ ওপাশ করে ঘুমানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে অবশেষে সকাল আটটার দিকে সেবককে বললাম নাপিত ডেকে আনতে। নাপিতের কাজ শেষ করে গোসল হলে নাশতা সেরে কোর্টে যাবার আগ পর্যন্ত কিছুক্ষণের জন্যে কোরআন তেলাওয়াত করলাম। এরপর দুটো পত্রিকা ডেইলী স্টার ও যুগান্তর রুমে দিলে তা পড়তে থাকি। সাড়ে ১১ টার দিকে কোর্টের উদ্দেশে জেলগেটে রওয়ানা দিলাম।

কোর্টে পৌঁছলে আমারদেশ পত্রিকাটি কে যেন হাতে দিল। আমি পত্রিকাটির প্রথম পাতা ও শেষ পাতাসহ কয়েকটি পাতা উল্টাতেই স্বনামধন্য কলামিস্ট এবং আমার দেশ সম্পাদক জনাব মাহমুদুর রহমানের মন্তব্য প্রতিবেদন নাকি উপসম্পাদকীয় দেখলাম। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়েই চললাম। লেখাটার এক পর্যায়ে আমাকে বেশ আক্রমণ করেই উনি তথ্য সন্ত্রাসী তথ্যমন্ত্রণালয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কিছু অবাঞ্ছিত মন্তব্য করেন। যেটা আমার কাছে বন্ধুর সমালোচনার মত মনে হয়নি। বরং যখন আমরা কারারুদ্ধ এবং বিপদগ্রস্ত সেই মুহূর্তে অবিবেচকের মত বেশ নির্দয়ভাবে কটাক্ষ করায় আমার মনে হল উনিও কি হলুদ সাংবাদিকতার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই সময় আমাকে এবং জামায়াতকে হেয় প্রতিপন্ন করাই শুধু নয়, কাটা ঘায়ে লবণের ছিটা দিয়ে আমাদের বিষ ব্যথা আরো বাড়িয়ে দিলেন!

চারদলীয় জোট সরকারের আমলে তো তার সাথে একটি কমিটিতে একত্রে কাজ করেছি। কয়েকটি পত্রিকার তথ্য সন্ত্রাসের জীবন্ত নিদর্শন ছিল আমার নামে চালিয়ে দেয়া ঐ বক্তব্যটি। আমি বলেছিলাম, পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল রাজনীতির বয়স, অথচ যেসব পত্রিকায় আমরা সিংগেল কলাম এমনকি ইনার পেজে কভারেজ পাই না, এমন পত্রিকা 'তথাকথিত বাংলা ভাইকে' ৪ কলাম কভারেজ দেয়া হয় পত্রিকার প্রথম পাতায় লীড নিউজ হিসেবে। অকর্ম করে যদি কেউ এরূপ প্রেস পাবলিসিটি পায়, তাহলে একজন কেন এরূপ শত শত বাংলা ভাই তৈরি হবে। আমার এই সহজ সরল উক্তিকেই বিকৃত করে সেদিন জনকণ্ঠের মত কটি পত্রিকায় হেডিং করা হয় "বাংলা ভাই মিডিয়ার সৃষ্টি"। অথচ এক সপ্তাহ আগে ঐ সাংবাদিকদের সামনে আমি তথাকথিত বাংলা ভাই-এর গ্রেফতার দাবি করেছিলাম। এক সপ্তাহ পরে যদি সত্যি আমি বাংলা ভাই-এর অস্তিত্ব অস্বীকার করতাম তাহলে সাংবাদিকরা অবশ্যই আমাকে এ প্রশ্ন করতে পারত, "তাহলে গত সপ্তাহে আপনি কার গ্রেফতার দাবি করলেন? আমি যে আগের সপ্তাহে তাকে গ্রেফতার করার দাবি জানিয়েছিলাম এর সাক্ষী ইংরেজী দৈনিক নিউ নেশন সহ বেশ কটি পত্রিকা। জামায়াতের প্রচার দপ্তরে তার কাটিং সংরক্ষিত থাকার কথা।

ঐ সময়ে জনাব মাহমুদুর রহমান সাহেবের সাথে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখা সাক্ষাৎ ও উঠাবসার সুযোগ হয়েছিল। বিশেষ করে টা টা কোম্পানির বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাব বিবেচনা করা উচিৎ কি উচিৎ নয়, এ বিষয়ের জন্যে গঠিত কমিটিতে বার বার দেখা সাক্ষাৎ এবং আলাপ-আলোচনা হয়েছে। যদি উনার মনে পত্রিকার বিকৃত ঐ সংবাদ শিরোনাম দেখে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েই থাকতো, তাহলে তো তখনই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতেন। আজকে যখন আমরা বিপদগ্রস্ত, জামায়াত ও জামায়াত নেতৃবৃন্দকে নিয়ে চলছে নানা চক্রান্ত ষড়যন্ত্র। সেই মুহূর্তে উনার নিজের পত্রিকায় নিজের কলামে আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে হলুদ সাংবাদিকতার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে এসব দায়িত্বহীন ও আক্রমণাত্মক উক্তি কোন উদ্দেশে করেছেন, তা আলেমুল গায়েব আল্লাহই ভাল জানেন। তার মনের ইচ্ছা যাই থাকনা

www.pathagar.com

কেন এই মুহূর্তে এটা জামায়াতের জন্যে ক্ষতিকর একটি বক্তব্য এব্যাপারে আমার বিন্দু মাত্র সন্দেহ সংশয় নেই। সুদিন দুর্দিনে পরিণত করতে আল্লাহর কাছে কোন ব্যাপারই নয়। তিনি অভয়বাণী শুনিয়েছেন, "অবশ্যই প্রতিকূল সময়ের পরে আছে অনুকূল সময়, অবশ্যই প্রতিকূলতার সাথেই আছে অনুকূল পরিস্থিতি।" প্রবাদ আছে " হাতি কাদায় পড়লে চামচিকেও লাথি মারে"। অবশ্য আমি লাখ টাকা মূল্যের মরা হাতির মতও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নই। আবার মাহমুদুর রহমান সাহেবকেও চামচিকার সাথে তুলনা করা আমি ঠিক মনে করি না। তবে আমরা একটা দুঃসময় পার করছি। এই অবস্থায় তার আক্রমণাত্মক মন্তব্যটি আমার জন্যে কাটা ঘায়ে লবণের ছিটার মতই বেদনাদায়ক মনে হওয়ায় এটাকে বন্ধুর সমালোচনা হিসেবে মনে করতে না পারার জন্যে আমি সত্যি দুঃখিত।

চট্টগ্রামের জজ কোর্টে হাজিরা দিতে গিয়ে বসে বসে কোর্ট চলা অবস্থায়ই আমার দেশে তার লেখাটা পড়ে মনে বেশ যন্ত্রণা অনুভব করি। কারণ আমার দেশকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে আমার ও আমার সংগঠনের একটা ভূমিকা ছিল যা মাহমুদুর রহমান সাহেবের অজানা থাকার কথা নয়। মনে কষ্টটা এ জন্যেই একটু বেশি অনুভব করছি। কিন্তু জেলে বন্দী অবস্থায় আমার পক্ষে তার এ ভুল ধারণার ভিত্তিতে করা মন্তব্যটির জবাব দেয়া সম্ভব নয় এটা তার না বুঝার কথা নয়। তার বহুল প্রচারিত পত্রিকায়, তার নিজ কলামে প্রকাশিত মন্তব্য পড়ে অসংখ্য মানুষ আমাকে ভুল বুঝতে, আমার সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করতে পারে, অথচ আমি তার প্রতিকার করতে পারব না, এটাকেই যদি মোক্ষম সুযোগ মনে করে তিনি এমনটি করে থাকেন তাহলে এটা আমার প্রতি একটি বড় রকমের অবিচার ও জুলুম।

আল্লাহ কোন দিন এর জবাব দেবার সুযোগ দেবেন কিনা জানি না। তবে আমি আমার বিবেকের কাছে পরিষ্কার। আমাদের দেশের মিডিয়ার একাংশ যে তথ্য সন্ত্রাসে লিপ্ত এটা এখন আর শুধু আমার একার কথা নয়, জেল জীবনে এই মন্তব্য শুনেছি অনেক ভুক্তভোগীর মুখে। এমন কি ইত্তেফাকের মত পত্রিকার একজন প্রথিতযশা সাংবাদিকের পুত্রের মুখেও শুনেছি এই একই উক্তি। ডিবিতে রিমান্ডে থাকাকালে এক সঙ্গে কয়েকদিন থাকার সুবাদে তার সাথে কথা হয়। তার উক্তি ছিল "যদিও আমার নিজের বাবাও একজন সাংবাদিক, তবুও আমি বলতে চাই আমার এই দুর্ভোগের জন্যে সাংবাদিকরাই দায়ী"।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ২৬ সেলে অবস্থান কালেও অনেক নামি দামি ব্যক্তিদের মুখে দায়-দায়িত্বহীন সাংবাদিকতার কারণে কতজন কেমন অবাঞ্ছিত, অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির শিকারে পরিণত হয়েছে, তাও শোনার সুযোগ হয়েছে, দুর্ভাগ্যক্রমেই হোক আর সৌভাগ্যক্রমেই হোক, ঐসব ব্যক্তিদের সাথে আলাপের সুযোগ পেয়ে আমি মনে কিছুটা হলেও স্বস্তি পেয়েছি, এই ভেবে যে সাংবাদিকদের মধ্যে যারা হলুদ সাংবাদিকতার মাধ্যমে মানুষের চরিত্র হনন করে আনন্দ অনুভব করে থাকে, তাদের ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব আমি একাই পোষণ করি না, অনেকেই আমার মত একই মনোভাব পোষণ করেন।

আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে ইয়াহুদি লবির প্রভাব প্রতিপত্তির বিষয় আমার চেয়ে মাহমুদুর রহমান সাহেবের আরো অনেক বেশি জানার কথা। ইসলাম ও ইসলামী ব্যক্তিত্বের ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ন করার লক্ষ্যে তারাই পেছন থেকে তথ্য সন্ত্রাসে মদদ যোগাচ্ছে। এই তথ্য সন্ত্রাসের শিকার আমি এবং আমার প্রিয় সংগঠন।

চট্টগ্রাম কোর্টে হাজিরা দিতে গিয়ে ২৭ আগস্ট সকালে কোর্টে যাবার আগে ডেইলী স্টার পত্রিকায় সাঁথিয়া উপজেলা আমীরসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে একটি সাজানো মিথ্যা মামলায় চার্জশিট দেয়ার সংবাদ দেখে মনে মনে একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলাম। মাত্র একটি উপজেলায় যদি ১১ জন মাঠকর্মীকে মামলায় জড়িয়ে হয়রানির শিকারে পরিণত করা হয়, তাহলে ওখানে সংগঠনের কী অবস্থা হবে? কোর্টে গিয়েই মিঠুকে এব্যাপারে দায়িত্ব দিলাম পাবনার সাথে যোগাযোগ করে প্রকৃত অবস্থা জানার। একটি মাত্র পত্রিকা ছাড়া আর কোন পত্রিকাতেই এখবর চোখে পড়েনি। কোর্টে বসে অনেক পত্রিকাই দেখার সুযোগ হয়। এবং পত্রিকার পাতা উল্টাতে উল্টাতে সময় কাটাতে হয়। পরের দিন ২৮ আগস্ট সকালে যুগান্তরের ভেতরের পাতায় একটা

www.pathagar.com

খবর দেখে আবার দুশ্চিন্তায় পড়ে যাই। খবরটি ছিল, আমেরিকার লুজিয়ানা স্টেটে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে ঘূর্ণিঝড় হ্যারিকেনের আশংকায়। ঘূর্ণিঝড়টি নিউ অরলিন্সের উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হানতে পারে। নিউ অরলিন্সে আমার বড় ছেলে নাকীবুর রহমান তারেক থাকে তার স্ত্রী ও দুইটি মেয়েসহ। পিএইচডির জন্যে যখন সে নিউ অরলিন্স ইউনির্ভাসিটি থেকে অফার পায় তার এক বছর আগে ওখানে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় হ্যারিকেন ক্যাটরিনায় জানমালের ব্যাপক ক্ষতির খবর আমার জানা থাকায় ছেলেকে ওখানে যেতে আমি মানাই করেছিলাম। কিন্তু তার কথা ছিল এরূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো আর সব সময় হয় না। ইতোমধ্যে আরো দুবার সেখানে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পূর্বাভাস ছিল। একবার তারা গাড়িতে মাল সামানা যা নেয়া যায় নিয়ে অন্যত্র সরে গিয়েছিল। দুর্যোগ কেটে যাবার পর ফিরে আসে। আর একবার কোথাও যেতে হয়নি। এবারের অবস্থা কী তা জানার জন্যে আমি মিঠুকে দায়িত্ব দিলাম, বাসায় ফোন করে খবর নিতে। মিঠু মোমেনকে ফোনে না পাওয়ায় আমি তাকে বললাম তার চাচীমার সাথে আলাপ করতে। জানা গেল এবার তাদেরকে সরে যেতে বলেনি। কিছুটা বাতাস বা ঝড়ো হাওয়া বইছে তবে বড় রকমের কোন বিপদের আশংকা তাদের এলাকায় নেই। আমি পরিবারের সকল সদস্যের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকি এবং আল্লাহর কাছে তাদের নিরাপত্তার জন্যে তাদের জানমাল ইজ্জত আবরুর হেফাজতের জন্যে সব সময়েই দোয়া করি। 'আল্লাহ যেন তাদের তাঁর পক্ষ থেকে নিরাপত্তার চাদরে আবৃত করে রাখেন, তাঁর পক্ষ থেকে রহমতের ছায়া তলে তাদেরকে আশ্রয় দিয়ে হেফাজত করেন।' প্রবাসী ছেলেমেয়ের জন্যে আরো একটু বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি কোন সমস্যার কথা শুনলে। তারেক আমার বড় ছেলে, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ সুনামের সাথেই শিক্ষকতা করছিল। ওখানে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তার ব্যাপারে একজন ভাল শিক্ষক হিসাবে প্রশংসা শুনে আল্লাহর শুকরয়া আদায় করেছি। স্বাভাবিকভাবে তার ব্যাপারে আবেগ একটু বেশি থাকা অস্বাভাবিক নয়। আমি জেলে, আর সে বিদেশে। মজলুম অবস্থায় দেশের জন্যে সংগঠনের জন্যে এবং পরিবারের জন্যে প্রায় সব সময়ই আল্লাহর কাছে দোয়া করে মনকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করি এবং অস্বস্তি কাটিয়ে হৃদয়ে প্রশান্তিও অনুভব করি। যাক ২৮ আগস্ট কোর্ট থেকে বের হবার অল্প আগে বিকেল সাড়ে ৪ টার দিকে মিঠু মোমেনের সাথে ফোনে কথা বলে এসে আমাকে জানাল, তারেকের সাথে ওখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ হয়েছে। তাদের কোন অসুবিধা হয়নি, আর ততক্ষণে বিপদসংকেত প্রত্যাহার করা হয়েছে। খবর শুনে মনের একরাশ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেলাম। আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে করতে প্রশান্ত চিত্তে আদালত থেকে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রত্যাবর্তন করলাম।

বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে সাড়ে ৯ টার মধ্যে কাসিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের উদ্দেশে চট্টগ্রাম ত্যাগ করার কথা। আর শনিবার পরিবারের লোকদের সাথে সাক্ষাতের নির্ধারিত দিন। তাদের সাথে সাক্ষাতের সময় তারেকের অবস্থা আরো বিস্তারিত জানার অপেক্ষায় রয়েছি। আগস্টের ২৬, ২৭ ও ২৮ তারিখ পর্যন্ত কোর্ট চলে এবং ১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর পরবর্তী তারিখ নির্ধারিত হয়। আমি ৩০ আগস্ট সকাল ১০টার দিকে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কাসিমপুর- ২ কেন্দ্রীয় কারাগারের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। এবারের চট্টগ্রাম যাওয়া-আসার সফরটা ছিল সাংঘাতিক বিরক্তিকর। ঢাকা ট্রাইব্যুনাল থেকে বিকেল সাড়ে ৪ টায় রওয়ানা করে রাত সাড়ে ১২ টায় চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছি। পথে তিনবার গাড়ী বন্ধ হওয়ায় মানসিক ভাবে কিছুটা হলেও চাপ অনুভব করি। ফেরার পথে ফেনীর পর থেকে কাসিমপুর-২ কেন্দ্রীয় কারাগারের সন্নিকটে কোনাবাড়ীর বাজার পর্যন্ত অভূতপূর্ব যানজটের মুখে পড়ি। সকাল ১০টায় রওয়ানা করে রাত সাড়ে আটটায় কাসিমপুর- ২ কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছি। রুমে পৌঁছতে রাত বেজে যায় নয়টা। মাগরিবের নামাজ গাড়িতেই আদায় করি টঙ্গি বাজারের কাছাকাছি এসে। আমার রুমে পৌঁছে রাতের খাবার খেয়ে এশার নামাজ আদায় করে ১০টা ৩০ মিনিটে রুমের ভেতরেই পায়চারী করে

www.pathagar.com

ঘুমোতে যাই। শনিবারে পরিবারের লোকদের থেকে তারেকের ওখানকার প্রকৃত অবস্থা জানার চিন্তা এখনও মাথায় থাকার ফলে এত ক্লান্তি সত্ত্বেও ঘুম আসতে বেশ সময় লেগে যায়।

পর দিন ৩১ আগস্ট শুক্রবার সারাটা দিনই বিশ্রামে কাটলেও তারেকের ওখানকার ঘূর্ণিঝড়ের প্রকৃত অবস্থা জানার চিন্তায় বিশ্রামও বিশ্রামের মত হল না। এরপরের দিন ১ সেপ্টেম্বর শনিবারের সাক্ষাতে মোমেন আসতে পারেনি, আমাদের মামলার ব্যাপারে ব্যস্ত থাকার কারণে। এবারে সে চট্টগ্রামও যেতে পারেনি। তাই বেশ অনেক দিনের ব্যবধান হয়ে গেছে, তার সাথে প্রয়োজনীয় কথাবর্তা বলার সুযোগ হয়নি। ৩ সেপ্টেম্বরে ট্রাইব্যুনালে মিসবাহুল ইসলাম এর জেরা শুরু হবার কথা। তার জবানবন্দীতে এমন সব বানোওয়াট তথ্য এসেছে যার দ্বারা তাকে ঘায়েল করা এবং জঘন্য মিথ্যা প্রমাণ করার সুবর্ণ সুযোগ আছে। এ সম্পর্কে আইনজীবীদের করণীয় সম্পর্কে আমার কিছু পরামর্শ দেবার ছিল। কিন্তু তার আর সুযোগ হল না।

বিগত ৩ ও ৪ সেপ্টেম্বর মিসবাহ সাহেবের জেরা করেন আমাদের আইনজীবী এডভোকেট মিজানুল ইসলাম। ৪ তারিখ ১টা পর্যন্ত জেরা অব্যাহত থাকে এবং পরবর্তী তারিখে নির্ধারিত হয় ১৬ সেপ্টেম্বর। মিসবাহ সাহেব সাক্ষী হিসাবে জবানবন্দী দিয়ে এবং আইনজীবীর জেরার পরিপ্রেক্ষিতে যা কিছু বললেন তা ইসলামের লেবাস পরে আপাদমস্তক মিথ্যাবাদী হিসাবে নিজেকে চিহ্নিত করার জন্যে যথেষ্ট। তিনি ইসলামী ছাত্র সংঘের কর্মী এমনকি সদস্য হবারও দাবি করেন। অথচ তার বক্তব্যে বেরিয়ে আসে ইসলামী ছাত্রসংঘের সেই সময়ের প্রাদেশিক সভাপতি কে ছিলেন তাও জানতেন না। তিনি ৬৫ সনে ইসলামী ছাত্রসংঘে যোগদান করেন। আর বলেন, তখন নাকি ইসলামী ছাত্র সংঘের পূর্বপাক সভাপতি ছিলেন মুহাম্মদ ইউনুস। আর আমি নাকি ছিলাম তার সাথে সম্পাদক। অথচ তখন সভাপতি ছিলেন একেএম নাজির আহমদ সাহেব। আর ঐ বছর নাজির সাহেবের সাথে কোন সম্পাদক বা সেক্রেটারী ছিল না। আমি অফিস সেক্রেটারী হিসাবে তাকে সহযোগিতা করতাম। মুহাম্মদ ইউনুস ১৯৬৯ সালের শেষের দিকে আমার সাথে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল হিসাবে কাজ শুরুর আগ পর্যন্ত ছিলেন চট্টগ্রামে। তিনি কোন দিনই প্রাদেশিক সভাপতি ছিলেন না। আর আমি তখন প্রাদেশিক সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করিনি। প্রাদেশিক সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছি প্রায় তিন বছর। এরপর কেন্দ্রীয় বা নিখিল পাক সভাপতির দায়িত্ব পালন করি দু'বছর। এবং ছাত্র সংগঠন থেকে অব্যাহতি পাই ১৯৭১ এর সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে।

মিসবাহ সাহেব বলেছেন '৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের নাকি অস্তিত্বই ছিল না। পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘ বলতে নাকি তিনি তার ভাষায় "আমরা পূর্ব পাকিস্তানের ইসলামী ছাত্রসংঘকেই বুঝতাম। মিসবাহ সাহেবের বক্তব্য তিনি ৬৫ সন থেকে ছাত্রসংঘের সাথে জড়িত হয়ে কর্মী থেকে সদস্য পর্যন্ত হন। অথচ তিনি খবরই রাখতেন না, আমার আগে যারা বিভিন্ন সনে এবং মেয়াদে নিখিল পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি হন, তারা সবাই ছিলেন তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের। '৬৫ সন থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর তারা পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন, সিলেটও সফর করেন। ইসলামী ছাত্রসংঘের সাথে কোন রূপ সম্পর্ক থাকলে এটা অবশ্যই তার জানার কথা।

আমি নিজে পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি হিসাবে ১৯৬৭ ও ৬৮ তে সফর করেছি। ১৯৭০ সালে সফর করেছি নিখিল পাক সভাপতি হিসাবে। তার সাথে কোথাও দেখা হয়েছে বলে মনে হয় না। তিনি সদস্য হবার কথা দাবি করেছেন। তার দাবি সত্য হলে অবশ্য আমার সাথে মৌলভীবাজার সফরে দেখা হত। এই দেখা হবার কথা তিনিও দাবি করেননি। আমার জানা মতে তিনি কখনও সদস্য তো দূরের কথা কর্মীও ছিলেন না; অতএব দেখা হবার প্রশ্নই উঠে না। তিনি শাহীন ফৌজকে ইসলামী ছাত্রসংঘের শিশু সংগঠন হিসাবে দাবি করেছেন, তার এ দাবিও ভিত্তিহীন। তদানীন্তন পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের বা পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের কোন শিশু সংগঠন ছিল না।

www.pathagar.com

তার দাবি, জামায়াতে ইসলামীর নাকি দুটি গঠনতন্ত্র ছিল, একটা আম জনতার, আরেকটি রোকনদের। একথাটাও কাল্পনিক এবং ভিত্তিহীন। তার দাবি জামায়াতে ইসলামীর নাকি পাকিস্তানের দুই অংশে দুটো আলাদা আলাদা ছাত্র সংগঠন ছিল। এটাও মিথ্যা ও বানোয়াট কথা ছাড়া আর কিছুই নয়।

একটু আগেই আমি বলেছি আমার উপরে ১৯৬৯ এর শেষের দিকে নিখিল পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের দায়িত্ব অর্পিত হবার আগ পর্যন্ত ১৯৬২ সন থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত তিনজন নিখিল পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলা সফর করেন। এদের মধ্যে শেখ মাহবুব আলী (করাচী) ৬১-৬৩ এবং ৬৩-৬৪ সেশনের সভাপতি হিসাবে ১৯৬৩ সালে ও ১৯৬৪ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন। তিনি ১৯৬৪ সালের ২ জানুয়ারী লক্ষাধিক মাদরাসা ছাত্রদের মিছিলেও যোগদান করেন, আর এজন্যে তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারেও যেতে হয়েছিল, ঐ মিছিলে নেতৃত্বদানের অভিযোগে। এরপর সাইয়্যেদ মুনাওয়ার হাসান সাহেব নিখিল পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি হিসাবে ১৯৬৫, ১৯৬৬ এবং ১৯৬৭ এই তিন বছরই তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপকভাবে সফর করেন। তারপর ১৯৬৮ সালে ও ১৯৬৯ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের নিখিল পাক সভাপতি হিসাবে পূর্ব পাকিস্তান সফর করেন ডঃ কামাল খান। ইসলামী ছাত্রসংঘের সাথে জড়িত থাকলে একথা বলতে পারতেন না যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ভিন্ন ভিন্ন নামে দুটি ভিন্ন প্রতিষ্ঠান ছিল। মিসবাহ সাহেব ছাত্রসংঘের সাথে জড়িত থাকলে এটাও নিশ্চিতই জানার কথা ছিল যে, আমি নিখিল পাকিস্তান সভাপতি হয়ে শুধু ঢাকায় বসে ছিলাম না বা পূর্ব পাকিস্তানে আমার কাজ সীমাবদ্ধ ছিল না। আমি ১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারী, মার্চ ও এপ্রিলের কিছু মিলিয়ে একটানা ৬৫ দিন তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের করাচী থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত সফর করেছিলাম। যে সফরের বিবরণী দৈনিক সংগ্রামে নিয়মিত প্রকাশিত হত। মিসবাহ সাহেবের উক্তি অনুযায়ী মৌলভী বাজারে সাপ্তাহিক জাহানে নও যেতো না। সংগ্রাম যেতো। যদি তিনি ছাত্রসংঘের সাথে সম্পৃক্ত থাকতেন, তাহলে অবশ্যই আমার এই সফরের খবর জানতেন, এবং আমার কর্মতৎপরতা শুধু পূর্ব পাকিস্তানে সীমাবদ্ধ ছিল, এই কথা বলতে পারতেন না।

তার 'চেক ডিস-অনার' প্রসঙ্গে তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা মূলত এই জঘন্য অপরাধ এর প্রকারান্তরে স্বীকৃতির পর্যায়ে পড়ে যায়। তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন লন্ডনে পাঠানোর জন্যে জনৈক ব্যক্তি থেকে তিনি ৭ লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু উক্ত অর্থ পাঠাতে না পারার কারণে সেই ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে মামলা করে। তিনি কোর্টে গিয়ে উক্ত চেকটি তারই বলে স্বীকৃতি দিয়ে কোর্টের মাধ্যমে ৭ লক্ষ টাকার সিংহভাগ পরিশোধ করে জামিন লাভ করেন। মাত্র ৩৪ হাজার টাকা বাকী থেকে যায়। এমন প্রতারককে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী বানিয়ে সরকার আমার চরিত্র হননের জঘন্য পথ বেছে নিয়ে নিজেদের মুখোশ উন্মোচন করলেন। চূড়ান্ত পরিণতিতে সরকারের রাজনৈতিক দুরভিসন্ধির মুখোশও আল্লাহ একদিন অবশ্যই উন্মোচিত করে ছাড়বেন, এটাই আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

ট্রাইব্যুনালের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব নিজামুল হক নাসিম আমাদের আইনজীবীকে মেসবাহ সাহেবের পক্ষ নিয়ে জেরায় বাধা সৃষ্টি করেন অত্যন্ত ন্যক্কারজনকভাবে। ট্রাইব্যুনালের চেয়ারে বসেও তিনি নিরপেক্ষ হতে পারেননি। তার কার্যক্রম দেখে মনে হয় এখনও তিনি 'ঘাদানিক' এর মেম্বার সেক্রেটারী হিসাবে তাদের সেই সাধের 'গণআদালত'ই চালাচ্ছেন। তখন ছিল ওটা মকট্রায়াল, এখন সরকারি সিদ্ধান্তে অফিসিয়াল পজিশন নিয়ে মনের সুখে সেদিন যা করতে পারেননি আজ তা করার সুযোগ পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যা খুশি তাই করে যাচ্ছেন।

মিসবাহকে সাংঘাতিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে, কারণ একদিকে সে নিজেকে স্বঘোষিত ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান বলছে। দেশের সর্ববৃহৎ ইসলামী সংগঠন এবং তৃতীয় রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে মেকি হলেও একজন ইসলামী দলের নেতাকে দিয়ে সাক্ষী দেয়ানোর সুযোগ ইসলাম বিরোধী মহলের কাছে অনেক বড় একটা ব্যাপার। সেই সাথে সে আবার দাবি করছে ইসলামী ছাত্রসংঘের কর্মী

www.pathagar.com

থাকায় মিডিয়া তাকে ইসলামী ছাত্রসংঘের সদস্য বলে চালিয়ে দিয়ে দারুণ আনন্দ অনুভব করছে। তবে আল্লাহর মেহেরবাণী, তার উক্ত বক্তব্য স্ববিরোধিতায় ভরপুর হওয়ায় সে যে ইসলামী ছাত্রসংঘের কর্মী সদস্য তো দূরের কথা একজন সমর্থকও ছিল না তা বুঝা যায়। ঐ সময়ে ইসলামী ছাত্রসংঘের প্রতিপক্ষ সংগঠনের লোকেরা ইসলামী ছাত্রসংঘ সম্পর্কে যতটা খবরাখবর রাখত, মেসবাহর তাও জানা ছিল না। তার গোটা মন্তব্য থেকেই তা প্রমাণিত হয়।

৪ সেপ্টেম্বরে কোর্টে আমার পক্ষ থেকে দাঁতের চিকিৎসার জন্যে ২ দিনের মুলতবির আবেদন করা হয়। সৌভাগ্যক্রমে মিসবাহ সাহেব ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় দিতে পারবেন না বলে জানানোর কারণে ১৬ সেপ্টেম্বরে পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ করেন মাননীয় আদালত। আমার পক্ষ থেকে আবেদন হয়ত বিবেচনায় নেয়া হত না। কিন্তু মিসবাহ সাহেবের অপারগতার কারণে আমি দাঁতের চিকিৎসার সুযোগ পাওয়ার জন্যে আল্লাহর দরবারে জানাই লাখো শুকরিয়া।

জেল কর্তৃপক্ষকে আগেই জানিয়ে গিয়েছিলাম ৫ এবং ৬ সেপ্টেম্বর আমার পক্ষ থেকে কোর্টে মুলতবি জানানো হবে, যদি মঞ্জুর হয় তাহলে ৫ সেপ্টেম্বর যেন আমাকে বারডেমে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

আমার ছেলে ব্যারিস্টার নাজিব মোমেন ট্রাইব্যুনালে থেকেই কাসিমপুর- ২ কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার ফোন করে এটা জানিয়ে দেয়। জেল কর্তৃপক্ষও তাৎক্ষণিকভাবে বারডেম হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট বিভাগে যোগাযোগ করে আমার জন্যে সময় নেন। ৫ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ৭ টার দিকে বারডেমের উদ্দেশ্যে কাসিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার- ২ থেকে রওয়ানা করে সোয়া দশটার দিকে বারডেমে পৌঁছাই। কিছু আনুষ্ঠানিকতা সেরে দন্তচিকিৎসা বিভাগীয় প্রধানের রুমে পৌঁছি। তার রুমে পৌঁছতেই মনে হল তিনি আগে থেকেই তৈরি হয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। বছর খানেক আগে দুবার তিনি আমার দাঁতের অবস্থা দেখেছিলেন। রুমে ঢুকতেই ডেন্টাল চেয়ারে আমাকে বসিয়ে দাঁতের অবস্থা দেখে বললেন দাঁতটা ফেলে দিতে হবে। আমি সম্মতি দিতেই দাঁত ফেলার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শেষ করে দাঁতটা এমন দক্ষভাবে তুললেন যে আমি মোটেই টের পাইনি। এনেসথেসিয়া দিতে একটু ব্যথা লাগার কথা, তাও টের পাইনি। ১০:৪৫ ঘঃ এর মধ্যে আমার দাঁত তোলার পর্ব শেষ হয়। তবে এবারে পরিবারের কাউকে কাছে আসতে দেয়া হয়নি। কোর্ট অর্ডার অনুযায়ী ইতঃপূর্বে চিকিৎসা হয়েছে আমাদের নিজ খরচে। এবার নতুন সিদ্ধান্ত অনুসারে খরচ কারা কর্তৃপক্ষ দেবে। কাজেই পরিবারের কেউ ধারে কাছেই আসতে পারবে না। আমার স্ত্রী, ছেলে এবং ভাতিজা মিঠু এসেছিল। মিঠুকে আমি নিজেই বলে দিলাম, "তোমার চাচিমা এবং মোমেনকে বলে দাও আমার কাছে যেন না আসে। দন্ত বিভাগের প্রধান আমার স্ত্রী এবং ছেলেকে চেনেন। তিনি নিজেই আমার সাথে যাওয়া ডেপুটি জেলারকে বললেন, উনার মিসেস কি আসতে পারবে না? আমি অনুভব করলাম আমার বেগম সাহেবা বিভাগীয় প্রধানের রুমের দরজায় করিডোরে দাঁড়িয়ে মিঠুর সাথে কথা বলছে। ডেপুটি জেলার মানা করায় আমি তাদের আসতে না করে দিলাম।

কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হল, আমার পরিবারের লোকদেরকে ওষুধ কিনে দিতে দিল না। নিজেরাও বারডেমে ফার্মেসী থেকে ওষুধ দিল না। বলল কারাগারে পৌঁছার সাথে সাথে ওষুধের ব্যবস্থা করবে। আমার বেগম সাহেবা ওষুধের নাম জানতে চাইলে বলা হল ওষুধের নামও বলা যাবে না।

বেলা দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে কাসিমপুর- ২ কেন্দ্রীয় কারাগারে ফিরে আসি। আমি ডেপুটি জেলারকে বললাম, আমার পরিবারকে ওষুধের ব্যবস্থা করতে না দিলেও আপনারা তো বারডেম ফার্মেসী থেকে ওষুধ আনতে পারতেন। আমার তো এখনই ওষুধ লাগবে। প্রকাশ থাকে যে, বারডেম হাসপাতালের গেটে অনেকক্ষণ গাড়ীতে বসে আমাকে অপেক্ষা করতে হয়। আমার পরিবারের লোকদেরকে সুযোগ দিলে ঐ সময়ের অন্তত অর্ধেকের মধ্যেই ওষুধের ব্যবস্থা করতে পারত। নিজেরা ইচ্ছা করলেও আনতে পারত।

www.pathagar.com

তারা প্রয়োজন ছাড়াই দীর্ঘক্ষণ হাসপাতাল গেটে বিলম্ব করায় সাথের পুলিশের লোকরা বিরক্তি প্রকাশ করে।

যাহোক ডেপুটি জেলারের ওয়াদা মতে জেলে ফেরার সাথে তো নয়ই দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত ওষধ না পেয়ে একজন সিআইডি জমাদার মাধ্যমে খবর পৌঁছাই যে আমার দাঁতের ব্যথা শুরু হয়েছে, ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ওষুধটা যেন তাড়াতাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা হয়।

আমি একটা ওষুধের প্যাকেট পেলাম বিকেল সাড়ে ৪ টার দিকে। ওষুধটা বারডেমের ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রে উল্লেখিত ঔষুধ নয়। দ্বিতীয় ওষুধ কারা হাসপাতালের ফ্রি ওষুধ যার গুণগত মান খুবই নিম্ন। আমি ডেপুটি জেলারকে বলেছিলাম, বারডেমের ফার্মেসী থেকে ওষুধ যখন দিলেন না, তখন আমাকে বাইরে থেকে ওষুধ কিনে দিতে হবে। কারা হাসপাতালের ওষুধ নিম্নমানের হয়ে থাকে এটা আপনিও জানেন। তাই কারা হাসপাতালের ওষুধ যেন আমাকে দেওয়া না হয়। আমি আরো প্রায় ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা অর্থাৎ দাঁত তোলার পর থেকে প্রায় ৬ ঘণ্টারও বেশি সময় ওষুধ ছাড়া থাকার কারণে বেশ অস্বস্তি বোধ করতে থাকি। এবং অগত্যা ঐ বিকল্প এবং নিম্ন মানের ওষুধই বিকেলে, রাতে এবং সকালে গ্রহণ করি। বিকেলে আল্লাহর রহমতে পরিবারের পক্ষ থেকে ওষুধ পাঠানো হয়, তাই রাত থেকে আসল ওষুধ খাওয়া শুরু করি। আলহামদুলিল্লাহ, দাঁত তোলার পরে আর কোন সমস্যা দেখা দেয়নি। শনিবার ৭ সেপ্টেম্বরে পরিবারের লোকেরা সাক্ষাৎ করতে আসে। এবারে আমার বড় জামাই সাইফুল্লাহ মানসুরও আসে। এবারের সাক্ষাতে ছেলেদের, প্রবাসীদের কারো কারো পাসপোর্ট নিয়ে ঝামেলা হবার খবরে মনটা বেশ খারাপ হল। পাসপোর্ট নবায়নের ক্ষেত্রে ঠিকানা পরিবর্তনের কারণে পুলিশ ভেরিফিকেশনের রিপোর্ট দরকার হয়ে পড়েছে। আমার কারণে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তারা রিপোর্ট দিতে অনীহা প্রকাশ করছে। এটা যে কত বড় অমানবিক ও নিষ্ঠুরতা তা অন্তর দিয়ে অনুভব করা যায়, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সাক্ষাৎ থেকে ফিরে এসে এই সমস্যা নিয়ে চিন্তা করছি, আর আল্লাহর দরবারের ফরিয়াদ করছি। এর মধ্যে গতকাল দুপুরে খাবারের সময় খবর পেলাম আমাকে নাকি পাবনা কোর্টে হাজিরা দিতে হবে আগামী অক্টোবর মাসে। এখান থেকে চট্টগ্রামের দূরত্ব পাবনার তুলনায় বেশি হলেও যাওয়া আসায় সময় বেশি লাগলেও এই পথে যে সুবিধাটা হয় পাবনার পথে সেই সুবিধা নেই। পাবনা আমার নিজের জেলা শহর হলেও, আমি পাবনার পথঘাট খুব একটা চিনি না। পথে ইস্তেঞ্জা, অজু, নামাজ ও খাওয়ার যে সুবিধা চট্টগ্রামের পথে আছে, সেই সুবিধা পাবনার পথে আমার জানা মতে নেই।

তাই এ খবরটা আসায় দুশ্চিন্তায় নতুন একটা মাত্রা যোগ হল। যে মামলাটিতে হাজিরা দিতে যেতে হবে সেটা ১/১১ এর সময়েই হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মামলার বাদী মামলাটি দিয়ে ব্ল্যাক মেইলের চেষ্টা করে, আমাদের লোকদেরকে ভয় দেখিয়ে মোটা অংকের টাকা দাবি করে। তার দাবি পূরণ করলে হয়ত আর কোন ঝামেলাই হত না। কিন্তু নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের লোকেরা এটা পছন্দ না করাতেই অবশেষে মামলাটা আমলে নেয়া হয়েছে। আমার মনে হয়েছে তথাকথিত যুদ্ধাপরাধের মামলায় পাবনা ও সাঁথিয়া বেড়া থেকে আমার বিরুদ্ধে কোন সাক্ষী হাজিরা করতে না পারার কারণেই সরকার আমাকে হয়রানি করার জন্যে এই মামলাটি সাজিয়েছে। আল্লাহ আলেমুল গায়েব, সকলের মনের গোপন ইচ্ছা সম্পর্কে তিনি সবচেয়ে বেশি ওয়াকেফহাল, তিনি অভয়বাণী শুনিয়েছেন। "আল্লাহু তোমাদের দুশমনদের ব্যাপারে (তোমাদের চেয়েও) অনেক বেশি ওয়াকেফহাল। তোমাদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী হিসাবে তিনিই যথেষ্ট।"

পাবনার আদালতে হাজিরা দিতে গেলে পথের কষ্টের কথা এবং ওখানকার জেলখানার পরিবেশের কথা চিন্তা করে কিছুটা দুশ্চিন্তা হলেও দুই বছর তিন মাস পরে এক অছিলায় নিজের জেলা সচক্ষে দেখতে পাব এবং নিজের এলাকার উপর দিয়েই যাওয়া আসার সুযোগ হলে মনে কিছুটা হলেও আবেগাপ্লুত ভাব অনুভব হতে পারে। নিজের চোখে এত দিন পরে নিজের এলাকার দৃশ্য দেখে কিছুটা হলেও মনে তৃপ্তি

www.pathagar.com

লাগতে পারে। তাই আল্লাহর উর ভরসা করে, তারই উপর সব কিছু সোপর্দ করে মনকে কিছু সান্ত্বনা দেবার প্রয়াস পাই। মাবুদ আল্লাহ ভাগ্যে কী রেখেছেন, তা তো কেবল তিনিই জানেন। তবে তারই আশ্বাস বাণী, "অবশ্যই কঠিন সময়ের পরেই রয়েছে সুসময়। সন্দেহ নেই কঠিন সময়ের পরেই আসবে সুসময়।"

আল্লাহর রাসূল (সা.) তো বলেছেন "সবচেয়ে বেশি বিপদ আপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে নবী রাসূলগণ, তারপর সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে তারা যারা নবী রাসূলদের অনুসরণের দিক দিয়ে যত বেশি অগ্রসর। রাসূল (সা.) এও বলেছেন মুমিনের বিপদ আসতে এমন অবস্থা হয় যে, তার আর কোন গোনাহই অবশিষ্ট থাকে না। আল্লাহ যদি দয়া করে আমাকে এদের অন্তর্ভুক্ত করেন তাহলে চিন্তার আর কী থাকতে পারে? তবে খালেদের ব্যাপারে দুশ্চিন্তামুক্ত হতে পারছি না। ১/১১ এর সময় প্রথম দফায় ৫৬ দিন এবং দ্বিতীয় দফায় ১১ দিন কারাবন্দী ছিলাম। এ সময় ভাইদের মধ্যে সে একা ছিল ঢাকায়। তখন আমাকে নিয়ে তার যে আবেগপূর্ণ ব্যস্ততা দেখেছিলাম সেটাই বার বার মনে পড়ছে। রাতে গ্রেফতার হয়ে প্রথমে ক্যান্টনমেন্ট থাকায় রাত কাটানোর পর সকালেই কোর্টের মাধ্যম কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়। রাতেই সে বড় জামাইসহ ক্যান্টমেন্ট থানায় পৌঁছে কাপড় চোপড়সহ একটা ছোট সুটকেস দিয়ে আসে। পরের দিন ফজরের পরপরই নাশতা নিয়ে ক্যান্টনমেন্ট থানায় হাজির হয় এবং আমার ব্লাড প্রেসার চেক করে আবার কোর্টে হাজির হয়। কোর্টে ভিড় ঠেলে, দলীয় কর্মীদের মধ্য দিয়ে আমার কাছ পর্যন্ত না আসতে পারলেও তার দৃষ্টি সারাক্ষণ ছিল আমার দিকে। আমি মনে মনে বেশ কষ্ট অনুভব করছিলাম, ওকে দেখলাম কিন্তু কাছে ডেকে নিয়ে কিছু বলতে পারলাম না।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারগারে এসেই জেল সুপারকে বললাম, আমার ছেলে কোর্টে এসেছিল, সেও আমাকে দেখেছে আমিও তাকে দেখেছি, কিন্তু কথা বলতে পারিনি। আমার পারিবারিক সাক্ষাতের ব্যবস্থা আজকেই করতে পারেন কিনা। জেলসুপার কথা দিলেন এবং বিকেল তিনটায় খালেদ তার মা ও বোনকে সাথে নিয়ে এসে দেখা করে যাওয়ায় সেদিন আমি মনে স্বস্তি ফিরে পেয়েছিলাম। কিছু দুঃশ্চিন্তার উদয় হয়েছিল মনে। খালেদ তার স্ত্রী ও মেয়েকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল। বউমার ছেলে হয়েছে।

আজ ১১ই সেপ্টেম্বর ২০১২ (মঙ্গলবার)। ১৫ই সেপ্টেম্বর শনিবারে আমার পারিবারিক সাক্ষাতের নির্ধারিত দিন। পরের দিন অর্থাৎ ১৬ই সেপ্টেম্বর ট্রাইব্যুনালে সাক্ষী মিসবাহ সাহেব এর জেরার দিন, ১৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্তও এটা চলতে পারে। আবার চট্টগ্রামে কোর্টে হাজিরা দেয়ার পূর্বঘোষিত তারিখ হচ্ছে, ১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর। এ জন্যে চট্টগ্রামে পৌঁছাতে হবে ১৮ই সেপ্টেম্বর। ট্রাইব্যুনাল চাইলে ১৮ই সেপ্টেম্বরেও সাক্ষীর জেরা অব্যাহত রাখতে পারেন। মিসবাহ সাহেবের জেরা শেষ হলে নতুন সাক্ষী আসতে পারেন। আগস্ট মাসের ২৬ তারিখ ট্রাইব্যুনালে সোয়া ৪ পর্যন্ত কার্যক্রম চলে, আর আমাকে চট্টগ্রামের উদ্দেশে রওয়ানা করতে হয় সাড়ে ৪ টায়। পথে তিনবার গাড়ী বন্ধ হয় অবশেষে রাত সাড়ে ১২ টার দিকে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছি। এবারও যদি ১৮ই সেপ্টেম্বরে ট্রাইব্যুনালে হাজির হতে হয় তাহলে গত তারিখের মতই চরম কষ্ট করে যেতে হবে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে, রাত যতই হোক না কেন।

চট্টগ্রামে কোর্ট ২ দিন চলার কথা। তবে জজ সাহেব চাইলে আবার ২/১ দিন বেশিও চালাতে পারেন। এ পর্যন্ত এরকমই হয়ে আসছে। ১৮ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম গিয়ে ২১ সেপ্টেম্বরেই ফিরে আসার কথা। এটা নির্ভর করছে জজ সাহেবের মর্জির উপর।

আমার উপর আল্লাহ সুবহানাহুতায়ালার বিশেষ মেহেরবাণী, আমার এবং আমার স্ত্রীর ব্যস্ততম জীবনেও ছয়টি ছেলে মেয়েকে মোটামুটি ভাল ভাবেই মানুষ করতে প্রয়াস পেয়েছি। তাদের একাডেমিক গঠনের সাথে সাথে দ্বীনের দৃষ্টিকোণ থেকেও মোটামুটি আদর্শ সন্তান রূপে গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। বড় মেয়েটি স্বামীর সাথে ঢাকাতেই আছে, একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছে, দ্বীনের পথেও বেশ

www.pathagar.com

অগ্রসর। বাকী চারটি ছেলে এবং ছোট মেয়েটা দেশের বাইরে। আমার গ্রেফতারের ছয় মাস আগে দ্বিতীয় ছেলেটা দেশে আসে বার এটল ডিগ্রী নিয়ে। তার আসার অল্প আগে তৃতীয় ছেলেটা স্ত্রী ও মেয়েসহ অস্ট্রেলিয়ায় চলে যায়। বাসায় থাকতে এদের সাথে প্রতিদিনই প্রায় ফোনে কথা হত বা অন-লাইনে দেখা হত।

জেলে দুই বছর তিন মাস কেটে গেল। বাইরে যারা আছে তাদের কে কেমন আছে এটা জানার সুযোগ হয় কেবলমাত্র সাপ্তাহিক পারিবারিক সাক্ষাতের দিনে। তাই সপ্তাহের এই একটি দিনের কদর এখন অনেক বেশি। সপ্তাহের সাত দিন যেন শেষ হতে চায় না। এই সাতটা দিন বছরের মত মনে হয়। অথচ সাক্ষাতের ৩০ মিঃ সময় যেন স্বপ্নের মত নিমিষেই শেষ হয়ে যায়।

আজ বিকেলে খালেদের কোন খবর পাব বলে আশা করেছিলাম। কিন্তু সারা দিন শেষেও কোন খবর পেলাম না। আর জেলখানার এটাই বড় সমস্যা। কোন বিপদ আপদ বা জরুরি প্রয়োজনের মুহূর্তে পরিবারের সাথে বা নিকট আত্মীয়-স্বজনের সাথে যোগাযোগের কোন উপয় নাই। কোর্টে আইনজীবী হিসাবে আমার ছেলেটা আসে। মনে করেছিলাম কেউ কোর্টে গেলে তার কাছ থেকে কোন খবর আসতেও পারে। কিন্তু না এ পর্যন্ত কোন খবর নেই। আজকেও মগজে একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে ঘুমোতে যেতে হবে। অথচ আমার মাথায় কোন চিন্তা ঢুকলে আর আমার পক্ষে কখনই ঘুমানো সম্ভব হয় না।

আল্লাহ আমাকে সন্তান হিসাবে দিয়েছেন সোনার টুকরো ছয়টি ছেলে মেয়ে। তাদের কারো কোন অসুবিধার কথা শুনলে আমি শত চেষ্টা সত্ত্বেও শান্তিতে ঘুমাতে পারি না। দুশ্চিন্তা মুক্ত হতে পারি না। শুধু মাত্র ঠিকানা পরিবর্তনের কারণে পুলিশ ইতিবাচক রিপোর্ট দিতে গড়িমসি করছে। এটা যেমন অযৌক্তিক তেমনি অন্যায় এবং জুলুমের পর্যায়ে পড়ে। ইতঃপূর্বে আমার নিজের পাসপোর্টের ক্ষেত্রে বহুবার ঠিকানা পরিবর্তনের ঘটনা ঘটেছে, যখন ভাড়া বাড়িতে থাকতাম। ছেলের এবং তার স্ত্রী ও মেয়ের পাসপোর্ট যখন হয় তখন মগবাজার ভাড়া বাড়িতে থাকতাম। এখন নিজের বাসায় গিয়েছি। রিপোর্টটা না দিয়ে একজনের জীবনকে বিপদগ্রস্ত করার মতই অমানবিক। তবে যদি রাজনৈতিক আক্রোশের কারণেই এমনটা হয়ে থাকে তাহলে তো কিছুই করার নেই। যেমন তালহার ব্যাপারে কোর্ট অর্ডারের পরেও কোর্টের দেয়া সময় সীমার মধ্যে পাসপোর্ট দেয়নি। দূতাবাসে তাকে ঢুকতেও দেয়নি। তবে উকিল নোটিশ পাবার পর ডেকে নিয়ে পাসপোর্ট দেবার ওয়াদা করে, আইনী পদক্ষেপ না নিতে অনুরোধ করেছে। শুনেছি, তাকে পাসপোর্টের নাম্বার দিয়েছে ২/১ দিন পরেই দিয়ে দেবে। খালেদের ব্যাপারে কী করা যায় বুঝে আসছে না, আগামী সাক্ষাতে সবার সাথে আলাপ করে একটা পথ বের করতে হবে।

সিনিয়র জেল সুপার এবং জেলার আজ সকাল ১০টার দিকে এসেছিলেন। এটা প্রতি বৃহস্পতিবারে তাদের রুটিন ওয়ার্ক। আমরা এতদিন ৭টা ৪৫ মিঃ এশার ফরজ নামাজটা আদায় করে রুমে ঢুকতাম এবং রাত ৮টায় লক আপ হত। কদিন থেকে পত্রিকার লেখালেখিকে কেন্দ্র করে ৭টায় লক আপের নির্দেশ হয়। এতে আমাদের এশার নামাজটা জামায়াতে আদায় করা হচ্ছে না। আমি তাদের আগমনের সুযোগে কথাটা তুললাম। সেই সাথে এটাও বললাম যে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে থাকতে ২৬ সেলের বারান্দার লক আপ বিকেল ৬টায় হলেও আমাদের রুম লক আপ হত রাত ৯টায়। ইতোমধ্যে আমরা এশার নামাজটা জামায়াতে আদায় করে, রাতের খাবার খেয়ে, কিছুক্ষণ হাঁটার সুযোগ পেতাম। উনারা বললেন, ইতোমধ্যে দু'জন জেলসুপার তৌহিদ সাহেব ও পার্থ বাবুর বিরুদ্ধে নাকি মামলা হয়েছে। আমাদেরকে একটু বেশি সুযোগ-সুবিধা দেবার অভিযোগেই নাকি এমনটি হচ্ছে। তাই উনারা বেশ চাপে এবং অসুবিধায় আছেন। তারপরও আমার কথা বেশ ধৈর্যের সাথে শুনলেন এবং খোঁজখবর নিয়ে দেখবেন কী করা যায়। সুপার সাহেব নিজেই বললেন, নিচে বারান্দা লক আপের পর তো আর নিরাপত্তার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন থাকার কথা নয়, তারপরও আমাদের ব্যাপারটি নিয়ে নাকি একটু বেশি

www.pathagar.com

সতর্কতার নির্দেশ আছে। অন্য দিকে আমরা নাকি একটু বেশি সুযোগ সুবিধা ভোগ করছি এই ব্যাপারে প্রচার প্রপাগাণ্ডাও আছে।

খালেদের পাসপোর্টের ব্যাপারে মনে হচ্ছে আগামী শনিবারের আগে কোন খবর পাব না। এ কদিন যে আমার কিভাবে কাটবে, শনিবারে যে খবর পাব, তাও ইতিবাচক হবে, না নেতিবাচক হবে, কল্পনার জগতে মনটা এ বিষয়ে ছুটাছুটি করছে। সন্তানদের প্রতি মায়া, মমতা আবেগ অনুভূতি তো আল্লাহ প্রদত্ত। এর ঊর্ধ্বে উঠা কোন সংবেদনশীল মানুষের পক্ষেই বোধহয় সম্ভব নয়। অন্তত আমার নিজের বেলায় তো আমি শত চেষ্টা করে এ ব্যাপারে আমার মনকে দুশ্চিন্তা থেকে কোনভাবেই মুক্ত রাখতে পারছি না। এই মুহূর্তে কোরআন তেলাওয়াত দোয়া কালামের মাধ্যমে মনকে একটু হালকা করার চেষ্টা করছি। আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা নিয়ে দোয়া করছি, আল্লাহ মজলুমের দোয়া ফেরৎ দেবেন না, এ বিশ্বাসটাই হতাশা নিরাশা থেকে বাঁচার একমাত্র উপায়। আল্লাহ সুবহানাহুতায়ালার নির্দেশ। "কাফের এবং মুনাফিকদের আনুগত্য করো না। তাদের নির্যাতন, নিপীড়নকে উপেক্ষা করে, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল কর। আল্লাহই তোমাদের উকিল হিসাবে যথেষ্ট।" আজকের এই মুহূর্তে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত এই নির্দেশনা অন্তরের গভীরে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। আল্লাহ তার দুর্বল মজলুম বান্দাদের ফেলে দেবেন না, এ বিশ্বাসই এখন একমাত্র সম্বল।

বিকেলে একটু আশার কথা শুনতে পেলাম। মিঠু নাকি কাকে বলেছে, খালেদের পাসপোর্টের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, আমি যেন এনিয়ে আর দুশ্চিন্তা না করি। ভালো খবর অসমর্থিত হলেও ভাল লাগে। মনে একটু স্বস্তি ফিরে পেলাম। এই আশা যেন পূরণ হয়, আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানানোর সাথে সাথে সেই দোয়াও করছি। আশাকরি আল্লাহ নিরাশ করবেন না।

আজ মোল্লা সাহেবের কোর্ট বেলা ২টা থেকে শুরু হবার কথা। তাই ফিরতে বেশ বিলম্ব হওয়াই স্বাভাবিক। তবে এখন সময় সন্ধ্যা ৭টা, তিনি কোর্ট থেকে ফিরে আসেননি। আশা ছিল মোল্লা সাহেবের সাথে কোর্টে আমার ছেলে ব্যারিস্টার নাজিবের দেখা হতে পারে। যদি দেখা হয়, তাহলে কোন খবর থাকলে তাও জানাবে। কিন্তু মোল্লা সাহেব এখনও এসে পৌঁছেননি। আসার পরে তার কাছে, কোন খবর থাকলে তা জানা যাবে। গত রাতে লক আপের পরে মোল্লা সাহেব আসার কারণে রাতে আর দেখা হয়নি, কথাও হয়নি। কোর্টে মোমেনের সাথে দেখা হয়ে থাকলে বা কথা হলে আজ সকালে মোল্লা সাহেব এসে নিশ্চয়ই কিছু জানাতো। মোল্লা সাহেব এখন পর্যন্ত দেখা না করার অর্থ তার কাছে কোন খবর নেই। গতকাল বিকেলে মিঠুর বরাত দিয়ে যে খবরটা পেলাম তা কতটা সঠিক সে সম্পর্কে এখনও সংশয় মুক্ত হতে পারছি না। তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে সব সময়ই ভাল কিছুই আশা করি।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ২৬ সেলে যতদিন ছিলাম লক আপ ছাড়া বাকী সময়টা মোটামুটি একটা অন্তরঙ্গ পরিবেশে কাটতো। একে অপরের সাথে ব্যক্তিগত পারিবারিক সমস্যা থেকে শুরু করে সব বিষয়েই মতবিনিময় করা যেতো। গাজীপুর জেলা কারাগারে ২৭ দিন ছিলাম একদম নিরিবিলি পরিবেশে। এমন একাকীত্ব আর কোথাও কোনদিন অনুভূত হয়নি। এখানে কাসিমপুর- ২ কেন্দ্রীয় কারাগারে আমি তৃতীয় তলায় আছি। কামারুজ্জামান ও মোল্লা সাহেব দ্বিতীয় তলায়। তৃতীয় তলায় আমার পাশের রুমে আছেন গিয়াসুদ্দিন মামুন। জোহর, আসর ও মাগরিব একসাথে আদায় করি। কিছু দিন আগ পর্যন্ত এশার ফরজটা একসাথে আদায় করতাম। কদিন হল এশার নামাজ আর জামায়াতে আদায় করা হচ্ছে না। কারণ ৭টায় লক আপ করা হয়। পত্রিকায় একটা ভুয়া খবরের ভিত্তিতে জেল কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা এনিয়ে কথা বলেছি, এখনও সিদ্ধান্ত বদলায়নি।

জোহরের নামাজ শেষে দুপুরের খানাটা এক সাথেই হয়। আসরের নামাজ শেষে যার যার মত কেউ হাঁটে কেউ ব্যায়াম করে। মাগরিবের জামায়াত শেষে একসাথে একটু হালকা নাশতার সাথে চা খেয়ে আগে সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টায় বিবিসি শুনে ৭:৪৫ মিঃ এশার ফরজ নামাজটা আদায় করে যে যার রুমে যেতাম।

www.pathagar.com

এখন মাগরিবের পর চা নাশতা সেরেই রুমে ঢুকতে হয়। সকাল থেকে জোহরের আগ পর্যন্ত এই লম্বা সময়টা একেবারে একা একা কাটে। কারো সাথে কারো দেখা সাক্ষাৎ বা মতবিনিময়ের কোন পরিবেশ এখানে নেই। মোল্লা সাহেব যদি মাগরিবের একটু আগে আসতেন তাহলে নামাজের সময় দেখা হত। কোর্টের খবরসহ অনেক কিছুই জানা যেত। আজ শুক্রবার। কিন্তু বন্দী জীবনে এখানে এই জেলখানায় এবং গাজীপুরে থাকতে জুমআর নামাজ আদায়ের কথা ভুলে গেছি। বাইরে থেকে জুমআর আজান কানে আসলে মনের মাঝে কেমন যেন একটা অব্যক্ত ব্যথা বেদনা অনুভব করি। কবে আবার জুমআর নামাজ আদায়ের সুযোগ পাব তাতো আল্লাহ ছাড়া কারো জানা নেই। আল্লাহর কাছেই এ সুযোগ পাওয়ার জন্যে দোয়া করছি।

আজকের সাক্ষাতে জানা গেল, খালেদের ব্যাপারে যে আশাব্যঞ্জক খবর শুনেছিলাম তা সঠিক নয়। পুলিশের ভেরিফিকেশন রিপোর্টটা এখনও যায়নি। গত দুদিন একটু আশার বাণী শুনে মনটাকে হালকা করেছিলাম, আজকে আবার নতুন করে দুশ্চিন্তায় পেয়ে বসল। আল্লাহ আমার জন্যে সন্তানদের পরীক্ষায় যেন না ফেলে এ জন্যে বার বার তাঁর দরবারে দোয়া করছি। আল্লাহ তো দোয়া করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং দোয়া কবুলের আশ্বাসও দিয়েছেন। দুদিন আগে হোক আর পরে হোক আল্লাহ প্রদত্ত আশ্বাস বাস্তবে রূপ নেবে ইনআশাল্লাহ। এই আশ্বাস বাণী স্মরণ করেই মনের সকল দুশ্চিন্তা দূর করার চেষ্টা করছি। আল্লাহর দরবারে নিজের মনের কামনা বাসনা চাওয়া পাওয়া পেশ করতে পারলেই মনে শান্তি ও স্বস্তি ফিরে পাই। দোয়ার ব্যাপারে যেন কখনো শৈথিল্য না আসে, সেজন্যেও আল্লাহর সাহায্য কামনা করছি। আমার স্ত্রী, বড় মেয়ে এবং ছেলে বলে গেল কোন সমস্যা নেই। সে এখন দেশে না এসে পরে আসুক। তার ওখানে থাকতে কোন সমস্যা নেই। তাদের কথাও যেন সঠিক হয়, এজন্যে আল্লাহর কাছে আবার আমার আকুতি জানাই।

চট্টগ্রামে যাওয়া-আসার বিড়ম্বনা- ০৯

২৭, ২৮ ও ২৯ শে জানুয়ারী ২০১৩ ছিল চট্টগ্রাম আদালতে হাজিরার নির্ধারিত তারিখ। এ জন্যে ২৬ শে জানুয়ারী সকাল সাড়ে ৯ টা থেকে ১০ টার মধ্যে রওয়ানা করার কথা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন বিশেষ কারণে পুলিশ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের ফলে রওয়ানা দিতে হল ১২-১৫ মিনিটে। যাহোক, দেরিতে রওয়ানা করলেও মোটামুটি ভালো ভাবেই চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছি রাত ১১-৩০ টার দিকে। টানা তিন দিন কোর্টের হাজিরা শেষে ৩০ শে জানুয়ারী গাজীপুরে ফিরে আসার কথা; কিন্তু ৩০ শে জানুয়ারী সকাল ১১-৩০ টার দিকে জেল কর্তৃপক্ষ জানালেন আজকে যাওয়া হবে না। পুলিশের স্কোয়াড পাওয়া যাচ্ছে না; কোথায় নাকি কী সমস্যা আছে। এদিকে ৩১ শে জানুয়ারীতে আছে দেশব্যাপী হরতাল। অতএব ১লা ফেব্রুয়ারী ছাড়া আর যাওয়া হচ্ছে না।

যদিও গাজীপুরেও জেলেই আছি, আবার চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় জেলও জেলই। বরং ওটা কেন্দ্রীয় কারাগার হওয়ার কারণে একটু সুযোগ সুবিধাও বেশি। তারপরও যেখানে আমার সমস্ত মাল সামানা, খাদ্যসামগ্রী ও ওষুধপত্র আছে, যেখানে সপ্তাহে নির্দিষ্ট একটা দিনে পরিবারের লোকেরা দেখা করতে আসে, এখনতো ওটাই আমার বর্তমান ঠিকানা। কোর্টের হাজিরা শেষে নির্দিষ্ট দিনে ফিরতে না পারায়, শুক্রবারের সাক্ষাতের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হল। অবশ্য পরের দিন শনিবারে সাক্ষাতে আসে পরিবারের লোকেরা। ২রা ফেব্রুয়ারী রোজ শনিবারে এই সাক্ষাৎ হয়, শুক্রবারের পরিবর্তে। পরের দিন ৩রা ফেব্রুয়ারী কোর্ট ছিল কিনা মনে নেই। তবে ১০ ই ফেব্রুয়ারীতে আমাকে ট্রাইব্যুনালে হাজিরা দিতে যেতে হয়। ঐ দিন আমাকে গারদেই অপেক্ষা করতে হয়। দুপুর ২-৩০ টার দিকে পরবর্তী তারিখ ২০শে

www.pathagar.com

ফেব্রুয়ারী নির্ধারণ করে আমাকে গাজীপুরে জেলা কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এদিকে চট্টগ্রামে হাজিরার তারিখ ছিল ১৭ ১৮ ফেব্রুয়ারী। অর্থাৎ ১৯শে ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম থেকে রওয়ানা হয়ে গাজীপুর ফিরে এসে পরের দিন সাত সকালেই ঢাকার ট্রাইব্যুনলে হাজিরা দিতে হবে, যা আমার মত অসুস্থ মানুষের জন্যে কতটা কষ্টসাধ্য তা ভুক্তভোগী ছাড়া কারো পক্ষেই অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

১৯ শে ফেব্রুয়ারী রাত সাড়ে আটটার দিকে ফিরে এলাম চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে গাজীপুর জেলা কারাগারে।

এই যাত্রায় চট্টগ্রাম যাওয়া আসায় পুলিশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল বেশ সতর্কতামূলক এবং চোখে পড়ার মত। যাওয়ার পথে কোথাও খাবার জন্যে সুযোগ না দেয়ার কথা জানানো হয়, সেই সাথে এটাও জানানো হয় যে পথ থেকে কোন প্যাকেট খাবারও গাড়িতে নেয়া যাবে না। এবার যেতেও হয়েছে ভৈরব ব্রিজ হয়ে, মেঘনা ব্রিজ ও দাউদকান্দি ব্রিজের মেরামত কাজ চলার কারণে। ভৈরব ব্রিজ পার হবার ১০ কিলোমিটার পরে একটি সিএনজি ফিলিং স্টেশন থেকে ড্রাইভার গাড়িতে গ্যাস নেয়ার জন্যে থামালে ওখানেই আমি এস্তেনজা এবং অজুর কাজটা সেরে নেই, যাতে গাড়িতে নামাজ আদায় করতে পারি। এরপর চলার পথে কুমিল্লা জেলার দেবীদ্বার থানার সামনে গাড়ী থামলে আমি আবারও এস্তেঞ্জা এবং অজু করে নেই। ইতোমধ্যে কুমিল্লা জেলার পক্ষ থেকে যে প্রটেকশন পার্টি আমাদের নিরাপত্তার জন্যে আসে, তার ইনচার্জ জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কে কোথায় খেতে চাই। বাবর সাহেব বলে দিলেন, পুলিশের প্রটেকশন পার্টি যেখানে নিয়ে যায় সেখানেই যাবেন। আমার সমস্যা হলো, আমার হাতে কোন ক্যাশ টাকা থাকে না; জেল কর্তৃপক্ষ আমার পি.সি একাউন্ট থেকে পিসিতেই আমার টাকা দিয়ে দেয় যা চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে পিসিতে জমা করা ছাড়া পথে কোথাও খরচের অনুমতি নেই। অতএব আমার পরিবারের পক্ষ থেকে একটা গাড়ী যায় চট্টগ্রামে, আবার চট্টগ্রাম থেকে ফিরে আসে গাজীপুরে। ঐ গাড়িতে থাকে আমার ভতিজা মিঠু, সেই সাধারণত খাবার ব্যবস্থা করে থাকে। সে বি.বাড়িয়া থেকে প্যাকেট দিতে চেয়েছিল কিন্তু পুলিশের ইনচার্জ রাজি না হওয়ায় তা সম্ভব হয়নি।

আমরা কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট অতিক্রম করার পর শুনলাম, বাবর সাহেবের গাড়ী কোন একটা সিএনজি স্টেশনে পৌঁছেছে। পুলিশ ইনচার্জের নির্দেশে আমার গাড়ী পথে ছোট একটা বাজারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলো প্রায় ৫০ মিঃ। শুনলাম বাবর সাহেব পুলিশের লোকদের সহ খাওয়া দাওয়া ও নামাজ পড়ছেন, নামাজ শেষে রওয়ানা দেবেন। ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে ওখানেই অপেক্ষা করতে বলা হল। আমি কুমিল্লার পুলিশ ইনচার্জকে বলেছিলাম, 'এডভান্স সিএনজি ফিলিং স্টেশন' সংলগ্ন 'পপুলার ফুড প্যালেস' থেকে খাবারের প্যাকেট নেয়ার কথা।

তিনি রাজী হওয়ায় মিঠু ওখানে গিয়ে খাবারের প্যাকেট তৈরি করার ব্যবস্থা করে। আমার ওখানে পৌঁছার সাথে সাথেই 'পপুলার ফুড প্যালেসের' কর্মচারীরা দ্রুত গতিতে আমাদের গাড়িতে খাবারের প্যাকেট পৌঁছিয়ে দেয়। পুলিশের লোকেরা গাড়িতেই খাবার খেয়ে নেয়। ড্রাইভার বেচারা বলল, সে চট্টগ্রাম পৌঁছার পর তার খাবার খাবে। চলতি গাড়িতে আমার পক্ষে প্যাকেটের খাবার খাওয়া সম্ভব ছিল না। বাসা থেকে টিফিন বক্সে কিছু ভুনা খিচুরি দিয়েছিল তাও খেতে পারলাম না। জেল খানা থেকে নেয়া ক'টি আটা রুটি ও কুসুম ছাড়া ডিম ভাজি দিয়ে খেয়ে নিলাম। আমাকে জোহর, আসর ও মাগরিবের নামাজ আদায় করতে হয়েছে গাড়িতে বসেই। ১৬ ই ফেব্রুয়ারী রাত ৮-৩০ টার দিকে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছি আমি ও বাবর সাহেব প্রায় একই সময়ে। পুলিশের যে কর্মকর্তা খাবারের প্যাকেট দিতেও নিষেধ করেছিলেন, তিনিও পরে আমার গাড়িতে থাকা পুলিশের ইনচার্জকে বললেন, তাদের জন্যে যেন খাবারের প্যাকেট রেখে দেয়া হয়।

রাতে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে ফেরার পর ইস্তেঞ্জা ও অজু সেরে এশার নামাজ আদায় করে, বাসা থেকে দেয়া খিচুরি খেয়ে নিলাম। আমার জন্যে দেওয়া পপুলার ফুড প্যালেসের প্যাকেটের খাবারটা

www.pathagar.com

সেবককে খেতে দিলাম। এই মুহূর্তে কারাকর্তৃপক্ষ আমার রাতের খাবারের ব্যবস্থা করেছিল কিনা তা আমিও সেবককে জিজ্ঞাসা করিনি। সেবকও এ ব্যাপারে আমাকে কিছু জানায়নি। তবে বাসার পাঠানো খিচুরি না খেলে বাসার লোক মনক্ষুণ্ন হত ভেবে আমি বেশ তৃপ্তির সাথেই ঐ খিচুরি খেয়ে নিলাম। চট্টগ্রাম আদালতে হাজিরার পূর্ব নির্ধারিত তারিখ ছিল ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারী। ১৭ তারিখে দুই বেলা আদালত চলার পর ১৮ তারিখের জন্যে আদালত মুলতবি করা হল। ১৮ ই ফেব্রুয়ারী ছিল হরতাল। অতএব ঐদিন আর আদালতে আমাদেরকে নেয়া হল না। পরের দিন ১৯ শে ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম থেকে গাজীপুর জেলা কারাগারের উদ্দেশে রওয়ানা করার কথা। ১৮ তারিখে আমাকে আদালতে না নিলেও আদালতের ঘোষণা মতে পরবর্তী তারিখ মার্চের ৩ ও ৪ তারিখ।

এদিকে শুনলাম কুমিল্লা জেলায় ১৯ শে ফেব্রুয়ারি অর্ধ দিবস হরতাল ডাকা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই আমাদেরকে এমন সময় রওয়ানা করতে হয়, যাতে কুমিল্লা জেলার সীমানায় পৌঁছার আগেই অর্ধ দিবস হরতালের সময় শেষ হয়ে যায়। আমরা প্রায় সকাল ১০ টা থেকে ১০-৩০ টার মধ্যে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে গাজীপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলাম। নিরাপত্তায় নিয়োজিত পুলিশ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা, কোথাও দাঁড়ানো যাবে না। গ্যাস নেয়ার জন্যে যে ফিলিং ষ্টেশনে দাড়াবে সেখানেই এস্তেঞ্জা সারতে হবে। আমাদের জন্যে যে পুলিশ প্রটেকশন পার্টিকে দায়িত্ব দেয়া হয়, তার ইনচার্জ কোন জায়গা থেকে প্যাকেট খাবার নিতেই রাজি হলেন না। অবশেষে একটা সমঝোতা হল, মিঠু তার গাড়িতে প্যাকেট নিয়ে রাখবে এবং সুবিধামত স্থানে (বিশেষ করে ফিলিং স্টেশনে) আমাদের গাড়িতে দিয়ে দেবে।

আমি এস্তেঞ্জার জন্যে একটা পছন্দের ফিলিং স্টেশনে নামতে চাইলেও কুমিল্লার পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হল, হোমনা দক্ষিণ থানায় নামতে। আবার বলা হল কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট পার হয়ে গিয়ে কোন থানায় উঠতে। আমি বললাম আমার পক্ষে এতক্ষণ অপেক্ষা করা সম্ভব হবে না, তাই কুমিল্লা সদর দক্ষিণ থানায় আমাকে সহ সবাইকেই নামানো হল। আমাদের এখানে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি চলে যায় গ্যাস আনতে। এস্তেঞ্জা ও অজু সেরে গাড়িতে উঠতে চাইলে বলা হল, একটু অপেক্ষা করতে। গাড়ি গ্যাস নিয়ে ফিরে আসেনি। এই সুযোগে আমরা নামাজ আদায় করে নিলাম। এই ফাঁকে মিঠু আমার গাড়িতে খাবারের প্যাকেট দিয়ে দেয়। ড্রাইভার এবং আমি ছাড়া পুলিশের লোকেরা চলার পথেই প্যাকেটের খাবার খেয়ে নেয়। আমি প্যাকেটের খাবার না খেয়ে সাথে আনা রুটি ও ডিম ভাজি খেয়ে নিলাম। বেচারা ড্রাইভারকে খাওয়ানোর জন্যে গাড়ী থামানোর আর কোন জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল না। দেবীদ্বার থানায় গাড়ি থামানোর প্রস্তাব করে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেল না। আমাদের গাড়ীর পুলিশের ইনচার্জ বললেন, বি.বাড়িয়া পুলিশ লাইনে অনুমতি পাওয়া গেছে, ওখানে ড্রাইভার খেয়ে নেবে। আর কেউ এস্তেঞ্জা করতে চাইলে তাও করতে পারবে। আমি গাড়ীতে জুতা খুলে বসা ছিলাম। বি.বাড়িয়া পুলিশ লাইনের কাছাকাছি এসে জুতা পড়ছিলাম। এমন সময় গাড়ী হার্ডব্রেক করায় ডান চোখের ডান পাশে বেশ আঘাত পেলাম। মনে হচ্ছিল চশমাটা বোধ হয় ভেঙ্গেই গেছে। ভাগ্য ভাল, আল্লাহর শুকরিয়া, নীচে থেকে চশমা তুলে দেখি চশমার কোন ক্ষতি হয়নি। অবশ্য পরে ঐ পুলিশ লাইনেও যাত্রা বিরতির অনুমতি পাওয়া যায়নি।

বি.বাড়িয়ার পুলিশ লাইনে থামবে ধারণায় জুতা খুলতে গিয়ে আঘাত পেলাম, কিন্তু সেখানে নামা হল না। তারা বলেছিল, কোন ফিলিং স্টেশনে থেমে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে নিতে। অবশেষে ভৈরব ব্রিজের মোড় থেকে ৮/১০ মিলোমিটার আগে একটি ফিলিং স্টেশনে গাড়ি থামানো হল। ওখান থেকেই ইস্তেঞ্জা এবং অজু সেরে নিলাম যাতে চলন্ত গাড়িতে নামাজের সময় হলে, নামাজ আদায় করে নিতে পারি। আমাদের গাড়ীর ড্রাইভার ঐ ফিলিং স্টেশনেই তার খাবার খেয়ে নিল।

আমরা ভৈরব ব্রিজ পার হয়ে নরসিংদী শহর অতিক্রম করতেই মাগরিবের নামাজের আজান কানে ভেসে এল আশে পাশের মসজিদ থেকে। ঐ আজানের ডাকে সাড়া দিয়ে কোন মসজিদের জামায়াতে শরীক হবার সুযোগ যে আল্লাহ কবে দেবেন, তা তিনিই জানেন। গাড়িতেই কোন মতে মাগরিবের নামাজ

www.pathagar.com

আদায় করে নিলাম। নরসিংদীর পর থেকে ট্রাফিক জ্যামের শুরু। যার শেষ হয় গাজীপুরের চৌরাস্তা হয়ে জেলা কারাগারের গেটে পৌঁছার পর। রাত ১১ টার দিকে গাজীপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছে জেল গেটের আনুষ্ঠানিকতা সেরে রুমে পৌঁছেই ইস্তেঞ্জা অজু শেষে এশার নামাজ আদায় করে নিলাম। রাতের খাবার সেরে ক্লান্ত দেহমন নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আবার কাল সকাল ৭ টায় রওয়ানা করতে হবে ট্রাইব্যুনালে হাজিরা দেয়ার জন্যে।

সকাল ৭টার দিকে ট্রাইব্যুনালের উদ্দেশে রুম থেকে জেল গেটের দিকে রওয়ানা করলাম। ৭-৩০ টায় ট্রাইব্যুনালের উদ্দেশে আমাকে নিয়ে গাড়ীটা রওয়ানা করল, পৌঁছল ১০-৩০ টার দিকে। পৌঁছে দেখি কামারুজ্জামান উপস্থিত।

তাকে ১১টার কিছু পরে কোর্টে ডাকা হল। তার আই ওর জেরা চলছে। ১টার বিরতির পর সে আবার গারদে ফিরে এল। এই সময় কে একজন সিঁড়ি বেয়ে নামার পথে আমাকে লক্ষ্য করে বলল, আমাকে ডাকা হবে দুটোর পর।

এই সময়ে ১০ মিনিটের জন্যে অনুমতি নিয়ে আমার মেঝ ছেলে ব্যারিস্টার নাজিব মোমেন আমার খাবার ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্যে আসল, সেও বলল ২-১৫ এর দিকে কোর্টে উঠতে হতে পারে। নামাজ ও খাওয়া শেষে বসে বসে পত্রিকা পড়তে পড়তে কোর্টে যাওয়ার জন্যে বলা হল। কোর্টের জেরার সময়টা বেশ বোরিং লাগে। তাও বসতে হয়। জেরার উত্তরের ব্যাপারে সাক্ষীকে বিচারকদের পক্ষে থেকেও সাহায্য করা হয়। প্রসিকিউটরদের পক্ষ থেকেও সাহায্য করা হয়। পক্ষান্তরে আমাদের আইনজীবীকে বাধাগ্রস্ত করা হয়, মাঝে মধ্যে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে উত্তেজিত করার অপপ্রয়াসও চালানো হয়, যা বুঝতে খুব বেশি বুদ্ধি খরচের প্রয়োজন হয় না। বিকেল ৪টা পেরিয়ে যেতেই পরবর্তী তারিখ নিয়ে কিছুটা শলাপরামর্শের পর ৬ই মার্চ তারিখ নির্ধারণ করে আদালত মুলতবি ঘোষণা করা হল।

আমি গতকাল চট্টগ্রাম থেকে গাজীপুর পর্যন্ত লম্বা পথের সফর শেষে আজ যেমন সাত সকালে ট্রাইব্যুনালের জন্যে গাজীপুর জেলা কারাগার থেকে বের হয়েছি, তেমনি সামনের বারও ৫ই মার্চ চট্টগ্রাম থেকে গাজীপুর এসে ৬ই মার্চ ভোরেই আবার দৌড়াতে হবে ট্রাইব্যুনালের উদ্দেশে। মেহেরবান আল্লাহ এই কষ্টের অবসান ঘটান এই দোয়া ছাড়া আমার জন্যে বিকল্প কোন করণীয় নেই।

চট্টগ্রাম থেকে আসার দিন পথে আমার দেশ ও নয়া দিগন্ত পত্রিকায় হাটহাজারী মাদরাসার মুহতামিম হযরত মাওলানা আহমদ শফী সাহেবের খোলা চিঠি দেখলাম। জেল গেট থেকে রওয়ানার মুহূর্তে মিঠু নাস্তার সাথে ঐ পত্রিকা দুটি দিয়ে দিয়েছিল। মুফতী সাহেবের অরাজনৈতিক খালেছ ইসলামী ও ঈমানের দাবিতে জনগণকে জেগে উঠার আহ্বানটি বেশ হৃদয়স্পর্শী। কুমিল্লা সদর দক্ষিণ থানায় ইস্তেঞ্জা ও নামাজের জন্যে যাত্রা বিরতির সময় মেজর জেনারেল (অব.) রাজ্জাকুল হায়দার সাহেব একটা নয়া দিগন্ত আমার গাড়িতে দিয়ে দেন, উনি ভেবেছিলেন হয়তো মুফতী সাহেব এর খোলা চিঠির ব্যাপারে আমার জানার সুযোগ হয়নি। মুফতী সাহেব তার খোলা চিঠিতে দেশবাসীকে জেগে ওঠার আহ্বান করেছেন, তারপর মুফতী আব্দুর রহমান সাহেবও নাকি একই ভাবে দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন। গত শুক্রবার থেকে গতকাল পর্যন্ত সারা দেশে বিক্ষোভ সমাবেশ ও হরতাল পালনের মাধ্যমে দেশের তৌহিদী জনতা দেশ বরেণ্য এই দুই বুজর্গ আলেমে দ্বীনের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে।

কিন্তু বামবুদ্ধিজীবীরা দাবি করছে, ব্লগারদের বিরুদ্ধে নাকি এটা মিথ্যা প্রচারণা। প্রধানমন্ত্রী বলছে আজব কথা, যারা এ অন্যায় কাজটি করেছে (মানে ফাঁস করেছে) তারাও নাকি সমান অপরাধী। এভাবে ইসলাম বিরোধী প্রচারণাকে চাপা দেয়ার অপকৌশলও অব্যাহত আছে। সংসদে তোফায়েল সাহেব বলেছেন, তারা নাকি ইসলামের বিরুদ্ধে নয়, যুদ্ধাপরাধীদের বিরুদ্ধে। তাহলে শাহবাগের মঞ্চের সংগঠকরা যে নিজেদেরকে ইসলাম বিদ্বেষী হিসাবে নিজেরাই চিহ্নিত করল, তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না কেন? ড. ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী, সম্ভবত ২০ শে ফেব্রুয়ারীর যুগান্তরে লিখেছেন, তিনি শাহবাগের

www.pathagar.com

চত্বরের সংগঠকদের কোন কোন ব্লগারদের ব্যাপারে ইসলামী বিদ্বেষী প্রচারণাকে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেননি কিন্তু পরে নিজে তাদের ওয়েব সাইটে ও ফেসবুক চেক করে অবাক হয়েছেন। তার ভাষায়, পশ্চিমা দেশের কোন কোন মহল মাঝে মধ্যে যেভাবে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনে থাকে, এদের প্রচার তার চেয়ে জঘন্য। তার নিবন্ধটা যুগান্তরেই ছাপা হয়েছে উপসম্পাদকীয় হিসাবে অথচ যুগান্তরই বেশি জোরালোভাবে বলে চলেছে, ব্লগারদের সম্পর্কে ঐ অভিযোগ নাকি সঠিক নয়, ওটা জামায়াত এবং শিবিরের প্রচারণামাত্র।

অথচ কালকের যুগান্তরে আবার বলা হয়েছে, কিছু সংখ্যক ব্লগারদের আল্লাহ ও রাসূল সম্পর্কে কটূক্তির কারণে যারা কোন দিন জামায়াতের সাথে ছিল না, তারাও প্রতিবাদমুখর হয়ে মাঠে নেমেছে। আসলে ইসলাম বিদ্বেষী মহল জামায়াতকে ঘায়েল করার জন্যে চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র চক্রান্ত করে চলেছে। এক্ষেত্রে মিডিয়ায় জামায়াতের বিরুদ্ধে, ইসলামী ছাত্র শিবিরের বিরুদ্ধে অপপ্রচারই তাদের প্রধান কৌশল। সেই সাথে জামায়াত এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরকে জঙ্গি হিসাবে চিহ্নিত করার জন্যে, কোন কোন গোয়েন্দা সংস্থার অপতৎপরতার কথাও শোনা যাচ্ছে। ইতঃপূর্বে খোদ পুলিশের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের হাতে দিয়াশলাই ও পেট্রোলের বোতল ধরিয়ে দেবার ছবি ছাপা হয়েছিল একাধিক পত্রিকায়। কাল একজন কয়েদীর মুখে শুনলাম, জামায়াতের এক কর্মী বর্তমানে গাজীপুরে জেলে আটক আছে, সে বলেছে, সে একজনকে বাসে আগুন দিতে দেখে তাকে ধরে ফেলে তার পরিচয় জানতে চাইলে, সে নিজেকে জামায়াতের কর্মী বলে দাবি করে, তখনই এই বন্দী তাকে এ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে বলে, জামায়াতের কর্মী হলে তো তুমি এটা করতে পার না। এই বন্দী অবশেষে তাকে বারণ করার জন্যে মার দিতেও বাধ্য হয়, তখন ঐ ব্যক্তি তার পকেট থেকে তার আইডি কার্ড বের করে বলল, সে ডিবির লোক এবং তাকে আগুন দেয়া থেকে বিরত রাখতে মার দেবার কারণে, এখন এই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়েছে। একজন সাধারণ কয়েদীর এই বক্তব্যের সময় একজন কারারক্ষীও উপস্থিত ছিল, সেও তার কথায় সায় দিয়ে বলল, আল্লাহ এত মিথ্যাচার সহ্য করবে না, স্যার চিন্তা করবেন না।

গাড়ী ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের অভিযোগে পাইকারীভাবে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতা কর্মীদের গ্রেফতারের ঘটনায় মাঝে মাঝে বেশ দুশ্চিন্তা ও কিছুটা অস্থিরতাও পেয়ে বসে। প্রত্যক্ষ দর্শীর এবং পরিস্থিতির শিকার এক ব্যক্তির এই বর্ণনায় নিশ্চিত হলাম, এটা সরকারের পরিকল্পনা। জামায়াতের বিরুদ্ধে পুলিশের এ্যাকশন নেয়ার ক্ষেত্র তৈরি করার জন্যে এবং জামায়াতের ব্যাপারে জনমতকে বিভ্রান্ত করার জন্যে একটি সুদূর প্রসারী পরিকল্পনার মাধ্যমেই এসব করা হচ্ছে।

আবার আমাকে ২রা মার্চ চট্টগ্রাম রওয়ানা করতে হবে। ওখানে ৩রা ও ৪ঠা মার্চ হাজিরা শেষে ৫ মার্চ গাজীপুরে ফিরে এসে পরের দিন ৬ ই মার্চ ট্রাইব্যুনালে হাজিরা দিতে হবে। এত দিন চট্টগ্রাম যাওয়া আসায় শুধু স্বাস্থ্যগত অসুবিধা এবং কষ্টের কথাই ভাবতাম। এখন থেকে নিরাপত্তাহীনতার আশংকাও পেয়ে বসেছে। গত তারিখে চট্টগ্রাম থেকে আসার পথে কুমিল্লার দেবিদ্বার থানায় আমাদের পুলিশের ইনচার্জ ওঠার অনুমতি চেয়ে পায়নি। বি.বাড়ীয়া পুলিশ লাইনে উঠারও অনুমতি পাওয়া যায়নি। তার মানে উনারা আমাদের নিরাপত্তার কোন দায়-দায়িত্ব নিতে চাচ্ছেন না। বর্তমানে শাহবাগ চত্বরের গণজমায়েত থেকে সারা দেশেই একটা উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্যে মিডিয়ার সাহায্যে উস্কানি দেয়া হচ্ছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া কী, তা আল্লাহই ভাল জানেন, তবে আলেম সমাজ এবং আলেম সমাজের সাথে সংশ্লিষ্ট জনতা এতে তাদের বিরুদ্ধেই অবস্থান নিয়েছে। কিন্তু সরকারের দলীয় লোকজন এটাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে আমাদের জন্যে নিরাপত্তাহীনতার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে চলেছে, যাতে পুলিশ প্রশাসনকেও বেশ প্রভাবিত মনে হয়। সরকারী চাকুরীজীবী হয়ে সরকারের লোকদের বিরুদ্ধে তাদের এ্যাকশনে যাওয়া কোন সহজ ব্যাপার নয়। আমাদের জীবনের নিরাপত্তার

www.pathagar.com

চেয়ে, তাদের কাছে তাদের চাকরিই অনেক বড়। তাই এখন থেকে চট্টগ্রাম যাওয়া আসায় শারীরিক কষ্টের চেয়ে মানসিক চাপটা অনেক বেশি অনুভূত হচ্ছে।

আজ ২৭ শে ফেব্রুয়ারী ২০১৩ যুগান্তর পত্রিকায় শেষ পৃষ্ঠায়, শাহবাগ আন্দোলন সম্পর্কে 'ইনডিয়ান টাইমসের' একটি প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে, যার শিরোনাম হল 'শাহবাগ আন্দোলন, ইন্ডিয়ার মদদে, টাইমস অব ইন্ডিয়া। কথাটি যথার্থ এবং মোক্ষম সত্য। ইতঃপূর্বে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব ঢাকায় এসে তাদের রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে শাহবাগ আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে গেছেন। যা একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নগ্ন হস্তক্ষেপ, এতে কোন সন্দেহ সংশয়ের প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাদের দেশপ্রেম এতে বিন্দুমাত্র আহত হয় না। (কোলকাতায় এই শাহবাগ আন্দোলন নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন হয়েছে বলে ক'দিন আগের পত্রিকায় দেখেছি।) আসলে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলেই ভারত তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্যে উঠে পড়ে লেগে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, আমাদের কর্তাব্যক্তিরা দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের তুষ্ট করে ক্ষমতার আসনকে পাকাপোক্ত করার প্রতি মনোযোগী হবার কারণে, অবশেষে জ্ঞানপাপীর ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হয়। শুধু সরকারের কর্তাব্যক্তিরাই নয়, তাদের পোষা সুশীল সমাজ, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, সাংস্কৃতিক সংগঠনও একাট্টা হয়ে ভারতীয় এজেন্ডা বাস্তবায়নে সরকারের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির কাজ শুরু করে দেয় জানপ্রাণ দিয়ে। তাদের যুক্তি বুদ্ধির কাছে ভারতীয় এজেন্ডা বাস্তবায়নের কোন নেতিবাচক দিকই ধরা পড়ে না। তাদের বিবেক বুদ্ধি এখানে অন্ধ। এটাই যদি হয় স্বাধীনতার চেতনার দাবি, তা হলে এদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? যারা সত্যই দেশকে স্বাধীন সার্বভৌম দেখতে চান, রাখতে চান, তাদেরকে বিষয়টি অত্যন্ত গভীরভাবে বিবেচনায় নিয়ে নিজেদের দায়িত্ব কর্তব্য পালনে যথার্থ ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হবে।

মার্চ ২০১৩ এর ৩রা ও ৪ঠা তারিখে চট্টগ্রাম আদালতে হাজিরা দেয়ার জন্যে নির্ধারিত ছিল। সাঈদী সাহেবের বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট রায়ের মাধ্যমে তাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণায় দেশ ফুঁসে উঠে। জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে সারা দেশে ৩রা ও ৪ঠা মার্চ হরতালের ডাক দেয়া হয়। সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে এসে বিএনপির চেয়ারপার্সন সাবেক প্রধান মন্ত্রী এবং বর্তমানে বিরোধী দলের নেত্রী সংবাদ সম্মেলন করে দেশের চলমান পরিস্থিতির ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন, এবং ৫ ই মার্চের সকাল সন্ধ্যা হরতালের ডাক দেন। আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি, চট্টগ্রামে হরতালের দিন কোন বন্দী আসামীকে আদালতে হাজির করা হয়নি। এ ব্যাপারে নাকি চট্টগ্রাম বার সমিতির একটা সিদ্ধান্তও আছে। অতএব আমাদের জন্যে হাজিরার নির্ধারিত তারিখে কোর্টে হাজির করা হবে না এটাই স্বাভাবিক। এছাড়া ৫ তারিখে হরতালের কারণে, ফিরে এসে ৬ই মার্চ ট্রাইব্যুনালে হাজিরা দেয়াটাও সম্ভব হবে না। এ ব্যাপারে গাজীপুর জেল কর্তৃপক্ষকে আমি অবহিত করি। তাদেরকে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ করে এ বিষয়টা মানবিক দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ জানালাম। তারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ করে আমাকে জানালেন, ২রা মার্চের আগের শিডিউল অনুযায়ী চট্টগ্রাম যেতে হবে।

এখানে আর কিছু করার নেই। ২রা মার্চ ২০১৩ তারিখে সকাল ৯ টা ৯-৩০ টার মধ্যেই রওয়ানা করার কথা। কিন্তু নিরাপত্তার কারণে কাশিমপুর- ১ কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বাবর সাহেবকে বহনকারী গাড়ী ও প্রটেকশন পার্টি এর গাড়ী আনা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে করতে প্রায় দুপুর ১২টার দিকে রওয়ানা করতে হল। এ ব্যাপারে পথের অবস্থা ভাল নয় অনুমান করে অতিরিক্ত সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়।

ইতঃপূর্বে আমরা চলার পথে নির্বিঘ্নে কোন ফিলিং স্টেশনে নেমে ইস্তেঞ্জা অজু সেরে নামাজ আদায় করতাম। দুপুরের খাবারটা কোন হোটেলে বসে খেয়ে নিতাম। এখন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ, কোথাও দাঁড়ানো যাবে না। একান্ত প্রয়োজন হলে রাস্তার ধারে কোন থানায় উঠতে হবে।

www.pathagar.com

আমরা কুমিল্লা সেনানিবাস পার হয়ে, একটা সিএনজি ফিলিং স্টেশন থেকে গাড়িতে গ্যাস নেয়ার সময় ইস্তেঞ্জা অজু ও নামাজ আদায় করে নিলাম। সামনে যাবার পথে রেলগেট এর যানজটের কারণে আমাদের গাড়ী থামলে, সেখানেই মিঠু গাড়িতে প্যাকেটের খাবার তুলে দেবার ব্যবস্থা করে। গোটা পথই গোলমালের আশংকায় কেটে যায়। সীতাকুণ্ড থানা এলাকায় পৌঁছতেই সীতাকুণ্ড থানার ও.সি আমাদের পুলিশ স্কোয়াডের ইনচার্জকে ফোন করে জানালো, পথে হরতালের সমর্থনে পিকেটিং চলছে, আপনারা গাড়ি নিয়ে আসুন। কিন্তু আমাদের গাড়ীর অথবা প্রটেকশন পার্টি এর গাড়িতে থাকা পুলিশের কেউই সীতাকুণ্ড থানার (পুলিশ স্টেশন) অবস্থান কোথায় তা জানে না, একবার সামনে আগায়, আবার পিছনে যায়, এক পর্যায়ে হাইওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির সামনে কিছুক্ষণ অবস্থান করে থানার অবস্থান জেনে, সেখানে গিয়ে দাঁড়ানোর পর সিদ্ধান্ত হয়, একটু পরেই আরো পুলিশ আসবে তারপর রওয়ানা করা হবে। আমি গাড়িতেই মাগরিবের নামাজ আদায় করে নিলাম। মাগরিবের পরে আর কোন পিকেটিং থাকার কথা নয়, তারপরও আগে পিছে পুলিশের বেশ কয়েকটি গাড়ী অবস্থান নিয়ে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের গেট পর্যন্ত যায়। রাত ৮ টা থেকে ৮-৩০ এর মধ্যে আমরা বেশ একটা অস্থিরতার মধ্য দিয়েই পৌঁছলাম চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে।

সীতাকুন্ড থানা থেকে চট্টগ্রাম মহানগরীর দিকে রওয়ানা দেয়া না দেয়া নিয়ে পুলিশের দায়িত্বশীলদের মধ্যে বেশ অস্থিরতা এবং সিদ্ধান্তহীনতা দেখেই আসলে আমার মধ্যে এই অস্থির অস্থির ভাবটা সৃষ্টি হয়। তবে জেল খানায় পৌঁছার পর আমার ব্লাড প্রেসার চেক করে দেখা গেল একেবারেই স্বাভাবিক (১৪০-৭০)। তবে রাস্তায় খাবারের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ না থাকায় ব্লাড সুগার লেভেল বিকেলে যা থাকার কথা তার চেয়ে অনেক নীচে নেমে যায়। যাহোক, এটা নিশ্চিত ছিল যে হরতালের মধ্যে কোর্টে নেয়া হবে না, তাই পুরো তিন দিন বিশ্রামেই কাটাতে হবে। ৪ঠা মার্চে ডিআইজি সাহেব জেল পরিদর্শনে এসে আমার সাথেও দেখা করেন। উনাকে বললাম, কোর্টে যেহেতু নেয়া হবে না, তাহলে অহেতুক কেন এভাবে লম্বা রাস্তায় ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আমাদের এনে কষ্ট দেয়া হয়? মানবিক দৃষ্টিতে বিবেচনা করে ভবিষ্যতে ব্যবস্থা নেয়া যায় কিনা, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আপনারা আলাপ করে ব্যবস্থা নেয়া উচিত বলেই আমি মনে করি।

আগের অভিজ্ঞতার আলোকে ভেবে নিয়েছিলাম ৫ ই মার্চও হরতাল থাকার কারণে, ট্রাইব্যুনালের ৬ই মার্চের তারিখটা পরিবর্তন করা হবে। ইতঃপূর্বে একবার এটা করাও হয়েছিল। কিন্তু আসরের নামাজের পর (৫/৩/১৩) বাবর সাহেব আমাকে বললেন, সুবেদার এসে বলে গেছে, লক আপের পরপরই আমাকে পাঠিয়ে দেবে। এরপর সুবেদার নিজে এসেও বলে গেল প্রস্তুতি নেবার জন্যে। আমি মাগরিবের আগেই আমার প্রস্তুতি পর্ব সেরে রাখলাম। আমি ভাবছিলাম, গাজীপুর কারাগারেই নিয়ে যাবে। রওয়ানার সময় (৬-৫০মিঃ বিকাল) ডেপুটি জেলার মাহমুদ সাহেব বললেন, আমাকে নাকি নেয়া হবে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। সারারাত সফর শেষে, সকাল বেলা কোর্টে যেতে অসুবিধা যাতে না হয় সেই জন্যেই নাকি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। কিন্তু বর্তমানে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কর্তৃপক্ষ আমাদের সাথে যে ব্যবহার করে তাতে দূর হলেও গাজীপুর থেকে কোর্টে আসাই আমার জন্যে সুবিধাজনক হত।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আমি তথাকথিত ১/১১ এর পর দুবার কারাগারে যাই গ্রেফতার হয়ে, দুবার ঐ জেলের ২৬ সেলে বা চম্পাকলিতে থেকেছি। এবারেও গ্রেফতার হবার পর থেকে দেড় বছরেরও বেশি সময় ওখানেই ছিলাম। এরপর ২৭ দিন গাজীপুরে কাটানোর পর প্রায় ছয়মাসেরও বেশি সময় কাশিমপুর- ২ কেন্দ্রীয় কারাগারে থেকে আবার গাজীপুর জেলা কারাগারে আছি বেশ কিছুদিন থেকে। এর মধ্যে এইবার নিয়ে তিনবার ট্রাইব্যুনালে হাজিরার জন্যে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রথমে ১৩ দিন, দ্বিতীয়বার দুই দিন এবং ২ রাত একদিন কাটাতে হল। ২৬ সেলে রুম খালি থাকা সত্ত্বেও প্রথমবারে ও তৃতীয় বারে রেখেছে সাত সেলে এবং দ্বিতীয় বারে ছয় সেলে। আমি বলব আমার প্রতি এটা ছিল চরম

www.pathagar.com

অবিচার। ঐ দুই সেলেই প্রধান সমস্যা হলো টয়লেট মোটেই মানসম্মত নয়; সেই সাথে গোসলের কোন সুযোগ নেই। গোসল করতে হয় খোলা আকাশের নীচে, যাতে আমি অভ্যস্ত নই। তাই প্রতিবার আমাকে ঐখানে কাটাতে হয়েছে গোসল ছাড়া। এবারও সারারাত জেগে রাত ২-৩০ টার দিকে বিছানায় গেলেও ঘুম হয়নি। ফজরের আযানের অল্প আগে উঠে আজানের অপেক্ষা করে, দ্রুত ফজরের নামাজ শেষে ঘুমানোর চেষ্টা করলাম।

কিন্তু ঘুমোতে পারলাম না। আমার মনে হয়েছিল এবার সাত সেলে আমার পরিচিত কেউ নেই। যখন পৌঁছি তখনতো মনে হয়েছে একেবারেই জনমানুষ শূন্য। ফজরের পর মনে হল, কোন কারাবন্দী হাঁটছে, আমি শোয়া অবস্থায়ই তাকে সালাম দিলাম, তখনই তিনি জানলেন আমাকে রাতের কোন এক সময়ে আনা হয়েছে। তিনি জানতে চাইলেন কখন এসেছি, আমি জানালাম, জেল গেটে রাত ১-৪৫ মিনিটে এখানে রাত ২-৩০ টার দিকে। তার কাছেই জানলাম, এখানে মুজাহিদ সাহেব এবং কামারুজ্জামান সাহেবও আছেন। তারাও জানতো না আমার আসার কথা। সকালে কোর্টে যাবার কিছু আগে কি নাস্তার আগে তাদের সাথে দেখা হয়। কামারুজ্জামান ক্ষোভের সাথেই বলল, ২৬ সেলে রুম খালি থাকা সত্ত্বেও আপনাকে জবরদস্তি করে অন্যায়ভাবে এখানে নিয়ে এসেছে। আমি এ বিষয়ে আর কোন মন্তব্য করলাম না। এখন এ অবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা এবং ছবর ছাড়া আর কিছুই করার নেই। এ অবিচারের বিচারের ভার আল্লাহর কাছেই দিয়ে রাখলাম।

ঐদিন মুজাহিদ সাহেবের কোর্ট ছিল না, তার কোর্ট পরের দিন ৭ই মার্চ। ৬ই মার্চ সকালে ট্রাইব্যুনালে হাজির করার জন্যে আমাকে ৫ই মার্চ দিবাগত রাতে এভাবে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে আসে। সকাল ৯ টার দিকে প্রস্তুত হয়ে থাকতে বলা হল কোর্টে যাওয়ার জন্যে। শুনছিলাম কামারুজ্জামান ও আমাকে এক সাথেই নেয়া হবে। রওয়ানা দিয়েই শুনলাম তাকে একটু আগেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমাকে নিয়ে বসিয়ে রাখা হল ডেপুটি জেলারের রুমে। বলা হল, যে গাড়িতে কামারুজ্জামান সাহেবকে পাঠানো হয়েছে ওটা ফিরে আসলেই ঐ গাড়িতেই আমাকে পাঠানো হবে। পথ অল্প হলেও নাজিমুদ্দিন রোডটি ব্যস্ততম বাণিজ্যিক এলাকা চক বাজারের প্রবেশদ্বার হওয়ার কারণে প্রায় সব সময়ই যানজট লেগেই থাকে। গাড়ী ফিরে আসা পর্যন্ত তাই আমাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। অবশেষে প্রায় ১১টায় ট্রাইব্যুনালে পৌঁছলাম। ১১-৩০ থেকে ১১-৪৫ এর দিকে আমাকে কোর্টে ডাকা হল। সাক্ষীর জেরা শুনতে আসলে মনে মনে সাংঘাতিক বিরক্তির ভাব সৃষ্টি হয়। কারণ এত মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা শুনে হজম করা মনে হয় কারো পক্ষেই সহজ নয়। তদুপরি ডিফেন্স ল'ইয়ারকে সরকারী আইনজীবী এবং সম্মানিত বিচারপতিদের পক্ষ থেকে অযৌক্তিকভাবে বাধা দান, সাক্ষীর দুর্বল কথা সবল করার ক্ষেত্রে উভয় দিকের সহযোগিতা প্রদানের দৃশ্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কেউ লক্ষ্য করলে তার মনে হবে সত্যি এখানে বিচারের নামে যা হচ্ছেতা প্রহসন বা নাটক ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমি গতরাতে মোটেও ঘুমোতে পারিনি, প্রায় সারা রাতই পথে কেটেছে। রাতের যে সময় বাকী থাকতে রুমে ঢুকি, তার কিছুক্ষণ পরই বিছানা ছেড়ে উঠতে হয়েছে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের চার দিকেই মসজিদ। সম্ভবত শেষ রাতের প্রথম আযানটি কানে ভেসে আসে বংশাল রোডে অবস্থিত জমিয়তে আহলে হাদিসের কেন্দ্রীয় মসজিদ থেকে, এর কিছুক্ষণ পরপরই প্রায় একযোগে, চকবাজার শাহী মসজিদ, মৌলভীবাজার জামে মসজিদ, উর্দূ রোডের মসজিদ থেকে শুরু করে অনেক মসজিদের আযান শুনে মনে জাগে এক বিশেষ আবেগজনিত অনুভূতি।

রাত ২-৩০ টায় শুয়ে, তাও আবার দীর্ঘ সফর শেষের ক্লান্ত দেহমন নিয়ে তাহাজ্জুদের জন্যে জেগে ওঠা ছিল অনিশ্চিত ব্যাপার। তবে বংশালের (আহলে হাদিসের কেন্দ্রীয় মসজিদের) আযানের পর দু'রাকাত দু'রাকাত করে চার রাকাত নামাজ আদায় করে দোয়া মুনাজাত শেষে ফজর পড়ে নিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা

www.pathagar.com

করলাম, কিন্তু এমন পরিবেশে সাধারণত আমার পক্ষে ঘুমানো কখনই হয়ে ওঠে না। সারা রাতের সফরের ধকল, এরপর নির্ঘুম রাত্রি যাপন সত্ত্বেও বিনা গোসলে নাশতা সেরে কোর্টে যাওয়ার কারণে দিনের পুরো সময়টাই কাটে অস্বস্তিতে। ৭ সেলের রুমের টয়লেটে গোসল তো দূরের কথা অজুও করা যায় না। গোসল করতে হয় রুমের বাইরে, খোলা আকাশের নীচে, যাতে আমি অভ্যস্ত নই। তাই ওখানে এর আগেও যখন গিয়েছি, তখনও গোসল করা হয়নি। মাঝখানে একবার ৬ সেলে গিয়েছিলাম সেখানেও গোসল করতে পারিনি। তবে আজকের গোসল করতে না পারাটায় আমার শরীর ও মনে সৃষ্টি হয় সাংঘাতিক অস্বস্তি। এই অস্বস্তিকর অবস্থায় কোর্টে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অপেক্ষা করে ফিরে এলাম কেন্দ্রীয় কারাগারের অস্থায়ী ঠিকানায়। কোর্টে পরবর্তী তারিখ ১৯ শে মার্চ হবার কারণে, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের পৌঁছার সাথে সাথেই ঐ একই গাড়িতে করে আমাকে পাঠানো হল গাজীপুর জেলা কারাগারে। পথেই মাগরিবের নামাজ আদায় করতে হয়েছে চলন্ত গাড়িতে বসেই। রাত ৮টার দিকে পৌঁছলাম গাজীপুর জেল কারাগারে আমার বর্তমান ঠিকানায়। আমি রওয়ানার মুহূর্তেই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছিলাম গাজীপুর কারাগারে আমার যাবার ব্যাপারটি অবহিত করতে। রওয়ানার পর নাজিমুদ্দিন রোড অতিক্রম করার আগেই আবার পুলিশের স্কোয়াড ইনচার্জের মাধ্যমে বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেবার পর, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাকর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করল যে, ইতোমধ্যেই গাজীপুরকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু গাজীপুর কারাগারে পৌঁছে শুনলাম তারা কোন খবর পায়নি। ফলে দেখা গেল আমার সেবক ওয়ার্ডে রয়েছে, আমি পৌঁছার পর তাকে ডেকে আনতে হল। রাতের খাবারেরও কোন ব্যবস্থা হয়নি। আমি রুমে পৌঁছে এশার নামাজ আদায় করার পর সেবক ছেলেটা (সে বাবুর্চি নয়) কোন মতে অল্প সিদ্ধ খিচুরি রান্না করল। একটা কুসুমবিহীন ডিম ভাজি দিয়ে ঐ খিচুরি বেশ তৃপ্তির সাথে খেলাম এবং অল্প একটু পায়চারী করে ঘুমাতে গেলাম। পরের দিন অর্থাৎ শুক্রবারে আমার পারিবারিক সাক্ষাৎ। সাক্ষাতে ছেলেকে অনেক বিষয়ে বলার চিন্তা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তেমন কিছুই যেন বলা হল না, সময় শেষ হয়ে গেল। আমার তিন ছেলে, এক মেয়ে এবং জামাই দেশের বাইরে, তাদের ব্যাপারে আমি মাঝে মধ্যে বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। বিশেষ করে ছোট ছেলেটার ব্যাপারে, এবার এদের সম্পর্কে যা যা জানার বা বলার ছিল তার কিছুই যেন জানা বা বলা হল না, মনের এই অতৃপ্তি নিয়েই শেষ হল এ সপ্তাহের সাক্ষাৎ।

আবার ১২ ই মার্চ চট্টগ্রাম কোর্টে হাজিরা দেয়ার জন্যে ১১ ই মার্চ সকালে রওয়ানা করতে হবে। দেশের বর্তমান উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে এই সফরটা আমার জন্যে সবচেয়ে বেশি পীড়াদায়ক। শরীরের উপর দিয়ে যে ধকল যায়, তার চেয়ে বেশি কষ্ট হয় মানসিক চাপে। আল্লাহই ভাল জানেন কবে শেষ হবে এই ভোগান্তি। কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে এর থেকে পরিত্রাণ চেয়ে দোয়া করে চলেছি। কবুলের মালিক কেবল তিনিই।

গত তারিখের মতই এবারে চট্টগ্রাম কোর্টে আমাদেরকে নেয়া হয়নি। ১২ তারিখে নেয়া হয়নি হরতালের কারণে, ১৩ তারিখে কী জন্যে কোর্টে নেয়া হল না, তা অবশ্য জানা যায়নি। তবে নাস্তিক্যবাদী ব্লগারদের বিরুদ্ধে সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা মুফতী আহমদ শফি সাহেবের নেতৃত্বে বিক্ষোভ সমাবেশের কথা ছিল। আবার নাস্তিক ব্লগারদেরও প্রোগ্রাম ছিল একই স্থানে। ফলে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটান পুলিশ কর্তৃপক্ষ গোটা চট্টগ্রামে ১৪৪ ধারা জারি করে। মুফতি আহমদ শফি সাহেবের নেতৃত্বে ওলামা মাশায়েখের পক্ষ থেকে ঘোষিত হরতাল প্রত্যাহার করা হয়, ব্লগারদের প্রোগ্রামও স্থগিত ঘোষণা করা হয়। তাই ভেবেছিলাম আজ কোর্টে যেতে হবে। যথারীতি ১০ টা থেকে ১১টার মধ্যে মোটামুটি প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। সাধারণত চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে আমাদেরকে কোর্টে নেয়া হয় ১২-১৫ থেকে ১২-৩০ টার মধ্যে। সাড়ে ১১টার দিকে আমার সেবক এসে জানালো, সুবেদার তাকে বলেছে, আজ কোর্টে নেয়া হবে না। কিছুক্ষণ পরে বাবর সাহেব বললেন মার্চের ২৪ ও ২৫ তারিখে পরবর্তী

www.pathagar.com

হাজিরার জন্যে আসতে হবে। আমাদের আগের সিডিউল অনুযায়ী ১২ ও ১৩ মার্চ কোর্ট শেষে ১৪ মার্চে চট্টগ্রাম থেকে রওয়ানা করার কথা, বাবর সাহেব প্রস্তাব করলেন, এবং জেল কর্তৃপক্ষকে বললেন, আজই দুপুর ২টার মধ্যে আমাদেরকে পাঠিয়ে দেয়া হোক। কিছুক্ষণ পরে সুবেদার সাহেব এসে বলে গেলেন, ৩টার দিকে রওয়ানা করতে হবে, সেইভাবে প্রস্তুতি নিতে। আমার অভ্যাস অনুযায়ী সময়ের একটু আগেই প্রস্তুতিপর্ব সেরে নেই। অবশেষে রওয়ানা হই বিকেল ৫-৩০ টার দিকে।

ইতঃপূর্বে ৫ই মার্চ বিকেল ৬-৫০ এ রওয়ানা দিয়ে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছেছিলাম রাত ১-৪৫ মিনিটে। এবারে তার একঘণ্টা ১০ মিঃ আগে রওয়ানা দিয়েও আমি গাজীপুর জেলা কারাগারে পৌঁছি রাত ঠিক ৩টার সময়।

জেল গেটে পৌঁছার পর সেবককে ওয়ার্ড থেকে ডেকে আনার পর রুমে যখন পৌঁছি তখন রাত ৪টা হয়ে যায়। পথে পাউরুটি আর কলা খেয়েছিলাম। কুমিল্লা থেকে মিঠু আমাকেসহ পুলিশ ও ড্রাইভারের জন্যে খাবারের প্যাকেট দিয়ে দিয়েছে। গাড়ী গ্যাস নেয়ার ফাঁকে ড্রাইভার খেয়ে নেয়। পুলিশের লোকেরা চলন্ত গাড়িতেই খেয়ে নেয়। আমার পক্ষে চলন্ত গাড়িতে প্যাকেটের খাবার খাওয়া সম্ভব ছিল না, আমি সাথে থাকা তিন স্লাইস পাউরুটি ও একটা কলা খেয়ে নেই। আমার প্যাকেটটার কিছুটা খেয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘড়িতে ৫-৩০টার এলার্ম দিয়ে রাখলাম যাতে ফজরের নামাজ ঠিক সময়েই আদায় করতে পারি। এত রাস্তা সফরের ক্লান্তি সত্ত্বেও ঠিকমত ঘুম হল না। ফজরের পরে অনেকক্ষণ শুয়ে কাটালাম, কিন্তু তারপরও ঘুম বলতে যা বুঝায় তার কিছুই হল না। অবশেষে উঠে গোসল নাশতা শেষে মনকে স্বস্তি দেবার চেষ্টা করলাম। এবারে ছেলে মোমেন চট্টগ্রাম যেতে পারেনি তার সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রেশন পাবার জন্যে ১৫ মার্চ পরীক্ষা থাকার কারণে। একই কারণে ১৫ মার্চ শুক্রবারের সাক্ষাতেও তার পক্ষে আসা সম্ভব হয়নি।

সামনে ট্রাইব্যুনালে হাজিরা দিতে হবে ১৯ মার্চ। এদিকে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে হরতাল দেয়া হয়েছে ১৮, ১৯, ২০ ও ২১ মার্চ পর্যন্ত। অতএব আমাকে ট্রাইব্যুনালে হাজিরার জন্যে হরতালের আগের দিন অথাৎ ১৭ মার্চেই ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যাবে। ইতঃপূর্বে এভাবে তিনবার হরতালের আগে আমাকে কেন্দ্রীয় কারাগারে নেয়া হয়েছে ট্রাইব্যুনালে হাজিরার সুবিধার্থে। কিন্তু জেল কোড অনুযায়ী আমাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাকর্তৃপক্ষ ডিভিশনে থাকার সুযোগ দেয়নি। এবার টানা চার দিনের হরতালের সময়ও যদি সেভাবে আমাকে রাখে তাহলে আমার ভীষণ কষ্ট হবে, এটা ভেবে এখন থেকে বেশ খারাপ লাগছে। ইতঃপূর্বে যেখানে রেখেছে সেখানে গোসল করার সুযোগ পাইনি। প্রথমবারে কথা বলার মত দু'জন সাথী পেয়েছিলাম। মুহতারাম মাওলানা আব্দুস সুবহান ও স্নেহভাজন আজহার ওখানে পূর্ব থেকেই অবস্থান করছিলেন। দ্বিতীয়বারে ৬ সেলে থাকা অবস্থায় গোসল করতে পারিনি। কথা বলার লোকও বলতে গেলে পাইনি। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে গেটে আজহারের সাথে কয়েকবার যাওয়া আসার সময় দেখা হয়। আর ট্রাইব্যুনালে দেখা হয় আব্দুল কাদের মোল্লা সাহেবের সাথে। তৃতীয় বারে রাতে কাউকে না পেলেও, সকালে এবং বিকেলে মুজাহিদ সাহেব ও কামারুজ্জামান সাহেবের সাথে দেখা হয়। এবারে কোথায় রাখবে চারটা দিন এবং রাত কিভাবে কাটবে, কেন যেন এই চিন্তা থেকে মনকে মুক্ত রাখতে পারছি না। আল্লাহ তার এই দুর্বল বান্দার মধ্যে ছবর ও ইস্তেকামাতের শক্তি বাড়িয়ে দিন।

শাহবাগ মঞ্চ সরকারেরই কূটকৌশলের একটি অংশ এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। অতিসম্প্রতি তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে পুলিশ কমিশনারের ঘোষণা থেকে সেটা আরো স্পষ্ট হয়েছে। সরকার এদের ব্যবহার করে পা দিয়ে সাম খেলতে যাচ্ছে। এদের প্রতি ভারতের পররাষ্ট্র সচিবের রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সমর্থন ঘোষণা, ভারতের পত্রিকা ইন্ডিয়ান টাইমস এর প্রতিবেদনেও উল্লেখ করা, 'বাংলাদেশে শাহবাগ চত্বরে যা কিছু হচ্ছে তা ভারতের মদদেই হচ্ছে', ভারতের রাষ্ট্রপতির সফরেও এই মঞ্চের প্রতি সমর্থনের আভাস পাওয়া যায়। এটা দুইভাবে, এক. এই সময় সফরসূচি বাতিল করলে, বাংলাদেশে মৌলবাদীরা উৎসাহিত হবে মর্মে তার মন্তব্য, দুই. 'তরুণরাই বাংলাদেশ, আর ভারত চায় বাংলাদেশ হোক একটি

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র।' বলতে দ্বিধা নেই শাহবাগ চত্বরের ঘোষণায় শুধু যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসি চাই দাবিই উঠছে না, সেই সাথে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার শ্লোগানও দেয়া হচ্ছে, অপর দিকে এই মঞ্চের সংগঠক ব্লগারদের ওয়েব সাইটে আল্লাহ, রাসূল ও কুরআন সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যসহ তাদের বিভিন্ন লেখা লেখি ফাঁস হওয়ায় দেশের আলেম সমাজ ও ধর্মপ্রাণ মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। দেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমে দ্বীন মুফতী আহমদ শফীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশের সর্বত্রই ঐ নাস্তিক খোদাদ্রোহী ব্লগারদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ হচ্ছে। চরমোনাইয়ের পীর ইসলামী রাজনীতি আর জামায়াত শিবিরের রাজনীতি এক নয়, বলে মন্তব্য করলেও, যারা জামায়াত শিবিরকে নিষিদ্ধ করতে চায় তারা যে ইসলাম বিরোধী, এটা বুঝেই তাদের বিরুদ্ধে শাস্তির আইন পাস করার দাবিতে জাতীয় সংসদের স্পীকারের কাছে স্মারক লিপি দিয়েছিল।

দলমত নির্বিশেষে দেশের আলেম সমাজ এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন, বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই এর বিরুদ্ধে কলাম লিখছেন। এখন চাপের মুখে সরকারের পক্ষ থেকে তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়েছে। তবে সরকার বিষয়টাকে অন্যের ঘাড়ে চাপানোর কৌশলও অবলম্বন করেছে। আল্লাহ, রাসূল ও কোরআন সম্পর্কে নাকি ঐ ব্লগারদের ফেস বুকে অন্য কেউ এগুলো ঢুকিয়ে দিয়ে তারপর এটা ফাঁস করে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। তবে অতিসম্প্রতি যুগান্তরের এক উপসম্পাদকীয়তে ড. ফেরদৌস আহমদ কোরেশী নিজে ঐ ব্লগারদের ওয়েব সাইটি চেক করে এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে তার পক্ষ থেকে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন, এমন প্রচারণা তো পাশ্চাত্যের ঐ সব প্রপাগাণ্ডার চেয়ে জঘন্য যেগুলো পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবীরা করে থাকে। সাবেক রাষ্ট্রপতি মহাজোটের দ্বিতীয় বৃহত্তম দলের প্রধানও এ ব্যাপারে তার ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে একজন মুফতী এ ব্যাপারে নীরব রয়েছেন, শুধু তাই নয়, জামায়াতের বিরুদ্ধে সরকারী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে তার সমর্থক আলেমদের সমাবেশ ডেকেছেন আগামী ২৩ মার্চ শাপলা চত্বরে। এভাবে জামায়াত বিদ্বেষী এই মুফতী সাহেব এবার তার আসল পরিচয় জাতির সামনে তুলে ধরতে যাচ্ছেন, আমার বিশ্বাস এটাও আল্লাহতায়ালার পরিকল্পনাতেই হচ্ছে। এ পর্যন্ত সরকারের পদক্ষেপে আমাদের এবং জনগণের জানমালের ক্ষতি হওয়া অবশ্যই দুঃখজনক। তবে এ পর্যায়ে সরকারের প্রায় প্রতিটা পদক্ষেপই তাদের জন্যে বুমেরাং হচ্ছে। আরো হতে থাকবে। এই মুফতী সাহেবকে দিয়ে সরকার যা করতে চাচ্ছে তাই মুফতী সাহেবের এবং সরকারের জন্যে বুমেরাং হবে, ইনশাআল্লাহ।

১৯ শে মার্চ ২০১৩ ছিল ট্রাইব্যুনালে তৃতীয় সাক্ষীর জবানবন্দীর নির্ধারিত তারিখ। এদিকে ১৮ ও ১৯ মার্চ বিরোধী দলের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হরতালের কর্মসূচি। তাই আমাকে ১৭/০৩/১৩ রোজ রবিবারে সকাল ১০ টার দিকে নেয়া হলো ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে। দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছার পর জানলাম, এবারো, আমাকে ৭নং সেলে থাকতে হবে। একজন ডেপুটি জেলারকে বললাম আমার আপত্তির কথাটা। জেলার এবং সুপার সাহেবকে জানান ঘটনাক্রমে ঐ সময়ে উনারা দুইজনের একজনও অফিসে ছিলেন না। এটা তাদের কৌশলের একটা অংশ। ডেপুটি জেলার এর আগেও স্বীকার করেছেন, আজও স্বীকার করলেন, জেল কোড অনুযায়ী আমার দাবি যথার্থ। তবে এখানে তার কিছু করার নেই। তিনি বিনয়ের সাথে অনুরোধ করলেন, আমি যেন তার জন্যে বদদোয়া না করি। ৭ সেলে ডেসটিনির চেয়ারম্যান এবং এমডি একই রুমের মেঝেতে বিছানা করে থাকেন। প্রথম রাতে যখন ঐ সেলে যাই সেই দিনই তাদের সাথে প্রথম পরিচয় হয়। দুপুর থেকে বার বার খবর দেবার পর সন্ধ্যায় লক আপের পরে একজন ফার্মাসিস্ট এসে আমার ব্লাড প্রেসার চেক করে গেলেন। পরের দিন সকালে এলেন একজন ডাক্তার, তিনি বললেন, আমি তো মনে করেছিলাম আপনি ২৬ সেলে আছেন, তাই ওখানেই চলে গিয়েছিলাম। ওখানে গিয়েই জানলাম, আপনাকে ৭ সেলে রাখা হয়েছে। কিন্তু ওখানে তো সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীকে দেখলাম। উনি ওখানে থাকার সুযোগ পেলে আপনাকে কেন দেয়া হল না, তাতো বুঝে

www.pathagar.com

আসল না। আমি বললাম, আসলে দাড়ি টুপিওয়ালাদের ভিআইপি হিসাবে গ্রহণ করতে এদের বেশ কষ্ট হয়। আর আমাদেরকে কষ্ট দিয়ে তারা আনন্দ পায়।

১৯ মার্চ ট্রাইব্যুনালে হাজিরা, তার আগের দিন ১৮ মার্চ থেকে ১৯ মার্চ দুদিন ডাকা হয়েছে হরতাল। সকালে বারান্দায় একটু হাঁটাহাঁটি করে নাশতার আগে, গোসলের পরিবর্তে মাথায় একটু পানি দিয়ে তোয়ালে ভিজিয়ে গাটা মুছে নিয়ে নাশতা খেয়ে নিলাম। যেহেতু ২৬ সেল থেকে নাশতা আসে তাই নাশতার মান মোটামুটি ভাল। নাশতা শেষে আমি কোরআন তেলাওয়াত ও দোয়া দরুদ পাঠ শেষে সময় কাটানোর জন্যে ডেসটিনির চেয়ারম্যান ও এমডির রুমে গিয়ে জানতে চাইলাম উনাদের কাছে কোন পত্রিকা আছে কিনা। উনারা জনকণ্ঠ, ইত্তেফাক ও সংবাদ এই তিনটি পত্রিকা দেখিয়ে আমাকে জনকণ্ঠ ও ইত্তেফাক দিলেন, আর বললেন, সংবাদে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নেই। তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত পত্রিকা দুটোর আদ্যোপান্ত দেখে ও পড়ে কিছুটা সময় কাটালাম। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে অল্প সময়ের জন্যে যাওয়া হয় বিধায় সাথে কোন বই পুস্তক নেই না। এই পুস্তক নিলেই আবার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতির দরকার হয়। তাছাড়া এখানে ধর্মীয় বইয়ের ব্যাপারে খোদ আইজি প্রিজন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। এনিয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকা অবস্থায় তার সাথে আমার নিজেরই কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। ধর্মীয় বইয়ের ব্যাপারে তার আপত্তির সপক্ষে কোন যুক্তি দিতে না পারলেও নিজ সিদ্ধান্তে তিনি অটল থাকেন। তাই ঝামেলা এড়ানোর জন্যে ওখানে আর কোন ধর্মীয় বই নেই না। বরং কোন বইই নেই না। নেই শুধু তেলাওয়াতের কোরআন শরীফটা। ১৮ই মার্চের পুরোটা দিন বিশ্রাম এবং কোরআন তেলাওয়াতেই কাটিয়ে দিলাম।

১৯ মার্চের সকাল ৯-৩০ টায় ট্রাইব্যুনালে হাজিরার জন্যে রওয়ানা হবার কথা। তার আগে ১৮ মার্চের মতই, মাথায় পানি দিয়ে ভেজা তোয়ালে দিয়ে গা মুছে নাশতা সেরে আমি আমার চিরন্তন অভ্যাস মত নির্ধারিত সময়ের আগেই তৈরি হয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। ট্রাইব্যুনালের উদ্দেশ্যে রওয়ানার আগে ডেপুটি জেলারের রুমে কিছুক্ষণ বসতে হল। সেই ফাঁকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'শুনলাম সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীও এসেছেন, উনাকে কোথায় রাখা হয়েছে? আমার কথায় ডেপুটি জেলারকে বেশ অপ্রস্তুত ও লজ্জিত মনে হল। আবারও সেই একই কথা বললেন, 'স্যার, এক্ষেত্রে আমার কিছু করার নাই, আমাকে বদ দোয়া দিয়েন না'। অভিজ্ঞ লোকদের মতে, দুনিয়াটা শক্তের ভক্ত এবং নরমের যম। প্রবাদ বাক্যটি জেলকর্তৃপক্ষের আচরণে অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়েছে বার বার। এখানে এতদিন যা জেনেছি, তাহলো যাদের ব্যাপারে কোন না কোন পর্যায়ে বিপদে পড়ার আশংকা আছে অথবা যারা টাকা পয়সা দিয়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ম্যানেজ করতে পারেন, কেবল তাদেরকেই অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়। শুধু তাই না, তাদেরকে আইনের উর্ধ্বে মনে করা হয়। আইন প্রয়োগ হয় কেবল সহজ সরল ও নিরীহ মানুষের ব্যাপারে। অবশেষে ট্রাইব্যুনালে এসে প্রায় বিকেল তিনটা পর্যন্ত, বসে বসে কাটালাম। এরপর একজন সাক্ষীর বানোয়াট, মিথ্যা ও ভিত্তিহীন জবানবন্দী শুনতে হল ৪টা পর্যন্ত যার অধিকাংশ ডিকটেট করা হয় প্রসিকিউটর এবং বিচারপতিদের পক্ষ থেকে। অবশ্য প্রসিকিউশনকে একজন বিচারপতি অবশেষে বললেন, সাক্ষীকে আগেই শিখিয়ে আনা উচিত, আদালতে এভাবে তাকে শিখিয়ে দেয়া অশোভনীয় দেখায়। বিচারপতির ব্যবহৃত শব্দটি হুবহু আমার মনে না থাকলেও তিনি যা বলেছেন তার ভাব অর্থ এটাই দাঁড়ায়। হরতালের দিন সিনিয়র আইনজীবীগণ আদালতে আসতে পারেন না। জুনিয়রদের পক্ষ থেকে এ জন্যে সময় চাওয়া হয়, কখনও আদালত এটা শোনে আবার কখনও শোনে না। আজকের সাক্ষীর জবানবন্দী হল সিনিয়র কোন আইনজীবীর উপস্থিতি ছাড়াই। ফলে প্রসিকিউটরগণ সাক্ষীকে বিনা বাধায় সাহায্য করার সুযোগ গ্রহণ করে। নিয়ম মাফিক সাক্ষীর জবানবন্দীর পর জেরা শুরু হয়ে থাকে। জেরা করে ট্রায়াল ল' ইয়ার বা সিনিয়র আইনজীবী। জুনিয়র আইনজীবী প্রতীকীভাবে একটা প্রশ্নের মাধ্যমে জেরার সূচনা করে দিয়ে পরবর্তী তারিখ প্রার্থনা করেন, একটু সময়ের

www.pathagar.com

ব্যবধান রেখে। আদালত আগামী ৩১ মার্চ পরবর্তী তারিখ ঘোষণা করেন। এর আগে আমার আইনজীবী জুনিয়র হলেও একটি মাত্র প্রশ্ন করে সাক্ষীকে অপ্রস্তুত করে দেন। খুবই ছোট্ট এবং সহজ সরল প্রশ্ন, বাংলাদেশ কবে স্বাধীন হয়।' সাক্ষী তার উত্তরে বলল, আমার খেয়াল নেই। সাক্ষীর ভাষা ছিল দু'রকম। একবার বলে, মনে নেই। আবার বলে, বলতে পারব না। বিচারপতি রেকর্ড নিলেন তার পক্ষ থেকে সংশোধিত ভাষায়, আমার খেয়াল নেই। অথচ এর আগে সাক্ষী তার জবানবন্দীতে বার বার উল্লেখ করেছে স্বাধীনতার ১০/১২ দিন আগে স্বাধীনতার আগের দিন বিকেলে ইত্যাদি। স্বাধীনতার দিনটাই যদি জানা না থাকে তাহলে তার ঐ সব কথাও কি ভিত্তিহীন হয়ে যায় না?

১৯ মার্চে ট্রাইব্যুনালে এ পর্যন্ত হাজির হওয়া সাক্ষীদের তৃতীয় ব্যক্তির জবানবন্দী শেষ হল এবং জেরার আনুষ্ঠানিকতা স্বরূপ একটি প্রশ্ন করে, এর সূচনা করে। আগামী ৩১ মার্চ ১৩ তে পরবর্তী তারিখ ধার্য করা হল। এদিকে চট্টগ্রামের আদালতে হাজিরার পূর্ব নির্ধারিত তারিখ ছিল ২৪ ও ২৫ শে মার্চ। এজন্যে আমাকে ২৩ মার্চে নিয়ে যাওয়া হল গাজীপুর জেলা কারাগার থেকে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে। গাজীপুর কারাগার থেকে সকাল ১১টার দিকে রওয়ানা করে বেলা ২টার দিকে কুমিল্লা পৌঁছে একটা ফিলিং স্টেশনে গাড়িতে গ্যাস নেয়ার সময়, নেমে এস্তেঞ্জা অজু ও নামাজ সেরে নিয়ে গাড়িতে উঠলাম। গাড়িতে ড্রাইভারসহ পুলিশদের জন্যে প্যাকেট খাবার এখান থেকেই দেয়া হল। আমার জন্যেও একটা বিশেষ প্যাকেটের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু আমি চলন্ত গাড়িতে ঐ প্যাকেটের খাবার না খেয়ে বাসা থেকে পাঠানো খিচুরির অর্ধেক, চামচের সাহায্যে খেয়ে নিলাম। এবারে বাসা থেকে আমার পছন্দের দইবড়াও পাঠানো হয়েছিল, তারও প্রায় অর্ধেকটা খেয়ে নিলাম।

চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছে, কুমিল্লা থেকে দেওয়া খাবারের প্যাকেট, বাসা থেকে পাঠানো খিচুরি বাকীটা এবং দইবড়া আমার সেবককে দিয়ে দিলাম, পাশের রুমের সেবক এবং কর্তব্যরত কারারক্ষীদের সাথে নিয়ে খেয়ে নেবার জন্যে।

২৪শে মার্চ দুপুর ১২-৪৫ এর দিকে কোর্টের উদ্দেশে রওয়ানা দিলাম। আজ দুপুর ২টা বাজার অল্প আগে শুরু হয়েই নামাজ এবং খাবারের জন্যে ৩-৩০ পর্যন্ত মূলতবী হয়ে যায়। আবার তিনটারও বেশ কিছু পরে শুরু হয়ে পরের দিনের জন্যে বিকেল ৪-৩০ দিকে মূলতবী করা হয়। ২৫ শে মার্চ বিরোধী দলের হরতালের কারণে আমাদেরকে আর কোর্টে যেতে হয়নি। চট্টগ্রাম জেলকর্তৃপক্ষের সাথে কথা হয়েছিল আমাদেরকে ২৬ মার্চেই পাঠিয়ে দেয়া হবে। এজন্যে মোটামুটি প্রস্তুতিও নিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু সকালে বাবর সাহেব জানালেন, গত রাতে সুপার সাহেব এসে উনাকে বলে গেছেন, ২৬ মার্চের সকালের দিকে উনাকে পাঠানো হবে। আমাকে নাকি পাঠাতে পারবেনা, আমার জন্যে নাকি অতিরিক্ত সিকিউরিটির দরকার হয়। বাবর সাহেব ২৬ মার্চের সকালে চলে গেলেন। ঐ বিল্ডিংয়ে এখন আমি একা। ২৭ ও ২৮ মার্চ দুই দিন হরতাল। সুতরাং ২৯ মার্চেই আমাকে যেতে হবে। এদিকে ২৯ মার্চ শুক্রবার হবার কারণে চট্টগ্রামে গাড়ী ভাড়া পেতে সমস্যা হয় বলে এর আগে একবার জেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিলেন, তাই এবারে যাতে সে সমস্যা না হয় এ জন্যে আগেই গাড়ী ভাড়া নিশ্চিত করার জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে বিশেষভাবে তাগিদ দেয়া হল। পরের দিন জেল সুপার এসে কৈফিয়তের সুরে আমাকে ২৬ শে মার্চে পাঠাতে না পারার কারণ ব্যাখ্যা করলেন। এদের সাথে কোন কথা বলে লাভ হয় না বিধায় আমি অন্য কোন কথা না বলে শুক্রবারে ২৯ মার্চে যেন যেতে পারি বিষয়টা নিশ্চিত করতে বলে দিলাম।

এবারে ১৯ মার্চে ট্রাইব্যুনালে মোমেন যেতে পারেনি। ঐদিনই সে বিশেষ কোন কাজে কাতারে যায়। একই কারণে ২২ মার্চ শুক্রবারে সাপ্তাহিক সাক্ষাতেও সে আসতে পারেনি। এর আগের শুক্রবারে ১৫ মার্চে ছিল তার সুপ্রিম কোর্টে রেজিস্ট্রেশন উপলক্ষে পরীক্ষা তাই তার সাথে সাক্ষাতের গ্যাপটা বেশ বড়ই হয়ে যায়। কাতারে যাবার কারণে চট্টগ্রামে সে যেতে পারেনি।

www.pathagar.com

এবারে ২৯ মার্চ শুক্রবার পরিবারের সদস্যদের সাথে সাপ্তাহিক সাক্ষাতের জন্যে নির্ধারিত। এ দিনে চট্টগ্রাম থেকে গাজীপুর পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে, কাজেই সাপ্তাহিক সাক্ষাতের জন্যে শনিবারে ব্যবস্থা করার জন্যে বাসা থেকে গাজীপুর জেলকর্তৃপক্ষকে জানালে, তারা রাত ৯টায় জানাবেন বলে পরিবারের সদস্যদেরকে জানিয়েছেন। এটা জেনে মিঠু আমার গাড়ীর কর্তব্যরত একজন পুলিশের লোকের মাধ্যমে আমাকে জানালো, আমি নিজে যেন গাজীপুর কারাগারে পৌঁছে কারাকর্তৃপক্ষকে এভাবে ব্যবস্থা করতে বলি। আমি জেল গেটে ৭-৩০- ৮টার দিকে পৌঁছে একজন ডেপুটি জেলারকে, পরবর্তীতে জেলার সাহেব এসে হাজির হলে তাকেও এ ব্যাপারে অনুরোধ করলাম। তাদের একটা জিজ্ঞাসা ছিল পরিবারের কেউ চট্টগ্রাম কারাগারে দেখা করেছে কিনা, আমি জানালাম, তাদের কেউ চট্টগ্রামে যায়নি। আরো আবেগের ব্যাপার হল, আমার ছেলে গত দুই সপ্তাহের নির্ধারিত দিনে সাক্ষাতে আসতে পারেনি। আজকের দিনের সাক্ষাৎ না হতে পারার জন্যে আমি বা আমার পরিবার দায়ী নয়। আমাকে যদি ২৬ মার্চ পাঠানো হত তাহলে আজকের শুক্রবারের সাক্ষাতে কোন অসুবিধা হত না। অবশ্য আর কোন কথা না বাড়িয়ে জেলার নিজে বললেন, ঠিক আছে, উনাদেরকে আসতে বলা হবে।

আজ ৩০ মার্চ শনিবার পারিবারিক সাক্ষাতের পরিবর্তিত দিন। আজ বেশ সকাল সকালই তারা গেটে এসে পৌঁছে। এস.বি'র লোক সময়মতই উপস্থিত হয়। তাদের আসার সংবাদ যখন পাই, তখন আমি সবেমাত্র নাশতা শুরু করেছি। যাহোক একটু তাড়াহুড়ো করে নাশতা সেরে তৈরি হয়ে জেল গেটের দিকে রওয়ানা হই। আজ আমার মা মনি মুহসিনা আসতে পারেনি। সে ওঊখঞঝ পরীক্ষা দিতে গেছে। আমার কারাজীবনের এই পৌনে তিন বছরে প্রতি সপ্তাহেই মুহসিনা দেখা করতে এসেছে। শুধু একবার মালয়েশিয়ায় কোন একটা সেমিনারে যাওয়ার কারণে সে আসতে পারেনি। আজকে তার আসতে না পারাটাও একটি জরুরি কারণেই। অতএব তার অনুপস্থিতি তীব্রভাবে অনুভূত হলেও মনে কিছু করিনি। আল্লাহ তাকে অনেক ঝামেলার মধ্যে দিয়ে এ লেভেল এবং বিবিএ ও এমবিএ পাস করার তৌফিক দিয়েছেন, সামনে যদি সে তার ক্যারিয়ার গঠনে আরো এক ধাপ এগুতে পারে, তাহলে তার পিতা হিসাবে নিজেকে ধন্যই মনে করব। আমার প্রথম সন্তান হিসাবে তার প্রতি মনের আবেগ একটু বেশিই, এটা প্রকাশ করতে আমার আপত্তি নেই। অন্য ছেলে-মেয়েরাও এটাকে স্বাভাবিকভাবেই নেবার কথা, কারণ তারাও তাদের বড় বোনকে আমার মত একটু বেশি গুরুত্ব দিয়ে অভ্যস্ত।

আগামীকাল ৩১ মার্চ ট্রাইব্যুনালে সাক্ষীর জেরা আছে, ছেলে আইনজীবী হওয়ার কারণে ব্যক্তিগত কুশল বিনিময়ের পর পরই মামলার আলোচনা এসে যায়। তা ছাড়া তার সাম্প্রতিক কাতার সফরে আরব বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আলেম ডা. ইউসুফ আল কারদাভীর সাথে সাক্ষাতের বর্ণনা শুনে, তার পক্ষ থেকে কিছু সান্ত্বনার বাণী শুনে বেশ ভালই লাগল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ, তার পক্ষ থেকে জামায়াতে ইসলামীর প্রতি জুলুম নির্যাতনের ফলে মুসলিম বিশ্বে জামায়াতের প্রতি সহানুভূতি অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাচ্ছে। ভবিষ্যতে এটা জামায়াতে ইসলামীর জন্যে একটা বড় পুঁজি হবার সম্ভাবনা আছে। আল্লাহ যেন আমাদের বর্তমান দায়িত্বশীলদেরকে বিশেষ করে মাঠ কর্মীদেরকে এবং প্রবাসী ভাইদেরকে এটা কাজে লাগানোর জন্যে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার তৌফিক দেন (আমীন)।

৩১ মার্চ '১৩ তে ট্রাইব্যুনালে হাজিরার জন্যে সকাল সকাল গোসল, নাশতা সেরে তৈরি হয়ে অপেক্ষা করতে থাকি। আমি সকাল ৭টার মধ্যে তৈরি হয়ে গেলেও আমাকে নেয়ার জন্যে ডেপুটি জেলার সাহেব আসলেন ৭-৪৫ মিনিটে। ট্রাইব্যুনালের উদ্দেশে রওয়ানা দিলাম ঠিক সকাল ৮টায়। পৌঁছলাম ১০-৩০ টায়। গিয়ে শুনলাম আজ দুপুর ১২টার আগে কোর্ট বসবে না। কারণ বিচারপতিগণ সুপ্রীম কোর্টের আপিল ডিভিশনের চারজন নতুন বিচারপতির শপথ অনুষ্ঠানে গিয়েছেন, ওখান থেকে ফিরে এসেই কোর্টে উঠবেন। দুপুর ১২টার কিছু পরেই আমাকে ডাকা হল, সাক্ষীর জেরা শুরুর পর থেকে ঐ দিনের কোর্টের

www.pathagar.com

প্রসিডিংয়ের শেষ পর্যন্ত সরকারী প্রসিকিউটরদের পক্ষ থেকে আক্রমণাত্মক ভাষায় আমার আইনজীবীকে বাধা প্রদান করা অব্যাহত রাখা হয়, এমনকি আমাদের আইনজীবীকে প্রসিকিউশনের কেউ একজন বেয়াদব বলে গালি দিলে আমাদের আইনজীবীও তার যথাযথ জবাব দেন। উত্তপ্ত এই পরিবেশকে ঠাণ্ডা বা স্বাভাবিক ও শান্ত করার জন্যে বিচারপতিদেরকে বেশ কিছুক্ষণ নিষ্ক্রিয় দেখা যায়। তবে কথায় বলে ইবঃঃবৎ ষধঃব ঃযধহ হবাবৎ. একেবারে কিছু না হওয়ার চেয়ে কিছু দেরীতে হলেও ভাল। অবশেষে বিচারপতিদের একজনের পদক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

ট্রাইব্যুনালে সরকার পক্ষীয় আইনজীবীদেরকে পেশাদার আইনজীবী মনে না হয়ে বরং আওয়ামী লীগের মাঠ কর্মীদের মত ফ্যাসিবাদী আচরণই তাদের কর্মকাণ্ডে প্রাধান্য পেয়েছে। তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডিফেন্স ল' ইয়ারকে জেরা করতে না দেয়ার জন্যে তারা কখনও একযোগে, বা কখনও কোন একজন ব্যক্তিগতভাবে প্রায়ই মারমুখী ভূমিকা পালন করে থাকে। সাক্ষীর দুর্বল বক্তব্যকে সবল করার জন্যে নির্লজ্জভাবে সাক্ষীকে আদালতে বসেই চৎড়সঢ়ঃ (প্রমপ্ট) করে। ট্রাইব্যুনালের সম্মানিত চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে তাদেরকে একাধিকবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়, সাক্ষীকে এভাবে আদালতে বসে সাহায্য করা বা শিখিয়ে দেওয়া বেমানান। যা শিখাবার আপনারা আগে থেকে শিখিয়ে আনবেন। ট্রাইব্যুনালের সম্মানিত চেয়ারম্যানের এভাবে বলাটাও তো সরকারী আইনজীবীদের ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন সৃষ্টি করার জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু সরকারী আইনজীবীদের আচরণে এরপরও কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। দিন যত যাচ্ছে তারা ততই তাদের মারমুখী আচরণ তীব্র থেকে তীব্রতর করে চলেছেন।

ট্রাইব্যুনালের বিচারপতিদের আচরণ থেকেও মাঝে মধ্যে মনে হয় তারা বিচারক নন বরং আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নকারী একটিভিস্টের ভূমিকাই পালন করছেন। বিশেষ করে প্রসিকিউটরদের কারো কারো ভূমিকা রাজনৈতিক মাস্তানীর পর্যায়ে নেমে আসে। যা আসলেই আওয়ামী লীগের নিজস্ব স্বভাব প্রকৃতিরই বাস্তব প্রকাশ বটে। আওয়ামী লীগ মূলত একটি ফ্যাসিস্ট দল। তাদের কাছে থেকে কোন পর্যায়েই গণতান্ত্রিক আচরণ আশা করা যায় না। ভিন্নমত বরদাশত করা তাদের স্বভাব প্রকৃতির পরিপন্থী। তারই জীবন্ত নমুনা দেখা যাচ্ছে ট্রাইব্যুনালে। চট্টগ্রামে আমাদের হাজিরার তারিখ নির্ধারিত হয়েছে ৭ই এপ্রিলে। স্বাভাবিকভাবে কোর্টের হাজিরার নির্ধারিত তারিখের একদিন আগে আমাদেরকে চট্টগ্রাম নেয়া হয়ে থাকে। কখনও হরতাল বা অন্য কোন রাজনৈতিক কর্মসূচির কারণে নিরাপত্তার প্রশ্ন দেখা দিলে আরো একদিন আগেই পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। এবারে ঘটনাক্রমে দেশ বরণ্যে আলেমে দ্বীন হযরত মুফতী শাহ আহমদ শফী সাহেবের নেতৃত্বে হেফাজতে ইসলাম নামক সংগঠনের পক্ষ থেকে ৬ই এপ্রিলে ঢাকা অভিমুখে সারাদেশ থেকে লংমার্চের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে আমাদেরকে এবারও আগের মত একদিন আগেই চট্টগ্রাম নেয়ার ব্যবস্থা হতে পারে। ৫ই এপ্রিল শুক্রবার আমার সাপ্তাহিক পারিবারিক সাক্ষাতের নির্ধারিত দিন। জেল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছে, সকাল সকালে আমার পরিবারের লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করেই যেন চট্টগ্রাম রওয়ানা করতে পারি। আল্লাহ ভাল জানেন, এবারের সফরটা কেমন হবে।

৭ ও ৮ই এপ্রিল কোর্টে হাজিরার পর ৯ই এপ্রিলেই গাজীপুরে ফিরে আসার কথা। কিন্তু ৯ই এপ্রিল বিরোধী দলের পক্ষ থেকে ঢাকায় মহাসমাবেশ ডাকা হয়েছে। সাথে সাথে এও বলা হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে কোন প্রকার বাধা দেওয়া হলে ঐ মহাসমাবেশে আগত জনগণ ঢাকার রাজপথে বসে পড়বে, বা অবস্থান ধর্মঘটে যেতে পারে। কাজেই ৯ই এপ্রিলে চট্টগ্রাম থেকে আমরা আসতে পারব কিনা এনিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ সংশয় দেখা দিয়েছে। গাজীপুর থেকে চট্টগ্রামের এই লম্বা পথের সফর এমনিতেই আমার জন্যে কষ্টকর। তদুপরি, বর্তমান পরিস্থিতির কারণে নিরাপত্তা জনিত দুশ্চিন্তা মনের উপর মাঝে মধ্যে ভীষণ চাপ সৃষ্টি করে। মূলত কারাজীবনের প্রধান সমস্যাই হল মানসিক চাপে থাকা। চট্টগ্রামের আদালতে হাজিরার নির্ধারিত তারিখ ছিল এপ্রিল মাসের ৭ ও ৮ তারিখ। নিয়ম অনুযায়ী কোর্টের

www.pathagar.com

হাজিরার একদিন আগে যাওয়ার কথা। কিন্তু ৬ই এপ্রিল হেফাজতে ইসলামের লং মার্চের কারণে আমাদেরকে চট্টগ্রামে নেয়ার ব্যবস্থা করা হয় ৬ ই এপ্রিল সকালে। এদিকে আমার পরিবারের লোকদের সাথে সাক্ষাতের সাপ্তাহিক দিনও ছিল শুক্রবার অর্থাৎ ৫ এপ্রিল। জেল কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম রওয়ানার আগে আমার পরিবারের লোকদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দেয়ার কারণে, তাদের সাথে দেখা করেই আমি চট্টগ্রামের পথে রওয়ানা হই। রওয়ানা হই মনে একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে। এক দিকে হেফাজতে ইসলামের লংমার্চ উপলক্ষে মহাসমাবেশের জন্যে শাপলা চত্বরে অনুমতি দেয়া হয়, অপর দিকে লংমার্চ ঠেকাবার জন্যে সরকার সমর্থিত ২৩টি সংস্থার পক্ষ থেকে শুক্রবার ৬টা থেকে শনিবার সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত হরতাল ডাকা হয়। শুধু তাই নয় শুক্রবারে বিকেল ৩টা থেকে দেয়া হয় অবরোধ। যাতে লংমার্চকারীগণ চট্টগ্রাম থেকে বের হতে না পারে এবং ঢাকায় প্রবেশ করতে না পারে। ফলে পথে সংঘাত সংঘর্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয় খোদ সরকারের পক্ষ থেকেই।

রাস্তায় কেমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে তা তো আল্লাহ আলেমুল গায়েব ছাড়া আর কারও জানা নেই। কথায় বলে 'ভালটাই আশা কর, তবে সবচেয়ে খারাপ কিছু ঘটতে পারে এজন্যেও প্রস্তুত থাক।' এমন একটি মানসিক চাপ সহই আমাকে রওয়ানা করতে হল চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে। আমার ছেলে জানে সন্ধ্যা ছয়টা থেকে হরতাল আর বিকেল তিনটা থেকে অবরোধ। তাই এর আগেই চট্টগ্রাম পৌঁছে যাওয়া উচিত। কিন্তু পুলিশের প্রটেকশন পার্টির ব্যাপারে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনার ফলে রওয়ানা করতে বেশ একটু দেরীই হয়ে যায়। আমরা নারায়ণগঞ্জের সীমানা পার হওয়ার আগেই কুমিল্লা জেলার পুলিশ কন্ট্রোল রুম থেকে আমাদের গাড়িতে থাকা পুলিশ স্কোয়াডের ইনচার্জকে ফোনে জানানো হল, হেফাজতে ইসলামের লংমার্চে লোকেরা পায়ে হেঁটেই রওয়ানা দিয়েছে। গাড়ী না পাওয়ার কারণে আমাদের স্কোয়াড ইনচার্জকে বলা হল, দাউদকান্দি টোল প্লাজায় পৌঁছার পর যেন খোঁজ খবর নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়। কুমিল্লা পুলিশ কন্ট্রোল রুমের পক্ষ থেকে এই নির্দেশনা ও সতর্ক সংকেতে পুলিশ স্কোয়াডের মধ্যেও কিছুটা চাঞ্চল্য এবং অস্থিরতা লক্ষ্য করলাম। আমি মনে মনে আল্লাহর সাহায্য কামনা করে নিজেকে দোয়া কালামের মধ্যে মগ্ন রাখার চেষ্টা করলাম।

চলতি পথে অনেক ট্রাক বাসে হেফাজতে ইসলামের ডাকা লংমার্চে লোক যাচ্ছে, এটা বেশ স্পষ্ট লক্ষ্য করলাম। চট্টগ্রাম থেকে যাদের বাদ জুমা রওয়ানা করার কথা ছিল তারা ৫ ই এপ্রিল শুক্রবারে সকাল ৮-৯ টা থেকেই রওয়ানা শুরু করে। ফলে বিকেল তিনটার অবরোধের কারণে তাদেরকে ঢাকা আগমনে বাধা দেয়া সম্ভব হয়নি। তবে বিকেল ৩ টার দিকে দারোগা হাট নামক স্থানে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা রামদা হাতে একত্রিত হয়ে চট্টগ্রাম থেকে বাস চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে। বাস ট্রাক লরী দিয়ে গোটা রাস্তা আটকিয়ে দেয়। আমাদের গাড়ীর একটু আগে অগ্রসর হয়ে যায় বাবর সাহেবের গাড়ী। উক্ত গাড়ীর পুলিশ স্কোয়াড ইনচার্জ ফোনে জানায় অবরোধ অতিক্রম করে সামনে যাওয়া যাবে না। ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে আমাদের কেইস পার্টনার মেজর জেনারেল (অব.) রাজ্জাকুল হায়দার এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুর রহীম সাহেবদ্বয় এ অবরোধের মুখোমুখি হন। কিন্তু সেটা ছিল প্রাথমিক অবস্থায়; তাই উনারা আমাদের ঘণ্টাখানেক আগে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছতে সক্ষম হন, উনাদের কাছ থেকেই অবরোধের সূচনা পর্বে রামদা হাতে আওয়ামী ক্যাডারদের অপতৎপরতার চোখে দেখা বর্ণনা শুনলাম।

চলার পথে আমাদের গাড়ীতে অবস্থানরত পুলিশের লোকেরাও বলছিল রামদা দিয়ে বাসের সামনের চাকা কেটে দিয়ে এ অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের ভাষায়, 'রামদা' ধারীদের সংখ্যা ৫/৬ জনের বেশি হবে না, তবে তাদের সাথে আছে আরো ২০/২৫ জন। আশার কথা চট্টগ্রাম জেলার পুলিশ প্রটেকশন পার্টি বেশ সাহস এবং দক্ষতার সাথে সর্বোপরি আল্লাহর মেহেরবানীতে, এই ভয়াবহ অবরোধ ভেদ করে আমাদেরকে একটু বিলম্বে হলেও চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে নিরাপদেই পৌঁছে দেয়। আমাদের অনুসরণ করে সব সময় মিঠু একটি মাইক্রোবাস নিয়ে চট্টগ্রাম যায় এবং আসে। ওরা চট্টগ্রাম ঢুকতে পারবে কিনা,

www.pathagar.com

আশংকা করতে দেখি ওদের গাড়িটা আমাদের সাথেই পাশেই এসে গিয়েছে। তারা বুদ্ধিমত্তার সাথে আমাদের গাড়ীকে অনুসরণ করে পুলিশী তৎপরতার সুযোগটা গ্রহণ করে আমাদের সাথে চট্টগ্রাম শহরে পৌঁছায় এবং পরের আদালতে সারাক্ষণ আমার পাশে অবস্থান করে। ঐদিন আমার ছেলে মোমেন যেতে পারেনি।

গত শুক্রবার সন্ধ্যার দিকে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছলেও মনটা যেন পড়ে ছিল রাজধানী শহর ঢাকার শাপলা চত্বরে। শনিবারের পত্রিকা ইত্তেফাক এবং ডেইলী স্টার এ আশংকা প্রকাশ করে খবর প্রকাশ করা হয়। জেলখানায় এছাড়া আর কোন পত্রিকা পাইনি। তবে বাবর সাহেব এবং অন্যান্যরা রেডিও, কেউ কেউ টেলিভিশনের সাহায্যে সর্বক্ষণিক খবরের প্রতি নজর রাখছিলেন, এবং আমাকে অবহিত করছিলেন। দিগন্ত টিভি সরাসরি সম্প্রচার করায় সরেজমিনে কী ঘটছে তাও তারা দেখছিলেন এবং আমাকেও জানাচ্ছিলেন, ঐদিন সন্ধ্যার বিবিসিসহ বিভিন্ন রেডিওতে প্রচারিত খবর। খবরের বিশ্লেষণও শোনার সুযোগ হয়।

পরের দিন রোববার ৭ই এপ্রিল কোর্টে গিয়ে সংগ্রাম, আমারদেশ ও নয়াদিগন্ত পেয়ে তিনটা পত্রিকারই আদ্যোপান্ত বিশেষ মনোযোগের সাথে পড়ে অভিভূত হলাম। অন্য পত্রিকার রিপোর্টেও এটাকে কম গুরুত্ব দেয়া হয়নি। লংমার্চ ও মহাসমাবেশের সাইট রিপোর্টগুলো ছিল চমৎকার এবং উৎসাহজনক। বিশেষ করে আমরা যারা জামায়াতে ইসলামীর দায়িত্বশীল হিসাবে জেলখানায় আছি, প্রায়ই জামায়াত এবং শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি ও আয়োজনের খবর শুনে কিছুটা হলেও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বা বিচলিত হই, হেফাজতে ইসলামের এই কর্মসূচির প্রতি ঈমানদার মুসলমানদের স্বতঃস্ফূর্ত সংহতি ও সহমর্মিতা প্রকাশের জীবন্ত নমুনা দেখে আশান্বিত হই। ২/১ টি ইসলামী সংগঠন ও সংগঠনের নেতা কর্মীদের নির্মূল করলেই ইসলাম নির্মূল হবে না, ইনশাআল্লাহ।

সোমবার ৮ই এপ্রিল আমাদের কোর্টে হাজির হবার পূর্ব নির্ধারিত তারিখ থাকা সত্ত্বেও হেফাজতে ইসলাম আহূত হরতালের কারণে ঐদিন আমাদেরকে কোর্টে নেয়া হয়নি। তবে জজ সাহেব কোর্টে বসে এপ্রিলের ২২, ২৩ ও ২৪ তিন দিনের তারিখ ঘোষণা করেন। পূর্ব সিডিউল অনুযায়ী রবিবার ও সোমবার কোর্ট শেষে মঙ্গলবার অর্থাৎ ৯ ই এপ্রিল আমাদের চট্টগ্রাম থেকে গাজীপুর ফিরে আসার কথা। কিন্তু হেফাজতে ইসলামের এক দিনের হরতালের সাথে ১৮ দলীয় জোটের ৯ ও ১০ এপ্রিল ৩৬ ঘণ্টার হরতাল যোগ হয়। তাছাড়া চট্টগ্রামের সন্তান বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা আব্দুল্লাহ নোমানকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে চট্টগ্রামে হরতাল বৃহস্পতিবারে ১১ই এপ্রিলে। একই সাথে সারা দেশব্যাপী সকাল সন্ধ্যা হরতাল ডাকে ইসলামী ছাত্রশিবির। তাই আমাদের চট্টগ্রাম থেকে আসা পিছিয়ে যায় ১২ এপ্রিল পর্যন্ত।

১২ এপ্রিল সকাল ১১টার দিকে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে গাজীপুর জেলা কারাগারের উদ্দেশ্যে আমি এবং কাশিমপুর- ১ কেন্দ্রীয় কারাগারের জন্যে বাবর সাহেব রওয়ানা করেন। এবারে ইতিহাসের কঠিনতম যানজটে পড়তে হয়। চট্টগ্রাম থেকে শুরু করে গাজীপুর জেলা কারাগার পর্যন্ত সর্বত্রই কম বেশি যানজটের কবল থেকে রেহাই পাওয়া যায়নি। রাস্তা স্বাভাবিক থাকলে যেখানে ৬/৭ ঘণ্টার মধ্যে চলে আসা যায়, সেখানে এবার আসতে সময় লাগে ১৩ ঘণ্টা অর্থাৎ সকাল ১১টায় রওয়ানা করে গন্তব্যে পৌঁছি রাত ঠিক ১২টায়। দূরপাল্লার সফর আমার সায়েটিকা রোগের কারণে ক্ষতিকর। তাই বেশ ক্লান্ত হয়ে যাই, জয়েন্টের ব্যথা বৃদ্ধি পায়। এবারের কষ্ট ছিল অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় কঠিনতম।

চট্টগ্রাম থেকে ১২ এপ্রিল শুক্রবারের দিবাগত রাত ১২টার সময় গাজীপুর জেলা কারাগারে পৌঁছে, জানলাম শনিবারে আমার বেগম সাহেবার স্কুলের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম থাকায় সাক্ষাতের জন্যে রবিবার আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমার সাপ্তাহিক সাক্ষাতের নির্ধারিত দিন এখন শুক্রবার। তবে চট্টগ্রাম থেকে যদি শুক্রবারের আগে আসা না যায় তা হলে শনিবারে হয়ে থাকে। এবারে যেহেতু চট্টগ্রাম থেকে

www.pathagar.com

শুক্রবারেই রওয়ানা করতে হয়েছে, কাজেই আশা করেছিলাম শনিবারেই সাক্ষাৎ হবে। কিন্তু বিশেষ কারণে তা আরো একদিন পিছিয়ে গেল।

১লা বৈশাখ ১৪ই এপ্রিলে সকাল ১১টার দিকে আমার পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা হল। পরের দিন ১৫ই এপ্রিল ট্রাইব্যুনালে হাজিরা। শুনলাম, আমার এলাকার মাধবপুর থেকে একজনকে পুলিশের মাধ্যমে জোরপূর্বক ঢাকায় আনা হয়েছে সাক্ষী দেয়ানোর জন্যে। সেই সাথে পাবনা জেলার বর্তমান মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কমান্ডারকেও নিয়ে আসা হয়েছে। ট্রাইব্যুনালে গিয়ে শুনলাম, মাধবপুর থেকে আর যাকে আনা হয়েছিল সে মিথ্যা সাক্ষী দিতে পারবে না বলে বাড়িতে ফিরে গেছে। তবে জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার ট্রাইব্যুনালে এসেছে হাজিরা দেবার জন্যে। দুপুরের বিরতির পর সাক্ষীর জবানবন্দী দেবার কথা। ১টার বিরতির সময় শুনলাম, সাক্ষী অসুস্থ, তাই আজ আমাকে কোর্টে উঠানো হবে না। সাক্ষীরও জবানবন্দী হবে না। পরের দিন অর্থাৎ ১৬ এপ্রিল আসতে হবে। ১৬ই এপ্রিল সাক্ষীর জবানবন্দীর ধরন প্রকৃতি দেখে মনে হল অসুস্থতা নয়, তাকে শিখানোর জন্যেই একটু সময় নেয়ার কৌশল স্বরূপ তাকে গতকাল অসুস্থ দেখানো হয়েছিল। মানুষের মধ্য থেকে অনেকেই মিথ্যা কথা বলে থাকে, তবে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে এসে যে মিথ্যাচার করা হল, তার কোন নজীর নেই। আর এ সব মিথ্যাচারই করা হল রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব মানুষকে সৎ পথে পরিচালনা করা, আর অসৎ পথে বাধা প্রদান করা। কিন্তু বর্তমানে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে কিছু ব্যক্তিকে লোভ লালসা এবং ভয়ভীতির মাধ্যমে আমাদের বিরুদ্ধে ইতিহাসের জঘন্যতম মিথ্যাচার করতে বাধ্য করছে। আদালতের কাঠগড়ায় বসে বসে নিজের কানে নিজের সম্পর্কে এতসব অবাস্তব বানোয়াট মিথ্যা শুনতে শুনতে মনটা যে বিষিয়ে উঠছে। আল্লাহ মিথ্যাকে পছন্দ করেন না, জুলুম ও সীমালঘংনকেও পছন্দ করেন না। তবে তিনি অপরিসীম ধৈর্যশীল হওয়ার কারণে মিথ্যাবাদী, জুলুমবাজ ও সীমালঘংনকারীদের তিনি আর কত সময় দেবেন তাতো কেবল তিনিই জানেন।

আবার আগামী কাল ট্রাইব্যুনালে হাজিরা দিতে হবে, সাক্ষীর জেরায় উপস্থিত থাকার জন্যে। আমাদের আইনজীবীকে জেরার সময় সরকার পক্ষের আইনজীবীগণ যে আচরণ করে, তাকে রাজনৈতিক মাস্তানী ছাড়া আর অন্য কিছু বললে সঠিক কথা বলা হয় না। এরপর আবার ২২ শে এপ্রিল থেকে ২৪ শে এপ্রিল পর্যন্ত চট্টগ্রামের আদালতে হাজিরা দিতে হবে। চট্টগ্রামে আদালতে বসে বসেই আইনজীবীদের সাথে বেশ মতবিনিময় করা যায়। কিন্তু ঢাকার ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায় থাকায় বন্দির মত সময় কাটাতে হয়। প্রয়োজনে কারো সাথে কোন কথা বলারও তেমন কোন সুযোগ পাওয়া যায় না। চট্টগ্রামে যাওয়া আসায় বেশ কষ্ট হলেও ওখানে আদালতে এবং জেলখানায় মোটামুটি একটু স্বস্তির সাথেই সময় কাটানো যায়।

এবারে চট্টগ্রামে যাওয়ার ১/২দিন আগে পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ হবে। আর ফিরে আসার পর পরবর্তী শুক্রবারেই সাক্ষাৎ হওয়ার কথা, তবে শুক্রবারের আগে আসতে না পারলে পরের দিনের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

দেখতে দেখতে পৌনে তিনটা বছর শেষ হয়ে গেল। লেখাপড়ার জন্যে এ সময়টা কাজে লাগাতে পারলে অনেক ভাল হত। কিন্তু দেশের পরিস্থিতিতে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের উপর সেই সাথে বিরোধী দল বিএনপির উপর এবং অন্যান্য ইসলামী দল, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর, মামলা হামলার যে নজীরবিহীন নিপীড়ন নির্যাতন চলছে, তার প্রতিক্রিয়া থেকে তার উপলব্ধি অনুভূতিকে চেপে রেখে লেখা-পড়া করতে কেন যেন মোটেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে পারছি না। নিজে মজলুম অবস্থায় সকল মজলুমদের জন্যে অহর্নিশি আল্লাহর দরবারে প্রাণ উজাড় করে দোয়া করছি, আল্লাহ যেন দ্রুততম সময়ের মধ্যে এই জালেমদের জুলুম থেকে সব মজলুমকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করেন।

৫ ই ফেব্রুয়ারী থেকে শাহবাগ চত্বরে কিছুসংখ্যক যুবক ও যুবতীদেরকে নামানো হয় গণজাগরণ মঞ্চের নামে, তাদের শ্লোগান ছিল 'সকল রাজাকারের ফাঁসি চাই, শিবির ধর জবাই কর, জামায়াতের রাজনীতি

www.pathagar.com

নিষিদ্ধ কর।' তাদের এই কর্মসূচি অহিংস গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মডেল হিসাবে অনুসরণীয় বলে মন্তব্য করেন অনেকেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংসদের বক্তৃতায় বলেন, 'তার মন পড়ে আছে শাহবাগে।' সেই সাথে তিনি ট্রাইব্যুনালের বিচারপতিদের প্রতি আহ্বান জানান 'রায় প্রদানের ব্যাপারে যেন ঐ শাহবাগ চত্বরের জনগণের আবেগ অনুভূতির দিকে লক্ষ্য রাখা হয়।' যার অর্থ দাঁড়ায় আইনের তোয়াক্কা মাত্রার কোন প্রয়োজন নেই, শাহবাগীদের দাবি অনুযায়ী রায় দিতে হবে। এই শাহবাগ চত্বরে মাতিয়ে রাখার ব্যাপারে একজন যুবতী বা ছাত্রী বিশেষ ভূমিকা রাখায় কোন কোন পত্রিকা (যুগান্তর) তাকে বারুদ কন্যা বা অগ্নিকন্যা হিসাবে অভিহিত করে। গণজারগণ মঞ্চের কর্মীদের নামের তালিকা পড়ে দেখা যায় ১৪ জনের মধ্যে মাত্র ৩ জন কোন মুসলমান পরিবারের মেয়ে, বাকী ১১ জনই অন্য ধর্মীয় পরিবার থেকে আসা। প্রথমে অনেকেই এটাকে মিশরের 'তাহরির স্কয়ার' হিসাবে অভিহিত করেন। এদের ব্যাপারে ব্যতিক্রম ধর্মী বক্তব্য দেন ড. ফেরদৌস আহমদ কোরেশী এবং এক পর্যায়ে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীও। এদের অনেকে ব্লগার হিসাবে ফেসবুকে যে সব ইসলাম বিদ্বেষী লেখালেখি করে তা হঠাৎ ফাঁস হয়ে যায়। এটা ফাঁস করার জন্যে আমার দেশকে দায়ী করা হলেও প্রথমে নাকি এটা ফাঁস করে দেয় দৈনিক ইনকিলাব। এটাকে কেন্দ্র করে হেফাজতে ইসলামের পক্ষ থেকে তৌহিদী জনতার সমর্থনপুষ্ট হয়ে করা হয় একটি সফল লংমার্চ ও মহাসমাবেশ।

শাহবাগ চত্বরের নাস্তিক ও ইসলাম বিদ্বেষীদের আন্দোলনকে অহিংস ও গণতান্ত্রিক বলে চালিয়ে দেয়ার সকল প্রয়াসকে তারা নিজেরাই নাকচ করে দেয়, ১৮ দলীয় হরতাল ও হেফাজতে ইসলামের দাবির বিরুদ্ধে যুবক যুবতীদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সহিংস লাঠি মিছিলে উন্মত্ততা প্রদর্শন করে। হেফাজতের এই সময়োচিত কর্মসূচি আল্লাহর পক্ষ থেকে দেশের কলেমায়ে বিশ্বাসী তৌহিদী জনতার আবেগ অনুভূতি প্রকাশের একটি কুদরতি ব্যবস্থা বলেই আমার মনে হয়েছে।

সরকার এদেশে ইসলামের আওয়াজ এবং আধিপত্যবাদী সম্প্রসারণবাদী আগ্রাসী শক্তির সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্যে জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ছাত্র শিবিরের উপর নির্যাতনের স্টিম রোলার চালিয়ে আসছে। মনে করেছে এই দুই সংগঠনকে নির্মূল ও নেতৃত্বহীন করতে পারলে, তাদের প্রভুদের এজেন্ডা অনুযায়ী বাংলাদেশেকে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীন ও ভারতের করদ রাজ্যে পরিণত করার পথে কোন বাধাই থাকবে না। হেফাজতের সফল লংমার্চ তাদের এই ভুল ধারণা ভাংতে সক্ষম হবে কিনা জানি না। হেফাজতে ইসলামের লংমার্চ ও মহাসমাবেশ ঠেকানোর জন্যে তাদের সমর্থক সকল সংগঠনের সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগ করেও সরকার ব্যর্থ হয়েছে, এমনকি সরকার পক্ষীয় কিছু আলেম নামধারী ব্যক্তিদের ব্যবহার করেও কোন সুবিধা করতে পারেনি। সরকারের মনে রাখা উচিত ছিল, দাউদ হায়দারের বিরুদ্ধে রাসূল (সা.) এর অবমাননার অভিযোগে যে আন্দোলন হয়, তখন জামায়াতে ইসলামী নামের কোন সংগঠনই মাঠে ছিল না।

১৬ই এপ্রিল আমার বিরুদ্ধে সরকার পক্ষের সাক্ষী পাবনা জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের জবানবন্দী শেষে জেরা শুরু করে, পরবর্তী তারিখ ঘোষণা করা হয় ১৮ই এপ্রিল। ১৮ই এপ্রিল সকাল ১১টা থেকে শুরু করে দুপুর ১টা পর্যন্ত জেরা চলে। এরপর পরবর্তী তারিখ নিয়ে কিছুক্ষণ বাদানুবাদ শেষে ২৫ শে এপ্রিল দিন ধার্য করা হল। চট্টগ্রামে আদালতে আমার হাজিরা পূর্ব নির্ধারিত। উক্ত হাজিরা হবে ২২, ২৩ ও ২৪ শে এপ্রিল। তিন দিন হাজিরা শেষে সাধারণত পরের দিন আমরা চট্টগ্রাম থেকে রওয়ানা হয়ে আসি। ট্রাইব্যুনালের কাছে এ বিষয়টি আমার আইনজীবীদের পক্ষ থেকে তুলে ধরা সত্ত্বেও বিচারপতি মণ্ডলী ২৫ শে এপ্রিল তারিখ ঘোষণার উপর অনড় থাকলেন। তারা মানবিক দৃষ্টিতে এটাও বিবেচনায় নিলেন না, যে ২৪ শে এপ্রিল বিকেল ৪টা থেকে ৫টা পর্যন্ত আদালত চলার পর, আদালত থেকে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে এসে রওয়ানা দিতে দিতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে, আর সন্ধ্যা কালে রওয়ানা দিয়ে গাজীপুরে বা ঢাকায় আসতে গোটা রাতই কেটে যাবে। এ অবস্থায় আমার বয়সের একজন অসুস্থ মানুষ কিভাবে পরের

www.pathagar.com

দিন কোর্টে হাজির হবে এবং নতুন কোন সাক্ষীর মিথ্যা জবানবন্দী শুনতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে। তারা এমন অমানবিক সিদ্ধান্ত নিলেন যানজট সম্পর্কে মোটেই কোন ধারণা না থাকার কারণে, নাকি আমাকে একটু বাড়তি কষ্ট ও মানসিকভাবে কষ্ট দেবার জন্যে এব্যাপারে আলেমুল গায়েব আল্লাহ ভাল জানেন। আজ ১৯ শে এপ্রিল শুক্রবার, রুটিন মাফিক পারিবারিক সাক্ষাতের দিন। আগামীকাল অথবা পরশু দিন চট্টগ্রাম যেতে হবে। চট্টগ্রামে যাবার পথে মিঠু একটা বড় অবলম্বন হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকে। আজ সে আসতে পারেনি। কাল সে ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত ছিল, তবে কয়েকদিন থেকে তার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। আজ সাক্ষাতে আসে নাই। চট্টগ্রামে যেতে পারবে কিনা জানতে না পেরে একটু দুশ্চিন্তা হচ্ছে। কারণ বন্দী অবস্থায় লম্বাপথের সফরে আপনজন বলে তো আর কেউ সাথে থাকে না। কোন প্রয়োজনে হাতের লাঠি হিসাবে সেই এ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে আসছে। দোয়া করছি, আল্লাহ যেন তাকে সুস্থ করে দেন এবং আমার সফরের সময় আব্দুস সাত্তারকে সাথে নিয়ে পিছে পিছে যেতে পারে। পুলিশের লোকদের সাথে যোগাযোগ রেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে পারে। এবারের সফরে সে বা আব্দুস সাত্তার কেউ একজন সাথে সাথে না গেলে গোটাপথ এবং চট্টগ্রামে অবস্থান ও ফিরে আসার পুরো সময়টাই কাটাতে হবে ভীষণ দুশ্চিন্তায়। অবশ্য সব অসহায়ের সহায় একমাত্র আল্লাহ।

এবারের সাক্ষাতে মোমেনও আসতে পারেনি। সে কোন কাজে যেন একটু বাইরে গেছে। গতকাল কোর্টের পরিবেশ (ট্রাইব্যুনাল) ভাল না থাকলেও আমার ছেলে মোমেনের মুখে যখন শুনলাম, আমার বড় ছেলে তারেকের পিএইচডি হয়ে গেছে, তখন মনটা বেশ আনন্দে সর্বোপরি আল্লাহর শুকরিয়ায় ভরে যায়। আল্লাহ আমার ছেলেকে কুদরতিভাবে সাহায্য করেছেন এ ডিগ্রী পাওয়ার ক্ষেত্রে। আমাদের দেশী একজন শিক্ষক তাকে বিপদে ফেলেছিল, ডিগ্রী ছাড়াই দেশে ফেরৎ পাঠানোর ষড়যন্ত্র করেছিল। এ ষড়যন্ত্র সফল না হলেও আমার ছেলেকে ২/৩ টি বছর বেশ কষ্ট করতে হয়েছে। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী ও অপার অনুগ্রহ আমাদের পরিবারের উপর, তা আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উপলব্ধি করি।

আজ আমার বেগম সাহেবা এবং বড় মেয়ে তারেকের দেশে আসার কথা বলছিল। আমি এখনই তার দেশে আসার পক্ষে নই। তবে তার কনভোকেশনে অভিভাবক হিসাবে তার মা যেতে চাইলে মোমেনকে সাথে নিয়ে যেতে পারে। তারেক এটাই চাচ্ছে। আমি জেলে বন্দী অবস্থায়, মামলায় গতিপ্রকৃতি কী হয় কোন দিকে যায় এ অবস্থায় তাদের দেশের বাইরে যাবার অনুমতি দিব কি দিব না, সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছি। ছেলের আবেগ অনুভূতি যখন বন্দি পিতাকে দেখতে আসার জন্যে ছটফট করছিল, তখন তাকে দেশে আসার অনুমতি দেই নাই। এবার তার জীবনের একটি বিশেষ অর্জনের মুহূর্তে অন্তত মাকে পাশে পেতে চায়, তার এই আবেগ অনুভূতিকে উপেক্ষা করতে বেশ কষ্ট অনুভব করছি। আবার এই মুহূর্তে তাদের যাওয়া ঠিক হবে কিনা, আমার কখন কী প্রয়োজন হয়, সেটা দেখার জন্যেও তো আর কেউ পাশে থাকবে না, অন্তত ফিরে না আসা পর্যন্ত। আল্লাহর কাছে সঠিক সিদ্ধান্তের তৌফিক কামনা করে দোয়া করছি, ইনশাআল্লাহ চট্টগ্রাম থেকে ফিরে এসে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়া যাবে।

চট্টগ্রামে যাওয়া-আসার বিড়ম্বনা- ১০

এপ্রিল মাসের ১৮ ও ১৯ (২০১৩) তারিখে এক সাক্ষীর জবানবন্দী এবং জেরা হয়। আমার চট্টগ্রামের আদালতে হাজিরার পূর্বনির্ধারিত তারিখ ছিল ২২, ২৩ ও ২৪ এপ্রিল। ট্রাইব্যুনালকে এটা বিবেচনায় রেখে পরবর্তী তারিখ দেয়ার জন্যে আমার আইনজীবীদের পক্ষ থেকে অনেক অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও ২৫ এপ্রিল-ই ট্রাইব্যুনালে হাজিরার তারিখ ঘোষণা করা হয়। আমি আমার আইনজীবীদের বললাম এটা তো আমার জন্যে খুবই কষ্টকর হবে। ২৪ শে এপ্রিল চট্টগ্রাম কোর্টের কার্যক্রম চলতে পারে বিকেল ৪টা এমনকি ৫টা পর্যন্তও। তারপর চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে ফিরে এসে প্রস্তুতি নিয়ে ঢাকা বা গাজীপুরের উদ্দেশে রওয়ানা করতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। চট্টগ্রাম ঢাকার সড়ক পথের সফর কত যে কষ্টদায়ক এবং

www.pathagar.com

বিরক্তিকর তা কেবল ভুক্তভোগীরাই উপলব্ধি করতে পারে। রাতের কষ্টদায়ক এই সফর এড়ানোর জন্যে চট্টগ্রাম আসতে ২৪ শে এপ্রিলের হাজিরা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে আমার আইনজীবীকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলেছিলাম। কিন্তু ২৩ শে ও ২৪ শে এপ্রিল হরতালের ঘোষণা আসার পর আর এটা করেও কোন লাভ হবে না বিধায় আইনজীবীর পক্ষ থেকে আর সে উদ্যোগ নেওয়াটা অর্থহীন হয়ে যায়।

২৩ শে এপ্রিল হরতালের কারণে কোর্টে যেতে হয়নি। ২৪ তারিখেও কোর্ট বসার কথা নয়। কিন্তু হঠাৎ ২৪ এপ্রিল দুপুর ১২টার সময় একজন সুবেদার এসে বলে গেলেন দুপুর ২টায় কোর্টে যেতে হবে। চট্টগ্রামের হরতাল নাকি অর্ধ দিবস। তাই নামাজ ও দুপুরের খানা শেষে কোর্টের জন্যে প্রস্তুতি নিয়ে যথাসময়ে জেল গেটের দিকে রওয়ানা করলাম। তখনও আমি জানি না, যে ঐ দিন কোর্ট থেকে ফিরে এসেই আমাকে পরের দিন ট্রাইব্যুনালে হাজিরার জন্যে রাতেই রওয়ানা করতে হবে। কারণ ইতঃপূর্বে দুবার রাতের সফরের তিক্ত অভিজ্ঞতা তথা আমার কষ্টের কথা চট্টগ্রামের কেন্দ্রীয় কারাগারের জেল সুপারকে আমি বুঝিয়ে বলার পর উনি কথা দিয়েছিলেন আমাকে আর কখনও রাতে পাঠাবেন না। কিন্তু কোর্টে পৌছেই মিঠুর কাছে শুনলাম বাবর সাহেবের লোকজন তাকে বলেছে আমাকে নাকি আজকেই বিকেল ৫টার দিকে পাঠিয়ে দেবে। এজন্যে জেলকর্তৃপক্ষ পুলিশের স্কোয়াড চেয়েছেন বাবর সাহেবও এ খবরটা পেয়েছেন আগেই। বিকেল ৫টায় রওয়ানা করলেও কিছুটা সময় পাওয়া যেত, গন্তব্যস্থলে পৌঁছে একটু বিশ্রাম নিয়ে ট্রাইব্যুনালের উদ্দেশে রওয়ানা করার সুযোগ পাওয়া যেতো।

কোর্ট থেকে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছলাম ৪-৩০ টার দিকে। সুবেদারের কাছে রওয়ানার সময় জানতে চাইলে তিনি কিছু বলতে পারলেন না। জেলার সাহেবের সাথে বাবর সাহেব আলাপ করে অনুরোধ জানালেন এভাবে আমাকে রাতে না পাঠানোর জন্যে। তিনি জেলারকে আমার শরীরের অবস্থা জানিয়েই এ অনুরোধটা করলেন। জেলার সাহেব বললেন সুপার সাহেব থাকলে উনার অনুমতি নিয়ে কোন ব্যবস্থা করা যেতো। কিন্তু উনি তো ঢাকায় চলে গেছেন। আমি আর কোন অনুরোধ করা অর্থহীন মনে করে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিলাম। সেবককে বললাম, আমার পক্ষে খাবার জন্যে কয়েকটা রুটি বানিয়ে দিতে। রাতে সাধারণত ড্রাইভারদের ঘুমের কারণে গাড়ী চালাতে অসুবিধা হয়, তাই ফ্লাস্কে চা দিয়ে দিতেও বললাম। মাগরিব শেষেও যখন কোন খবর পেলাম না তখন নামাজ শেষে রাতের খানা অগ্রিম খেয়ে নিলাম, কারণ রাতের খাবারের আগেই আমাকে ব্লাড প্রেসারের ওষুধ খেতে হয়। পুলিশের স্কোয়াড আসতে বিলম্ব হওয়ায় আমাকে রুম থেকে বের হতে হল ৮-১৫ মিনিটে আর গাড়ী ছাড়ল, রাত ৮-৩০ মিনিটে। মেলার কারণে জেল গেট থেকেই শুরু হল যানজট। আর যানজট অতিক্রম করে যাওয়ার পর থেকে নগরবাড়ী গেট পর্যন্ত অতিক্রম করতে হল যানজট। দুদিনের হরতাল শেষে চট্টগ্রাম ঢাকা রোডে ভারী যানবাহন যথা ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান এবং কনটেইনারের আধিক্য ও আধিপত্যের কারণে ছোট যানবাহনের চলাচল হয় অস্বাভাবিক কষ্টকর। এই কষ্টের মধ্য দিয়েই পুরো রাতটা কাটাতে হল রাস্তায়।

চট্টগ্রাম জেল কর্তৃপক্ষ পুলিশের ইনচার্জকে বলে দিয়েছে যদি বেশি দেরি হয়ে যায়, তাহলে যেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যায়, আর যদি একটু সময় হাতে থাকে তাহলে যেন গাজীপুর জেলা কারাগারে নিয়ে যায়। আমরা কুমিল্লা সদর দক্ষিণ থানায় পৌঁছলাম রাত প্রায় ১টার দিকে। তার আগে গাড়িতে গ্যাস নেয়ার সময় ড্রাইভার ও পুলিশদের জন্যে প্যাকেট খাবার নেয়া হয়। খাবারের প্যাকেট আমার জন্যেও দেয়া হয়। তবে আমি যেহেতু মাগরিবের পর পরই একটা রুটি খেয়ে নিয়ে ছিলাম, তাই ঐ প্যাকেটটা গাজীপুর জেলখানা পর্যন্ত নিয়ে আসি। তবে এতক্ষণে ওটা আর খাবার যোগ্য ছিল না। রওয়ানার পর পরই পুলিশ ও ড্রাইভারকে খাবার খেয়ে নিতে বলি। কুমিল্লায় যাত্রা বিরতির পর আমিও দুই পিস (স্লাইস) পাউরুটি ও একটা কলা খেয়ে নেই। কুমিল্লা থেকে মেঘনা ব্রিজ পর্যন্ত যানজটের মধ্য দিয়েই আসতে হয়েছে। অবশ্য ফেনী কুমিল্লার সীমানা পর্যন্ত ফেনীর পুলিশ প্রোটেকশন পার্টি এবং কুমিল্লা থেকে

www.pathagar.com

দাউদকান্দি ব্রিজ পর্যন্ত কুমিল্লার পুলিশ প্রোটেকশন পার্টির সহায়তায় বেশ ভাল ভাবেই মেঘনা ব্রিজ পর্যন্ত পৌঁছাই। দাউদকান্দি ব্রিজের পর থেকে নারায়ণগঞ্জের সীমানা পর্যন্ত মুন্সিগঞ্জের পুলিশ প্রোটেকশন পার্টি আমাদের সহায়তা করে। মেঘনা ব্রিজ অতিক্রম করি রাত ৩-২০ মিনিটে। পুলিশের স্কোয়াড ইনচার্জ তার সিদ্ধান্ত জানালেন, আমাদের হাতে সময় আছে, তাছাড়া গাজীপুরের দিকে রাস্তাও বেশ হালকা মনে হচ্ছে অতএব গাজীপুরেই যাওয়া যাক। মেঘনা ব্রিজ পার হবার পর থেকে নারায়ণগঞ্জের কাঞ্চন ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তা ছিল মোটামুটি যানজট মুক্ত। মনে হচ্ছিল ৪-৩০ থেকে সকাল ৫টার মধ্যেই গাজীপুর জেলা কারাগারে পৌঁছে যাবো। আমি অবশ্য কুমিল্লা সদর দক্ষিণ থানায় যাত্রা বিরতিকালে ইস্তেঞ্জা সেরে অজু করে নিলাম, যাতে পথেই ফজরের নামাজ আদায় করতে পারি। গাজীপুর জেলার সীমানায় ঢোকার কিছু পর থেকে কঠিনতম যানজটে পড়ে যাই। মনে হচ্ছিল কোর্টে বোধহয় সময় মত পৌঁছানো সম্ভব হবে না। অনেক কষ্টে যানজট অতিক্রম করে গাজীপুর জেলগেটে পৌঁছি ৫-৪৫ মিনিটে। আমি রুমে পৌঁছি ৬টার পরে। রুমে পৌঁছেই গোসল ও নাশতার পর্ব সেরে কোর্টে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হই সকাল ৭টার মধ্যেই। গাজীপুর জেলা কারাগার থেকে ট্রাইব্যুনালের উদ্দেশে রওয়ানা হই ৭-৩০ টার দিকে এবং পৌঁছে যাই ঠিক ৯-৪৫ মিনিটে। ১০-৪৫ এর দিকে কোর্টে যেতে বলা হল।

এবার করমজা গ্রাম থেকে একজন সাক্ষীকে আনা হয়। ২০০০ সালের ডিসেম্বরের ৭ তারিখে তদানীন্তন আওয়ামী লীগ সরকার ঐ গ্রামের কবরস্থান থেকে কিছু হাড়গোড় টেলিভিশনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিল আমাকে বিতর্কিত বানানোর জন্যে। উল্লেখ থাকে যে ঐ দিনটি ছিল আমার নব নির্বাচিত আমীরে জামায়াত হিসাবে শপথ গ্রহণের দিন। ঐ গ্রামে এরূপ কোন ঘটনার কথা ইতঃপূর্বে আমি কখনো শুনিনি। ঘটনার সময় নাকি আমি উপস্থিত ছিলাম, যা সাক্ষী নিজে দেখেনি অন্য একজনের কাছে শুনেছে। এমন ঘটনায় আমি জড়িত থাকলে তো ৭২ থেকে ৭৫ এর ১৫ আগস্ট পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে অবশ্য মামলা হতে পারতো। এবং আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থাও নিতে পারত। ৭১ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করে হঠাৎ ২০০০ সালের ৭ই ডিসেম্বরে তাদের এটা মনে হওয়া এবং কবর খুঁড়ে হাড়গোড় প্রদর্শন করা যে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এতে কোন সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই। আর সেই উদ্দেশ্য ছিল নবনির্বাচিত আমীর হিসাবে আমাকে বিতর্কিত করা এবং ২০০১ সালে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এটাকে আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা। কিন্তু তখন তাদের এ উদ্দেশে সফল হয়নি। ঐ নির্বাচনে আমি ৩৯,০০০ ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে হারিয়ে নির্বাচিত হই। সকল ভোট কেন্দ্রের তুলনায় ঐ কবরস্থান সংলগ্ন ভোট কেন্দ্রে সবচেয়ে বেশি ভোট পাই। মিথ্যাকে সত্যের মত করে বিনা দ্বিধায় কথা বলতে আওয়ামী লীগের লোকেরা যে কত দক্ষ গতকালের ঐ সাক্ষীর জবানবন্দীতে তার প্রমাণ আর একবার পাওয়ার সুযোগ হল। এত নির্জলা মিথ্যা অভিযোগ শুনে মনের উপরে যে দারুণ বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় তা কেবল অনুভব করা যায়। মুখে বা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ইতিহাসের জঘন্যতম মিথ্যা অভিযোগের কারণে দেখতে দেখতে কারাগারে কেটে যাচ্ছে প্রায় তিনটি বছর। আর কত দিন এভাবে থাকতে হবে, তাতো আল্লাহই ভাল জানেন।

সাভারে গার্মেন্টস ভবন ধসের ফলে বৃহস্পতিবার থেকে গার্মেন্টস শ্রমিকরা কর্ম বিরতি পালন করছে। বৃহস্পতিবারে কোর্টে যাওয়ার পথে আমাদের সাথে বিএসবি এর লোকের কাছ থেকেই এটা শুনতে শুনতে গেলাম ট্রাইব্যুনাল পর্যন্ত। ফেরার পথে টঙ্গি পৌঁছে দেখলাম সারা রাস্তায় কিছু দূর ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য গাড়ী ভাংচুরের অবশিষ্ট আলামত রাস্তায় পড়ে থাকা গাড়ীর কাঁচের টুকরো। গতকাল শুক্রবারে আমার পারিবারিক সাক্ষাৎটা হতে পারেনি এ জন্যেই। তারা বাসা থেকে রওয়ানা করে পথে থেকে ফিরে গিয়ে ফোনে জানায়, রাস্তার অবস্থা ভাল নয়, তাই আজ তারা আসতে পারবে না। আগামীকাল আসবে। সেই আগামীকাল অর্থাৎ আজকেও আসতে পারবে কিনা সন্দেহ ছিল। কিন্তু আল্লাহর মর্জি তারা বেশ সকাল সকাল অর্থাৎ

www.pathagar.com

৯-৩০ টার মধ্যে এসে উপস্থিত হয়। ডিএসবি এর লোক আসতে দেরী হওয়ায় আমাকে একটু পরে গেটে যেতে বলা হয়। আজকের সাক্ষাতে আমার বড় মেয়ে মুহসিনা এবং ছেলে ব্যারিস্টার নাজিব মোমেন আসতে পারে নাই। মফিজকে সাথে করে আমার বেগম সাহেবা একাই এসেছে। প্রতি দিনের মত আজকেও তার পক্ষ থেকে ঈমান দীপ্ত কণ্ঠে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হল, ইনশাআল্লাহ কিছুই হবে না, মন খারাপ করবে না। নির্জন পরিবেশে আল্লাহকে বেশি বেশি ডাকার যে সুযোগ আছে এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে।

আগের সপ্তাহের সাক্ষাতের সময়ে আলেমদের উদ্দেশে আমার কয়েকটা বক্তৃতার সংকলন হিসাবে দুটি বুকলেট নিয়ে এসেছিল, দুটো উদ্দেশ্য নিয়ে এক. এগুলো আলেমদের কাছে পৌঁছানোর ব্যাপারে দায়িত্বশীলদের যেন বলে দেই। দ্বিতীয়টি হল, এরই আলোকে বর্তমান অবস্থানকে সামনে রেখে আরো নতুন ও বাস্তবমুখী বক্তব্য সহ কোন কিছু লিখতে যেন চেষ্টা করি। আমার গাজীপুর চট্টগ্রাম যাতায়াত করতে হচ্ছে কোন মাসে তিনবার কোন মাসে দুবার। ট্রাইব্যুনালে হাজিরা গাজীপুর থেকে, এটাও কম কষ্টের নয়। এই অবস্থায় লেখাপড়ার ইচ্ছা থাকলেও সুযোগ করে ওঠা মোটেই সম্ভব হয় না। অতএব তার আশ্বাস বা প্রস্তাব অনুযায়ী নতুন কিছু লেখা যেন খুব একটা সহজ নয় সেটা বুঝতে অনুরোধ করেই বিদায় দিলাম। 'রাসূলুল্লাহর মক্কার জীবন' লেখার পর দাবি ছিল মদিনার জীবনটা লেখার, প্রায় তিন বছর সময়ের মধ্যে যার জন্যে আমি কোন পদক্ষেপই নিতে পারছিলাম না। এত অবসর সময়টাকে কাজে লাগাতে না পারার জন্যে মনে বড় ব্যথা আছে কিন্তু কোন উপায়ই হয়ে উঠছে না।

শুক্রবার ২৬ এপ্রিলের নির্ধারিত সাক্ষাতের দিনে আমার ছোট মামা এবং মামানিও আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পথে শ্রমিকদের অবরোধের কারণে আমার পরিবারের সদস্যদের সাথে তারাও ফিরে যান। পরের দিন শনিবারে আর তাদের পক্ষে আসা সম্ভব হয়নি। ছোট মামা আসতে পারলে বেশ ভাল লাগত। এলাকার খোঁজ-খবরও কিছু জানা যেতো। কিন্তু তার পক্ষে হয়ত পরের দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না, তবে এ দিনে মুহসিনা ও মোমেনও আসতে পারেনি তাদের নিজ নিজ ব্যস্ততার কারণে। বেগম সাহেবার সাথে শুধু মফিজ এসেছিল। এবারে ট্রাইব্যুনালে হাজিরার তারিখ ও চট্টগ্রামের কোর্টের তারিখ সামনে রেখে আমার জন্যে সহনীয় গ্যাপ দিয়ে যেন তারিখ দেয়া হয়, এই কথাটা ছেলেকে এবং ছেলের মাধ্যমে সিনিয়র আইনজীবীকে যেভাবে বুঝিয়ে বলার জন্যে বলতে চেয়েছিলাম, মোমেন না আসায় আর তা সেভাবে বলা হল না। আগের তারিখে চট্টগ্রামের তারিখ ২২, ২৩ ও ২৪ জেনেও ট্রাইব্যুনাল ২৫ এপ্রিল আমার জন্যে অবিবেচকের মত তারিখ নির্ধারণ করায় আমার যে কত কষ্ট হয়েছে, সেটা আলেমুল গায়েব আল্লাহ ছাড়া আর কারো জানা বা বোঝার কথা নয়। এই কষ্টের কথা উল্লেখ করে এ সপ্তাহটা বিশ্রামের জন্যে রাখার ব্যবস্থা করতে বলেও কোন ফায়দা হল না। সরকার পক্ষের সাক্ষী অসুস্থ হবার কারণে ২৮ এপ্রিলের পর মাত্র একদিন গ্যাপ দিয়ে ৩১ এপ্রিল তারিখ দেওয়া হল। এরপর আবার কবে যে তারিখ দেয় কে জানে। এদিকে চট্টগ্রামে ৫, ৬ ও ৭ই মে কোর্টে হাজিরা দেয়ার জন্যে ৪ঠা মে তারিখে নিয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু হেফাজতে ইসলাম এর ৫ই মে প্রোগ্রামের কারণে ৩ মেও নিয়ে যেতে পারে। এমনটি হলে পারিবারিক সাক্ষাতের অসুবিধা হতে পারে। অবশেষে ৩ মে '১৩ তেই আমাকে চট্টগ্রাম নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন জেল কর্তৃপক্ষ। অবশ্য চট্টগ্রামের পথে রওয়ানার আগে পরিবারের লোকদের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দেয়ার ব্যবস্থা হয়। তাদের সাথে দেখা করেই গাড়িতে উঠলাম চট্টগ্রাম যাওয়ার জন্যে। এবারে যাওয়ার সময় পিসি থেকে টাকা নেয়ার কথা ভুলে যাই।

চট্টগ্রাম কোর্টে ৫, ৬ ও ৭ মে হাজিরা শেষে ৮ মে সকালের দিকে রওয়ানা দিয়ে কাশিমপুর- ১ কেন্দ্রীয় কারাগারে ফিরে আসি। ১২ মে ট্রাইব্যুনালে হাজিরা দেয়ার জন্যে ঐ দিন কামারুজ্জামান সাহেবের বিরুদ্ধে প্রদত্ত ট্রাইব্যুনালের রায়ের প্রতিবাদে হরতাল আহ্বান করায় ১১ তারিখে আমাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। এবারেও শুক্রবারের সাক্ষাতের সুযোগ না হওয়ায় পরিবারের লোকেরা শনিবারে দেখা

www.pathagar.com

করতে আসে। তাদের সাথে সাক্ষাৎ সেরে রুমে ফিরে জোহরের নামাজ ও দুপুরের খানা শেষে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের উদ্দেশে দুপুর বেলা ৩টার দিকে রওয়ানা করে প্রায় বিকেল ৬টার দিকে পৌঁছি। এবার অবশ্য জেল কর্তৃপক্ষ সদয় বিবেচনা করে আমাকে ২৬ সেলে থাকার সুযোগ দেয়। এখানে থাকার সুযোগ পেয়ে পুরতন সাথীদের সাথে দেখা হয়। তাদের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হই। কিন্তু আমাকে থাকতে দেওয়া হয় ঐ রুমে যে রুমটিতে থাকতেন হযরত মাওলানা সাঈদী সাহেব। রুমে ঢুকতেই বুকের মধ্যে কেন যেন অস্থিরতা অনুভব করলাম। পুরানা সাথীদের সাথে নামাজ আদায় ও রাতের খাবার ও একটু হাঁটাহাঁটি করে ঘুমোতে যাই। কিন্তু মনের অস্থিরতার কারণে রাতটা কেটে গেল ঘুম ছাড়াই। ফজরের পরও ঘুমোতে পারলাম না। ইতোমধ্যে ৩০ এপ্রিল সন্ধ্যার দিকে আমাকে হঠাৎ জানানো হল, কাশিমপুর- ১ কেন্দ্রীয় কারাগারে চালানে যেতে হবে। বেশ কিছুটা তাড়াহুড়ার মধ্য দিয়ে আমার মাল সামানা গুছিয়ে রওয়ানা দিলাম কাশিমপুরের উদ্দেশ্যে। কাশিমপুর- ১ কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে আমাদের সহকারী সেক্রেটারী জনাব আজহারুল ইসলাম ও অধ্যাপক মুজিবুর রহমান সাহেবকে গাজীপুরে স্থানান্তর করা হয়। আমি এখানে এসে মোটামুটি একটা ভাল পরিবেশ পেলাম। এখানে খোলামেলা পরিবেশে বেশ আলো বাতাস উপভোগ করা যায়। একসাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা যায়। তাছাড়া দু'বেলার খানা এবং সকালের নাস্তাও এক সাথেই করা যায়। যে সুযোগটা কেন্দ্রীয় কারাগারের ২৬ সেলে ছিল। অনেক দিন পরে আবার সেই সুযোগটা পেয়ে আল্লাহর শুকরিয়া জানালাম। এর আগের পারিবারিক সাক্ষাতের সময় আমার বেগম সাহেবা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোমাকে নাকি কাশিমপুর- ১ এ নেয়া হচ্ছে। আমি এসবের কিছুই জানতাম না।"

কাশিমপুরে আসার পর এ পর্যন্ত দু'বার চট্টগ্রাম যাতায়াত করতে হল। আর একবার ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারেও অবস্থান করতে হয় ট্রাইব্যুনালে হাজিরার জন্যে। এবারে মে মাসের ১৮, ১৯ ও ২০ তারিখে একটানা তিন দিন কাশিমপুর- ১ থেকে ট্রাইব্যুনালে (পুরানা হাইকোর্ট ভবনে) পরপর হাজিরা উপলক্ষে যাতায়াত করতে হয়। আবার চট্টগ্রামে যেতে হবে ২৭ মে ২৮, ২৯ ও ৩০ মে'র নির্ধারিত তারিখে আদালতে হাজিরা দিতে। এ জন্যে ট্রাইব্যুনালে চট্টগ্রাম থেকে আসার পরে তারিখ দিতে অনুরোধ করা সত্ত্বেও ট্রাইব্যুনাল ২৬ মে পরবর্তী তারিখ নির্ধারণ করে।

একটানা তিন দিন (১৮, ১৯ ও ২০ মে- ২০১৩) ট্রাইব্যুনালে হাজিরা দেয়ার জন্যে কাশিমপুর- ১ কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে যাওয়া আসার কষ্টের পর ২৫ মে পর্যন্ত সময় পাওয়াটা যদিও সৌভাগ্যের বিষয়ই বলতে হবে; কিন্তু ২৬ মে কাশিমপুর- ১ থেকে ট্রাইব্যুনালে যাওয়া আসার পরের দিনই চট্টগ্রামে যাওয়াটা আমার জন্যে স্বাস্থ্যগত দিক দিয়ে একেবারেই সহ্য সীমার বাইরে। তারপরও যেতে হবে, এটাই কারা জীবনের বিড়ম্বনা। এখানে ব্যক্তির সুবিধা অসুবিধা বিবেচনায় নেয়ার কোন সুযোগই নেই। আমি ২০ বছর আগে থেকে সায়েটিকা নামক রোগে ভুগছি। দূর পাল্লার সফর এর জন্যে সাংঘাতিক ক্ষতিকর তবুও মাসে ২/৩ বার কাশিমপুর থেকে চট্টগ্রাম যাওয়ার কষ্ট সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই। আমার জন্যে তো কাশিমপুর (গাজীপুরস্থ) থেকে ট্রাইব্যুনালে (ঢাকাস্থ পুরাতন হাইকোর্ট ভবন) যাওয়া আসাই কষ্টকর। মামলা ঢাকায় অথচ আমাকে রাখা হয়েছে কখনো গাজীপুরের জেলা কারাগারে, কখনো কাশিমপুর- ২ কেন্দ্রীয় কারাগারে, আবার গাজীপুর জেলা কারাগারে, আবার সেখান থেকে বর্তমানে কাশিমপুর- ১ কেন্দ্রীয় কারাগারে। এতে বুঝা যায় এভাবে কষ্ট দিয়েই তারা তৃপ্তি পাচ্ছেন। আমাদের জানের উপর দিয়ে, মনের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ঝড়ের তাণ্ডব। আল্লাহ ছাড়া এই কষ্টের কথা আর কাউকে বলে কোন লাভ নেই।

গতকাল ডিআইজি সাহেব এসেছিলেন জেল পরিদর্শনে তার সাথে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের কর্মকর্তাগণ এসেছিলেন, তাদের মধ্যে থেকে কে যেন একজন বললেন আপনার তো চট্টগ্রাম যাওয়া আসাতেই ভীষণ কষ্ট করতে হচ্ছে। তার এই অনুভূতি ও উপলব্ধি অবশ্যই মানসিক মূল্যবোধের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি।

www.pathagar.com

ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি দেলোয়ারও আছে কাশিমপুর- ১ এ। তার উপর অমানুষিক নির্যাতনের কথা শুনে গা শিউরে উঠে। তাকে কোর্টে হাজির করা হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে কোন মতে কোলে করে ধরে উঠানোর মত করে। পত্রিকায় সে ছবি দেখে যে কেউ বিস্ময়ে হতবাক না হয়ে পারে না, নির্দয় ও হৃদয়হীন, মানবতা মনুষত্ব ও বিবেক বর্জিত পুলিশের পক্ষ থেকে এরপরও আদালতে রিমান্ডের আবেদন করা হয় ১৭ দিনের। ইতোমধ্যেই তাকে ৫৩ দিন রিমান্ডে নিয়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে চরম নির্যাতন চালানো হয়েছে। এরপর আরো ১৭ দিন রিমান্ডে নিয়ে তার রিমান্ডে সময় দাঁড়াবে দুই মাসেরও বেশী ৭০ দিনে। দেলোয়ারের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে হেবিয়াস করপাস করা হলে, হাইকোর্ট থেকে বর্তমান মাসের (মে '১৩) ২৯ তারিখ পর্যন্ত, রিমান্ডে না নেয়ার আদেশ দিয়ে তার স্বাস্থ্যসম্পর্কীয় প্রতিবেদন পেশ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু কাশিমপুর- ১ কেন্দ্রীয় কারাগারের ডাক্তার সঠিক অবস্থা উল্লেখ করে প্রতিবেদন দিতে ভয় পাচ্ছেন। পুলিশী নির্যাতনে সম্ভাবনাময় একটি তরুণ যুবকের জীবন যখন সংকটাপন্ন তখন চিকিৎসার মহান মানবিক সেবামূলক পেশায় নিয়োজিত একজন ডাক্তার যদি তার রোগী সম্পর্কে সঠিক অবস্থার বর্ণনা করে প্রতিবেদন দিতে ভয় পান, এবং এই ভয়ের কারণে পেশাগত দায়িত্ব পালনে অপারগ হন, তা হলে দেশ কোথায় যাচ্ছে, দেশে কী হচ্ছে, এ ব্যাপারে দেশপ্রেমিক কোন ব্যক্তিই বিচলিত না হয়ে পারে না। এই জুলুমের অবসানে আল্লাহর কুদরতি হস্তক্ষেপ কামনা করা ছাড়া জেলের প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ অবস্থায় আমাদের আর কিই বা করার আছে। দুই দিন আগে আমাদের রাজশাহী মহানগরীর আমীর ও কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য আতাউর রহমান সাহেব এসেছিলেন দেখা করতে। তিনি শুধু জামায়াত নেতাই নয় একজন স্বনামধন্য শ্রদ্ধেয় শিক্ষক হিসাবেও দলমত নির্বিশেষে একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিও বটে। তাকেও মিথ্যা অভিযোগে চক্রান্তমূলকভাবে ফাঁসানো হয়েছে অত্যন্ত ন্যক্কারজনকভাবে। পুলিশের লোকেরা নিজেরা তার সাথে থাকা ব্রিফকেস খুলতে গিয়ে ভেঙ্গে ফেলে এবং উক্ত ব্রিফ কেইসের ভেতর কিছু ইসলামী বই ঢুকিয়ে দিয়ে ওটাকে জিহাদী বই বলে চালিয়ে দেয়। তাকে পুলিশ হেফাজতে থাকা অবস্থায় অমানুষিকভাবে মারপিট করা হয়। একজন শিক্ষকের সাথে এহেন অমানবিক ও পশুসুলভ আচরণ কল্পনা করাও অসম্ভবপর। কিন্তু আওয়ামী ফ্যাসিবাদী সরকারের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত পুলিশ বিশেষ করে গোপালী পুলিশের কাছে সব কিছুই সম্ভব। ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি দেলোয়ারের উপরও মীরপুর থানার ও.সি'র নেতৃত্বে বেশি নির্যাতন হয় তেমনি ঐ একই থানার ও.সি'র নেতৃত্বে আতাউর রহমান সাহেবের উপর চালানো হয় সবচেয়ে বেশি অমানবিক নির্যাতন।

আতাউর রহমান সাহেব এমনিতেই অসুস্থ। উক্ত রক্তচাপ এবং ডায়াবেটিসে ভুগছেন দীর্ঘ দিন থেকে, তার উপর এই নির্যাতন চালাতে পুলিশের বিবেকে একটুও বাধেনি। রাষ্ট্রযন্ত্রকে যারা এভাবে নিরীহ নিরপরাধ মানুষের বিরুদ্ধে ইতিহাসের জঘন্যতম মিথ্যা অভিযোগ এনে নির্মম জুলুম নিপীড়ন ও নির্যাতন চালাচ্ছে, তাদের উপর আল্লাহর অভিশাপ আসবেই দুদিন আগে হোক আর পরেই হোক, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

গত মে মাসের (২০১৩) ২৮, ২৯ ও ৩০ তারিখ ছিল চট্টগ্রামের আদালতে হাজিরার নির্ধারিত দিন। এটাকে সামনে রেখে এর আগে বা পরে যৌক্তিক গ্যাপ রেখে পরবর্তী তারিখ দেয়ার জন্যে ট্রাইব্যুনালকে আমার আইনজীবীদের পক্ষ থেকে অনুরোধ সত্ত্বেও ২৬ মে তারিখ ঘোষণা করা হল। অথচ ট্রাইব্যুনাল জানতেন যে, আমাকে ২৭ মে চট্টগ্রাম রওয়ানা করতে হবে।

ঘটনাক্রমে মাওলানা ইউসুফ সাহেব জামায়াতে ইসলামীর সিনিয়র নায়েবে আমীর এবং আমাদের সকলের মুরুব্বী গ্রেফতার হওয়ার প্রতিবাদে ২৬ মে হরতাল আহ্বান করা হয়। আর এ কারণে আমাকে ২৫ মে শনিবারে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। আমার আশা ছিল এবং আইনজীবীদেরকে এব্যাপারে ভালভাবে বলেও দিয়ে দিলাম যাতে অন্তত ২৭ মে তারিখ না দেয়। কারণ ঐ দিন কোর্টের

www.pathagar.com

কার্যক্রম শেষে চট্টগ্রাম রওয়ানা করলে বেশ রাত হয়ে যাবে চট্টগ্রাম পৌঁছতে। ২৬ মে কোর্টে এসে আবারও এ বিষয়ে মনে করিয়ে দিলাম। মিঠু বলল, আগামীকাল অর্থাৎ ২৭ মে তারিখ দেবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাক্ষীর সুবিধা অসুবিধাটাকে গুরুত্ব দিয়ে ২৭ তারিখেই ট্রাইব্যুনাল ঠিক রাখল। আমি বাধ্য হয়ে নিজে দাঁড়িয়ে অনুমতি নিয়ে আমার শারীরিক অবস্থা বিবেচনা রাখার অনুরোধ জানালাম। ট্রাইব্যুনালের বিচারপতিগণকে কিছুটা নমনীয় মনে হল, কিন্তু একজন মহিলা প্রসিকিউটর অত্যন্ত অমানবিকভাবে ট্রাইব্যুনালের উপর চাপ সৃষ্টি করায় ২৭ মেই দিন ধার্য করা হল। অর্থাৎ ২৭ মে ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম শেষে আমাকে ট্রাইব্যুনাল থেকেই চট্টগ্রাম রওয়ানা করতে হবে। ইতিপূর্বে একবার গাজীপুর থেকে ট্রাইব্যুনাল হয়ে এভাবেই আমাকে চট্টগ্রাম যেতে হয়।

ট্রাইব্যুনাল থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ফিরে গিয়ে একজন ডেপুটি জেলারকে জানালাম, আমাকে কাল ২৭ মে ট্রাইব্যুনাল থেকেই চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করতে হবে, সেইভাবে যেন গাড়ী ভাড়া করা হয় এবং পুলিশের স্কোয়াডের ব্যবস্থা করা হয়। বেচারা প্রথমে কথাটা যেন ভালভাবে বুঝতে পারলেন না, বা ভালভাবে নিতে পারলেন না। এরপর আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম, এভাবে ইতিপূর্ব আমি নিজেও গিয়েছি। তাছাড়া ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ২৬ সেলে অবস্থানরত অনেকেই ঢাকায় কোর্টে হাজিরা দিয়ে চট্টগ্রাম যাওয়ার নজির আছে। তখন তিনি বললেন ৮০% ভাগ নিশ্চিত দেওয়া গেল, আপনি যেভাবে বলেছেন সেভাবেই পাঠানো হবে, বাকীটা পরে জানাবো। আমি বিকেলে একজন সুবেদারকে উক্ত ডেপুটি জেলারের কাছে পঠালাম এ ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্যে। সুবেদার এসে জানাল কোন অসুবিধা হবে না সব ঠিক হয়েছে।

পরের দিন অর্থাৎ ২৭ মে ট্রাইব্যুনালের জন্যে এবং একই সাথে চট্টগ্রামের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছি। ইতোমধ্যে একজন কারারক্ষী সম্ভবতঃ সিআইডি জমাদার এসে বলল, স্যার আপনার চালান আছে চট্টগ্রামে। আমি বললাম, শুধু তো চালান নয়, চালানের আগে কোর্ট আছে। সে আবার বলল, আমাকে তো শুধু চালানোর কথাই বলা হয়েছে। আমি তাকে বললাম কোর্টে না গিয়ে চট্টগ্রাম চলে গেলে তো জেল কর্তৃপক্ষেরই অসুবিধা হবে। জেল কর্তৃপক্ষ তো জানে আজ আমার ঢাকায় কোর্ট আছে। আর আগামীকাল আছে চট্টগ্রামে। অতএব ঢাকায় কোর্টে হাজিরা দেবার পরই তো চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করার কথা। তাকে বিষয়টা ভাল করে জেনে আসতে বলায় সে আবার এসে জানালো সব ব্যবস্থাই করা হয়েছে। আপনি সেভাবে প্রস্তুতি নিন। ৯-৪০ মিনিটে আপনাকে নেয়ার জন্যে লোক আসবে।

এরপর যথারীতি প্রস্তুতি সেরে ট্রাইব্যুনালের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম অনেকটা তাড়াহুড়া করে বেলা ১২টার মধ্যে শেষ করা হল। আমি দুপুরের খানা ও জোহরের নামাজ শেষে চট্টগ্রামের উদ্দেশে ১২-৩০ থেকে ১টার মধ্যে রওয়ানা দিলাম। পথে গাড়িতেই আসরের নামাজ আদায় করি এবং কুমিল্লায় পৌঁছে একটা সিএনজি ফিলিং স্টেশনে গাড়িতে গ্যাস নেয়ার সময় ইস্তেনজা ও অজু সেরে নেই। এবার মিঠু যেতে পারেনি। ড্রাইভার আব্দুস সাত্তারের সাথে মফিজ ছিল। তারা ঐ ফিলিং স্টেশন সংলগ্ন একটি হোটেল থেকে খাবারের প্যাকেট দিয়ে দিল। পুলিশের লোকেরা একটা ফাঁকা জায়গায় রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে প্যাকেটের খাবার খেয়ে নিয়ে আবার রওয়ানা করে। পথে গাড়িতে বসেই আমাকে মাগরিবের নামাজ আদায় করতে হয়। চট্টগ্রাম শহরে যখন পৌঁছি তখন মসজিদ থেকে এশার আযানের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। রাত ৮টার দিকে আমরা চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছি। বাবর সাহেব এবং মেজর জেনারেল (অব.) রাজ্জাকুল হায়দার ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুর রহীম সাহেবগণ সকালে রওয়ানা করায় তারা আমার বেশ আগেই পৌঁছে যান।

২৮ মে ১৮ দলের হরতাল থাকায়, কোর্টে যেতে হয়নি। ২৯ ও ৩০ মে পরপর দুইদিন কোর্টে যেতে হয়। ৩০ মে কোর্টে কার্যক্রম শেষে বিকেল ৫টার দিকে পরবর্তী তারিখ ঘোষণা করা হয় ১১, ১২ ও ১৩ জুন। ৩০ মে ২০১৩ চট্টগ্রাম আদালতের হাজিরা শেষে পরের দিন ৩১ মে রোজ শুক্রবার সকাল ১০টার দিকে

www.pathagar.com

চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারগার থেকে কাশিমপুর- ১ কেন্দ্রীয় কারাগারের উদ্দেশে রওয়ানা দিয়ে কুমিল্লা সদর দক্ষিণ থানায় পৌঁছি প্রায় তিনটার দিকে। তার আগে একটা সিএনজি ফিলিং স্টেশন থেকে গাড়িতে গ্যাস নেয়ার সময় আমার ড্রাইভার আব্দুস সাত্তার ও মফিজ পাশের হোটেল থেকে আমার ও আমার সাথী সঙ্গীদের জন্যে খাবারের প্যাকেট আনার ব্যবস্থা করে। কুমিল্লা সদর দক্ষিণ থানায় আমি এস্তেনজা ও অজু সেরে নামাজ পড়ে নেই। এই সময়ে গাড়ীর ড্রাইভার এবং পুলিশের লোকেরা খাবার খেয়ে নেয়। এবার চট্টগ্রাম থেকেই যানজটের শুরু হওয়ায়, আমাদের গাড়ী ভাটিয়ারী ক্যান্টনমেন্টের মধ্য দিয়ে বেশ অনেক পথ ঘুরে এসে মেইন রোডে উঠে। তবুও যানজট থেকে রেহাই পাওয়া যায়নি। চট্টগ্রাম থেকে ১০ টায় রওয়ানা দিয়ে কুমিল্লা পৌছুতে যেখানে ৩ ঘণ্টার বেশি লাগার কথা নয় অন্তত সকালের দিকে রাস্তা অনেকটা ফ্রিই থাকার কথা। কিন্তু এবারে শুক্রবার হওয়া সত্ত্বেও সারা রাস্তাই অতিক্রম করতে হয় বেশ যানজটের মধ্যদিয়ে। তাই চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা পৌঁছতে লেগে যায় প্রায় ৫ ঘণ্টা সময়।

ফেনী সীমানা থেকে ফেনীর পুলিশ প্রটেকশন পার্টি এবং কুমিল্লা সীমানা থেকে দাউদকান্দি ব্রিজ পর্যন্ত কুমিল্লা পুলিশ প্রটেকশন পার্টির সহায়তায় মেঘনা ব্রিজ পর্যন্ত মোটামুটি ভালভাবেই চলে আসি তবে মেঘনা ব্রিজের পর থেকে আর কোন পুলিশ প্রটেকশন পার্টির ব্যবস্থা ছিল না অথচ গাজীপুর জেলার সীমানা পর্যন্ত মুন্সিগঞ্জ এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার পক্ষ থেকে পুলিশ প্রটেকশন পার্টি থাকার কথা। মদনপুর হয়ে গাজীপুর জেলার সীমানায় পৌঁছতে বেশ সময় লেগে যায়। গাজীপুর সীমানা থেকে গাজীপুরের চৌরাস্তা পর্যন্ত এবং গাজীপুর চৌরাস্তা থেকে কোনাবাড়ী বাজারের শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের কঠিনতম যানজট অতিক্রম করে রাত ১১টার দিকে কাশিমপুর- ১ কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছতে সক্ষম হই। আর বিছানায় ঘুমোতে যাই রাত ১২টারও বেশ পরে।

পরের দিন শনিবারে পারিবারিক সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয় শুক্রবারের পরিবর্তে। আমার বেগম সাহেবার সাথে এ দিন আসে বড় মেয়ে আমার মা মনি মুহসিনা, মেঝ ছেলে নাজিবুর রহমান মোমেন এবং মফিজ। পরের দিন ২ জুন ট্রাইব্যুনালের পূর্বনির্ধারিত তারিখ। কাশিমপুর থেকে ট্রাইব্যুনালের উদ্দেশে রওয়ানা করতে হয় সকাল ৭টা থেকে ৭-৩০ টার মধ্যে। এর আগেই গোসল নাশতা সেরে প্রস্তুতি নিতে হয়। এবারে সাক্ষী হিসাবে হাজির করা হয় তোফাজ্জল মাস্টারকে। দুপুর ১টা পর্যন্ত তার জবানবন্দী চলে; তাকে সাক্ষী হিসাবে আজকে হাজির করার কথা আগে জানানো হয়নি। এমনকি গতকাল বিকেল পর্যন্তও জানানো হয়নি। তাই আমাদের আইনজীবী আজকেও জেরা করতে অপারগতা প্রকাশ করলেন। সরকার পক্ষীয় আইনজীবীগণ বেশ চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন আজকের মধ্যেই জেরা শেষ করার জন্যে। কিন্তু তারা আসামী পক্ষের আইনজীবীকে আগেই নাম না দেয়ায় ট্রাইব্যুনালের বিচারপতিগণ মাঝে একদিন গ্যাপ দিয়ে ৪ জুন সাক্ষীর জেরার জন্যে দিন ধার্য করলেন। ৪ জুন সোমবার দুপুর ১টা পর্যন্ত জেরা চলার পর সাক্ষী নিজের অসুস্থতার কথা বলে তার জেরা আর না করার জন্যে ট্রাইব্যুনালের কাছে মাফ চাইলেন। ট্রাইব্যুনাল- ১ পরের দিন অর্থাৎ ৫ জুন জেরা চলবে বলে সিদ্ধান্ত দেন।

৫ জুন দুপুর ১২-৩০ টার দিকে রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষী তোফাজ্জল মাস্টারের জেরা শেষ হল, পিপি এবং বিচারপতিদের অযাচিত হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে, যে দৃশ্য দেখলে যে কোন নিরপেক্ষ দর্শকের মনে বিচারের স্বচ্ছতা সম্পর্কে প্রশ্ন সৃষ্টি না হয়ে পারে না। এই সাক্ষীর জেরা শেষে পরবর্তী তারিখের ব্যাপারে সরকার পক্ষের আইনজীবীই ১৬ জুনের প্রস্তাব করেন। কিন্তু আমাদের আইনজীবীরা ঐদিন আসতে অসুবিধা থাকার কারণে তিনি ১৭ জুনের প্রস্তাব করলে, অবশেষে ট্রাইব্যুনালের পক্ষ থেকে ৯ জুন পরবর্তী তারিখ ঘোষণা করা হল, এটা জেনেও যে আমাকে চট্টগ্রামে হাজিরা দেবার জন্যে ১০ জুন কাশিমপুর থেকে রওয়ানা করতে হবে। এভাবে চট্টগ্রাম যাবার দিন বা তার মাত্র একদিন আগে ট্রাইব্যুনালে হাজিরা দিয়ে চট্টগ্রাম যেতে যে খুবই কষ্ট হয়, আমার কোমর এবং হাঁটুর ব্যথা বেড়ে যায়, এটা জানিয়েও কোন লাভ

www.pathagar.com

হয়নি। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় "আন্তর্জাতিক মানবতাবিরোধী অপরাধ আদালত" বিচারপতিগণ অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি মানবিক আচরণ না করে বরং কষ্ট দিয়েই তৃপ্তি পান।

গতকাল ৭ জুন আমার পরিবারের লোকদের সাথে সাক্ষাৎ ছিল। আমার ছেলে ব্যারিস্টার নাজিবকে বললাম তাদের সিনিয়র যেন চেষ্টা করেন যাতে ৯/৬ এর পরের দিন ১৪/৬ এ তারিখ না দেয়। কারণ ঐদিন ট্রাইব্যুনালে হাজিরা দিতে হলে, ওখান থেকেই চট্টগ্রাম যেতে হবে যা হবে আমার জন্যে চরম কষ্টের, তবে আইনজীবীরা চেষ্টা করলেও অমানবিক পিপির কারণে বিচারপতিরা অনুরোধ রাখবেন কিনা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না।

৯ জুন ২০১৩ তে ট্রাইব্যুনালে হাজিরার পর ১০ জুন সকালে চট্টগ্রামের উদ্দেশে রওয়ানা করার কথা। সেখানে ১১, ১২ ও ১৩ জুন (২০১৩) কোর্টে হাজিরা দেবার কথা। ৯ জুন সরকার পক্ষ ট্রাইব্যুনালে সাক্ষী হাজির করতে না পারায় পরবর্তী তারিখ ঘোষণা করা হয় ১৬ জুন। ট্রাইব্যুনাল থেকে কাশিমপুর- ১ কেন্দ্রীয় কারাগারের উদ্দেশে রওয়ানা করার মুহূর্তে শুনলাম ১০ জুনে সকাল সন্ধ্যা হরতাল হবে। এটা শুনে একটু দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। হরতালের আগের দিন রাতে চট্টগ্রাম নিয়ে যাবে না কি হরতালের শেষে রাতে নিয়ে যাবে। হরতালের আগের রাতে যাওয়াটা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। আমার মন চাচ্ছিল কষ্ট হলেও হরতাল শেষে ১১ জুন বিকেলের দিকে রওয়ানা করলেই ভাল হবে। অবশেষে তাই হল। আসরের নামাজ শেষে বিকেল ৫টার পরে রুম থেকে জেল গেটের দিকে রওয়ানা দিলাম। ৫-৩০ টার দিকে আমাদের গাড়ী দুটো রওয়ানা দিল। আমরা চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছে রুমে যেতে যেতে রাত হয়ে যায় ৩-৩০। সাধারণত এই সময়টাতেই ঘুম থেকে উঠে থাকি। আজ সেই সময়ে বিছানায় ঘুমুতে যাই ক্লান্ত দেহমন নিয়ে।

ফজরের আযানের সাথে সাথেই উঠে নামাজ শেষে আবার ঘুমুতে যাই। সকাল ৮-৩০ থেকে ৯টার মধ্যে ঘুম থেকে উঠে গোসল ও নাশতা সেরে একটু কোরআন তেলাওয়াত করে, হাতে আসা নতুন একটা বই নিয়ে পড়ার চেষ্টা করি। ঘুমের প্রভাব কাটানো সম্ভব না হওয়ায় আবার বিছানায় শুতে হল।

জুন ২০১৩ এর ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ ছিল চট্টগ্রাম কোর্টে হাজিরার পূর্ব ঘোষিত তারিখ। ১১ ও ১২ জুন যথারীতি কোর্টের কার্যক্রম চলে। কিন্তু ১৩ জুনে তদন্তকারী কর্মকর্তা অসুস্থ হওয়ার কারণে ঐদিন আর কোর্টের কার্যক্রম চলেনি। দুপুর ২টার দিকে কোর্ট থেকে রওয়ানা করে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে চলে আসি দুপুর ২-৩০টার দিকে। বাবর সাহেব ঐ দিনই বিকেলে রওয়ানা করে আসার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু আমি রাতের সফর নিজের বেশ কষ্টকর মনে করে পরের দিন সকালে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমাদের কেইস পার্টনার মেজর জেনারেল (অবঃ) রাজ্জাকুল হায়দার এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আঃ রহীম সাহেবদ্বয়ও পরের দিন সকালে রওয়ানার সিদ্ধান্ত জানালেন। জেল কর্তৃপক্ষের সাথে আমার আগে থেকে কথা ছিল, আমাকে যেন কোন দিন বিকেল বা রাতে না পাঠায়।

১৪ জুন সকাল ৯-৩০ টার দিকে আমাদের গাড়ী দুটি চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে রওয়ানা হল। কুমিল্লা পৌঁছে ইস্তেঞ্জা অজু এবং নামাজের জন্যে ৪০/৪৫ মিনিটের মত যাত্রা বিরতি করতে হল। মাঝখানে কোন থানা ছাড়া অন্য কোন জায়গায় খাবার ব্যাপারে কুমিল্লার পুলিশ প্রটেকশন পার্টি অনুমতি দিত না। ফলে পুলিশের লোকেরা কখনও থানায় বসে খেত। কখনও গাড়িতেই খেয়ে নিত। আমিও সাধারণত গাড়ীতেই খেয়ে নিতাম। চলন্ত গাড়িতে খেতে অসুবিধা হয়, তবে আমি শুধু ডিমভাজি দিয়ে ক'টা রুটি খেয়ে নিতাম। এবারে এডভান্স সিএনজি স্টেশন থেকে গাড়ীতে গ্যাস নেয়ার সময় গাড়িতে খাবারের প্যাকেট দিয়ে দেয়া হলে কুমিল্লার পুলিশ প্রটেকশন পার্টির ইনচার্জ ওখানেই বসে খাবার খেয়ে নিতে নিজেরাই অনুরোধ করল, ফলে উক্ত সিএনজি স্টেশনের মালিকের খাস কামরায় ইস্তেঞ্জা অজু ও নামাজ শেষে ওখানেই দুপুরের খাবারটা খেয়ে নিলাম। চলন্ত গাড়িতে নানা তরকারি দিয়ে ভাত খেতে বেশ অসুবিধা হয় বিধায় এবারে খাবারের প্যাকেটে শুধু ভুনা খিচুরি দিতে বলেছিলাম। তবে এবারে আর

www.pathagar.com

গাড়িতে খেতে হল না, দুজন কর্মকর্তাসহ আমি মালিকের রুমেই খাবার খেয়ে নিলাম। পুলিশের অন্যান্য লোকেরা (পপুলার ফুড প্যালেস সিএনজি স্টেশন সংলগ্ন) একটি হোটেলে বসে খেয়ে নিল। এরপর ১-৩০ থেকে ২টার মধ্যে কাশিমপুর- ১ কেন্দ্রীয় কারাগারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলাম। শুক্রবার হওয়ার কারণে এবং এর আগে কোন হরতাল না থাকার কারণে রাস্তায় একমাত্র চৌদ্দগ্রাম ছাড়া আর কখনো কোন অসুবিধা হয়নি।

মেঘনা ব্রিজ পার হয়ে বেশ কিছু দূর আসার পর পেশাবের প্রয়োজন অনুভব করি। পুলিশের লোকেরা ড্রাইভারকে একটা ভাল ফিলিং স্টেশনে থামতে বলল। কিছু দূর এসে একটা ভাল ফিলিং স্টেশনে গাড়ী থামিয়ে পুলিশের স্কোয়াড ইনচার্জ উক্ত ফিলিং স্টেশনের লোকদের সাথে আমার পরিচয় দিয়ে আলাপ করে তাদের টয়লেট ব্যবহারের ব্যবস্থা করল। টয়েলেটে যেতেও তারা আমাকে বেশ সম্মানের সাথে সালাম জানায়। এবং টয়লেট সেরে ফেরার সময় এক কাপ চা খাওয়ানোর জন্যে বেশ পীড়াপীড়ি করতে থাকে। আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ি। তারা নাছোড় বান্দা হওয়ায় বুঝিয়ে বলি যে এই গাড়ীর ড্রাইভার এবং সাথের পুলিশদেরকে আমাকে রেখেই চট্টগ্রাম ফিরতে হবে। তাই দেরি হলে বেচারাদের খুব কষ্ট হবে। অতএব আপনাদের আন্তরিকতার জন্যে ধন্যবাদ। আল্লাহ অন্য কোন সময় সুযোগ দিলে দেখা যাবে বলে বিদায় নিলাম। বিদায়ের আগে তাদের হাতে আমার সাথে থাকা সাদা গোলাপী আতর এবং আম্বর একটু করে লাগিয়ে দিয়ে বেচারাদের আন্তরিকতার প্রতি একটু সম্মান প্রদর্শনের প্রয়াস পেলাম।

রাস্তা মোটামুটি যানজটমুক্ত থাকার ফলে এবারে কাশিমপুর- ১ কেন্দ্রীয় কারাগারে ফিরে এলাম বিকেল ৬ টারও একটু আগে। রুমে পৌঁছে বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়েই মাগরিবের নামাজ আদায়ের সুযোগ পেলাম। পথে মিঠু পুলিশের একজনের ফোনে জানালো আগামীকাল শনিবারে আমার পরিবারের লোকদের দেখা করতে আসতে একটু দেরি হবে। কারণ বেগম সাহেবার স্কুলের ফল ঘোষণা শেষ করেই তারা কাশিমপুরের কেন্দ্রীয় কারাগারের উদ্দেশে রওয়ানা করবে। আমার নিয়মিত সাপ্তাহিক সাক্ষাৎ হয়ে থাকে শুক্রবারে। তবে চট্টগ্রামে কোর্টে হাজিরা দিয়ে প্রায়ই শুক্রবারে রওয়ানা করার কারণে পুরো দিনটা রাস্তায় কেটে যায় ফলে বিকল্প দিন হিসাবে শনিবারেই দেখা করতে হবে। সাক্ষাতের এই মুহূর্তটা বন্দীদের জন্যে একটি দুর্লভ মুহূর্ত। ৩০ মিঃ সাক্ষাতের জন্যে চাতক পাখির মত অপেক্ষা করতে হয় পুরো একটা সপ্তাহ। সাক্ষাতের নির্দিষ্ট দিনের সকাল থেকেই শুরু প্রতীক্ষার পালা। ঐদিন আসতে দেরির কারণে যেন আমি কোন চিন্তা না করি এজন্যেই মিঠু এ খবরটা জানায়।

পরের দিন ১৫ জুন শনিবারে বেলা ২টা থেকে ২-৩০ টার মধ্যে পরিবারের সদস্যরা দেখা করতে আসবে সেই আশায় প্রহর গুণতে থাকি। এই সাক্ষাতের মাধ্যমেই প্রবাসী তিন ছেলে ও এক মেয়ের খোঁজখবর নেয়ার সুযোগ পাই, এজন্যে এ সাক্ষাৎটা আমার জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া আন্দোলন সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট ভাই বোনদেরও খোঁজখবর নেয়ার এছাড়া আমার দ্বিতীয় কোন মাধ্যম নেই। তাই সাক্ষাতের নির্দিষ্ট দিনের শুরু থেকেই বেশ আবেগ অনুভূতি সহ শুরু হয় প্রতীক্ষার পালা। এ দিনের সাক্ষাতে বেগম সাহেবার স্কুলের ফল ঘোষণার কারণে তাদেরকে আসতে হয় বেশ অসময়ে। জেলখানার সাথী ও সেবকদের অনুরোধে, সাক্ষাতের স্লিপ আসার আগেই দুপুরের খাবার খেয়ে নেয়ার জন্যে অনুরোধ করা হল। এদের অনুরোধে বেলা দুপুর ২টার দিকেই খেতে বসি। খাওয়া শেষের একটু আগে ২-১৮ এর দিকে দেখার স্লিপ এল। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে রওয়ানা দিলাম জেল গেটের দিকে। সাক্ষাতের জন্যে অনূর্ধ্ব পাঁচজন আসতে পারে। এবারে সাক্ষাতে আমার বেগম সাহেবার সাথে বড় মেয়ে মুহসিনা ফাতেমা, মেঝ ছেলে নাজিবুর রহমান ও তাদের সাথে মফিজুর রহমান এসেছে। আমার বেগম সাহেবার স্কুলের বার্ষিক ম্যাগাজিনটা এবারে পেলাম উপহার স্বরূপ। ম্যাগাজিনের সম্পাদনা ও উপস্থাপনা ও ফটোগ্রাফিক সাজ গোজটা সেই সাথে বিষয় বস্তুগুলো বেশ চমৎকার মনে হল। প্রতিষ্ঠানটির সাথে

www.pathagar.com

আমারও আবেগ অনুভূতি জড়িত। তাই জেল জীবনের দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতির মধ্যেই মনে মনে অনেকটা তৃপ্তি ও স্বস্তি বোধ করলাম।

আমার এই সাক্ষাতের পরের দিনই ছিল ট্রাইব্যুনালে হাজিরার তারিখ। কাশিমপুর থেকে ট্রাইব্যুনালে যাবার জন্যে ভোর ৬টা থেকেই প্রস্তুতি নিতে হয়। আমি সকাল ৬-৩০ মধ্যে গোসল শেষ করি এবং ৭ টার মধ্যে নাশতা সেরে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিও সম্পন্ন করে থাকি। জেল গেট থেকে ট্রাইব্যুনালের উদ্দেশে রওয়ানা দেই ৭-৩০ টার থেকে ৭-৪৫ মিঃ এর মধ্যে। ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম যখনই শুরু হোক না কেন আমাদের পৌঁছতে হয় সকাল ১০টা বাজার আগেই। অন্যথায় জেল কর্তৃপক্ষকে কৈফিয়ত দিতে হয়। গতকাল পারিবারিক সাক্ষাতের সময় মোমেন বলেছিল এবারে সাক্ষী আসবে। কিন্তু ট্রাইব্যুনালে গিয়ে ১১টার দিকেই শুনলাম যে, সাক্ষী বুকের ব্যথার জন্যে হাজির হতে পারেনি। সরকার পক্ষের আইনজীবীগণ নিজেরাই পরবর্তী তারিখ আগামী রবিবার (২৩ জুনের) প্রস্তাব করে কিন্তু ট্রাইব্যুনাল ২০ জুন বৃহস্পতিবার তারিখ ঘোষণা করে।

আমি মনে মনে চিন্তা করেছিলাম এ সপ্তাহের বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে রোজা রাখব, কাজেই এ সপ্তাহে যেন আর কোন তারিখ না হয়। কিন্তু এটা আমার আইনজীবীদের জানানোর সুযোগ হয়নি। আর সুযোগ হলেও ট্রাইব্যুনালের কাছে অভিযুক্তদের পক্ষের অনুরোধ রাখার কোন নজির এখানে নেই, কাজেই বললেও কোন লাভ হত না। যাহোক এবারে ট্রাইব্যুনাল থেকে ফিরে এসে জোহরের নামাজ শেষে এখানকার সাথীদের সঙ্গে এক সাথেই দুপুরের খানা খাবার সুযোগ হল। দুপুরের খাবারের শেষে বিশ্রামে যাওয়া গেল। ট্রাইব্যুনালের দিন বৃহস্পতিবারে রোজা রেখে কোর্টে যাওয়া আসার জন্যে ঠিক হবে কিনা চিন্তা করছি। তবে বুধবারের দিন রোজাটা রেখে নেই। পরে অবস্থা বুঝে বৃহস্পতিবারে রোজা রাখা যাবে অথবা গ্যাপ দিয়ে শুক্রবারে রাখা যাবে। গতকাল সকাল ১০টার দিকে একজন কারারক্ষী জেল গেট থেকে একটা স্লিপ হাতে নিয়ে এসে বলল, আমাকে চিকিৎসার জন্যে বারডেম হাসপাতালে যেতে হবে। এ সময় গিয়ে সাধারণত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের পাওয়া যায় না। গেলে আর একটু সকালে রওয়ানা করতে হত। তবুও জেল কর্তৃপক্ষ যাতে সামনে কোন অজুহাত দেখাতে না পারে এজন্যে অসময়ে হলেও আমি ঝটপট তৈরি হয়ে রওয়ানা করলাম। গেটে পৌঁছে আমার ছেলেকে খবর দিতে বললাম। ছেলে বারডেমে যে ক'টি বিভাগে আমার যাবার কথা সে ক'টি বিভাগের কর্মকর্তা এবং বিশেষজ্ঞ ও ডাক্তারদের সাথে তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগ করে সময় নেয়ায় আর কোন অসুবিধা হয়নি। আমার বাম পায়ের বৃদ্ধাংগুলি নিয়ে একটু দুশ্চিন্তায় আছি, ডায়াবেটিক রোগীদের এতে নাকি বেশ বড় রকমের সমস্যা হয়ে থাকে। প্রথমে ঐ বিভাগের ডাক্তারকেই দেখালাম। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আমার আগের কাগজপত্রগুলো সাথে না দেয়ায় এবং তাদের তৈরি করা মিনিটসে এর স্পষ্ট উল্লেখ না থাকায় ডাক্তার একটু বিব্রতবোধ করলেন। আমাকে ইতঃপূর্বে যিনি দেখেছিলেন তিনি বদলি হয়ে যাওয়ার ফলেও একটু সমস্যা হল। যা হোক আমি তাকে আমার সমস্যাটি বুঝিয়ে আন অফিসিয়ালি মৌখিক পরামর্শ চাইলাম। এরপর তিনি তার প্যাডে একটা পরীক্ষার জন্যে রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে বললেন। এরপর আমার পুরোনো সমস্যা সায়েটিকাজনিত কোমরের ও হাঁটুর ব্যথার ব্যাপারে ফিজিক্যাল মেডিসিনের প্রফেসর শাহ জামান খান সাহেবের চেম্বারে গিয়ে শুনলাম উনি জোহরের নামাজ পড়তে গিয়েছেন। এই ফাঁকে আমরা দন্ত রোগ বিভাগে গেলাম। আমার বেগম সাহেবা ওখানে অপেক্ষা করছিলেন। দন্তরোগ বিভাগীয় প্রধান আমার দাঁতের অবস্থা দেখে তাৎক্ষণিকভাবে ওটিতে নিয়ে গিয়ে দাঁতটা ফিটিং করে দিলেন। বেশ যত্ন সহকারে এবং আন্তরিকতার সাথেই কাজটা বেশ ধীরে সুস্থে শেষ করলেন।

এরপর রক্ত পরীক্ষার জন্যে নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার আগে মেডিসিনের ডাক্তারের পক্ষ থেকে আরো ক'টি টেস্ট এর জন্যে তিনিও কিছু এডভাইজ লিখে দিলেন। এরপর নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে ব্লাড দিয়ে এরপর ফিজিক্যাল মেডিসিনের প্রফেসরের সাথে দেখা করলাম। তিনি হাসপাতালে এসে ফিজিওথেরাপি নেওয়ার

www.pathagar.com

পরিবর্তে ক'টি ব্যায়াম শিখিয়ে দেয়ার জন্যে তার বিভাগের একজন টেকনিশিয়ানকে নির্দেশ দিলেন। সেই সাথে হট ওয়াটার ব্যাগের সেক নেয়ার এবং লম্বা জার্নির পর ব্যথা বাড়লে সিনাপল জাতীয় কোন ওষুধ খেয়ে নেয়ার পরামর্শ দিলেন। এরপর বেলা দেড়টার দিকে বারডেম হাসপাতাল থেকে কাশিমপুর- ১ কেন্দ্রীয় কারাগারের উদ্দেশে রওয়ানা করে প্রায় তিনটার দিকে পৌঁছলাম।

কারাগারের রুমে পৌঁছেই জোহরের নামাজ আদায় করে বাসা থেকে পাঠানো ক'টি স্যান্ডুইচ খেয়ে বিশ্রামে যাই। শাবান মাসের প্রথমার্ধে রোজা রাখা আমার ছাত্রজীবন থেকেই অভ্যাসের অংশ। ১৫ শাবান পর্যন্ত দুই সপ্তাহের বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে রোজা রাখার ইচ্ছা করেছি, কথাটা আমার বেগম সাহেবা এবং ছেলেকে বলতে ভুলে গেলাম।

গতকাল ২০ জুন ট্রাইব্যুনালে হাজিরার তারিখ ছিল। এখন চলছে শাবান মাস। আল্লাহর রাসূল (সা.) রজব মাস এলেই দোয়া করতেন-

"হে আল্লাহ রজব ও শাবান মাসে আমাদের বরকত দান কর। আর রমজান মাসে পৌঁছার তৌফিক দাও"। শুধু দোয়াই নয়, তিনি এই দুই মাসে রমজানের প্রস্তুতি স্বরূপ নফল এবাদত বন্দেগী নফল রোজা ও ছদকা বেশি বেশি আদায় করতেন। বিশেষ করে নেছফে শাবান (১৫ শাবান) পর্যন্ত বেশি বেশি রোজা রাখতেন। আবার শাবানের শেষার্ধে রাখতেন না। আমার পক্ষে হুবহু রাসূল (সাঃ) কে অনুসরণ সম্ভব না হলেও শাবানের প্রথমার্ধে কয়েকটি রোজা রাখি ১৫ শাবানসহ। এ মাসের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহের বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে রোজা রাখার চেষ্টা করছি। জেল জীবন ও কোর্টে আসা যাওয়ার মধ্যে রোজা রাখতে গিয়ে শারীরিক কষ্টের চেয়ে মানসিক কষ্টটাই হয় বেশি। কারণ মুক্ত জীবনে রোজা শেষে ইফতারের মুহূর্তটা হয়ে থাকে একটা উৎসবের মুহূর্ত। জেল জীবনে সেটা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। কাল তো মনে হচ্ছিল কোর্ট শেষে জেলখানায় পৌঁছার আগেই পথেই কোনমতে ইফতার সারতে হবে। তবে আল্লাহর মেহেরবানী রাস্তায় তেমন জ্যাম বা যানজট না হওয়ায় অন্য দিনের তুলনায় বেশ কম সময়ের মধ্যেই কাশিমপুর- ১ কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছেই ইফতার করার সুযোগ পেলাম।

এবারে যে সাক্ষীর জবানবন্দী রেকর্ড করা হল, ইতঃপূর্বে তাকে দুইবার অনুপস্থিত রাখা হয় অসুস্থতার অজুহাতে। কিন্তু তার জবানবন্দী থেকে এবং সরকারী প্রসিকিউটরের ভূমিকায় মনে হল, তাকে ভালভাবে মিথ্যা গল্প রপ্ত করিয়ে তারপরেই তাকে কোর্টে আনা হয়েছে সাজানো বানোয়াট ও অবান্তর অবাস্তব কথা বলানোর জন্যে। সাক্ষীর জবানবন্দী স্বতঃস্ফূর্ত নয়, প্রসিকিউটরের সাথে সাক্ষীর প্রশ্নোত্তরের মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ; মাঝে মধ্যে বিচারপতিদের আচরণ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয়। অতএব এখানে ন্যায় বিচরের আশা করা বাতুলতা মাত্র। যা হচ্ছে তাকে এককথায় বলা চলে ইতিহাসের জঘন্য মিথ্যাচারের মাধ্যমে বিচারের নামে হতে যাচ্ছে জঘন্যতম অবিচার। এনিয়ে ইতোমধ্যেই এই বিচারকে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও অস্বচ্ছও বিতর্কিত হিসাবে প্রশ্ন বিদ্ধ করা হয়েছে। আমার বলতে দ্বিধা নেই, দীর্ঘ ৪২ বছর পরে যাদের বিরুদ্ধে মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগ এনে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে '৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত বাংলাদেশের কোন থানায়ও একটি মামলার রেকর্ড নেই। তাদের বিরুদ্ধে আনীত সব অভিযোগই মিথ্যা বানোওয়াট এবং ভিত্তিহীন। এই সব অভিযোগের সপক্ষে যে সব সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হচ্ছে তাও সম্পূর্ণ মিথ্যা, ইতিহাসের জঘন্যতম মিথ্যাচার। সেই সাথে অভিযুক্তদের সাথে করা হচ্ছে নির্দয় নিষ্ঠুর অমানবিক আচরণ। আমাদের মামলা ঢাকায়, আমাদেরকে রাখা হয়েছে গাজীপুর জেলার কাশিমপুরে। যেখান থেকে ট্রাইব্যুনালে হাজিরা দেয়ার জন্যে ভোর ৬ টা থেকেই প্রস্তুতি নিতে হয়। যানজটের কারণে প্রায় দিনই ২-৩০ থেকে ৩-০০ ঘণ্টা সময় লেগে যায় কোর্টে পৌঁছতে। অথচ ঢাকা সেন্ট্রাল জেল থেকে ট্রাইব্যুনালে আসতে লাগে মাত্র ১০ থেকে ১৫ মিঃ সময়। একদিনে একই কোর্টে ২/৩ এমনকি ৪ জনকে হাজির করা হয়, যা কেবল মাত্র কষ্ট দেয়ার জন্যেই করা হয়।

www.pathagar.com

রমজানের প্রস্তুতি স্বরূপ শাবান মাসের প্রথমার্ধে রোজা রাখার অভ্যাস আমার ছাত্র জীবন থেকেই। কারাগারে বন্দী জীবনেও এ অভ্যাস একেবারে ত্যাগ করিনি। কিন্তু মুক্ত জীবনে নিজস্ব বাসায় অন্তরঙ্গ পরিবেশে এই রোজা যে আনন্দ বিশেষ করে সেহরী ও ইফতারের মুহূর্তে তা মনে হতেই হৃদয়ের গভীরে কেমন যেন একটি অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ পর্যন্ত দেখতে দেখতে তিনটি রমজান কেটে গেলে কারাগারে বন্দী অবস্থায়। দুটি রমজান কেটেছে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আর একটি কেটেছে কাশিমপুর-২ কেন্দ্রীয় কারাগারে। এবারে আসছে সামনে ৪র্থ রমজান মাস কাশিমপুর- ১ কেন্দ্রীয় কারাগারে। কেন যেন অবুঝ মন প্রতি রমজানকে সামনে রেখে মুক্ত পরিবেশে রোজা পালনের ও রমজান উদযাপনের আশায় অনেকটা অস্থির হয়ে ওঠে। রমজান মাসটাই ঈমানদারদের জন্যে আল-কোরআন নাজিলের কারণে "উৎসবের মাস"। এই উৎসবের প্রকাশ ঘটে একত্রে ইফতার করার মাধ্যমে ও তারাবির জামায়াতে কোরআন তেলাওয়াত শুনার মাধ্যমে। পারিবারিকভাবে সেহরীর সময়টা বেশ আনন্দঘন মুহূর্ত হিসাবেই বিবেচিত হয়ে থাকে। শেষ দশ দিনের ইতেকাফ এবং রমজান শেষে ঈদের অনুষ্ঠান সবটাই ঈর্ষণীয় আনন্দ উৎসবের এক নজিরবিহীন আয়োজন, জেল জীবনে যা থেকে বঞ্চিত আছি তিন বছরের প্রতিটি রমজানে। এবারেও কি সেই বঞ্চনার অবসান হবে না? আলেমুল গায়েব আল্লাহই জানেন আর কত দিন তাঁর ঐ বিশেষ নিয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে। আল্লাহ (আরবী) কুন ফাইয়াকুন এর মালিক তিনি চাইলে এবারের রমজানটা মুক্ত মানুষ হিসাবে পালনের সুযোগ অবশ্যই দিতে পারেন। আল্লাহ তো স্বীয় ঘোষণা মতে - "আল্লাহ তার নিজস্ব সিদ্ধান্তে অবশ্যই বিজয়ী" এতে কোন সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ নেই।

জুলাই মাসের ১, ২ ও ৩ তারিখে চট্টগ্রামে কোর্টে হাজিরার পূর্বনির্ধারিত তারিখ থাকায় ৩০ জুনে '১৩ রওয়ানা করার কথা। গত ২৬ জুন ট্রাইব্যুনালে ১১ তম সাক্ষীর জেরা শেষে ৭ জুলাইয়ে ট্রাইব্যুনালে হাজিরার পরবর্তী তারিখ দেয়া হল। অর্থাৎ চট্টগ্রাম থেকে ফিরে আসার পরের রোববারে। ৩০ জুন সকালের দিকে চট্টগ্রাম রওয়ানার জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে আছি। হঠাৎ ২৯ জুন ফজরের সময় বাবর সাহেব বললেন, আমাদের আজকেই নিয়ে যাবে, কারণ রবিবারে নাকি শিবির হরতাল দিয়েছে। গতরাত ৯ টার পরে জেল কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি ভেবেছি যদি নেয়াই হয় তাহলে তো সকাল ৯টা থেকে ১০টার মধ্যেই নেয়ার কথা। সেভাবেই সেবককে আমার লাগেজপত্র ঠিক করতে বললাম। ইতোমধ্যে বাবর সাহেব জানালেন, জেল কর্তৃপক্ষ বলেছে আমাদেরকে ২টা থেকে ৩টার মধ্যে নিয়ে যাবে। বাস্তবে আমাদের রওয়ানা করতে হলো প্রায় বিকেল ৪টার দিকে। গাজীপুরের সীমানা অতিক্রম করতে বেশ সময় লেগে যায় যানজটের কারণে। বিকেল ৫ টার দিকে গাড়িতেই আসরের নামাজ আদায় করে নিলাম। এবারে মিঠুরা কাশিমপুর জেল গেটের বাইরেই অপেক্ষা করছিল। বাসা থেকে পাঠানো কিছু খাবার তারা আমার গাড়িতে দিয়ে দিল। আমরা কুমিল্লার একটি সিএনজি স্টেশনে নেমে এস্তেঞ্জা অজু সেরে মাগরিব ও এশার নামাজ আদায় করে পুনরায় রওয়ানা হলাম। কুমিল্লা শহরের বাইরে আর একটা সিএনজি ফিলিং স্টেশন সংলগ্ন হোটেল থেকে মিঠু ও আঃ সাত্তার আমার ও অন্যান্যদের জন্যে খাবার প্যাকেট তুলে দিল। কুমিল্লা এলাকা অতিক্রম করে ফেনীর মধ্যে প্রবেশ করতেই জানা গেল, শিবির হরতাল প্রত্যাহার করেছে। হরতাল প্রত্যাহার করেছে তারা আবহাওয়াজনিত কারণে। আবার তাদের কেন্দ্রীয় সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে সরকারকে ক'দিন সময় দিয়ে পরবর্তী হরতালের আলটিমেটাম দিয়েছে।

আমরা অসম্ভব যানজটের মধ্য দিয়ে রাত ১টার দিকে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে পৌঁছি। ঘুমোতে যাই প্রায় রাত ২টার দিকে। সাথে ঘড়ি নেইনি। কাজেই ঘড়ির এলার্মের সাহায্যে ঘুম ভাঙ্গার কোন সুযোগ ছিল না। তবে আল্লাহ মেহেরবাণী করে ৩-৩০ টার দিকে জাগিয়ে দেন, অতএব ফজরের নামাজের আগে উঠতে পারব কিনা এ আশংকা আর থাকল না। আযানের আওয়াজ কানে আসার অনেক আগেই অজু

www.pathagar.com

করে আযানের অপেক্ষায় কিছু সময় কাটিয়ে নিলাম। ফজরের নামাজের আযান কানে আসতেই সেবককে সাথে নিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করে আবার ঘুমোতে যাই।

আজ হরতালও নেই কোর্টও নেই। অতএব কোরআন তেলাওয়াত শেষে সদ্য প্রকাশিত আমার একটা বইয়ের মুদ্রণজনিত ত্রুটি বিচ্যুতি যা আমাকে খুবই পীড়া দিচ্ছিল, ওটা সংশোধনের জন্যে বসে গেলাম। এটার কিছু কাজ ঢাকা থেকেই করে গিয়েছিলাম। এখানে এই অবসরে বইটা আগাগোড়া একবার ভাল করে দেখে নেয়ার চেষ্টা করলাম। বইটা সংশোধন করতে গিয়ে দেখলাম আমার ডান হাতের অবস্থা এখনও খুব একটা ভাল নয়, লিখতে গেলে হাতের আংগুল জড়িয়ে আসে। গতকাল ৫ জুন রোজ শুক্রবার সকাল ১১টার দিকে পরিবারের সাথে সাক্ষাতের স্লিপ এলো। এবারে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আমার ছেলে নাজিব মোমেন দেশের বাইরে থাকার কারণে আসতে পারেনি। অবশ্য জেল কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে আমাদের আইনজীবী টিমের প্রধান ব্যারিস্টার আঃ রাজ্জাক এসেছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংক্ষেপে ৫/৬ মিনিট আলাপ করার জন্যে। সে অত্যন্ত upright man হওয়ার কারণে ৫/৬ মিনিটের বেশি সময় নেয়নি। জেল কর্তৃপক্ষকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সে ৫/৬ মিনিটের তার কথা শেষ করে এবং আমাদের মতামত নিয়ে বিদায় নিল। অনেক দিন পূর্বে তার সাথে খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে আলাপের সুযোগ পেলেও বেশ ভাল লাগল। ব্যারিস্টার আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের বিদায়ের পর আমার বেগম সাহেবার সাথে এবং বড় মেয়ে মুহসিনা ফাতেমার সাথে আলাপ হল। তাদের মুখে আমি আজ পর্যন্ত কোন দিনই হতাশামূলক কোন কথা শুনিনি। আজও তারা বেশ আশার বাণী শুনানোর চেষ্টা করল। আমার বেগম সাহেবা ছেলে মেয়েদের ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে ইতিবচক ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। আমাদের দোয়া- আল্লাহ সুবহানহুতায়ালা কবুল করেছেন বলে আমি নিজে যেমন বিশ্বাস করি আমার বেগম সাহেবাও ঐ একই ভাষায় দোয়া করে অভ্যস্ত এবং এ দোয়াটা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে বলেও তার দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করে আমাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করায় আমারও ভাল লাগল। শুক্রবারে পারিবারিক সাক্ষাৎ শেষে একদিন পরেই ট্রাইব্যুনালে যেতে হয় পরপর দুইদিন। প্রথম দিন ৭ জুলাই সাক্ষাৎ হিসাবে জবানবন্দী দেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তার রথীন্দ্রনাথ কুন্ডু বাবু। ট্রাইব্যুনাল প্রদত্ত বইতে তার জবানবন্দীতে যেসব মিথ্যাচার করা হয়েছিল, তার বেশ কিছুটা এড়িয়ে গেলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়েও জঘন্য মিথ্যাচারের আশ্রয় নেয়। এবারে গ্রেফতারের পরই প্রথম তার সাথে পরিচয় হয়। আমিও জানতে পারলাম তার গ্রামের বাড়ী বেড়া থানার নাকালিয়ায় এবং পাবনা শহরেও দিলালপুরের তার বাড়ী আছে। ডাক্তার হিসাবে মাঝে মাঝে রোগী হিসাবে আমাকে দেখতে আসাতেই তার সাথে পরিচয়। এক পর্যায়ে সে বলে যে আমার ছেলে যেন তার সাথে দেখা করে। তার কথা মত আমার ছেলে দেখা করে আমাকে জানায় তার উদ্দেশ ভাল নয়, সে আমাদের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতেই বেশি আগ্রহী।

লোকটা আমার সাথে কথাবার্তার এক পর্যায়ে বলেছিল "আপনার কিছু হবে না, আপনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত যা হবে তাহলো সাক্ষী প্রমাণ নিশ্চিতভাবে না পাওয়ায় কোন শাস্তিমূলক রায় দেয়া গেল না।" তার কথায় মনে হল বিচার প্রক্রিয়ার সাথে তার একটা সম্পৃক্ততা আছে। আমাদের পুরো কারাগারের সাথীদের অনেকেই ইতঃপূর্বে মন্তব্য করেছে তার সম্পর্কে। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সুপার, জেলার সবাই তাকে তোয়াজ করে এবং ডাক্তাররাও তাকে ভয় পায়। তার সাথে সরকারেরই শুধু নয় সরকারের মুরুব্বী 'র' এর সাথেও তার ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। তার সাক্ষী সম্পূর্ণটাই শোনা কথার উপর ভিত্তি করে, যা একেবারেই মিথ্যা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। তার সাথে প্রথম পরিচয় হল এবারের জেলে এসে অসুস্থ হবার পর। সেও বলল, পাবনা শহরে বাড়ী হওয়ার কারণে মাওলানা আঃ সোবহান সাহেবের পরিবারের লোকদের সাথে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তবে আমাকে সে ইতঃপূর্বে কোথাও দেখে নাই। এমন কি তথাকথিত ১/১১ এর পর আমি দুইবার কেন্দ্রীয় কারাগারে থেকেছি, প্রথবারে ৫৬ দিন আর দ্বিতীয় দফায়

www.pathagar.com

১০ দিন। তখনও তার সাথে পরিচয় হয়নি। পরে তার মুখেই শুনেছি তিনি তখন ছিলেন কাশিমপুরে। ট্রাইব্যুনাল থেকে আমাদেরকে যে ক'টি বই দেয়া হয়েছে তার একটার মধ্যে সাক্ষীদের জবানবন্দী আছে, তাতে তার জবানবন্দীটা মনে হয়েছে বেশি হাস্যকর। আমার আইনজীবী মিজান সাহেবের বক্তব্য ছিল সে সাক্ষী দিলে আমাদের জন্যে ভাল হবে। তার সাক্ষী না দেবারও সম্ভাবনা ছিল। সে একদিন আমাদের এক ভাইকে (কারাগারের সাথী) বলে ছিল, সাক্ষীর তালিকা নাম থাকলে কি হল, আমি তো নাও যেতে পারি। তার একথা বলার কারণ ছিল, জেল সুপার এবং আইজিপিকে জানানো হয়েছিল, সে যেহেতু, আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে, তার জবানবন্দীতে যা বলেছে তাও দেখার সুযোগ হয়েছে, অতএব আমাকে দেখার জন্যে আর যেন কখনও তাকে পাঠানো না হয়। একথাটি তার কাছে পৌঁছার পূর্বে সে সম্ভবত মাওলানা সাঈদী সাহেবের কাছে একথাটা বলেছিল।

আমার বারডেমে চিকিৎসার কোর্ট অর্ডার সত্ত্বেও সে আইজিকে মিথ্যা রিপোর্ট দিয়ে আমার চিকিৎসা আটকিয়ে রেখেছিল।

একজন ডাক্তার আমাকে তার নাম গোপন রাখার শর্তে জানায়, কুণ্ডু বাবু আইজি প্রিজনারকে জানিয়েছে, আমি নাকি চিকিৎসার বাহানায় পরিবারের লোকদের সাথে খোশগল্পে সময় কাটাই। ঐ ডাক্তার আইজি সাহেবকে এ ব্যাপারে জানান যে কুণ্ডু বাবুর দেয়া রিপোর্ট সত্য নয়। এরপর আইজি সাহেব নিজে একদিন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ২৬ সেলে অবস্থানরত ভি,আই,পি বন্দীদের সাথে আলাপকালে তিনিও বলেন, যে একজন হিন্দু ডাক্তার নেতিবাচক রিপোর্ট দিয়েছিল, তবে আমি জেনেছি তার রিপোর্ট সত্য নয়। এরপর আইজি সাহেব নিজে সুপার এবং জেলারকে বলে গেলেন, আমাকে নিয়মিত ফিজিওথেরাপির জন্যে বারডেমের চাহিদা অনুযায়ী পাঠানোর ব্যবস্থা করতে। এরপর আমি একটানা দশদিন ফিজিওথেরাপি নেয়ার জন্যে বারডেমে যাওয়ার সুযোগ পাই। তবে চট্টগ্রাম কোর্টে হাজিরা দেয়ার জন্যে একটানা থেরাপি নেয়ায় বাধাগ্রস্ত হয়। বারডেমে ফিজিওথেরাপি নেয়ার প্রেসক্রিপশন দিলেও কুণ্ডু বাবু ওটা ঠেকানোর চেষ্টা করেন। তবে আইজি সাহেবের কারণে ঠেকাতে পরেননি। তার সম্পর্কে শুনেছি, সে আচার আচরণে উগ্রদাম্ভিকতার পরিচয় দিয়ে থাকে। সাধারণ বন্দী রোগীদের সাথে মারাত্মক দুর্ব্যবহার করে, এমনকি মারধরও নাকি করে থাকে। ভিআইপি রোগীদের সাথেও সে খারাপ ব্যবহার করতে দ্বিধাবোধ করতো না। রাগ করে মারাত্মক রোগীও না দেখে চলে যেতে দেখেছি।

দেখতে দেখতে চলে আসছে আল-কোরআন নাজিলের উৎসবের মাস রমজানুল মুবারক। আজ চাঁদ দেখা গেলেই আগামীকাল থেকে শুরু হবে রহমত, মাগফেরাত ও নাজাতের পবিত্র মাসের রোজা পালন। আমার জেল জীবনের তৃতীয় বছর শেষ হয়ে শুরু হল চতুর্থ বৎসর। জেল জীবনে সামনের রোজাও হবে চতুর্থ রোজা। এই পবিত্র রোজার মাসটি ছাত্র জীবন থেকে যে ভাবে পালন করে আসছি, জেল জীবনে সেই অপূর্ব আনন্দঘন পরিবেশ থেকে বঞ্চিত থাকার অনুভূতি যে কত গভীর কত বেদনার তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। পারিবারিক পরিবেশে সেহরী ও তারাবিহ শেষের হালকা নাশতার আনন্দের কথা স্মরণ হতেই বুকের মাঝে কেমন যেন একটা বেদনা অনুভূত হয়। সাংগঠনিকভাবেও গণ উপস্থিতিতে ইফতারের আনন্দ এখানে শুধু স্মৃতি হয়েই হৃদয়ে সৃষ্টি করে এক অন্য রকমের অনুভূতি। আমি তো সফরেও তারাবিহ বাদ দিতাম না। আমাদের কেন্দ্রীয় অফিসের সংলগ্ন মসজিদের তারাবিহতে অংশ নিয়ে আমি খুবই মজা পেতাম। এবার নিয়ে পরপর চারটি রমজানে সেই মজা, সেই আনন্দ উৎসব থেকে বঞ্চিত থাকতে হচ্ছে। জানি না আল্লাহ এর মধ্যেই হয়ত আমাদের জন্যে কোন বৃহত্তর কল্যাণ রেখেছেন। আজ চাঁদ দেখা যাবার সম্ভাবনা আছে, অতএব আগামীকাল থেকে রোজা রাখার জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছি। ঘটনাক্রমে আবার আগামীকাল ট্রাইব্যুনালে হাজিরারও তারিখ নির্ধারিত হয়েছে। পবিত্র রমজানের প্রথম রোজাতেই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শুনতে হবে জঘন্য মিথ্যাচার।

www.pathagar.com

রমজানের রোজা পালনের সাথে প্রাথমিকভাবে জড়িত সেহরী, তারাবিহ, ইফতার ছাড়াও দিনের একটা উল্লেখযোগ্য সময় কাটে কোরআন তেলাওয়াত, হাদিসের গ্রন্থসহ বিভিন্ন ইসলামী সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে। আমার দীর্ঘদিনের অভ্যাস ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত সারা বছরের কোরআন ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট কেতাবাদি সারা বছরের তুলনায় এই একমাসেই বেশি পড়া শোনা করতাম। কিন্তু এবারের জেল জীবনে রমজান মাসে কোর্টে যাওয়া আসা, বিশেষ করে চট্টগ্রাম যাওয়া আসার কারণে দীর্ঘদিনের গড়ে উঠা অভ্যাস আর ঠিক রাখতে পারছি না। এমনিতেও অন্যান্য মাসেও এই যাতায়াতের কষ্টের কারণে মনের চাহিদা অনুযায়ী লেখাপড়া করা মোটেই সম্ভব হচ্ছে না। এই শারীরিক কষ্টের সাথে মানসিক চাপটাও আমার লেখা পড়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। আমার তিন ছেলে এক মেয়ে দেশের বাইরে থাকায় ওদের কখন কোন সমস্যা হয় সে দুশ্চিন্তা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখাও মানবিক কারণে খুব একটা সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। বিশেষ করে আমার মত নরম দিলের মানুষের পক্ষে তো মোটেই সহজ নয়। সপ্তাহে একদিনের আধা ঘন্টার পারিবারিক সাক্ষাতে ঐ তিন ছেলে এক মেয়ের খবরের জন্যেই বেশি পেরেশানীর সাথে অপেক্ষা করি। আমার বেগম সাহেবার মুখে নাতি নাতনিদের গল্প শুনে বড্ড লোভ হয় ওদের একনজর দেখার জন্যে। ওদেরকে প্রাণভরে একটু আদর করার জন্যে মনটা বেশ ছটফট করে। এবারে ট্রাইব্যুনালে হাজিরা ছিল ১০ জুলাই বুধবার। এই তারিখে শ্যামলি নাসরিন নামের এক মহিলা তার স্বামী হত্যার ঘটনার সাক্ষী হিসাবে ট্রাইব্যুনালে আসে। তার জবানবন্দী শেষে জেরা অসামাপ্ত রেখে পরের দিন ১১ জুলাই বৃহস্পতিবারেও তারিখ দেয়া হল। ঘটনাক্রমে ঐদিন ১ম রমজান হওয়ায় অন্যান্য দিনের তুলনায় একটু বেশি কষ্টই হয়। সেহরীর পর ফজরের নামাজ শেষে একটু ঘুমোনোর প্রয়োজনটা একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু কাশিমপুর থেকে ট্রাইব্যুনালে যেতে হলে রওয়ানা দিতে হয় ভোর ৭টা ৭-৩০ টার মধ্যে। এ জন্যে আর ফজরের পরে বিশ্রাম নেয়া বা ঘুমানোর সুযোগ থাকে না।

ভদ্র মহিলার জবানবন্দীকে একটা সাজানো গল্পের মত মনে হল। ইতঃপূর্বে টেলিভিশনে একই বিষয়ে তার সাক্ষাৎকার দেখেছি, কোথাও আমার নাম সে উচ্চারণ করেনি। তার সব গুলো সাক্ষাৎকারে, আল বদরের নেতা হিসাবে দেখানো হয়েছে মাওলানা আব্দুল মান্নানকে। আজকের জবানবন্দীতেও তাকেই আল বদরের অর্গানাইজার বলা হয়েছে। তার বাড়ীর পাহারায় নিয়োজিত সকল যুবকদেরকে বলা হয়েছে আলবদরের লোক। এটাতো কিছুতেই বাস্তব সম্মত হতে পারে না। কারণ মাওলানা আঃ মান্নান ছিলেন আইয়ুব খানের কনভেনশন মুসলিম লীগের পূর্ব পাকিস্তানের জেনারেল সেক্রেটারী। আইয়ুব আমলে জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এটা সকলের জানা কথা। সেই দলের নেতা মান্নান সাহেবের সাথে জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ছাত্রসংঘের কোন সুসম্পর্ক থাকার প্রশ্নই উঠে না। ঐ মওলানা আব্দুল মান্নান যদি আল-বদরের অর্গানাইজার হয়, তাহলে তার সাথে জামায়াতে ইসলামী এবং ছাত্র সংঘের কেউ তো তার সাথে জড়িত থাকারও প্রশ্ন উঠে না। ট্রাইব্যুনালের কাঠগড়ায় বসেই শুনলাম ঐ ভদ্র মহিলা তার স্বামী শহীদ বুদ্ধিজীবী ডা. আব্দুল আলীমের উপর একটা বইও লিখেছেন, যাতে কোথাও তার স্বামী হত্যার ব্যাপারে আমাকে জড়িয়ে কোন বক্তব্য লেখা নেই। পরের দিন ১১ জুলাই পয়লা রমজানে জেরার সময় ঐ মহিলার বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রদত্ত সাক্ষাৎকার, শর্মিলা বসুর লেখা বইয়ে তার প্রদত্ত সাক্ষাৎ সম্পর্কেও আমার আইনজীবীর প্রশ্নে মহিলা আবোল তাবোল ব্যাখ্যা দেয়র চেষ্টা করে তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে দেয়া জবানবন্দী সম্পর্কেও অদ্ভুত ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করে। এই মুহূর্তে সরকারী সাক্ষীর বেহাল অবস্থা সামাল দেয়ার জন্যে সরকারী আইনজীবীদের মধ্য থেকে জনৈক মুহাম্মদ আলী সহ বেশ কয়েকজন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। তাদের ভূমিকায় মনে হয়েছে তারা পেশাদার আইনজীবী নয় বরং রাজনৈতিক মাস্তানের ভূমিকা পালন করছে। সাক্ষীর নিজের লেখা বইয়ের ভিত্তিতে সাক্ষীকে জেরা করা থেকে আমার আইনজীবীকে বারণ করার জন্যে ট্রাইব্যুনালের বিচারপতিদের প্রতি আহ্বান জানাতে থাকে আমাদের আইনজীবীকে চাপ দিতে থাকে।

www.pathagar.com

আমার আইনজীবী মিজানুল ইসলাম সাহেব বেশ সাহসের সাথে, বলিষ্ঠতার সাথে তার জেরা চালিয়ে যান। আগের দিন তার জবানবন্দী শেষে যে প্রশ্নটি দিয়ে জেরার সূচনা করা হয়, তা ছিল "আপনি ডা. ওয়াকিল আহমদ নামে কাউকে চিনতেন কিনা। ভদ্র মহিলা জবাবে বলে, না এই নামে কাউকে চিনতাম না। পরের জেরায় মিজান সাহেব তার বইয়ের পৃষ্ঠা ধরে ধরে অনেক প্রশ্ন করলে মহিলা আবোল তাবোল ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে ভদ্র মহিলার নিজের লেখা বইতে উল্লেখ করেছে, তার স্বামী ডা. আলীমের ডায়রিতে ডা. ওয়াকিল আহমদের ফোন নম্বর পেয়ে তাকে ফোন করে ডা. আলীম সাহেবের অবস্থান জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'ডা. আলীম আর বেঁচে নেই। কাউকে বলবেন না, তাকে মুক্তিযোদ্ধারা ধরে এনে মেরে ফেলেছে।" মহিলা এরপর লিখেছে, তার কথা শুনে তাকে বড় মিথ্যাবাদী বলে মনে হয়েছে, আসলে ১৫ ডিসেম্বর বিকেল ৪-৩০ টায় ঢাকার পরিস্থিতি কেমন ছিল এ সম্পর্কে যাদের সামনে ধারণাও আছে তাদের কাছে ডা. ওয়াকিলের বক্তব্য অবিশ্বাস্য হবার কথা নয়।

ভদ্র মহিলার বই থেকে এই সব উদ্ধৃতি দিয়ে জেরা করা হতে পারে এবং সাক্ষী বেকায়দায় পড়তে পারে, এটা সরকার পক্ষের আইনজীবীদের পক্ষে অনুমান করা সম্ভব হয়নি। আর ঐ মহিলা নিজে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে এবং নিজের লেখা বইয়ে কী লিখে রেখেছে এ সম্পর্কে তাদের কোন হোমওয়ার্কও ছিল না। তাই গায়ের জোরে জেরা করা থেকে আমাদের আইনজীবীকে বাধা প্রদানের জন্যে বার বার অপচেষ্টা করে। আল্লাহর মেহেরবানীতে মিজান সাহেব তার জেরা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হন। পরের দিন ১২ই জুলাই শুক্রবার ছিল আমার পারিবারিক সাক্ষাতের নির্দিষ্ট দিন। সপ্তাহের এই একটি দিনের জন্যে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষায় থাকতে হয়। কারা জীবনে পরিবারের লোকজনের সাথে সাক্ষাতের সময়টি যদিও মাত্র ৩০ মিঃ তবুও বন্দীদের জন্যে এটি মহামূল্যবান।

আজকের সাক্ষাতে যাওয়ার জন্যে সকাল ৯টার মধ্যেই তৈরি হয়ে বসে আছি। একটু কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সময় কাটাচ্ছি। মাওলানা আব্দুস সোবহান সাহেবের সাক্ষাতের লোক এসে গেল। কিন্তু সাক্ষাতের এখনও কোন খবর নেই। তবে মাওলানা আব্দুস সোবহান সাহেবকে যে সেবক গেটে রেখে রুমে ফিরে আসলো, তার কাছে শুনলাম আমার পরিবারের লোকেরা এসে গেছে। তবে স্লিপ পাঠাতে একটু দেরী হচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে সিআইডি জমাদার স্লিপ নিয়ে আসতেই রওয়ানা করলাম গেটের দিকে। গেটে পৌঁছতেই মাওলানা আঃ সোবহান সাহেবের সাক্ষাতের সমাপ্তি ঘটে। উনি ও উনার পরিবারের লোকেরা রুম থেকে বের হওয়ার পরেই গেটের বাইরে থেকে আমার পরিবারের লোকদেরকে নিয়ে আসা হল। অনেক দিন পরে এবারে আমার বড় জামাই সাইফুল্লাহ মানসুর আসায় খুব ভাল লাগল। তবে ছেলে মোমেন বিদেশে থাকায় এবারে আসতে পারেনি। গত তারিখেও তার পক্ষে একই কারণে আসা সম্ভব হয়নি। আশা করছি ইনশাআল্লাহ আগামী সপ্তাহে ছেলে সাক্ষাতে আসতে পারবে। সাথে বৌমাও আসবে আশা করি।

শুক্রবারের সাক্ষাৎ শেষে ফিরে মনটা বেশ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল আমার বড় বোনের মেঝ ছেলের দুঃসংবাদ শুনে। অল্প বয়সেই সে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়। পায়ে ঘা হওয়ায় গ্যাংরিন হয়ে যায়। বারডেমে চিকিৎসার জন্যে ভর্তি হবার পর তার একটা পায়ের হাঁটুও গোড়ালীর মাঝখান থেকে কেটে ফেলতে হয়েছে। বাপ মারা যায় ওর দেড়/দু'বছর বয়সের সময়। আর মা মারা গেছে অবশ্য ওর বিয়ে শাদী হওয়ার পরে। টগবগে যুবক অনিয়ম ও অযত্নের ফলে এই সর্বনাশা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত এভাবে দুর্ভাগ্যের শিকার হল। তার জন্যে মনের অজান্তেই দুশ্চিন্তায় আমিও বেশ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম। তার এই দুঃসময়ে তাকে একটু দেখতেও পারলাম না। অবশ্য তার চিকিৎসার জন্যে খালেদ বেশ কিছু টাকা পাঠিয়েছে শুনে খুশী হলাম। ছেলে আমার পক্ষ থেকে তার ফুফাতো ভায়ের দুঃসময়ে কিছুটা হলেও ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেছে দেশের বাইরে থেকেও। পরের দিন শনিবারটাও কেটে যায় এই দুশ্চিন্তা নিয়েই।

www.pathagar.com

রবিবার ১৪ জুলাই আমরা সকাল ১০-৩০ মিনিটে চট্টগ্রামের দায়রা জজ কোর্টে ১৫ জুলাই হাজিরা দেয়ার জন্যে রওয়ানা করি। কুমিল্লার একটা সিএনজি ফিলিং ষ্টেশনে গাড়িতে গ্যাস নেওয়ার সময় আমরা এস্তেঞ্জা অজু সেরে নামাজ আদায় করে আবার চট্টগ্রামের দিকে রওয়ানা করি। নামাজের সময়ই বাবর সাহেব বললেন, আগামী কাল তো ট্রাইব্যুনাল গোলাম আযম সাহেবের ব্যাপারে রায় দেবে। আজ ১৫ জুলাই (২০১৩) চট্টগ্রাম দায়রা জজ আদালতে আমাদের হাজিরা দেবার কথা। কিন্তু হরতালের কারণে কোর্ট বসেনি। তাই অলস সময় কাটাচ্ছি চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে কখনও বসে কখনো শুয়ে। আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ মুরুব্বী সাবেক আমীরে জামায়াত অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের বিরুদ্ধে রায় দেবে আজ "আন্তর্জাতিক মানবতাবিরোধী অপরাধ ট্রাইব্যুনাল"। আওয়ামী ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের এক কঠিনতম অধ্যায় পার করতে হচ্ছে এদেশের ইসলামী আন্দোলনকে। জামায়াতে ইসলামী সাধ্যমত রাজনৈতিকভাবে মাঠে ময়দানে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করছে। আইনী লড়াইয়ে যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিচ্ছে, কিন্তু এরপরও সরকার তাদের ব্লুপ্রিন্ট অনুযায়ী, জামায়াত নির্মূলে হিংসাত্মক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিকভাবেও এ বিচারের স্বচ্ছতা নিয়ে বিতর্কের সূচনা হচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের কণ্ঠস্বর হিসাবে ও,আই,সি'র সেক্রেটারী জেনারেল সরকারকে এই অস্বচ্ছবিচার প্রক্রিয়া বন্ধের আহ্বান জানালেও কোন কাজ হয়নি। আল্লাহর কুদরতি ব্যবস্থা ছাড়া আওয়ামী লীগ সরকারের এই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অবসানের কোন সম্ভাবনা আছে বলে মনে হচ্ছে না।

জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবির জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাজনৈতিকভাবে এ পরিস্থিতির মুকাবিলা করছে। শুনছি, জনগণের মধ্যে জামায়াতের প্রতি বেশ সহানুভূতি সৃষ্টি হচ্ছে। তবে এ জন্যে জামায়াতকে মূল্য দিতে হচ্ছে অনেক বেশি। আল্লাহতায়ালা বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের ভাগ্যে কী রেখেছেন তাতো এক মাত্র তিনিই জানেন। তবে মুমিনের জন্যে কোন অবস্থায় হতাশ হওয়ার সুযোগ নেই। গোলাম আযম সাহেবের রায় ঘোষণার আগে আবারও শাহবাগে তথাকথিত গণজাগরণ মঞ্চকে মাঠে নামানো হয়েছে। ইতঃপূর্বে এই গণজারগণ মঞ্চকে কেন্দ্র করে দেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমে দ্বীন হযরত মাওলানা শাহ আহমদ শফীর নেতৃত্বে প্রতিবাদের ঝড় উঠে ছিল। তাতে সরকারই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গতকালের পত্রিকায় মাওলানা শাহ আহমদ শফীকে লক্ষ্য করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে কটাক্ষপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছেন, তা মূলত এই সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমেদ্বীনের নেতৃত্বে গড়ে উঠা আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। দ্বীনের পক্ষে, হকের পক্ষে শক্ত অবস্থান নেয়াটাই ইসলাম বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের কাছে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। তারই জলন্ত নজির হেফাজতে ইসলামের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকারের এবং সকল ইসলাম বিরোধী মহলের মারমুখী ভূমিকা।

সরকার জামায়াতের বিরুদ্ধে যে ভূমিকা পালন করছে, নজীরবিহীন হিংসাত্মক অভিযান চালাচ্ছে তার মূল কারণ জামায়াতে ইসলামী, বাংলাদেশে ইসলামের পক্ষে একটি সংগঠিত শক্তি হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। ৪২ বছর পরে মানবতাবিরোধী অপরাধের নামে যে সব অভিযোগ আনা হচ্ছেতা ইতিহাসের জঘন্যতম মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। সরাসরি ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া যায় না তাই বাঁকা পথে মিথ্যা বানাওয়াট কল্পকাহিনীর আশ্রয় নিয়ে দলীয় লোকদের মাধ্যমে তদন্তের নামে হিংসাত্মক রাজনৈতিক অভিযান চালিয়ে বিচারের নামে করা হচ্ছে অবিচার। তারা ভেবেছে এভাবে ইসলামী আন্দোলনের প্রথম সারির কিছু ব্যক্তিকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিলেই ইসলামী আন্দোলন শেষ হয়ে যাবে। তাদের এই চিন্তা বা ধারণা কতটা বাস্তব তা আগামী দিনের ইতিহাস বলে দেবে। তবে তাদের মনে রাখা উচিত অতীতে দাউদ হায়দার রাসূল (সাঃ) এর অবমাননা করে যে কবিতা লিখেছিল তখন রাজনৈতিক ময়দানে জামায়াতে ইসলামীর অস্তিত্ব ছিল না। তারপরও প্রতিবাদের ঝড় উঠায় তাকে দেশ ত্যাগ করতে হয়েছিল। এবারে গণজাগরণের যে মঞ্চ করা হয়, তাদের ইসলামী বিদ্বেষী ভূমিকার বিরুদ্ধে জামায়াতে ইসলামীকে কিছুই করতে হয়নি। প্রথমবারে তাদের নামানো ছিল সরকারের একটা ভুল পদক্ষেপ, যার

www.pathagar.com

ফলে সর্বস্তরের আলেম ওলামা আওয়ামী সরকারকে ইসলাম বিরোধী সরকার হিসাবে চিত্রিত করেছে। সিটি করপোরেশনের নির্বাচনে সরকার তার জবাবও পেয়েছে। তাই সরকারের জামায়াত নির্মূল অভিযান বা জামায়াতকে নেতৃত্ব শূন্য করার অভিযান আপাতত সফল হলেও চূড়ান্ত পরিণতি কী হবে তা আলেমুল গায়েব আল্লাহই ভাল জানেন। তবে অতি সম্প্রতি দেশের পাঁচটি সিটি করপোরেশনের নির্বাচনের ফলাফল তার একটা আগাম বার্তা দেয় কিনা তাও ভেবে দেখার মত।

গতকাল থেকে বিদেশে অবস্থানরত তিন ছেলে ও এক মেয়ের কথা কেন যেন একটু অস্থিরতার সাথে মনে পড়ছে। বিশেষ করে বড় ছেলে তারেককে দেখি না ছয় বছর হয়ে গেল। গ্রেফতার হবার আগে প্রায়ই অন লাইনে দেখা হত কথা হত। কিন্তু গ্রেফতারের পর থেকে তিন বছর গত হল তার সাথে কোন কথা বার্তাও হয় না। মাঝখানে আমার ছোট মেয়ে খাদিজা এসেছিল। সে তার ছেলেসহ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কয়েকবার দেখা করে গেছে। তালহা গত বছর জুলাই আগস্টের দিকে তার অনার্স পরীক্ষা চলাকালে মাঝে কয়দিনের গ্যাপ থাকায় এসে দেখা করে গেছে। অবশ্য তার মালয়েশিয়ায় ফিরে যাবার আগের দিন দেখা করতে এসেও দেখা করতে পারেনি, জেল কর্তৃপক্ষের অমানবিক আচরণের কারণে। পারিবারিক সাক্ষাতের নির্ধারিত দিনে "সেফ হোমে" জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে যেতে হবে, বিধায় পরিবারের লোকেরা আগের দিন দেখা করার অনুমতি চেয়েছিল। এভাবে অতীতে আমাদের কোন কোন সাথীদের পরিবার সাক্ষাতের অনুমতি পেলেও আমার পরিবারের জন্যে সে সুযোগটা না দেয়ায় ছোট ছেলেটা যাবার আগে আমাকে দেখতে না পাওয়ার মনোকষ্ট নিয়েই বিদেশে যেতে বাধ্য হয়েছে। ছোট ছেলে বিদেশে যাবার আগের দিন আমাকে দেখতে এসে এভাবে দেখা করতে না পারায় আমারও মনে দারুণ কষ্ট অনুভব করি। খালেদ গ্রেফতার হবার ছ'মাস আগে অস্ট্রেলিয়া গিয়েছে, সেও এবার এসেছিল গত ঈদুল আজহার আগে। ঈদুল আজহার দিনও সে দেখা করে তারপর ফিরে গেছে অস্ট্রেলিয়ায়। কিন্তু তারেক (বড় ছেলে) ২০০৬ এর মাঝামাঝি সময় পিএইচডি করার জন্যে আমেরিকায় যাবার পর থেকে এ পর্যন্ত আসতে পারেনি। গ্রেফতার হবার পর কয়েকবার তার আম্মার মাধ্যমে আসার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেও আমি আসার অনুমতি দেইনি। মাঝে মাঝে তার কথা খুব বেশি বেশি মনে পড়ে। তার পিএইচডি ডিগ্রী প্রদান অনুষ্ঠানে আমাদের অনুপস্থিতিতে তার মনেও বেশ কষ্ট অনুভূত হয়েছে তার পাঠানো ম্যাসেজ থেকে যেটা বুঝা যায়। বাইরে থাকা তিন ছেলে ও এক মেয়ের কথা বেশ আবেগ অনুভূতিসহ মনে হচ্ছিল। বিশেষ করে বড় ছেলে তারেক এবং ছোট ছেলে তালহার কথা। আল্লাহ তাদেরকে এবং আমাকে বাস্তব অবস্থা মেনে নিয়ে ছবর করার তৌফিক দিন, এই সময়ের বড় প্রার্থনার অন্যতম প্রার্থনা এটাও।

এবারে মাহে রমজানের তৃতীয় দিনে চট্টগ্রামে আসতে হয়েছে আর একটি হয়রানী মূলক মামলার হাজিরা দেয়ার জন্যে। হরতালের কারণে আজ ১৫ জুলাই কোর্টে যেতে হয়নি। আগামীকাল ও পরশু অর্থাৎ ১৬ এবং ১৭ জুলাই কোর্ট আছে। তার পরের দিন ১৮ জুলাই কাশিমপুরের উদ্দেশে রওয়ানার আশা করছি। এবারে চট্টগ্রামে আসার সময় একটা জরুরি ওষুধ আনতে ভুলে গেছি। কাশিমপুরে ফিরে যেতে যেন আর দেরী না হয় মনে মনে এ অনুভূতিও একটু অস্থিরতার সৃষ্টি করছে। চট্টগ্রামের আদালত সাধারণত ১০/১২ দিনের ব্যবধানে তারিখ দিয়ে থাকে ফলে কোন কোন মাসে ৩ বারও আসতে হয়। এবারে রমজানের ৪, ৫, ৬ এরপর আবারও আসতে হলে ভীষণ কষ্ট হবে। ওদিকে ট্রাইব্যুনালে তারিখ আছে ২১ জুলাই। কাশিমপুর থেকে রোজার দিনে ট্রাইব্যুনালে সাত সকালে রওয়ানা করে আসতেও বেশ কষ্ট হয়। এত কষ্টের অবসান কবে হবে, আদৌ হবে কিনা আল্লাহই ভাল জানেন। মাঝে মাঝে আশা জাগে, মনে হয় খুব শিগগিরই এ কষ্টের অবসান হবে।

কঠিন অবস্থার সাথেই আছে সহজ অবস্থা আগমনের শুভ সম্ভাবনা আল্লাহ সুবহানাহুতায়ালার এই বাণীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসই আমার এই আশাবাদের ভিত্তি। এ পর্যন্ত আঃ কাদের মোল্লা, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, কামারুজ্জামানের বিরুদ্ধে রায়ের পর থেকে এদের সাথে আর দেখা সাক্ষাতের সুযোগ

www.pathagar.com

হচ্ছে না। আজ আমার পরম শ্রদ্ধেয় মুরুব্বীর ব্যাপারে ট্রাইব্যুনালের রায়ের পর উনাকে জেল কর্তৃপক্ষ কোথায় রাখবে, কিভাবে রাখবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে কোর্টে এ পর্যন্ত মাঝে মধ্যে অন্যদের মত তার সাথেও দেখা হত এখন আর সেটার কোন সুযোগ থাকলো না। আল্লাহ যেন তার কুদরতি ব্যবস্থায় আবার ময়দানে এক সাথে আমাদের সবাইকে তার দ্বীনের পক্ষে সক্রিয় এবং শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আবার কাজ করার তৌফিক দান করেন সে জন্যে অহর্নিশ আল্লাহর দরবারে দোয়া মুনাজাত করে যাচ্ছি। আল্লাহকে পূর্ণ আস্থা নিয়ে বলছি, তুমি তো দোয়া করার নির্দেশ দিয়েছো। আবার দোয়া কবুলের আশ্বাসও দিয়েছো। তোমারই নির্দেশ পালন করে দোয়া করছি, আমাদের জন্যে তোমার অনেক বান্দা ও বান্দীও দোয়া করছে। আল্লাহ তুমি এবার তোমার আশ্বাস অনুযায়ী সকলের দোয়া কবুল করো, আমাদেরকে সকল বিপদ-আপদ, বালা-মুছিবত থেকে মুক্তি দাও, মুক্তি দাও মামলা মুকদ্দমার মুছিবত থেকে, মুক্তি দাও পরিবার ও সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্নতার মুছিবত থেকে এবং কারাগারের মুছিবত থেকে। (আমীন)

***

www.pathagar.com